[প্রথম পর্ব, প্রথম খণ্ড]

প্রবোধকুমার সান্যাল

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

অতনু ও শান্তনুকে

॥ প্রবোধকুমার সান্যালের অন্যান্য বই ॥

বিবাগী ভ্রমর
মনে রেখো
দেবতাত্মা হিমালয় (১ম ও ২য়)
রাশিয়ার ডায়েরী
মহাপ্রস্থানের পথে
কাঁচকাটা হীরে
নিত্য পথের পথী
গঙ্গাপথে গঙ্গোত্রী
বেলোয়ারী
তুচ্ছ
আগ্নেয়গিরি
উত্তরকাল
নওরঙ্গী
জনম জনম হম
দেশদেশান্তর
এক চামচ গঙ্গা

জলকল্লোল
হাস্নুবানু
বনহংসী
আঁকাবাঁকা
দুই পাখী
অগ্নিসাক্ষী
উত্তর হিমালয় চরিত
নগরে অনেক রাত
তিন কন্যার ঘর
প্রভৃতি

পূর্বভাষণ

'বনস্পতির বৈঠক' প্রথম পর্ব পর-পর দুই খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। এই গ্রন্থ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশকালে নানা বিতর্ক দেখা দিয়েছিল।

সকল মানুষেরই সমগ্র জীবন বিরাট একখানা গ্রন্থের মতো। ভাগ্যনিয়ন্তা অন্তরাল থেকে এই গ্রন্থ রচনা করে চলেছেন। সেই বিরাট গ্রন্থ থেকে ছোট ছোট কয়েকটি টুকরো তুলে নিয়ে এই স্মৃতিচারণ। এই স্মৃতিচারণে একটি বিশেষ কালের পটভূমিকে ধরা হয়েছে যার আরম্ভ ১৯০৫-এ, এবং যেটি শেষ হয়েছিল ১৯৩৪-এ। এই কালটিকে ধরে আমার নিজের তৎকালীন কয়েকটি ছবি এঁকে গিয়েছি অনেকটা মুক্তহস্তে—যখন আমার মতো অনেকেরই বয়োগ.ত্তীর্ণ এসে পৌছয়নি। সুতরাং সে-ক্ষেত্রে পুরুষই হোক বা মেয়েই হোক—বিশেষ বয়সের স্বাভাবিক চঞ্চলতা, ভুল-ত্রুটি, আদর্শ-সংঘর্ষ, স্খলন-পতন, অনাচার-স্বেচ্ছাচার—এগুলি যেমন বয়সোচিত প্রভাবের জন্য এসেছে তেমনি সেই কালের প্রাণরক্ষার কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দ্বন্দ্বের দোলা, অর্থনীতিক উৎপীড়ন, নিত্যজীবনের হতাশা ও নৈরাশ্য, দুর্যোগ-দুর্দশা, যন্ত্রণা ও বেদনা—এরাও এসেছে। কিন্তু সেইকালের তরুণ-তরুণীরা একালে হয়ে উঠেছেন দাদামশায় ও দিদিমা। সুতরাং তাঁদের প্রবীণ বয়সে সম্ভবত সামাজিক বা পারিবারিক কারণে তাঁরা তরুণ যৌবনের কালকে স্মরণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন্। এটি স্বাভাবিক।

এই বৈঠকের বিতর্কে যাঁরা যোগদান করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ্, সমাজকর্মী, জননেতা, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ্, মহিলানেত্রী, সাহিত্যকর্মী, নানা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ছাত্রনেতা, প্রাক্তন পুলিস কর্মচারী ও সম্পাদক প্রভৃতি অনেকে। কেউ কেউ আমার তথ্যগত ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে দিয়েছেন, কেউ কেউ বা ভুল ধরতে গিয়ে নিজেরাই ভুল করে বসেছেন। যাই হোক, এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

স্মৃতিচারণের শ্রেষ্ঠ পরিচয় সত্যরক্ষার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। আত্ম-গোপনশীলতা বা অপলাপবৃত্তি স্মৃতিচারণের প্রধান শত্রু। তথ্যে, তারিখে, অজ্ঞানে, উদ্ধৃতিতে, বা স্মৃতি বিচ্যুতির কারণে একটু আধটু ভুল এখানে-ওখানে ঘটতে পারে, কিন্তু মূল সত্য দাঁড়িয়ে থাকে আপন অন্তর্নিহিত শক্তিতে।

তাকে বিকৃত করা অপরাধ। নির্ভুল তথ্যাদির দ্বারা অনেক অসত্যকে মনোহর চেহারায় সাজিয়ে তোলা যায় বটে, তার উদাহরণেরও অভাব নেই, কিন্তু সত্যের ইতিহাসে সেই স্মৃতিবিবরণ চাটুপ্রধান হয়ে থাকে। স্মৃতিচারণ কেবলমাত্র স্তুতিবাদ নয়। আমার সমকালীন বহু বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী বন্ধু-বান্ধবীর মধ্যে অনেকেই কালক্রমে ইতিহাসের পাত্র-পাত্রী হয়ে উঠেছেন। তাঁদের সঙ্গে একদা হাস্যে, রঙ্গে, কৌতুকে, মজলিশে, দ্বন্দ্বে, ভালবাসায়, চটুলতায়—আমার মন মেতে উঠত। তাঁদের অনেকে আজও আছেন, অনেকে নেই। তাঁরা আমার মনে শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসন রচনা করে রয়েছেন।

এই গ্রন্থের সঙ্গে 'তুচ্ছ' ও 'জলকল্লোল'—এ দুটি বইয়ের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। তাদের থেকে কিছু কিছু প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে পোশাক বদলিয়ে এসেছে।—

—গ্রন্থকার

বনস্পতির বৈঠক

'পথে যতদিন ছিনু, ততদিন
অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হ'ল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।'

ভারত সম্রাজ্ঞী কুইন্ ভিকটোরিয়া মারা গেছেন কিছুকাল আগে। তাঁর ছেলে সপ্তম এডোয়ার্ড এখন সম্রাট। লোকটার নাকি একমাথা টাক এবং স্ফূর্তিবাজ বিলাসী বাবু। নারীপরিবৃত শৌখীন 'সুগন্ধী' পুরুষ।

তাঁরই ছেলে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ আসছেন ভারতের রাজধানী কলকাতায়। চারিদিকে সাজ সাজ রব। যাঁরা দেশীয় খয়ের খাঁ, তাঁদের মধ্যে আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারই লাগি কাড়াকাড়ি চলছে।

১৯০৫, ৭ জুলাই।

অভ্যর্থনা সমিতির সভা বসছে টাউন হলে। আসছেন নবাব, আসছেন রাজা-মহারাজারা। আর আসছেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ—স্যার যতীন্দ্রমোহন ও প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, রাজা শ্রীনাথ ও সীতানাথ রায়, রাজা পিয়ারী মোহন মুখার্জি, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাচরণ পাল। আরও অনেকে—যাঁরা মোটা ডোনেশন্ দেবেন। ওঁরা আসবেন ল্যাণ্ডো বা ফীটনে। কলকাতার পথে তখন মোটর গাড়ি চলে না। মাঝে মাঝে ট্রামলাইন পাতা হচ্ছিল স্কোয়ার রাস্তাগুলোয়। পীচের রাস্তা তখনও হয়নি।

প্রসিদ্ধ কবি ফটিকচাঁদ দত্ত 'বেঙ্গলীতে' ইংরেজি এক কবিতায় কলকাতায় বর্ষার বর্ণনায় বলছেন, পথ ঘাট প্রতি বছরের মতো এবারেও দুস্তর। ঠনঠনে কালিতলায় কোমর অবধি জল। আমহার্স্ট স্ট্রীটে ডুবজল। বহুবাজার বেলেঘাটা অদৃশ্য। তেমনি জঞ্জাল, তেমনি মানুষের দুর্দশা। কিন্তু আর কতদিন?

৭ই জুলাই মানে আষাঢ়ের চতুর্থ সপ্তাহ। সারাদিন ঝুপঝুপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ অন্ধকার, ঘন মেঘলা। খোয়া বাঁধানো রাস্তার জলকাদা আর খানাখোন্দল মাড়িয়ে ছ্যাকরা গাড়িরা লোহার চাকা মড়মড়িয়ে 'ফিমেলদের' নিয়ে আনাগোনা করছিল। 'ফিমেল্' মানে ভদ্রসমাজের মেয়েছেলে, যারা রাস্তায় কখনও হাঁটে না। যারা হাঁটে তারা বর্ষীয়সী ঝি, রাঁধুনি, মেছুনি, রেজানি, গঙ্গাস্নানের বিধবা বুড়ি বা তিলকচন্দনপরা বার-বণিতা।

আর্সন্ কোম্পানি সেদিন বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, স্কচ হুইস্কি এক পাঁট পাঁচ সিকে।

খুচরো পেগ চার আনা। ভিক্টোরিয়া মার্কা বড় গিনির মূল্য পনেরো টাকা দু' আনা। স্টার থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নারায়ণী'—ম্যানেজার অমৃতলাল বসু। মোমবাতির ঝাড়ের আলোয় প্লে। স্টানলি বোস আর লুইসের দোকানে অস্ট্রেলিয়ান্ আপেল পঁচিশটে তিন টাকায়। দশ সের বালির পটোল এক টাকা। বড় মুরগির ডিম সাড়ে চার আনা কুড়ি। তাজা কাটা রুই মাছ পাঁচ আনা সের। খাসি-মটন্ পাঁচ আনা। ওসব খাবে সাহেব সুবোরা —যারা থাকে 'ইংরেজ টোলার' ওদিকে। নতুন বাজারে ওদের দাম অনেক কম।

রাত্রে মিটমিটে গ্যাসের আলোয় মাতালরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় বেশ্যার সন্ধানে। গৃহস্থপল্লীতে ঢুকে ওরা চেঁচামেচি করলেই দরজা-জানলা সব বন্ধ হয়ে যেত। গলিঘুঁজিতে সর্বত্র ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবল, গরুর গোয়াল, শ্যাওলাধরা ডোবা, চারদিকে খোলা-খাপরার বস্তি। পুঁটিবাগান, চাল্‌তাবাগান, গোঁয়াবাগান, নেবুবাগান, সিজ্বিবাগান, রামবাগান, হাতিবাগান—সব বস্তিতে ভরা। বাগমারি বা পায়রাটুনির ওদিকে দিনের বেলাতেও কেউ যায় না।

৭ই জুলাই, শুক্রবার। জাপানের কাছে রাশিয়া পরাজিত হবার পর থেকে সেই দেশে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। চীন নাকি তখনও ইংরেজদের হাতে আফিং আর চণ্ডু খেয়ে ঝিমোচ্ছে। চন্দননগরে ফরাসী মদ খেতে যায় কলকাতার ধনী বাবুরা।

আজ শিয়ালদা থেকে হ্যারিসন রোড দিয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোড ধ'রে প্রথম ট্রাম চলবে হাইকোর্ট পর্যন্ত। ওই দৃশ্যটি দেখার জন্য পটলডাঙ্গা আর শিয়ালদার মোড়ে ওই বর্ষার দুর্যোগেও ভিড় জমে গেছে। মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের এক দোকান থেকে বিক্রি হচ্ছে বায়স্কোপের ছবি নির্মাণের সাজসরঞ্জাম। ওখানে নাকি তার জন্য কাঁচা ফিলম পাওয়া যায়। আজ জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনস্টিট্যুশনে—পরে যার নাম হয়েছিল স্কটিশচার্চ কলেজ—সেখানে বঙ্গসাহিত্য সভার একটি অধিবেশন বসছে। সভাপতি প্রফেসর ম্যাকিন্‌টস। লর্ড কিচেনার এখন ভারতের প্রধান সেনাপতি। লর্ড কার্জন বড়লাট। রাজধানী কলকাতা ওঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্র। অ্যাডভোকেট দাশরথি সান্যাল হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস করছেন। কবিরাজ কেদারনাথ কবিতীর্থ আজ এক সাহিত্যসভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করবেন : 'জাতীয় জীবনগঠনে সাহিত্যের ব্যবহার'। ইংল্যাণ্ডে ভারতের প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হচ্ছে।

হঠাৎ বর্ষণমুখর কলকাতার জনজীবনে আগুন লাগল আজ ৭ জুলাই,

১৯০৫। ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড বালফোর ভারতসচিবের মুখ দিয়ে ঘোষণা করলেন বেঙ্গল পার্টিশন্! বললেন, এটি ফাইনালি সেট্‌লড্!

টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছিল সারাক্ষণ।

রিপনের ইংরেজির অধ্যাপক এবং বেঙ্গলীর সম্পাদক সুরেন বাঁড়ুয্যে তাঁর কাগজে চিৎকার করেছেন আজ,—এ অন্যায়, এ অবিচার, এ স্বৈরাচার। সমগ্র দেশ শোকসন্তপ্ত। রাজভক্ত ভারত মর্মাহত।

টেলিগ্রামটি এসেছিল এলাহাবাদ থেকে। রিপন কলেজের অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেটি দেখে আঁৎকিয়ে উঠেছিলেন—বাঙ্গালী জাতির চরম সর্বনাশ। সুরেন বাঁড়ুজ্যেকে ডেকে তিনি বললেন, ৭ জুলাই, ১৯০৫—এই তারিখটি বৃটিশ সাম্রাজ্যের কলঙ্ক দিবস।

পথে-পথে বেরিয়ে পড়ল হাজার-হাজার পুরুষ। ইস্কুল-কলেজ সব বন্ধ। শুধু চারিদিকে পুরুষ,—হাটে, বাজারে, দোকানে পথে-ঘাটে শুধু পুরুষের জটলা। পটলডাঙ্গা, চাঁপাতলা, ছানাপটি, জলের কলের মাঠ, কোম্পানি-বাগান, গ্যাঁড়াতলা, চাষাধোবাপাড়া, চোরবাগান, পোস্তা, পগেয়াপটি, রায়বাগান, বার-শিমলে,—সর্বত্র পুরুষের গাঁদি লেগেছে। মেয়েরা রান্নাবান্নার ফাঁকে খড়খড়ির ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে, পুরুষ-জগতে কি নিয়ে যেন একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে! ওরা ঘুষি পাকিয়ে জেলে যাবার কথা বলছে!

ঠিক সেই তারিখটিতে জাতিয়তাবাদী তরুণ বাঙ্গালী সশস্ত্র বিপ্লববাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিল সুরেন ঠাকুরের বাড়িতে। গোপন নেতৃত্ব নিলেন প্রমথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ, ভূপেন দত্ত, নিবেদিতা, বারীন ঘোষ—আরও কে কে যেন। এবার থেকে আর আপোস নয়। তরবারির আঘাতে বাঙ্গালী জাতিকে যারা দ্বিখণ্ডিত করল, তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে!

খুটুর-খুটুর ক'রে একখানা লালরঙের থার্ডক্লাস ছ্যাকরাগাড়ি সেই দুর্যোগের ভিতর দিয়ে আসছিল বহুদূর হাইকোর্টের পাড়ার ওদিক থেকে। পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না। জলে কাদায় খোয়ায়—দুর্গম পথঘাট। ট্রামরাস্তা পেরিয়ে হেদুয়ার পূবদিকে জেনারেল অ্যাসেম্বলি কলেজ। তারপর বীডন ষ্ট্রীট পেরিয়ে গোয়াবাগানের পথ। সেই পথে ঢুকে বাঁহাতি সাধুখাঁদের তেলের কল আর ঘিয়ের দোকান। ওটা ছাড়ালে ডানহাতি ঘুরে গেল গোয়াবাগান আর ডালিমতলার গলি—যেদিকে দীনু ধোবা আর গয়লাপাড়ার বস্তি।

কিন্তু ছ্যাকরাগাড়িখানা সাধুখাঁদের গদি ছাড়িয়ে রাধানাথ বোসের গলির

মোড়েই রাশ টেনে থামল। রুগ্ন দুটো টাট্টু ঘোড়া, হাড় আর পাঁজরা সার। ছুটতে পারে না বেশি, তাই চাবুক খেয়ে মরে। হাইকোর্টের ওদিক থেকে এ পর্যন্ত পৌছতে লাগে ছ' আনা, বর্ষা-বাদলে আট আনা। সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি —একটু বেশি। ভাড়াটে ফীটন্ ইংরেজটোলায় ঘোরে, এদিকে আসতে চায় না।

সরুগলির মধ্যে ঢুকলে ঘোড়ার গাড়ির পক্ষে ঘুরিয়ে বেরিয়ে আসা কঠিন। সুতরাং ওখানেই সওয়ারি নামল। চার নম্বর বাড়ি এই ত দু পা গেলেই ডান হাতি। গোপাল সুরের নতুন দোতলা বাড়ি। নিচে-ওপর চার পাঁচখানা ঘর, ছাদ, উঠোন, কলতলা, পায়খানা, রান্না-ভাঁড়ারের ঘর। ভাড়া অনেক—বাইশ টাকা। আজকাল সব দিকেই দর বেড়েছে। কলুটোলার বাড়ি এর চেয়ে বরং ভালই ছিল। দু'দুটো গরু রাখার গোয়াল ঘর ছিল সেখানে। ভাড়া নিত কুড়ি টাকা।

যিনি নামলেন তিনি সৌম্যদর্শন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। গৌরবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গ এবং স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। সায়াহ্নকালেও দেখা যাচ্ছিল তাঁর মুখে সামান্য ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি—তার রং উজ্জ্বল তাম্রাভ। ভাড়া চুকিয়ে একটি ছোট হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে তিনি হনহনিয়ে গলিতে ঢুকলেন।

টাকা দিয়ে তিনি কিছু ফেরৎ নিলেন না দেখে পিছন দিকে মুসলমান গাড়োয়ান চেয়ে রইল। ভদ্রলোকের পরনে কোঁচানো কালাপাড় ফরাসডাঙ্গার ধুতি, গায়ে মট্‌কার চুড়িদার পানজাবি, পায়ে চকচকে কালো পামসু। পা দুখানা ধবধব করছে। তার সঙ্গে স্বাস্থ্য আর পৌরুষের প্রদীপ্ত বলশালীতা। নাম—রাজেন্দ্রনাথ সান্যাল। বয়স চল্লিশ ছাড়িয়েছে।

হাঁ, বড়া আদ্‌মি—বুড়ো দাড়িওলা গাড়োয়ান হঠাৎ ঘোড়াদুটোর গা ঠুকে আদর জানিয়ে বলল, তিনোকো পেট ভর দিয়া—!

বাড়ি ঢুকে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে গেলেন। সোজা গেলেন কোণের ঘরটিতে। সেখানে মেঝের বিছানায় শুয়ে আছেন অসুস্থ স্ত্রী। পাশে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সেই বাগ্‌দিদের মেয়েটা। কাঁচপোকার টিপপরা, হাসিখুশী, শ্যামবর্ণা—নাম রানিদাই।

রাশভারি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। ছয় ফুট লম্বা। বুকের ছাতি দেখলে গা যেন ছমছম করে। ভয়-তরাসে ছেলেমেয়েরা বাপের আসবার খবর পেলেই আড়ালে গা ঢাকা দেয়! উনি আধুনিক তাই 'শাদা' কেরোসিন তেলের আলো জ্বালেন। বাড়িতে দশ-বারোটা হ্যারিকেন ল্যাম্প। রেড়ির তেলের

আলো বা মোমবাতি ওঁর পছন্দ নয়। বাড়িতে রাঁধুনি বামুন ঠাকরুণ, চাকর যোগেন, রাত-দিনের ঝি গুড়াবউ—সবাই তটস্থ ওঁর উপস্থিতির কালে। উনি নিচের তলায় বৈঠকখানায় গেলে সবাই খুশী। সেখানে পান-তামাক ও তাস-পাশার আসর। অন্য একটি নিজস্ব ঘরে মস্ত লাইব্রেরী। চারিদিকে ঠাসা বই। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত পুঁথি, বিভিন্ন সাময়িক পত্র—হিতবাদী, বঙ্গবাসী, বেঙ্গলী, বঙ্গদর্শন, বহু পুরনো সমাচার দর্পণ, দেশ-বিদেশের নানা গ্রন্থাদি,—আগাগোড়া শুধু বই। মাঝখানে সরু একখানা তক্তার ওপর গাল্‌চে পাতা ফরাস। পাশে রুপো বাঁধানো মস্ত নলের সঙ্গে মোগলাই গড়গড়া।

সকালে বেরোবার আগে উনি জেনে গিয়েছিলেন স্ত্রীর অল্প-অল্প ব্যথা উঠেছে। তাঁর চলাফেরা ও কাজকর্মের প্রতি অনিচ্ছা তিনি দেখেই গেছেন।

রাত্রের দিকে বৃষ্টি বেড়ে উঠলো। কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। বাচ্চারা খেয়ে দেয়ে বিছানায় উঠেছে। একজন গৃহশিক্ষক প্রথম তিনটি ছেলে-মেয়েকে সকালের দিকে পড়িয়ে যায়। তিনি গ্রাজুয়েট, তাই দশটাকা মাসিক পারিশ্রমিক পান। ছোট দুটি ছেলে ইংরেজি হাই স্কুলে পড়ে। তারা নাবালক।

প্রবল ঝড় বৃষ্টি আবার যেন নতুন করে এল। তার সঙ্গে ছুটছে আকাশ চিরে বিদ্যুদ্দাম, তারই সঙ্গে একটির পর একটি বজ্র গর্জন। এ বছরের এই যেন প্রথম সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক দুর্যোগ। এখনই জল জমছে গোয়াবাগানে আর ডালিমতলায়, এখনই হাঁটুজল জমবে হেদুয়ার পূর্বদিকে আর এই গলিতে। এ কি ভয়াবহ বর্ষা! এ যেন জন্মাষ্টমীর বৃষ্টিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক জানলার বাইরে অন্ধকার কলকাতার দিকে তাকালেন। সেই আধমরা কলকাতা আজ জনবিদ্রোহ ঘোষণায় উত্তাল, জাতীয়তাবাদের মহাসংগ্রাম আজ থেকে শুরু। ঝড়ের তাড়নায়, বজ্রের হুঙ্কারে, ঝলসিত বিজলীর তলোয়ারের আস্ফালনে, আকাশভাঙ্গা বর্ষার বন্যাপ্লাবনে—এ যেন কোনও এক অতিকায় দানব সৃষ্টিলোকের ঝুঁটি ধ'রে নাড়া দিয়ে সর্বগ্রাস করতে আসছে!

দেওয়ালের বড় ঘড়িতে টং ক'রে বাজল রাত সাড়ে বারোটা। ঠিক তখনই নবজাত শিশুর উচ্চদীর্ঘ কচিকণ্ঠ শোনা গেল উপর তলায়। রানিদাই ঘরের বাইরে এসে বামুন ঠাকরুণকে চেঁচিয়ে ডেকে বলল, বউগিন্নির একটি ছেলে হয়েছে গো!

এই বলে তৎক্ষণাৎ সে আঁতুড়ঘরে আবার ঢুকল। কিন্তু তার মুখের সুসংবাদটি ভাল করে অনুধাবন করার আগেই আকস্মিক প্রচণ্ড বজ্র গর্জনে

বাড়িখানার ভিত যেন কেঁপে উঠল!

ভদ্রলোক অকম্প, অবিচল। বোধ হয় ভাবছিলেন, মাঝে দুটি সন্তান পর পর হয়েই মারা গেছে। এটি তাহ'লে অষ্টম গর্ভের, এবং তৃতীয় পুত্র!

এখন তবে দাঁড়াল মোট ছয়টি সন্তান। বড় মেয়েটি বারোয় পড়ল। বছর দুয়েকের মধ্যে তার বিয়ে দিতে হবে। আর নয়, এবার থেকে হিসেব ক'রে চলা দরকার। বিয়ে করেছেন তিনি একটু বেশি বয়সে,—অর্থাৎ ছাব্বিশ বছরে। সেটা ১৮৮৭ ইংরেজি সাল। সেই কালে তাঁর মামারা গোয়েন্দাদলের মতো গিয়ে গোয়ালিয়রের ওদিক থেকে তাঁকে ধ'রে আনেন কাশীতে। কাশীতেই তাঁর বিয়ে হয়; কাশীতেই তাঁর স্ত্রীর জন্ম। নামটি তাই বিশ্বেশ্বরী। সত্যি বলতে কি স্ত্রী তাঁর লক্ষ্মী। বিয়ের পর থেকে তিনি স্থিতিমান হন্, নইলে তাঁর যে উচ্ছৃঙ্খল পরিচয় ছিল—না ওকথা থাক্, সমবয়সী মামারা বোধ হয় ভালই করেছিল। তিনি মামাদের নাম ধরে ডাকেন, তুই-তুকারি করেন। এখন তিনি ওয়াটকিন্সের পার্টনার, মাস-মাস তাঁর প্রায় আড়াইশ' টাকা খরচ। আজকাল দর বেড়েছে সব জিনিসের। খাঁটি দুধ ছ'সের টাকায়। গাওয়া ঘিয়ের দর চোদ্দ আনা। ভাল দাদখানি চাল তিন টাকা মণ হতে চলল। টাকায় মাত্র পাঁচ সের সরষের তেল। ন'সিকে আড়াই টাকা নৈনিতাল আলুর মণ,—গরীব গৃহস্থরা খাবে কি? এই ত সেদিন উনি একখানা ছোট ফীটন্ গাড়ির অর্ডার দিয়ে এলেন। একটা ভালো ঘোড়াসুদ্ধ গাড়ি-খানার দাম পড়বে সাড়ে তিনশ টাকা। ওদিকে দর্জিপাড়ার জমিটুকুতে একতলা একখানা বাড়ি তুলতে গেলেও হাজার চারেক টাকার কম নয়। আজকাল একটা রাজমিস্ত্রির দিনমজুরি ছয় আনা সাড়ে ছ'আনা।

নবজাত শিশুর চিৎকার শুনছেন তিনি জানলায় দাঁড়িয়ে। গলার আওয়াজ কচি, কিন্তু ওই আওয়াজে যেন প্রবল প্রাণশক্তি! ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত—এবার একটু ক'মে এসেছে। রাত তিনটে।

১৯০৫-এর আশ্বিনে ঝড় নাকি ঐতিহাসিক। বার-শিমলের খোলার চালাঘরগুলো উড়ে গিয়েছিল। ছানাপটির করোগেট টিন ছুটে এসেছিল পটলডাঙায়। দু'শ' নৌকোডুবি হয়েছে গঙ্গায়। খানকয়েক ঘোড়ার গাড়ি ছিটকে পড়ে উল্‌টিয়ে। গয়লাপাড়ার কয়েকটা গরু দড়ি ছিঁড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ল্যাজ তুলে দৌড়য়। হেদুয়ার কয়েকটা দেবদারু গাছ ভেঙ্গে পড়ে ট্রাম-রাস্তায়। চাটুয্যে বাড়ির নতুন বউ নাকি ছাদে উঠেছিল, আশ্বিনে ঝড় তাকে

ন্যাংটো করে পরনের শাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যায়। সেবারের ঝড় নাকি একটা গল্পকথা।

কিন্তু সেই ঝড় আবার উঠল ওই ভদ্রলোকের পরিবারে কার্তিক মাসের ১১ তারিখে রাত দশটায়!

নিচের তলায় আহারাদি সেরে উনি দোতলায় উঠছিলেন। সিঁড়ির মাঝপথে হঠাৎ জলদগম্ভীর স্বরে উনি একবারটি আর্তনাদ করে উঠলেন, ওরে, ওরে হাওয়া কি নেই কোথাও? হাওয়া—হাওয়া—আ…

ওইটি তাঁর শেষ কণ্ঠস্বর। শোনা যায় উপরের সিঁড়ি পর্যন্ত তিনি পৌঁছে-ছিলেন। অতঃপর তিনি ভূতলশায়ী হলেন যেন এক বিশাল শাল্মলী তরু। রোগটার নাম নাকি 'অ্যাপোপ্লেক্সি, ওটা নাকি সন্ন্যাসরোগ।

অষ্টম গর্ভের ওই সাড়ে তিন মাসের শিশুটা সহসা জননীর কোল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিৎকার করতে লাগল। সে যেন সমস্তটার প্রতিবাদ করছে, বিদ্রোহ ঘোষণা করছে বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি স্থিতির বিরুদ্ধে। যেন ডাক দিচ্ছে প্রলয় ঝঞ্ঝার আর ভাবী জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার। ডাক দিচ্ছে যেন অন্যায় মৃত্যুর বিরুদ্ধে। তার চিৎকার কিছুতেই থামবে না। শিশু পিতৃহীন হলো।

খবর ছুটল গয়লাপাড়ায়, বাদুড়বাগান আর ভট্টাচার্যি বাগানে। খবর ছুটল গড়পারে। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস এসে বললেন, অনেকক্ষণ আগে মারা গেছেন!

এলেন শ্বশুরকুলের ভটচার্যিরা, তাঁদের সঙ্গে এলেন মাতুলগোষ্ঠীর ভাদুড়িরা, —শরৎ, গোকুল আর হরিদাস। তাঁদের ছেলেরাও ওই রাত্রে ছুটতে ছুটতে এল। নলিনীমোহন, মোহিনীমোহন, শিবু, রমণী প্রভৃতি। হরিদাসের ছেলেরা আগে এসে পৌঁছল,—তরুণ বালক শিশিরকুমার, তারাকুমার,—না, বিশ্বনাথকে আসতে দেয়নি অত রাত্রে, সে তখন খুব ছোট। সেদিনকার মধ্যরাত্রির দুঃসহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে ফুঁপিয়ে উঠছিল।

শবদেহ কাঁধে. তুলছিল তরুণ বয়স্করা। শিশির পরের বছর বুঝি এনট্রান্স পরীক্ষা দেবে। সে ঘন ঘন চোখ মুছছিল। এবার এগিয়ে এসে নাছোড়-বান্দার মতো সে আবদার ধরল, না আমি শুনব না, কিছুতেই শুনব না। আমিও কাঁধ দিয়ে 'বাঙালদাকে' নিয়ে যাব নিমতলায়—।

বাঙাল! হ্যাঁ, আলবৎ বাঙাল! মৈমনসিং, বরিশাল আর ফরিদপুর—অর্থাৎ আচার্য-চৌধুরী, লাহিড়ী আর সাণ্ডেল—এরাই ত ছিল স্টক। বাঙাল না হয়ে যাবে কোথা? তা ছাড়া ভদ্রলোক শৈশব থেকে ছিলেন ভীষণ জেদী

ও একগুঁয়ে। দাম্ভিক ও আত্মপ্রত্যয়ী। আত্মাভিমান ছিল প্রবল, তাই অনেক সময়ে ধরাকে সরাজ্ঞান করতেন! অশিক্ষা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে শ্বশুর শাশুড়ি, শ্যালক শ্যালিকা প্রভৃতিকে গ্রাহ্য করতেন না। মামার বাড়ি ছিল শিক্ষিত মহল। সেই দিকে ওঁর ঝোঁক বেশি। ছোট মাতুল হরিদাস ছিলেন ইনজিনিয়র, থাকতেন তিনি বাইরে-বাইরে। তাঁরই জন্য এই ভাগ্নে গিয়ে একদা মেদিনীপুরে মেয়ে পছন্দ করে আসে। পরবর্তীকালে ভাগ্নে হয়ে উঠেছিল ছোট ছোট ভাইদের স্থানীয় অভিভাবক। শিশিরের মা অর্থাৎ ছোট মামী ছিল কুইন্ ভিকটোরিয়ার মতো সুশ্রী ও সুন্দরী।

সে যাই হোক, অতঃপর সকলের চোখ পড়ল ওই চারমাসের কচি শিশুর দিকে। ও শিশু পিতৃহন্তা, যাকে বলে বাপখেগো। দেখছ, কী সাংঘাতিক দুধ টানে? সব যেন নিঃশেষে চুষে নিতে চায়। সাংঘাতিক ক্ষিধে এনেছে সঙ্গে। চেহারাটা একবার দেখেছ? রং ফেটে পড়ছে। ওইটুকু কচি ছেলে, কী স্বাস্থ্য? যেন ঠিক এক বছরের। ওর নাম থাক্ মূলে! মূল কেটে দিয়েছে, তাই মূলে! দেখছ না বাঘের বাচ্চা বাঘ! এক মাথা রাঙা কোঁকড়া চুল ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেন। কালো দুটো চোখে এখন থেকেই নষ্টামি। মরি-বাঁচি বলে রাখলুম, এ ছেলে তোমার ভাল হবে না, বিশু।—বিশ্বেশ্বরীর মেজদিদি মন্তব্য করে গেলেন।

আর একজন কে যেন ব'লে গেল, বাপ গেল অকালে, তার চেয়ে বাচ্চাটা টেঁসে গেলেই পারত। এখন খাবে কি সব? ছ'সের করে দুধ বাঁধা থাকত, এখন থেকে ফ্যান খাইয়ো। একঘর ছেলেপুলে সুদ্ধ সবাইকে পথে বসিয়ে গেল। খরুচে-লোক ছিল, এক পয়সা জমায়নি।

একে একে বিদায় নিল লাহিড়িরা, মৈত্ররা, চক্রবর্তী ও ভাদুড়িরা। বলে গেল, আমাদের কর্তব্য আমরা যথাসাধ্য করব বৈকি। সাঁতরাগাছির ওরাও রইল। তবে কিনা এতগুলো নাবালক-নাবালিকার দায়িত্ব···ওদের মানুষ করে তোলা···বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন সবই আছে। মাতামহগুষ্টি ছাড়া কে করবে। এদের আশ্রয় দেওয়া—অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা—

নাবালক দলের জননী শান্ত, শুদ্ধ, অনেকটা যেন আত্মসমাহিত। বয়স আর কত? বছর বত্রিশ। স্বাস্থ্যবতী, পরিশ্রমী ও মৃদুস্বভাব।

এবার মাতামহী এগিয়ে এলেন। প্রবীণা বর্ষীয়সী তিনি। বললেন, ভয় কি, আমি এখনও মরিনি ত! ছোট জামাই আমাকে না হয় মানত না, কিন্তু ও যে আমার ছোট মেয়ে। এক হাঁড়ি ভাত ফোটাব, এক গাল ক'রে

সবাই মুখে তুলবে। আমিই ওদের নিয়ে যাচ্ছি। কর্তা আজও বেঁচে। বিশু যে তাঁর আদরের মেয়ে। কিচ্ছু ভয় পাসনে মা। কেউ যার নেই, সেই তিনিই দেখবেন তাকে।

ওই শিশুর অন্নপ্রাশনে রাশ নাম রাখা হয়েছিল, বিভূতি। কেননা ও বোধ হয় শ্মশানের ছাই মেখে উঠেছে। কেউ রাখল, কাশীনাথ—কেউ বা রাখল রাসবিহারী। না, কোনটাই নয়,—ওর নাম থাক্, রাম।

রাম! মন্দ কি! হরধনু ভঙ্গ করবে, তাড়কাকে মারবে, লঙ্কার রাবণ ওর হাতে ধ্বংস হবে। আর ওর বউ কেঁদে কেঁদে মরবে!

শিশুর জননী কাকে যেন একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর চাপা মৃদুকণ্ঠে ধরাগলায় মাথা নিচু করে বললেন, ওর নাম আমিই রাখব। ও আমার শেষ সান্ত্বনা।

হঠাৎ বজ্রাঘাতে ভেঙ্গে পড়ল একটা সাজানো-গোছানো সংসার। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল একটি সুখী পরিবারের জীবন ব্যবস্থা। বামুন ঠাকরুণ আর ঝাড়াবউ চোখের জল মুছে বিদায় নিল। যোগেন আবার বেরিয়ে পড়ল ভাগ্য অন্বেষণে। ফীটন গাড়ি আর কেনা হল না। দর্জিপাড়ার জমিটুকুতে ঘর-দোর আর উঠবে না।

রাধানাথ বোসের গলির বাড়িখানা যথাসময়ে ছেড়ে দিতে হ'ল।

'হাওয়াগাড়ি' দেখা দিচ্ছে কলকাতায়। ওর সঙ্গে হাওয়া-গাড়িমার্কা সবুজবর্ণ সিগারেটের প্যাকেট। এক প্যাকেট আড়াই পয়সা। ভটচার্যিবাগানে হাওয়াগাড়ি ঢুকত ছ' মাসে ন' মাসে এক আধখানা। দেখে ভয় পেত সবাই, বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ হয়ে যেত। কি জানি, কলের গাড়ি ত? যদি হঠাৎ ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে? বাচ্চারা ভাবত, ওটা বুঝি একটা অতিকায় কোনও জন্তু। রবার টিপে একটা বিকট আওয়াজ তুলে ওটা এগিয়ে আসত। অমনি দে ছুট,—যে যেখানে গিয়ে লুকোতে পারে।

ভটচার্যিবাড়ির বুড়ো উপীনমামা ওই হাওয়াগাড়ির তলায় একদিন চাপা পড়ল। হাওয়াগাড়ি আসছে, উনি ভাবলেন ওঁকেই বুঝি ওটা তাড়া করেছে! সেইজন্য সত্তর বছরের বুড়ো সামনের দিকে ছুটতে আরম্ভ করলেন। তিনিও ছোটেন, পিছনে পিছনে হাওয়াগাড়িও দৌড়য়। বুড়ো মানুষ, ছুটবেন কত? হঠাৎ তিনি শেতলদের বস্তিতে ঢুকে পড়বার জন্য ডান দিকে বাঁক নিতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন। ড্রাইভারও বোধ হয় অপটু ছিল। উপীন-মামার পিঠের ওপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে গেল। খোয়ার রাস্তার ওপর রক্তগঙ্গা।

উপীনমামার মাথায় ছিল মেয়েদের মতো বড় বড় চুল। একেবারে শাদা ধবধবে। পরনে ছিল শান্তিপুরের কোঁচানো ধুতি, গায়ে গিলে করা মসলিনের পানজাবি। গান-বাজনার বৈঠকি আসরে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। তিনি বিয়ে করেন নি। কিন্তু তাঁর সুশ্রী চেহারার নাম-ডাক শোনা যেত। ওই বৃদ্ধ বয়সেও চলতি ফ্যাশন অনুযায়ী তাঁর এক অভিজাত বংশীয় রক্ষিতা ছিল। উনি ইদানীং সেই ফুলবাগানেই থাকতেন। সেই নারী 'সতী' ছিলেন কিনা কেউ জানে না, তবে তিনি সাধ্বী রমণী ছিলেন। তাঁর দান-ধ্যান জপতপ ছিল। সবাই তাঁকে মামী বলে ডাকত।

সেই বাচ্চাটা এখন একটু বড় হয়েছে।

অসময়ে ক্ষিধে পেলে চুরি করে খাচ্ছে, বিড়ালছানার পিছনে ছুটছে, চড়াই পাখি ধরার ফিকির খুঁজছে, এবং নেংটি ইঁদুরের মত ছুটোছুটি করছে পুরনো জরাজীর্ণ বাড়ির আনাচে কানাচে। মাঝে মাঝে ফুড়ুক ফুড়ুক করে বাড়ির বাইরে গলি ঘুঁজিতে ঘুরে আসছে।

সামনে অন্ধ 'গঙ্গার মার' ছোট্ট একখানা ঘর। বুড়ি যেন কোথায় কার বাড়িতে গিয়ে কাজ ক'রে দেয়, এঁটো পাত কুড়িয়ে কলাইয়ের থালায় করে সেই উচ্ছিষ্টগুলি ঘরে এনে খায়। পা বুলিয়ে আন্দাজে সে হাঁটে। এ-বাড়ির উত্তর-পূব কোণে একটা নিমগাছ। ওই গাছের পাশেই গোলাপী রংয়ের বাড়িখানার নাম 'বেশ্যাবাড়ি'। সেটার ঠিক পাশে পুঁটিবাগানের মোড়ে চক্কোত্তিদের ছাপাখানা। পুঁটিবাগানে ঢুকে দক্ষিণে কয়েক পা গেলেই উত্তরমুখী বাগানবাড়ি। নাম 'সুরধাম'। ওখানে থাকেন ডি-এল-রায়।

ওই বাচ্চাটা জানে না কে ডি-এল-রায়। কিন্তু ওদের বাগানের নিচু পাঁচিলটার ওপর উঠে ফুল ছিঁড়তে গেলেই মালী তেড়ে আসত, বাচ্চাটা তখন ঝাঁপ দিয়ে পড়ত রাস্তায়। নেংটি ইঁদুর মুহূর্তে অদৃশ্য। বাচ্চাটা আজও বালক হয়ে ওঠেনি।

বাড়িতে ওদের অনেক লোক। দিদিরা, দাদারা, মাসি ও মামীরা, বউরা— চৌবাচ্চাটা ছিল অন্ধকার নিচের তলায় দক্ষিণ কোণে। কলতলার গায়ে করোগেটের চালা। তার সামনে মস্ত বেলগাছ। ওদিকটায় রাত্রের দিকে আসে পিশাচরা, তাদের হাড় চিবনোর কড়মড়ি শব্দ শোনা যায় দোতলা থেকে। তখন চাপা গলায় কে যেন চুপি চুপি বলে, 'ভূত আমার পুত, শাঁকচুন্নি আমার ঝি, রামলক্ষ্মণ বুকে আছে করবে আমার কি ?'

ব্যস, আর ভয় নেই। ওই ওপাশে রাত্রের দিকে শুয়ে আছে ওই দুরন্ত শিশু-বালক—ওর নামই ত রাম! খোকা আর রাম—দুটো নামই চলছে!

কিন্তু কেমন সেই পিশাচ, কি রকম দেখতে তারা? ওই নিচেকার মস্ত চৌবাচ্চাকে ঘিরে বাড়ির মেয়েরা আর বউরা দল বেঁধে কাপড় খুলে স্নান করতে নামে, গায়ে সাবান মাখে—কই তখন পিশাচরা এসে ওদের কাপড়গুলো নিয়ে পালায় না কেন? খোকা একদিন নিচে গিয়েছিল ওদের স্নান করা দেখতে। ওকে কেউ শিশু-পুরুষ বলে গ্রাহ্যও করে নি। শুধু ওদের মধ্যে একদল এগিয়ে এসে হাসি-হাসি মুখে ওর কান মলে দিয়ে বলেছিল, আবার এসেছিস? বলে দেবো?

ও ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

না, অন্ধকারে নয়, ভরদুপুরে একদিন ওই কৌতূহলী ছেলেটা সকলের চোখে ধুলো দিয়ে চৌবাচ্চাটার ওদিকে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত বাড়ি নিশুতি। চৈত্রমাসের হাওয়ার মর্মর উঠেছে বেলগাছে। কাক ডাকছে তন্দ্রা জড়ানো কণ্ঠে। চড়াই আর শালিকের চূর্ণ কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। চাল্‌তা বাগানের ওদিক থেকে কালোয়ারেরা ছেনি দিয়ে লোহা কাটছে,—তারই আর্ত আওয়াজ আসছে দূর থেকে।

ওর মাথার চেয়ে চৌবাচ্চাটা অনেক উঁচু। কী আছে, কত জল আছে ওর মধ্যে? হ্যাঁ, সবাই ঘুমোচ্ছে এখন, এই সুযোগ। খোকা হাত উঁচুতে তুলে চৌবাচ্চার পাড় দুহাতে শক্ত করে ধরে হাঁটুর সাহায্যে পায়ের উপর চাপ দিয়ে অতি সাবধানে পাড়ের উপর উঠল। আ, কী সুন্দর ছলছলে ভরা জল! কী গভীর, কী কালো! তলার দিকে ঘন শ্যাওলা, তারই একটা ছায়া উঠেছে উপর দিকে। আ, স্নিগ্ধ-শীতল স্বচ্ছ জল। ভিতর দিকে নিচে নামবার জন্য কয়েকটা সিড়ি রয়েছে। ওকে যেন ডাকছে জলের তলা থেকে সেই যক্ষী বুড়ী। সেই ডাক অপ্রতিরোধ্য।

খোকা একটা সিঁড়িতে পা ডুবিয়ে নামল। প্রায় হাঁটুজল, কিন্তু নধর পিছল শ্যাওলা পায়ের তলায়, অথচ মধুর ঠাণ্ডা! যক্ষীবুড়ী আবার হাত বাড়িয়ে দিল, আয়, আরও নেমে আয়—তবে ত কোলে নেবো, তবেই ত ভালবাসব! আয়, আয়—ভয় পাসনে।

খোকা দ্বিতীয় সিঁড়িতে নেমে আরও নিচে ডান পা বাড়াতে গিয়ে তার কচি বাঁ-পাখানা পিছলিয়ে গেল।

তারপর! তারপর যক্ষীবুড়ী হা হা করে হেসে দু'হাত বাড়িয়ে ওকে

কোলে তুলে নিল। তখনও এই যক্ষপুরী চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম।

পেট ভরে জল খাচ্ছিল প্রথমটা, মাছেরা যেমন হাঁ ক'রে টোপ গেলে। তারপর খেতে লাগল প্রাণভরে। এত খাচ্ছে যে কচি দুটো চোখ বেরিয়ে আসছে! তারপরে যক্ষীবুড়ির আর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু ঘন গূঢ় অন্ধকারে তার হাত-পা নড়ছে, শেষ নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে আরও জল ভিতরে নিচ্ছে। না, আর কিছু মনে নেই।

চোখ খুলে যখন তাকাল, তখন সে বিধবা জননীর কোলে। শাসন নেই, প্রহার নেই, তিরস্কার নেই। শুধু শান্ত স্নেহ-নিবিড় দুটো কালো চোখে জলধারা নেমে এসেছে। চারিদিক থেকে ঘিরে রয়েছে সবাই। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল।

এই নিয়ে বার তিনেক সে বাঁচল নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে। সেবার পড়ে গিয়েছিল উত্তর দিকে ন্যাড়া সরু বারান্দা থেকে পাশের খোলার চালার ছাদে এবং সেখানে টাল সামলাতে না পেরে একেবারে নিচের তলায় নর্দমায়। আর এই ত সেদিন। বেলগাছে উঠতে গিয়েছে শালিক ধরবে, এমন বোকা! পাঁচ গজ আন্দাজ উঠে সরু ডালটায় পা রেখে যেই ডিঙ্গি মারতে গেছে, অমনি মড়-মড়-মড়াৎ। শান-বাঁধানো বেলতলায় শানের ধারে মাথা ঠুকে ছড়-ছড়িয়ে রক্ত। ভাগ্যি কচি দুর্বোঘাস পাওয়া গেল। তাই ছেঁচে দিয়ে তবে রক্ত থামে। একবার রেড়ির তেলের পিদিমে কাগজ পোড়াতে গিয়ে হাত পোড়াল,—এক দোয়াত কালি খরচ হল। তাতেও জ্বালা কমে না, তখন আলুবাটা। অমন দুরন্ত দুর্বার ছেলে, ও কিছুতেই বাঁচতে আসেনি। মরবেই একদিন অপঘাতে। মৃত্যু ওর পিছু নিচ্ছে কথায় কথায়। সেদিন ছোট ছুরিতে আঙুল কেটে গেছে, ও সেই রক্তটা নিয়ে মেঝের ওপর আঁকিবুকি কাটছে! শুনেছ এমন কথা?

একদিন ছেলেটা শুনল সবাই যাচ্ছে ভাগলপুরে পিসিমার বাড়ি, তাকেও নেবে সঙ্গে। ওই একই পিসি, পিসেমশাই জজ। ওরা বড়লোক।

বাড়ি থেকে হাওড়া ইস্টিশান।

বিকেলের দিকে ছেলেটা ওদের সঙ্গে ভাড়াটে ছ্যাকরা ঘোড়ারগাড়িতে উঠল। সেই প্রথম গাড়ি চড়া। কলকাতা তখন ছোট। ধর্মতলা থেকে উত্তরে গিয়ে হাতিবাগান ছাড়িয়ে ফড়েপুকুর পর্যন্ত। ব্যস, তারপর ট্রামডিপো ছাড়ালে দুটো চারটে মুড়ি-মুড়কি আর তেলেভাজার দোকান। মাঝে মাঝে মাড়োয়ারিদের কাপড়-গামছা বিক্রির ছোট ছোট চালাঘর। ওদের গাড়ি

চলল কাঁসারিপাড়া আর সিজিবাগানের ভিতর দিয়ে। কী অধীর পুলক আর দুর্বার কৌতূহল ছেলেটার চোখে। ও যেন চাইছে এই গতিবেগ না থামে। গাড়ির তলার দিকে চারটে চাকা কেবলই ঘুরুক, যেন কিছুতেই থামে না। গাড়ির জানলার বাইরে কী সুন্দর আবিষ্কার, কী বড় বড় উঁচু বাড়ি,—চারিদিক যেন উদ্দাম আর চঞ্চল। পুঁটিবাগান বা ভটচার্যিবাগানে এসব কিচ্ছু নেই। তাকে গাড়ির চালে উঠতে বা বসতে দেওয়া হয়নি। সে ছোট, সে দুরন্ত। আচ্ছা, আগে সে আরেকটু বড় হোক।

সে রাত্রে রেলগাড়িতে সে ঘুমোয়নি। অন্ধকারের মধ্যে গাড়ি যেন ছুটছে কোন্ দিকে। শুধু তলার থেকে শুনছে, 'যাচ্ছি যাব, খাচ্ছি খাব!' ওর মা শুধু আঁচলের খুঁটে ওর একখানা পায়ের গোছ শক্ত করে গেরো দিয়ে রেখেছেন পাছে জানালায় ঝুঁকতে গিয়ে সর্বনাশ বাধায়। তখন কোনও গাড়ির জানালায় রেলিং থাকত না।

আর কিছু মনে নেই ভাগলপুরের কথা। বাড়িখানা ছিল মস্ত বড়, তার ভিতরে ছিল মস্ত উঠোন। রাস্তাটার নাম নাকি ছিল 'ওয়েস রোড'। ওরা সবাই মিলে ফিরে এসেছিল মাস দুই পরে। তখন শীতের শেষ।

কলকাতার সেই একই পুরনো বাড়ি। এ যেন বন্দীশালা, এ যেন ছেলেটাকে দুঃখ দেওয়া হচ্ছে। সে চিনে এসেছে বাইরেটা, দেখে এসেছে মস্ত আকাশ মিলিয়ে প্রকাণ্ড এক পৃথিবী!

দিদি ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিত ছড়া কেটে: "ছোট পাখি ছোট পাখি, এসো মোর কাছে। পরিপাটি খাঁচা এক তোমা তরে আছে। সুকোমল মখমল দিব শয্যা পেতে। পাকা পাকা মিষ্ট ফল পাবে তুমি খেতে!"

ছোট পাখি বলল, "না ভাই যাব না আমি তরুলতা ছাড়ি। সুন্দর কাননে মোর আছে ঘরবাড়ি। উড়িতে বাসনা মোর নীলাকাশে ভাসি। হলেও সোনার খাঁচা ভাল নাহি বাসি।"

ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ একদিন ভাত খাবার ঠিক আগে ছেলেটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ভাতের থালা পড়ে রইল, ছেলে আসে না। মা চটে আগুন। হাতের কাছে বেলুনটা নিয়ে মা ছুটলেন। আজ ওর ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে তবে ছাড়ব। দাঁড়া ত—

কিন্তু কোথায় ছেলে? ঘরে-বাইরে কোথাও নেই। তবে কি আবার সেই চৌবাচ্চায়? এক-একজন এক-এক দিকে ছুটল। ছাদে বারান্দায়

সিঁড়ির নিচে কলতলায় ঠাকুর ঘরে—না নেই। ছোড়দা ছুটল লালার দোকানের দিকে, সামনের আস্তাবলে, ললিতবাবুর রান্নাঘরে, কাওরাদের বস্তির ভিতরে। না কোথাও নেই। দেখো ত মা ভাঁড়ার ঘরে তেঁতুল চুরি করে খাচ্ছে কিনা? না, সেখানেও নেই। দেখো হয়ত ক্ষিরি নাপতিনির ঘরে গিয়ে ঢুকেছে আল্‌তাপরার লোভে—ওর ত আর লজ্জা-শরম নেই। যাই, একবার দেখে আসি।

না, ছেলেটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। নিরাশ হয়ে একে একে সবাই ফিরে এল। যারা ওর জ্বালায় রাতদিন অস্থির হত, তারাই আগে কেঁদে ফেলল। আজ ষষ্ঠীর উপবাস ছিল। সন্তানের কল্যাণ কামনায় মেয়েরা নাকি ষষ্ঠী করে।

বেলা গড়িয়ে গেল। দুপুর পেরিয়ে অপরাহ্ণ। রাস্তায় গিয়ে ঘোরাঘুরি করছে সব। কেউ গেছে শুঁড়িপাড়া, কেউ জেলেটোলা, কেউ বা গেছে চাল্‌তাবাগানের দিকে। মেয়েরা কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

ওর মা ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল সদর দরজার দিকে চেয়ে। একে একে সবাই তখন দোতলায় উঠে গেছে। সন্ধ্যার আলো জ্বালা হ'ল রেড়ির তেলে।

এমন সময় এক হিন্দুস্থানী পাহারাওলা হাঁক দিয়ে সদর দরজায় এসে দাঁড়াল। মা এগিয়ে এল, দেখল পাহারাওলার কোলে তাঁর ছেলে। পরনে সেই গেঞ্জি আর ছোট ইজের। পাহারাওলা বলল, মা, আপনার ছেলিয়া ঘুরছিল হাওড়া ইষ্টিশনে। বোলে কি, ভাগলপুর যাবে! লেকিন হুঁসিয়ার বাচ্চা আছে, মা। এ মহল্লার নাম জানে, রাস্তার নাম ভি জানে!

পাহারাওলা বকশিস নিল না। জননীর কাছে ছেলেকে দিয়ে খুশী মনে চলে গেল। মা তাকালেন ছেলের দিকে, আর সেই অপরাধী ও আতঙ্কিত শিশু-বালকও মায়ের দিকে তাকাল। রেড়ির পিদিমের আলোয় সর্বশেষ সন্তানের দিকে নিরীক্ষণ করে মা দেখলেন এ সেই মুখ, অবিকল সেই মুখেরই অভিব্যক্তি—যে মুখখানা একদা কার্তিক মাসের রাত্রে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে! এ সেই তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ।

ছেলেটাকে বুকের মধ্যে তুলে নিয়ে মা স্নান করাতে গেলেন। যখন তিনি সাবান মাখাচ্ছিলেন, তখন ছেলেটা বলল, ইজেরটা কেচো না মা, ওর মধ্যে একটা জিনিস আছে।

কী জিনিস?—মা বললেন, ছাই আর পাঁশ! কই, বার কর।

ছেলেটা ইজেরের পকেট ঘেঁটে বার করল শালপাতার একটি মোড়ক।

তার মধ্যে রয়েছে একটি আম-সন্দেশ। তারপর থতিয়ে-থতিয়ে সে বলল, চারটে ছিল। তিনটে আমি যে খেলুম, আর এটা তোমার জন্যে! ওই যে, ওই লোকটা কিনে দিয়েছিল!

সেই দিন রাত্রে মেঝের উপর কাঁথার বিছানায় শুয়ে মা কাঁদছিলেন নিঃশব্দে। ছেলেটা শুয়েছিল ওঁর কোলের কাছে। অজ্ঞান ছেলেটা এক সময় প্রশ্ন করল, 'মা, কাঁদছ তুমি? বকেছে কেউ?'

মা জবাব দিলেন না, ওকে শুধু আরও কাছে টেনে নিলেন।

পরদিন হাতে খড়ি। পূজো-আর্চা করে বেলার দিকে শিশু-বালককে রঘু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি ক'রে দেওয়া হ'ল। এই ত কাছেই চাল্‌তা-বাগানের মোড়ে—রাধাচরণ পালের বাড়ির ঠিক সামনে। এগারোটায় যাবে, তিনটে পর্যন্ত বাঁধা থাকবে।

সেই ভাল। ও একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে। এবার থেকে বাছাধন জব্দ। পড়া না পারলে রঘুপণ্ডিত পিঠের চামড়া তুলে নেবে, দেখিস।

পাঠশালায় ভর্তি করতে গৃহস্থের খরচ হল অনেক। তিন পয়সা একখানা স্লেট, এক পয়সা দুটো পেন্সিল, বর্ণ-পরিচয় এক পয়সা, বোধোদয় এক পয়সা, এক আনা পণ্ডিতের প্রণামী। মোট দশ পয়সা। মাইনে মাসে দু'আনা।

দেখিস তোরা, ওই ছেলে একদিন চাকরি করবে, এনে খাওয়াবে। আর তোরা হ'লি মেয়ে। মেয়ে না মাটির ভাঁড়। ছেলে হলে আজও শাঁখ বাজে। আর মেয়ে হলে? সাত পুরুষ একেবারে নরকস্থ!—দিদিমা বললেন।

॥ ২ ॥

বর্ষার জলে ভরে যেত পুঁটিবাগানের সংকীর্ণ পথ। সেই পথ দিয়ে ছেলেটা যেত পাঠশালায়। ভোরেই বর্ষা নেমেছে; ঝাপসা জলো হাওয়ায় যখন চারিদিক বিষণ্ণ করুণ, শীত-শীত ভাব, কাজে জড়তা,—থৈ-থৈ জল এখানে-ওখানে, ঘরের বাইরে পা বাড়াতে ঠাণ্ডা লাগে, আকাশ আর পাঁচিল আর বেলগাছ যখন বিষাদের অশ্রুতে আর কুহেলীর ছায়ায় ঢাকা, যখন বাইরের পথ থেকে সবাইকে ডেকে আশ্রয় দিতে ইচ্ছা করে,—সেই সময় সকালের বর্ষায় আর ঠাণ্ডায় লুকিয়ে সে বেরিয়ে পড়ত পাঠশালার পথে। সবাই থাকুক আশ্রয়ে, সুখে থাকুক,—ওকে যেতে হবে বাইরে। ওর অন্তর্গূঢ় প্রাণচেতনার

সঙ্গে যোগ রয়েছে বাইরের বর্ষার, জল দাঁড়ানো পথের, দুর্যোগের আর ওই দিগন্তজোড়া কাতর ভাবটির। ওদের সঙ্গে ওকে মিলতে হবে, ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ওর সর্বাঙ্গ বেয়ে যখন জলের ধারা নামে, মনে হয় কেমন যেন অদ্ভুত চেতনায় ধারা নেমে আসছে। অনেক সময় চোখ বুজে সে থমকে দাঁড়িয়েছে পথে, দেখেছে বন্ধ চোখের উপরে কেমন নিবিড় জলধারা নামতে থাকে। চোখের সামনে থেকে পাঠশালা ভেসে যায়, ভেসে যায় বাড়ীর শাসন, ভেসে যায় শরীরের হিতাহিত জ্ঞান, ভেসে চ'লে যায় ইহকাল আর পরকাল।

গল্পটা অনেক দূর এগিয়েছিল—

পিতলের পিলসুজের ওপর রেড়ির তেলের আলোটা জলছে অনেকক্ষণ থেকে। শিখাটা নিস্তেজ, তেলের অভাবে সল্‌তেটা প্রায় শুকিয়ে এসেছিল। পুরনো ঘরের চুনবালিখসা দেওয়াল পর্যন্ত আলোটা পৌঁছচ্ছে না। ছায়াগুলো নড়ছিল চারদিকের দেওয়ালে।

বাইরে শ্রাবণের বর্ষা নেমেছে। পুরনো ঘরের কড়িকাঠের ফাটল বেয়ে জল চুঁইয়ে নেমে এসেছে ঘরের মেঝেতে। কিন্তু সেই আধমরা আলোটাকে ঘিরে যে ছয়-সাতটি অর্বাচীন ছেলেমেয়ে ব'সে রয়েছে,—ঘনবর্ষার দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা গল্পের আসরে তন্ময় হয়ে রয়েছে।

......আওয়াগড় রাজ্য নাকি সাতটি নদীর পার। কত পাহাড় আর কত তেপান্তরের মাঠ ছাড়িয়ে যেতে-যেতে তবে নাকি মস্ত রাজবাড়ী। রাজার নাকি দুই ছেলে; যুবরাজ মহেন্দ্র আর যোগেন্দ্র। যুবরাজ মহেন্দ্র সেপাইসান্ত্রী নিয়ে হাতীর পিঠে চ'ড়ে বেরিয়েছিল মৃগয়ায়। মাথায় তার রাজছত্র। ঘোড়াশাল থেকে গিয়েছিল ঘোড়া রূপার জড়োয়া সাজ প'রে যুবরাজের অভিযানে। অস্ত্র, লস্কর, খাদ্য, সজ্জা,—সব মিলিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা।

দেশ দেশান্তর পেরিয়ে চলেছে সেই রাজকীয় শোভাযাত্রা। অবশেষে যুবরাজ মহেন্দ্রের তাঁবু পড়ল কোন্ এক জনপদে কি এক নদীর ধারে। কাছেই ছিল শিবের মন্দির,—সেই মন্দিরে সেদিন অক্ষয়-তৃতীয়ার মেলা। মস্ত সমারোহ সেই মেলায়।

গল্পটা অনেকদূর এগিয়েছিল।

আওয়াগড় কোথায়?

থাম্—একটা ধমক এলো ছেলেটার মুখের ওপর,—বললুম না সাতটা নদীর পার?

ও-কি নদী ?

গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-নর্মদা-সিন্ধু-কাবেরী ! নৌকায় গেলে লাগে ছ'মাস, গরুর গাড়ীতে এক বছর, হেঁটে গেলে বাঘের পেটে যায় ! যাবি তুই হেঁটে ?

চুপ ক'রে গেল ছেলেটা। একজন তাকালো সভয়ে পিছন দিকে। ঘরের দেওয়াল থেকে বালি ধ্বসেছে, কড়িকাঠ থেকে উইপোকার দড়ি নেমেছে নীচের দিকে, ইঁদুর ছুটেছে এগর্ত থেকে ওগর্তয়, আরসোলা চ'রে বেড়াচ্ছে ঘরময়। আলোটা আরো মলিন হয়ে এসেছে।

অক্ষয়তৃতীয়ার মেলায় নাকি শিবের পূজো দিতে গিয়েছিল কুমারী যোগমায়া ! অমন সুন্দরী মেয়ে ছিল না আর ভূ-ভারতে। মেঘের মতন কালো চুল, আর খগরাজ পায় লাজ নাসিকার কাছে !

যোগমায়া কে ?

রাজকন্যে ! আবার কে ?—আরেকজন ছেলেটাকে ধম্‌কালো।

না রে না—যোগমায়া হোলো এক গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে। সদাগরী আপিসে চাকরি করতো তার বাপ। সেই যোগমায়াকে যুবরাজ মহেন্দ্র দেখে একেবারে মুগ্ধ। তিনি গিয়ে সেই ব্রাহ্মণকে বললেন, ঠাকুর, আমি তোমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবো। ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করলেন যুবরাজকে। দু'জনের বিয়ে হয়ে গেল।

তারপর ?

অসীম কৌতূহল আর উদ্বেগ সকলের মুখে চোখে। কিন্তু ঘরের বাইরে দালানে শুয়েছিলেন দিদিমা,—তিনি অন্ধকারের থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কাতরোক্তি ক'রে বললেন, হুঁঃ, তারপর। তারপর থেকেই ত সর্বনাশ, বাবা ! ওই যে বলে, 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—তাই !

রাজকুমার মহেন্দ্র পরম সমাদরে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চাইলেন নিজের রাজ্যে, কিন্তু যোগমায়া রাজী নন্‌। তিনি ভয়ে আর ভাবনায় মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে রইলেন। কত সাধ্য-সাধনা, কত কাকুতি মিনতি,—কিন্তু মেয়ের কি কান্না ! রাজবাড়ী নাকি ভয়ঙ্কর, ঢাল-তরোয়াল নিয়ে থাকে সেখানকার পাহারা, রাজবাড়ীতে গিয়ে একবার ঢুকলে আর কোনোদিন বাপের বাড়ী আসা যায় না ; কান্নাকাটি করলে নাকি তারা মাটির তলায় পুঁতে ফেলে।

যোগমায়া প্রাণভয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। যুবরাজ মহেন্দ্র মনের দুঃখে মৃগয়া ত্যাগ করলেন। কখনো কখনো সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দিন কাটান, যোগমায়াকে সাধ্য-সাধনা করেন,—আবার বা একসময়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। যোগমায়া বাপের বাড়ী ছেড়ে এক পাও নড়েন না। বড় বেশী তাঁর প্রাণভয়।

বারো বছর পর্যন্ত যুবরাজ মহেন্দ্র যোগমায়াকে নিয়ে যাবার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যুর পর বড়ভাই যুবরাজ যোগেন্দ্র রাজা হন, কিন্তু রাজবাড়ীর চক্রান্তে তাঁকে কি এক ওষুধ খাইয়ে পাগল ক'রে দেওয়া হয়; সেই পাগল একদিন এক লাঠির ডগায় একটি পুঁটুলি বেঁধে আর মাথায় পাগড়ী জড়িয়ে তাঁর রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যান। ছোট যুবরাজ মহেন্দ্র অনেক চেষ্টা ক'রেও যোগমায়াকে না আনতে পেরে অবশেষে বিবাগী হন। তাঁরও দিন কাটে পথে পথে।

আঁক্!—চেঁচিয়ে ওঠে ছোট বোন। সঙ্গে সঙ্গে একটা হুড়োহুড়ি, সেই গোলমালে পিলসুজসুদ্ধ প্রদীপটা ছিটকে যায়! ব্যাপারটা আর কিছু নয়, অন্ধকারে একটা আরসোলা উড়ে এসে তার নাকে বসেছিল!

গল্পটা সেদিন শেষ হয়নি সেই শ্রাবণের রাত্রে। কিন্তু গল্পটার ভয়াবহ বিয়োগান্ত সম্ভাবনার চিন্তা ছিল সকলের মনে। পাড়ার কোন্ মেয়ে শ্বশুরঘর করতে যায় না,—মনে প'ড়ে যেতো যোগমায়াকে। কোন্ স্বামী কবে মনের দুঃখে কোথায় চ'লে গেল,—অমনি মনে প'ড়ে যেতো রাজ্যহারা পরিব্রাজক যুবরাজ মহেন্দ্রকে। যুবরাজ এ বাড়িতে সকলের প্রিয়পাত্র।

হঠাৎ কোনো কোনোদিন মনের ভুলে দিদিমা নিঃশ্বাস ফেলে বলতেন, তাই ত, হাঁ রে, অনেকদিন ন'জামাইকে দেখিনি, তোরা খোঁজ পেলি কিছু? কোথায় আছে জানিস?

জবাব দেবার মতন কোনো মানুষকে কাছাকাছি পাওয়া যেতো না। সন্ত স্নান সেরে ন'মাসিমা তাঁর চুলের রাশির ডগায় গেরো দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াতেন স্থির প্রতিমূর্তির মতন। দিদিমা মুখ তুলে বলতেন, অনেকদিন খবর নেই, বেঁচে আছে ত?

স্বামীর উল্লেখমাত্র ন'মাসিমার প্রসন্ন সুন্দর মুখে রক্তের আভাস দেখা দিত। শান্তকণ্ঠে বলতেন, ছেলেমেয়ে তিনটের জ্ঞান হয়েছে, এখন ওসব কথা তোলো কেন, মা?

দিদিমার মুখে আর কোনো কথা আসে না, মাসিমা তেমনি দৃপ্তভঙ্গীতে ফিরে চ'লে যান। দিদিমার কাঁধের পাশে পোষা বিড়ালটার মতো ব'সে থাকত ওই ছেলেটা।

কিছু কি শোকের ছায়া ছিল তার মনে? কিছু কি বিষণ্ণতা? অপরিণত মানস-চেতনার মধ্যে যেন সে উপলব্ধি করতে পারত, নরনারীর ভিতরকার কিছু একটা রহস্যজনক সম্পর্ক। কোথাও একটা অন্যায় ঘটেছে, কিছু একটা ভুল থেকে যাচ্ছে,—সেটা যেন নৈরাশ্যে, বেদনায়, যন্ত্রণায় আর চিত্তগ্লানিতে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

মামা একদিন এসে বললেন, বেঁচে আছে গো, বেঁচে আছে,—বলোগে তোমার মেয়েকে কপালে সিঁদুর পরতে! কই দাও দেখি কিছু আজ?

দিদিমা ভুরু কুঁচকে বললেন, সুখবরটা দিয়ে বুঝি তুই গাঁজার পয়সা চাইতে এলি?

মামা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, গাঁজার দাম ত দু' পয়সা, খবরটা যে লাখো টাকার? শুনে এলুম তোমার ভাসুরপো ভোলা ভট্‌চার্যির মুখে। জোড়াসাঁকোর আপিংয়ের দোকানের সামনে তোমার জামাইকে সে দেখতে পেয়েছে!—আজ আমার দু'টাকা চাই।

দু'টাকা!—দিদিমা ফণা তুলে উঠলেন, তোর মাগের ভাত-কাপড় আমি যোগাবো, আর তুই চাইবি হাতখরচ? দু'টাকা রোজগার করেছিস কখনো? কখনো দেখেছিস চোখে একসঙ্গে?

বারুদখানায় আগুন লাগলো। মামা চীৎকার ক'রে উঠলেন, তোর টাকা? ফল্‌না ভট্‌চার্যির টাকায় তোর গুষ্টিকে খাওয়াসনে? রমেশ মিত্তিরকে দিয়ে জাল উইল ক'রে আমাকে পথে বসাস্‌নি? ঘুঘু চরাবো ভিটেয় ব'লে দিচ্ছি। পেয়াদা ছোটাবো। বেড়াল কাঁদাবো। এই চললুম হাইকোর্টে!

হাইকোর্টে যাবার জন্য মামা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। পরে জানা গেল, আনা চারেক পয়সা পেয়ে তিনি আপাতত মামলা-মোকদ্দমা স্থগিত রাখলেন। হাইকোর্ট অনেক দূর।

ওই ছেলেটার ডাক পড়তো মামার ঘরে। সে গিয়ে দাঁড়াত দরজার এক কোণে ভয়ে ভয়ে। চণ্ডালের গল্প শুনেছে সে মিত্তিরদের বরদা-ঝির কাছে। মামার মুখশ্রী দেখলে জুলু চণ্ডালকে মনে প'ড়ে যেতো। ঘড়ির কাজ করতে করতে একসময়ে মুখ তুলে মামা বললেন, মাগীকে ডেকে দে ত?

কোন্ মাগীকে?

মামা মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, গুয়োটা! বলে আবার কোন্ মাগী! বাড়ীতে একপাল মাগীর মধ্যে আমার মাগী কোন্‌টা? ডাক্ শিগগির! ফের যদি আমার বেড়ালকে মারবি, কি ডালিমগাছের ফুল ছিঁড়বি,—ত বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো!

মামীকে সে ডেকে আনল। মামা বললেন, একটা পয়সা দাও ওই ছোঁড়ার হাতে—তামাক আনবে!

পয়সা!—মামী ডুকরিয়ে উঠলেন, এক পয়সার আজ্ঞির করে রেখেছ আমাকে, মনে নেই? আমার জন্যে কি করেছ তুমি শুনি? একজোড়া ঢাকাই শাঁখা কিনে দিয়েছিলে, সরলা তখন পেটে! তোমার জন্যে আমার মাথা ধরার ব্যামো, চুলে তেল পড়ে না দু'বছর,—যেমন খাই-পরি তেমনি গতরে খাটি,—হাত পা প'চে গেল হাজায়! কোন্ দিকে তোমার চোখ আছে বলো দিকি?

ছেলেটা দাঁড়িয়ে। মামা তাঁর ফ্রেঞ্চ-কাট্ দাড়িতে হাত বুলিয়ে ক্রুর চক্ষে তাকিয়ে বললেন, হুঁ! পয়সা দিবিনে, কেমন? আমার পকেট মারে ওপাড়ার ছোট বৌ এসে—না? বলি ভোর রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে নীচের তলায় কোথায় যাস, শুনি?

আ মর, মুখে আগুন! পঞ্চাশ বছর বয়স হ'তে চললো, কথা শোনো—! বলতে বলতে মামী হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেলেন।

মামা বললেন, ওরে গুয়োটা, বিনি পয়সায় তামাক আনতে পারবিনে?

ছেলেটা বলল, পারবো!

তবে নিয়ে আয়, দেখি তুই কেমন বাপের বেটা?

ছুটে চ'লে গেল ছেলেটা তেতলায় দিদিমার ঠাকুরঘরে। ঘরের একপাল্লা দরজায় তালা বন্ধ। একথা জানা ছিল মিত্তিরদের ঝি বরদা এসে সংক্রান্তির পুজো দিয়ে গেছে পাঁচ পয়সা। এই বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ফেলে রেখে গেছে পয়সা ক'টা।

বাঁহাতে দরজার পাল্লাটা ঠেলে ধ'রে কচি ডান হাতখানা ভিতরে সেঁধিয়ে দিতেই হাতে উঠে এলো এক-আনিটা। সমস্ত শরীর কাঁপছে ঠকঠক ক'রে। সমস্ত অন্তরাত্মা কাঁপছে থরথরিয়ে।

তামাক আনল সে লালার দোকান থেকে। মামা উল্লসিত হয়ে বললেন, আমার ভাগ্নে তুই, একথা ভুলবিনে কোনদিন। তোর নামে আমি সর্বস্ব উইল্ ক'রে যাবো! যা, তামাক সেজে আন্!

মামার ঘরে ছিল ময়লা বিছানার পুঁটুলি, কয়েকটা খালি শিশি-বোতল, গোটা দুই তামাকের নল ও ভাঙ্গা মাটির কল্কে, কব্জাভাঙ্গা একটা তোরঙ্গ, মা-মনসার ছবির পট, ছেঁড়া মাদুর, এবং ফল্না ভট্চার্যির আমলের একখানা ধূসর মলিদা, সেখানা দেখলে বেজি-রঙের পুষি বিড়ালকে মনে প'ড়ে যেত।

তামাক সেজে আনল সে হুঁকোয়। মামা সন্দিগ্ধ চক্ষে বললেন, এত তাড়াতাড়ি যে ধরালি? টেনেছিস বুঝি?

কই, না?

দেখি মুখে গন্ধ?

মামা মুখের কাছে মুখ আনতেই ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল,—উঃ—কী বিচ্ছিরি তামাকের গন্ধ আপনার মুখে! বমি আসে·· ও-য়্-য়্-ক্!—বলতে বলতে সে স'রে পড়ল।

কিন্তু চুরি ধরা প'ড়ে যায়। কে নিলে ঠাকুরের পয়সা? ভয়ে ছেলেটার গা কেমন করে! তামাক কিনেছে, কিনে এনেছে লাট্টু আর লেত্তি। সুতরাং এদিক ওদিক সে খোঁজ করতে লাগল। বেলতলার ছাদে ভিজে শাড়ীর আঁচলে কার যেন একটা পয়সা বাঁধা ছিল—সেটা সে সংগ্রহ করল সন্ধ্যায়। কিন্তু শাড়ীখানা হোলো মামীর; রেড়ির তেল আনবার সময় পয়সাটার খোঁজ পড়লো। সে জানে বহুলোকের খরদৃষ্টি তা'র ওপর। অতএব তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে দিদিমার কাঠের বাক্সয় তা'র হাত পড়লো। সেখান থেকে দু' পয়সা হাত্ড়ে নিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে বেরিয়ে আসছে,—মামী তখন চীৎকার করছেন কাপড় দেখিয়ে। মা ছুটে এলেন, এলেন ন' মাসিমা। আলো নেই কোথাও, সুতরাং অন্ধকারে হাত চালাবার সুযোগ মিললো। একটা পয়সা ছুঁড়ে দিল সে শাড়ীখানার মধ্যে। মায়ের কথায় মামী সেই শাড়ী ঝাড়া দিতেই ঠন্ ক'রে পড়লো তাঁর হারানো পয়সাটা!

দিদিমা চীৎকার করে উঠলেন, আবাগী, তোর বড় আস্পদ্দা, চুরির দায়ে বাছাদের সন্দেহ! দুটি চক্ষের মাথা খা।

মামা ওঘরে লাঠি ঠুকে বললেন, দাঁড়াও যাচ্ছি!

কিছুক্ষণ পরে দ্বাদশীর বাতাসা কেনবার জন্য দিদিমার বাক্স খুলে দেখা গেল, দুটি পয়সাই উধাও! ব্যাপারটা দেখতে দেখতে জটিল হয়ে উঠছে। ছেলেটা যেন প্রত্যেকটা ঘটনায় দ্রুত জড়িয়ে পড়ছে। মনে প'ড়ে গেল ছোট বোনের বিস্কুটের বাক্সয় সে এক-আধটা পয়সা জমাতো। আপাতত সেটার

থেকে আত সঙ্গোপনে কিছু নিয়ে তেতলায় গিয়ে সে ঠাকুরের দেনা শোধ ক'রে এল। মামীর দেনা আগেই শোধ হয়েছে। বড়দাদা হাওয়াগাড়ী সিগারেট খেতে শিখেছিল—তার পকেট থেকে কিছু নিয়ে দিদিমার বাক্সয় রাখা গেল। এবার বাকি ছোট বোন।

কিন্তু বাড়ীতে তখন ভীষণ হৈচৈ উঠেছে। মা তেড়ে এলেন, ছেলেটা গিয়ে আশ্রয় নিল মামার ঘরে। মামা বীর্যবান লোক। তিনি লাঠি বাগিয়ে বললেন, তোকে বাঁচাবো আমি, নৈলে এই জান্ দেবো! আমার ভাগ্নে, একথা ওদের জানিয়ে যাবো। খবরদার!

সমগ্র ঘটনাবলী ছেলেটার নৈতিক সাধুতাকে কলঙ্কিত করতে উদ্যত ব'লেই সে কাঁদছিল। মামা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভয় কি তোর, আমি আছি। দেশলাইটে বার কর ত পকেট থেকে, আলোটা আগে জ্বালি!

মামা ঘরে আলো জ্বাললেন। তারপর ছেলেটাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, যা, তোকে ঝোড়োর দোকানের সন্দেশ খাইয়ে দেবো। যা, কোনো ভয় নেই।

চারিদিকেই যখন চুরি হচ্ছে তখন ছোট বোন তার বিস্কুটের বাক্সটা খুলে তহবিল মেলাতে গিয়ে দেখে সর্বনাশ! সে হাউ-মাউ ক'রে উঠলো। এই গোপন তহবিলের সংবাদ একমাত্র ওই ছেলেটাই জানত,—সুতরাং তৎক্ষণাৎ সবাই মিলে তাকেই চেপে ধরলো।

ওর ভিতরকার দুঃসাহসী তখন জেগে উঠে বলল, কখ্খনো না, মিথ্যে কথা! আমাকে জব্দ করার ফন্দি! খুলুক টিনের বাক্স সকলের সামনে, দেখুক সবাই।

বিস্কুটের বাক্স টেনে সকলের মাঝখানে ছেলেটাই ব'সে গেল। ওর হাতে যাদু ছিল। পুঁতির কৌটো খুলতেই বেরিয়ে পড়লো একটা এক-আনি। তাই দেখে ছোট বোন ফস্ ক'রে বলল, আমার যে চারটে তামার পয়সা ছিল?

থাম্ পোড়ারমুখী, চুপ ক'রে যা—মা ধমক দিলেন।

রাত্রে বড়দাদা বললেন, আমার পকেটে গোটা চারেক পয়সা ছিল, কোথায় গেল রে!

ছেলেটা বলল, তোমার পকেটে ত সিগ্রেট্ থাকে, পয়সা থাকে কোথায়?

মা ওধার থেকে বললেন, কী বললি? কি থাকে?

বড়দাদা বললেন, ও দিন-দিন ভারি বেড়ে উঠছে, তা জানো মা? বলি পুরনো পড়া দিয়েছিলুম, হয়েছে?

হয়েছে।

তবে মুখস্থ বল্।

মা বললেন, আচ্ছা আজ থাক্, কাল সকালে বলবে।

রাত্রে পাশে শুয়ে মা চুপিচুপি বললেন, ছি, আর কখনো কারো পয়সায় হাত দিয়ো না, বুঝলে? সব আমি বুঝতে পেরেছি।

ছেলেটা তখন অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল বৈকি!

মামী ধরা পড়লেন পরের দিন প্রাতে। মামার পকেটে ছিল একআনা, সেটা অন্তর্হিত হয়েছে কোন্ মন্ত্রে!

মামীর চীৎকার—পকেট থেকে দেশালাই বা'র করেছিল কে? আমি?

ফের ছোবল মারছিস?—মামা হাঁক দিলেন।

মুখনাড়া দিয়ে মামী বললেন, মামা-ভাগ্নে গলাগলি হয়নি কাল সন্ধ্যাবেলা?

খবরদার! মুখ সামলে কথা বলিস। আমার ভাগ্নে মনে রাখিস।—মামা চীৎকার করলেন।

দিদিমা এদিক থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার নাতির নামে যে লাগায়, সে চোখের মাথা খাক্।

কিন্তু মামীর অন্তর্দৃষ্টি চিরদিনই প্রখর ছিল!

সদর দরজায় মাঝে মাঝে ন'মাসিমার স্বামী এসে ডাক দিতেন। ভিতরে তিনি কোনোদিনই আসেন নি। বাইরের রকে ব'সে ডাকডাকি করতেন, কেউ কেউ তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতো। হয়ত অনেক ডাকাডাকিতে বিরক্ত হয়ে একসময়ে ন'মাসিমা গিয়ে দূরত্ব বাঁচিয়ে দাঁড়াতেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বক্তব্য থাকতো না। সেই নীরবতা যেন কণ্ঠরোধ করতো। ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিজের সন্তানগুলির দিকে একবার প্রসন্ন স্নেহে তাকিয়ে একসময় তিনি উঠে প'ড়ে বলতেন, যাই—

ছেঁড়া কোট গায়ে, কোটে বোতাম নেই। ছেঁড়া কাপড়ে কোথাও কোথাও গেরো বাঁধা; পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে চটা-ওঠা কলাইয়ের একটি গেলাসের মাথা। পায়ের চটিজোড়াটা তথৈবচ! কোথায় তিনি যাবেন, কোথায় থাকেন, কেমন ক'রে তাঁর দিন গুজরান হয়,—এসব প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু কেন এই আসা যাওয়া? কিসের টান? কোন্ প্রশ্ন তাঁর মনে জাগে? কোন্ কথাটা তাঁর আজো বলা হয়নি?

ন'মাসিমা আগেই ভিতরে চ'লে গিয়েছেন দৃষ্টির আড়ালে। তাঁর স্বামী

অবসন্ন ক্লান্ত পা টেনে-টেনে চ'লে যাবার আগে একটি মেয়েকে অনুরোধ করলেন, বিশুকে একবার ডাকো ত মা।

একটু পরে ভিতর থেকে মা এসে দাঁড়ালেন। দু'জনেই কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক। একসময় ন'মাসিমার স্বামী বললেন, তোমার বোন কোনো কথা না ব'লে চ'লে গেল। তোমার চোখে জল কেন, বিশু?

মা বললেন, আপনি মানুষ হ'লে আর চোখের জল পড়তো না!

ও, তুমিও বুঝি ওই দলে?—সহাস্যে তিনি বললেন, যাক্ গে।—এইটিই বুঝি তোমার সেই কোলের ছেলে? একেই ত তিন মাসেরটি রেখে রাজেন মারা গেছে! শোনো বিশু, খড়দার গঙ্গার ধারে একটু থাকবার জায়গা পেয়েছি। তোমার বোনকে বুঝিয়ে বলো, ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে চলুক আমার সঙ্গে।

মা বললেন, ওরা কি গঙ্গাজল খেয়ে থাকবে?

কেন, আমি ওখানে এক মসলার দোকানে কাজ পাবো, তাতেই যা হোক ক'রে চ'লে যাবে! গঙ্গার ধারে বেশ থাকবো।

ভিতর থেকে সহসা ন'মাসিমার গলার আওয়াজ এলো, বিশু, ভেতরে চ'লে এসো, ওখানে তোমার থাকার দরকার নেই।

মা বললেন, আমার কথা শুনবে কেন, ওরা কেউ আপনাকে বিশ্বাস করে না,—যেতেও চায় না!

তবে আর কি করবো! যাই!—হ্যাঁ, আর এক কথা। তোমার মাসো-হারার জন্যে আমি খুবই হাঁটাহাঁটি করছি। বোধ হয় হয়ে যাবে।

মা বললেন, হ'লে বাঁচি, দিন আর চলে না!

ভিতর থেকে আবার ডাক এলো, বিশু!

মা তাড়াতাড়ি ভিতরে চ'লে গেলেন।—

হঠাৎ একদিন দু'জন পুলিশের লোক এসে সদর দরজায় দাঁড়ালো। তাদের গলার আওয়াজ কর্কশ। কিন্তু পুলিশের নামে লোকে ভয় পায়, পাড়ায় আতঙ্ক দেখা দেয়, লোকের বাড়ীর জানালা দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ত্রাহি মধুসূদন!

এটা কি নোগেনবাবুর বাড়ী আছে? হামরা আসিয়েছি জোড়াবাগান পুলিশ থেকে।

ব্যাঘ্রের আবির্ভাবে হরিণের দল নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তেতলার ছাদে গিয়ে ঠাকুরঘরের পাশে আশ্রয় নিয়েছে সবাই। কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে জানা গেল, ন'মাসিমার স্বামী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ।

খবরটা শোনামাত্র বাড়ীময় একটা ধিক্কার প'ড়ে গেল।

মামা বললেন, আমি পারবো না। আমার বিরুদ্ধে অনেক থানায় ডায়েরী লেখা আছে, আমাকে দেবে না জামিনে দাঁড়াতে,—আর কাউকে পাঠাও।

অবশেষে বড়দাদার জামিনে ন'মাসিমার স্বামী খালাস হলেন। কিন্তু তারপর দিন তিনেকের মধ্যেই আসামী নিরুদ্দেশ! ফলে বড়দাদাকে নিয়ে পুলিশে টানাটানি। বাড়ীতে হাঁড়ি চড়া বন্ধ। কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা মানত্। কাশীপুরের দিকে সর্বমঙ্গলার কাছে পূজো। সত্যপীরের সিন্নি। ঠাকুরঘরে শান্তিস্বস্ত্যয়ন, গ্রহপূজা। কিন্তু সকলের সম্মিলিত প্রার্থনার জোরে মাসখানেক পরে একদিন ন'মাসিমার স্বামী নিজের থেকে পুলিশে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। চুরির অভিযোগ সত্য নয়,—তাঁর নাকি জীবনধারণের উপযুক্ত সুপ্রকট কোনো ব্যবস্থা নেই! আইনের চক্ষে সেটি দণ্ডনীয়।

তাঁর ছয়মাসের জেল হোলো। বড়দাদার বিপদ কাটলো। কিন্তু ন'মাসিমার শান্ত অবিচলিত চিত্তের কোনো বিকার কেউ দেখেনি। ন'মাসিমার গম্ভীর ব্যক্তিত্ব পাষাণ-প্রতিমাকে স্মরণ করিয়ে দিত।

দিদিমা বলতেন, দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। খবরদার,—আমার বাড়ীর দরজায় যেন সে পা দেয় না। অমন জামাইয়ের মুখ দেখতে চাইনে। এমুখো হ'লে পাড়ার লোক ডাকবো।

মামা বলেন, তবে জামাইয়ের গুষ্টিকে বাড়ীতে বেআইনী ধ'রে রেখেছ কেন?

তুই আমাকে আইন দেখাসনে, খবরদার!—দিদিমা হেঁকে উঠলেন।

মামা বললেন, বেআইনী আটক রাখলে দু'বচ্ছর জেল। হাকিম অমনি এক কথায় খচাখচ! ঘুঘু দেখেছ, আর ফাঁদ দেখোনি! মায়ে-ঝিয়ে এক-দড়িতে বাঁধা পড়বে!

দূর হ, দূর হ, নিপাত যা……

তবে আমিও চললুম পুলিশে খবর দিতে। মনে রেখো হাতের ঢিল একবার ছুঁড়লে আর ফিরবে না!

মামা অবশ্য কোথাও যান নি, ঢিলও ছোঁড়েন নি। ভয় দেখিয়ে সেদিন তিনি আফিংয়ের পয়সা আদায় করেছিলেন।

সমগ্র ব্যাপারটা ভুলে যেতে প্রায় বছরখানেক সময় লেগেছিল। এমন সময় একদিন নীচের তলায় হৈ চৈ উঠলো, ন'মাসিমার স্বামী এসে দাঁড়িয়েছেন

সদর দরজায়। ওঁর সঙ্গে পুলিশের ছোঁয়াচ আছে, সুতরাং আতঙ্কে সবাই থরহরি! বাড়ী নিশুতি, কেউ যেন নেই,—একেবারে শ্মশান!

সদর দরজায় গুমগুম শব্দ হচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে। মেঝের উপর কান পেতে সেই মৃদু গম্ভীর আওয়াজ শুনছে সবাই। পুরুষ-হৃদয়ের সেই মর্মান্তিক ডাক কোনো পাষাণীর মনকে বিচলিত করছে না, কিন্তু এক নাবালকের সমগ্র প্রাণসত্তাকে মথিত ক'রে সেদিন অনর্গল অশ্রু নেমেছিল। কেন সে অশ্রু? কী অর্থ তার? চিরকালের বিচ্ছেদ-বেদনা সেদিন কি তাকে অভিভূত করেছিল? মনুষ্যত্ব অপমানিত হচ্ছে—সেদিন কি সে অনুভব করেছিল?

দিদিমা শান্ত মৃদু কণ্ঠে মাকে ডাকলেন। বললেন, তুই না হয় একবার যা মা, কি বলে শুনে আয়। এ জ্বালা আর সইতে পারিনে। আমার মরণ হলেই মুক্তি পাই।

চোখের জল মুছে মা গেলেন। ছেলেটা গেল পিছনে পিছনে। মা গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালেন। জেলফেরত ব্যক্তিকে জীবনে প্রথম দেখল ছেলেটা। চেহারাটা খর্বকায়, কিন্তু সৌম্যদর্শন। এমন কি সত্যকার সুপুরুষ বলা চলে। দৃষ্টি শান্ত, অমায়িক। মাথায় টাক, দাড়ি-গোঁফ নেই। অত রোদে পথ হেঁটে এসে মুখখানা রাঙ্গা। দরজার সামনে কুলুঙ্গিতে ব'সে জোরে-জোরে নিঃশ্বাস টানছেন। তাঁর হাঁপানি রোগ।

মুখ তুলে তিনি মিষ্টকণ্ঠে বললেন, তোমাদের দেখতে এলুম অনেকদিন পর, ছেলেমেয়েরা কই?

মা বললেন, তারা ত নেই এখানে, কাশী গেছে।

কাশী!

হ্যাঁ, মেজদি এসে নিয়ে গেছেন সবাইকে। তারা সেখানেই থাকবে।

রাঙ্গা মুখে নৈরাশ্য ফোটে। মুখ তুলে তিনি তাকান মার দিকে। আশা, আশ্বাস, আনন্দ, বেদনা,—সেই চক্ষে কোনো কিছু কি দেখতে পেয়েছিল ছেলেটা? কিছু কি ছিল কথা? কিছু ব্যাকুলতা?

কিন্তু তিনি আর বসতে চাইলেন না। হাঁপানির টান তাঁকে অস্থির ক'রে তুলছিল। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, দেখি যদি কাশী যেতে পারি, গেলে দেখা হবে।

হঠাৎ দিদিমা বেরিয়ে এলেন আড়াল থেকে। চাপা রুষ্টকণ্ঠে তিনি বললেন, তোমার আর সেখানে গিয়ে কাজ নেই, মহেন্দ্র—এবার থেকে ওদের তুমি মুক্তি দাও!

নতমুখে শান্তকণ্ঠে জবাব এলো, কিন্তু আমার ছেলেমেয়ে? আমার স্ত্রী?

দিদিমা এবার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, ছেলেমেয়ের ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না। আর যোগমায়ার কথা যদি বলো, সে তোমার মুখও দেখতে চায় না। বিশু, ভেতরে এসো।

মাকে নিয়ে দিদিমা ভিতরে গেলেন। রুদ্ধশ্বাস আর রুদ্ধকণ্ঠে ছেলেটা এল মায়ের পিছনে পিছনে। উত্তাল প্রশ্নটা তার অধীরকণ্ঠে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠলো,—মা? উনি কোন্ মহেন্দ্র?

মা বললেন, হ্যাঁরে, সেই গল্পটা! ওই হোলো সেই আওয়াগড়ের কুমার মহেন্দ্র চক্কোত্তি! তোর ন'মাসির নাম যোগমায়া,—জানিসনে?

শ্রাবণের সেই রাত্রে যে-রূপকথা শেষ হয়নি, এই চৈত্রের দুপুরে এই কি তার পরিণাম? সহসা সেখান থেকে ঠিক্‌রে বাইরে এল ছেলেটা। ততক্ষণে যুবরাজ মহেন্দ্র চ'লে গেছে অনেক দূর। ক্ষিরি নাপতিনীর ঘর ছাড়িয়ে, চম্পটিদের বাড়ী পেরিয়ে, অর্জুনের দোকান বাঁ-হাতি রেখে এগিয়ে গেছে সে। ছুটতে ছুটতে ছেলেটা চলল তাঁর পিছু পিছু। যোগাসনে ধ্যানস্থ যিনি দেবাদিদেব, ভিন্নরূপে তিনিই হলেন ভোলানাথ। তিনি সর্বহারা, নিরাশ্রয়। পরনে ছিন্নবাস, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি। তিনি চিরকালের পথিক, চির পরিব্রাজক। ছেলেটা তার স্বপ্নলোকের রাজভিখারীকে দেখতে চায়!

আর্তকণ্ঠের ছেলেটা আবেগ সামলাতে পারেনি সেদিন। ছুটতে ছুটতে গিয়ে পিছন থেকে সে ডাকল, মেসোমশাই! মেসোমশাই!

রৌদ্রদগ্ধ পথের উপরেই সেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন, কি রে? কেন এলি এত রোদে? কি বলছিস?

আপনিই কি সেই যুবরাজ মহেন্দ্র? আওয়াগড়ের রাজা?

লোকে বলতো বটে। কিন্তু সে বেঁচে নেই।

আবার সেই প্রসন্ন সুন্দর হাসি! ছেলেটা পায়ের ধুলো নিল। তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠোর থেকে একটি টাকা বা'র ক'রে সে বলল, মা আপনাকে নিতে বললেন।

টাকাটা তিনি নিঃসঙ্কোচে হাত পেতে নিলেন। তারপর বললেন, তোর মাকে বলিস, আসছে মাস থেকেই তার পাঁচটাকা মাসোহারা ব্যবস্থা হয়েছে! সবাইকে আশীর্বাদ ক'রে যাই! তোরা যেন নিজের পায়ে একদিন দাঁড়াতে পারিস।

বছর তিনেক পেরিয়ে গেছে তারপর। চাল্‌তাবাগানের প্রান্তে এক গলিতে দু'খানা ঘরে ওরা ভাড়া থাকে। সেদিন দশহরার যোগ। জ্যৈষ্ঠের-রৌদ্রে ক্লান্ত হয়ে মধ্যাহ্নকালে মা ফিরলেন গঙ্গার ঘাট থেকে। গঙ্গাজলের ফোঁটার মতো মায়ের চোখ বেয়ে জল নামছিল।

মহেন্দ্র মেসোমশাই মারা গেছেন। তাঁর অন্তিম ঘনিয়ে আসে কিছুদিন থেকে। কলকাতার এক চায়ের দোকানের বেঞ্চে ব'সেই তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর ছেঁড়া জামার পকেটে ছিল কাগজপত্র, তার থেকে জানা যায় তিনি রাজা উপাধিধারী এক মস্ত জমিদার। ভিন্ন পকেটে ছিল ন্যাকড়ায় বাঁধা সপ্তম এডোয়ার্ড মার্কা খাঁটি রুপোর একটি টাকা।

কলকাতার খোয়া-বাঁধানো রাস্তায় ঘড়ঘড় ক'রে লোহা-বাঁধানো চাকায় ঘোড়ার গাড়ী চ'লে যেতো। এ গলি পেরিয়ে যেতো সেই গাড়ী সশব্দে—যেতো অনেক দূরে—মানিকতলার গির্জা পেরিয়ে, হেদোর মোড় ছাড়িয়ে। ছেলেটা চেয়ে থাকত চারখানা ঘূর্ণায়মান চাকার দিকে, ঘোড়ার পায়ের নীচে। সোনার বেনেরা চড়তো ল্যাণ্ডো, কিংবা ফীটন্‌,—তাদের ঘোড়াগুলি ভালো। তাদের পরনে ফরাসডাঙ্গা অথবা শিমলার কোঁচানো ধুতি, গিলেকরা পাঞ্জাবি, পায়ে কালো রঙের পাম্‌-সু,—হাতের আঙুলে অনেকগুলি ঝলমলে পাথর-বসানো আংটি। গায়ের রং তাদের ফর্সা, চোখগুলি একটু কটা। নিজেরা চালিয়ে যেতো গাড়ী—পিছনে থাকতো সহিস। কালো রঙের পাল্‌কি গাড়ীতে যেতো অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, তাদের ছিল আবরু। পেতলের আংটা টানা গাড়ীর দরজা—ওরই মধ্যে ইঞ্চিখানেক ফাঁক থাকতো বায়ু চলাচলের জন্য। ওর মধ্যেই ছেলেটা দেখে নিত হীরের নাকছাবির হঠাৎ-ঝলকানি, কিংবা চুড়িপরা হাতের দোলা,—এবং তার পাশে হয়ত বা একজোড়া অসুরের মতো কালো গোঁফ। বড়রাস্তায় ট্রাম যায় ঘণ্টা বাজিয়ে—তাদের রং হোলো হল্‌দে আর খয়েরী মেলানো। একখানা ট্রামে অনেকগুলি দরজা, ভিতরে এধার থেকে ওধার অবধি ইস্কুলের মতন বেঞ্চি পাতা,—সকাল ন'টা দশটায় কিছু কিছু লোক চলাচল করে,—তারপর সারাদিন ট্রামগাড়ীতে তেমন আর লোক-সমাগম নেই। ভাড়া তিনপয়সা আর পাঁচ পয়সা—ট্রান্সফার হোলো চার পয়সা আর ছ'পয়সা। এছাড়া যানবাহনের মধ্যে ছিল পাল্‌কি,—তার একটা আড্ডা ছিল গোয়াবাগানে।

নতুন বউরা আসতো পাল্‌কিতে। উড়ে বেহারারা হল্‌দে রঙের কাপড়

আর নতুন গামছায় সাজগোজ ক'রে চারজনে নিয়ে যেতো পাল্কি কাঁধে তুলে। সুবিধা এই, অন্দরমহল থেকে সওয়ারী নিয়ে আবার অন্দরমহলে গিয়েই পৌঁছে দেওয়া। ভাড়া চার আনা, কিংবা চারজনে আট আনা। গিন্নীরা পাল্কি চ'ড়ে যেতেন এপাড়া থেকে ওপাড়ায়। বড়লোকের বাড়ীর মেয়েরা পাল্কি চ'ড়ে যেতেন গঙ্গাস্নানে,—একেবারে জলের উপরে গিয়ে পাল্কি নামাতো। সে আবরুর বিচিত্র দৃশ্য। হাঁটুজলে নামবে মেয়েরা,—চারধারে কাপড়ের পর্দা ধ'রে দাঁড়াতো চারজন। তারা নাকি অসূর্যম্পশ্যা, সূর্যের সঙ্গে তাদের দেখাশোনা নেই। পাল্কি কাঁধে নিয়ে বেহারারা চ'লে যেতো দূর থেকে দূরে। তাদের সম্মিলিত বোল্ শুনতে শুনতে ওই ছেলেটার মনটা তাদেরই সঙ্গে উধাও হয়ে যেতো। শরৎকালের আকাশ পূজার গন্ধে ভরো-ভরো, সোনা-ঝরানো রোদ পড়তো বাড়ীর উঠানে; কোথাও কোথাও আগমনী গান শোনা যাচ্ছে। পাল্কি চ'ড়ে বউ চলেছে বাপের বাড়ী। সঙ্গে তোরঙ্গ আর ক্যাশবাক্স,—ওতে থাকতো গহনা। বউদের চুলে ফুলেল গন্ধের আভাস —চুলের ফিতে আর কাঁটায়, সিঁদুর কৌটায় আর আলতায় থাকতো শ্বশুর-বাড়ীর গন্ধ,—থাকতো মৃদু মোহের আবেশ। বাপের বাড়ীতে মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে পাল্কির বেহারারা পাত পেড়ে উঠানে খেতে ব'সে যেতো। শ্বশুরবাড়ীর ঝি-বউকে পৌঁছে দিয়ে পূজোর 'বিদায়' নিয়ে হাসিমুখে তারা ফিরতো।

মোটরগাড়ী দেখা দিয়েছে কলকাতায় খানকয়েক। তখন ওর নাম ছিল হাওয়াগাড়ী। রবারের ফানুসটা টিপলেই বিকট আওয়াজ হয়,—সেই আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসে পাড়ার ছেলেমেয়েরা সদর দরজায়, আর সঙ্গে সঙ্গে দোতলার জানালাগুলো যায় খুলে। পাড়ার মধ্যে মোটরগাড়ী ঢুকলে লোকে লোকারণ্য, —বুড়ি গঙ্গার মা ভয় পেয়ে তার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিত। কার্তিক স্যাকরার ঘরের ঠুকঠাক আওয়াজ থেমে যেতো। কাওরাদের বস্তিতে দীপু গুণ্ডার এক মেয়েছেলে থাকতো,—তার নাম লছমী। ছাপরা জেলায় নাকি তার বাড়ী। সেই স্বাস্থ্যবতী মেয়েটা একখানা ফিনফিনে বৃন্দাবনী শাড়ী কোনোমতে কোমরে জড়িয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতো বস্তির মুখে হাওয়াগাড়ী দেখার জন্য। ওই ছেলেটার চোখে পড়তো মেয়েটার কপালে আর হাতে সবুজ রঙের উল্কি,—হাতে দুগাছা কাঁচের চুড়ি, পান-জর্দায় টকটকে মুখ, হাত আর পায়ের আঙুলে মেহেদীপাতার রংলাগা। দীপু যখন কেরোসিন তেল বিক্রি করতে যেতো, লছমী তখন আলাপ জমাতো এপাশে ওপাশে। কোনো কোনোদিন সন্ধ্যার পর মার খেতো মেয়েটা আগাপাছতলা,—তার কোনো

কারণ ছেলেটার জানা ছিল না। চেঁচামেচি আর কান্নাকাটির শব্দে দিদিমা একসময়ে বিরক্ত হয়ে বলতেন, কালকেই আমি থানায় খবর পাঠাবো। রোজ রোজ এই কেলেঙ্কার আর বরদাস্ত হয় না। ওরে, উত্তরদিকের জানলা দুটো বন্ধ ক'রে দে ত?

তবু কান্নার আওয়াজ আসতো অনেক রাত পর্যন্ত। সে-কান্না মেয়ের, নারীর, জননী ও ভগিনীর। সেই কান্না শুনে ঘুম আসতো না। সেই কান্না ঘুমের মধ্যেও ওই ছেলেটার গলায় ফুঁপিয়ে উঠতো। স্বপ্নে দেখত, ভয়ানক মার খাচ্ছে সে তার মায়ের হাতে,—সর্বাঙ্গে তার দড়া দড়া দাগ! স্বপ্নের কাতরোক্তিতে তার নিজেরই ঘুম একসময়ে ভেঙে যেতো। চেয়ে দেখত,—চোখ খুলে যেতো। নিঃসাড় ঘুমে অচেতন সবাই। ভগ্ন জরাজীর্ণ বাড়ীর আনাচে কানাচে বিড়াল কাঁদে। কান্না শুনত সে দেওয়ালের ফাটলে, বেলগাছের নীচে, ও-মহলের শূন্য ঘরগুলির আশে পাশে। কে যেন স'রে যেতো, যেন ছায়ামূর্তি ন'ড়ে যেতো। বাতাসের সরসরানি, জানালার ধারে খুটখাট, ছাদের উপরে পায়ের শব্দ, বেলগাছের আগডালে বেম্মদত্যির আনাগোনা, শাঁকচুন্নির শাড়ীর হাওয়া,—আর নীচের তলায় কাটা ছাগলের রক্তাক্ত মুণ্ড নিয়ে পিশাচের দাঁতের কড়মড়ি।

তার শরীরের রক্ত চলাচল থেমে যেতো। চোখ বুজত সে অন্ধকারে।

সকালে উঠে সে দেখত সমস্তটা নির্ভুল বাস্তব,—ভ্রম, ভ্রান্তি কোথাও কিছু নেই। সেই প্রাচীন অনাবিষ্কৃত দিগন্ত, অগ্নিকোণ থেকে সূর্যের সেই আবির্ভাব,—তিনকড়িদের বাড়ীর ধার দিয়ে সেই দইওয়ালা হেঁকে চলেছে। অর্জুন মুদির দোকান পেরিয়ে সে চ'লে গেল কাঁসারিপাড়ার দিকে, কিংবা বাহির শিমলায়।

কলকাতাটা কত বড়—ছেলেটা ভাবত মনে মনে। কোন্ দিকে ঠন্ঠনে আর বউবাজার? কোন্ দিকে বা ধর্মতলা? একা একা কি যাওয়া যায় জোড়াসাঁকো আর মুর্গিহাটা, কিংবা সেই পাথুরেঘাটা? শ্যামবাজার আর রাধাবাজার? উল্টোডিঙ্গি আর পায়রাটুনি? বালীগঞ্জ আর বকুলবাগান? চুপ ক'রে থাকত সে। কে নিয়ে যাবে? কবে সে আবিষ্কার করতে পারবে এক একটি পথ? কবে হাঁটতে হাঁটতে চ'লে যাবে জানা থেকে অজানায়? কিন্তু যাওয়া সহজ নয়। পথে নামলেই ধরবে সেই ডাইনী,—তার নাম কাগী। এই পথ দিয়ে যায় সে সকালে দুপুরে। বাঁকা চোখে সে তোমার দিকে তাকিয়ে গেলে তোমার মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেবে, রক্ত উঠবে মুখ

দিয়ে। কাগী আসছে সামনের পথ দিয়ে,—অমনি সব বাড়ীর দরজা বন্ধ, ছেলেমেয়েরা গিয়ে লুকিয়েছে খাটের তলায়। কাগীর আকর্ষণ বড় ভয়ানক,—দিনের বেলায় সে ডাইনী; রাত্রে সে হয়ে ওঠে পিশাচী। শুকনো খড়ের মতন তার চুল, গরুড়ের মতন নাক, চোখদুটো আগুনের ডেলা, কাঠকয়লার মতো বর্ণ, হাত দুখানা লোহার বরগার মতন শক্ত আর সরু। কাগীকে চোখে দেখলে আর রক্ষা নেই। ছটফট ক'রে মরতে হবে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে,—পাগল হয়ে কামড়াতে ইচ্ছে হবে সবাইকে। দিনের বেলায় এই হোলো সকলের বড় ভয়। সন্ধ্যায় আসে ছেলে-ভয়-দেখানো রাক্ষসী। সদর দরজায় এসে সে দাঁড়ায়। মুখের উপরে মস্ত বড় মুখোশ,—করাল তার চোখ, লকলকে রক্তাক্ত জিহ্বা, সর্বাঙ্গে কালো আচ্ছাদন, মস্ত মস্ত দুখানা টিনের হাত,—মাথায় দানবীয় পরচুলা। রেড়ির তেলের মিটমিটে আলোটা তার দিকে তুলে ধ'রে সবাই দেখে,—আর বুকের মধ্যে গুরুগুরু কাঁপন লাগে। বিস্তৃত দুখানা হাত তুলে ছায়ান্ধকারে সেই রাক্ষসী যখন আলুথালু নাচে,—তখন সে প্রলয় তাণ্ডব,—রক্তে রক্তে ঝনঝনিয়ে ওঠে আতঙ্কময় অস্থিরতা, অন্ধকার নিশীথিনী যেন বিভীষিকার ছায়া ছড়িয়ে দেয় সর্বত্র। অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে অস্তিত্বের চারিধার।

হঠাৎ পাশ থেকে ছেলেটার পিঠে ধাক্কা পড়ে,—আর অবাধ্য হবি কখনো? না ব'লে কোথাও চ'লে যাবি?

না।

পাশ থেকে বড় বোন বলতো, আর পা-জামা নোংরা করবি?

কম্পিতকণ্ঠে ছেলেটা জবাব দিত,—না।

তারপর আড়ালে ওকে সরিয়ে এনে রাক্ষসীকে একটি অথবা দুটি পয়সা দেওয়া হোতো। উদ্দেশ্য—ও যে প্রকৃত রাক্ষসী নয়, এ যেন ছেলেটা জানতে না পারে। ও যে একটা পুরুষ, এটা যে ওর সন্ধ্যাবেলার পেশা,—এটা জানতে পারলে পাছে তার ভয় ভেঙে যায় ... শেষে লোকটা মাথার ওপর মুখোশটা তুলে দিয়ে টিনের হাত দুখানা খুলে নিয়ে একসময়ে চ'লে যেতো।

কোনো কোনো সন্ধ্যারাত্রে ভিন্ন আকর্ষণ ছিল। মেয়েদের মতো ক'রে কাপড়পরা, মুখে একমুখ লম্বা দাড়ি, হাতে তেলের প্রদীপের পাত্র,—দরজায় এসে আওয়াজ দিত দীর্ঘকণ্ঠে—ইয়া পী—র, মুশকিল আসান!

লোকটা শান্ত, আত্মসমাহিত। চোখদুটো অচঞ্চল, ললাট মসৃণ রেখাহীন, মুখ প্রসন্ন গম্ভীর,—যীশুখৃষ্টের ছবিখানা মনে প'ড়ে যেতো। চাহনি যেন

ক্ষমাসুন্দর, ভাষণ অতি মৃদু,—দাঁড়াবার ভঙ্গীটি যেন তপোবনের মুনির মতো। পীরের জন্য ভিক্ষা দাও—ভালো ; না দাও—কোনো নালিশ নেই। পথে নেমে আবার সে নারীসুলভ কণ্ঠে ডাক দিত—ইয়া পীর, মুশকিল আসান ! বহুদূর থেকে যেন সেটা সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মতো কানে এসে বাজতো অনেক রাত পর্যন্ত। প্রদীপের পাত্রের সেই আলো অনেকদূরে গিয়ে মিলিয়ে যেতো। সেই বিলীয়মান আলো ছেলেটার মনকে কতবার টেনে নিয়ে গেছে তার পিছু পিছু। সে চাইত একটা মুক্তি। সে-মুক্তির চেহারাটা জানা ছিল না, তার কল্পনাটাতেও ছিল একটা দুর্ভাবনা,—তবু ছিল প্রবল একটা পিপাসা বাঁধন ডিঙিয়ে যাবার, সমস্তটাকে অস্বীকার ক'রে ছোটবার। বাইরেটা বোবা, মুখের ভাষা তখনও এসে পৌছয়নি, যুক্তি আর বিশ্লেষণের বুদ্ধি তখনও কাঁচা,—কিন্তু অন্তর্লোক কাজ ক'রে চলেছে। ভয়, কুসংস্কার, প্রচলন, অন্ধতা, অনাচার,—সমস্তর বিরুদ্ধে অন্তর্দ্রোহ চলছে,—বাইরে তার অভিব্যক্তি নেই।

শ্বশুরবাড়ী থেকে মেয়ে এলো বাপের বাড়ীতে,—ঘাড়ের কাছে তার বঁটির ক্ষতচিহ্ন ; সে নাকি আত্মনাশ করার চেষ্টা করেছিল। স্বামী, শাশুড়ী ও ননদদের কদাচারের সে-সব কাহিনী শুনে যাওয়াটা ক্লান্তিকর। কোন্ মাসতুতো ভাই কবে এসে বয়স্থা কুমারী শিবরাণীকে ডেকে নিয়ে গেল ছাদের চিলেকোঠায়,—সেখানে কী যেন বলাবলি,—তারপর শিবরাণী নীচে নেমে এলো কাঁদতে কাঁদতে। পরনে শান্তিপুরী কালোপাড় শাড়ী, ধপধপ করছে গায়ের রং, নাকটা ঈষৎ থাঁদা,—বেশী বয়স হোলেও মেয়েটার তখনও বিয়ে হয়নি। গৃহস্থঘরের মেয়েমহলে তখনও গায়ের জামার চলন হয়নি,—তখনও পেটিকোট ব্যবহার ছিল অভব্যতা, সকলের সামনে চুল খোলাটা ছিল অসভ্যতা ; আয়নার সামনে এসে কেউ দাঁড়ালে তার চরিত্রের ওপর দাগ প'ড়ে যেতো। কুটুম্বর মেয়ে শিবরাণীর বেলা এ-সব শাসন কিন্তু চলতে পারতো না। আবার দেখা যায় একদিন জামাই এলো কোন্ শনিবারে। রবিবারটা থাকবে,—যাবে সেই সোমবারে। ভরসন্ধ্যাবেলায় স্ত্রীর চোখে কান্না ; জামাই তাকে কী যেন অপমান ক'রে চ'লে গেছে। ব'লে গেছে আর কোনোদিন অমন স্ত্রীর মুখ-দর্শন করবে না। বাড়ীতে শোকের ছায়া। দিদিমা কাঁদতে লাগলেন। একদিন যেন কবে বাড়ীর বধূকে দেখতে এলেন বধূর পিতা—তিনি কিছু শিক্ষিত, কিছু বা অবস্থাপন্ন। তাঁর সামনে বধূর আচরণ নিয়ে সমালোচনা

উঠলো,—সঙ্গে সঙ্গে বেধে উঠলো কদর্য কচকচি আর বাক্‌বিতণ্ডা। বধূর পিতা একদিকে,—আর একদিকে পরস্পর-মারমুখী জনতা। ভদ্রলোক নতমুখে সেই যে গেলেন, এ বাড়ীতে আর এলেন না কোনোদিন। বধূনির্যাতনটাও প্রচলিত ব্যবস্থার একটা অঙ্গ ছিল।

বধূ নির্যাতন? হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল সেই আনন্দময়ীর কথা। সেই বধূটি প্রকাশ করতে গিয়েছিল স্বকীয়তা আর মৌলিক বিচারবুদ্ধি। স্বভাব-চরিত্রে তার ছিল আভিজাত্য—এই ছিল অপরাধ। তার চেয়ে বড় অপরাধ,—লেখাপড়ার দিকে তার ঝোঁক ছিল। ফলে স্বামী, শাশুড়ী আর ননদ একদিকে,—অন্য দিকে সে একা। বলা হোলো, তুমি যদি মানিয়ে চলতে না পারো, বাপের বাড়ী চ'লে যাও। আনন্দময়ী বলল, যাবো না—এখানেই আমার অধিকার। আমার স্বামী, আমার ঘরকন্না, আমার শাস্ত্রসম্মত দাবী—

আনন্দময়ীকে অবরোধ ক'রে রাখা হোলো তেতলার ছাদের পায়রার খোপরে। সর্বাঙ্গে তার আঘাতের ক্ষতচিহ্ন। সেখানে পানীয় দেওয়া হোতো না। সেখানে সে ছিল চার মাস,—তার মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিল। হঠাৎ এক প্রতিবেশী সন্দেহবশে খবর পাঠালো থানায়। এই সংবাদে সমগ্র বাংলাদেশের হৃদয় বেদনায় উত্তাল হয়ে উঠলো। স্বামী, শাশুড়ী ও ননদকে কারাগারে যেতে হোলো।

মনে পড়ছে সেই সেকালের স্নেহলতাকে। দরিদ্র পিতার সুশ্রী কন্যা। কিন্তু কন্যাদায়ে অনেক টাকা লাগে যে। অত বড় মেয়ের বিয়ে হয় না,—আত্মীয়-কুটুম্ব-মহলে আর পাড়াপল্লীর আসরে ঢি ঢি নিন্দা! অবশেষে একদিন স্নেহলতা নিজের শরীরের ওপর কেরোসিন ঢেলে তার ওপর একটি দেশলাইর কাঠি ধরালো। সে যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তখন সমস্ত দেশের লোক সেই ঘটনায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো অনেক দিন। স্নেহলতা আর আনন্দময়ী,—ওরাই নাকি আধুনিক নারী-আন্দোলনের প্রথম সাড়া জাগিয়েছিল।

উর্মিলাদিদি এলেন ছেলেপুলের সঙ্গে স্বামীকে নিয়ে। তাঁরা নাকি পূবদেশের কোন্ জমিদার। উর্মিলাদির গায়ে একগা গয়না—দড়ি আর কড়ির হার, হাতের বাজুতে মোটা মোটা ফারফোরের তাগা, দুই হাতে একরাশি সোনার চুড়ির সঙ্গে বালা আর ব্রেসলেট, কানে মস্ত মাকড়ি, কোমরে চন্দ্রহার, মাথায় সোনার ফুল আর টায়রা, নাকে চেন্‌টানা নথ, আর পায়ের আঙুলে চুটকী। বড়মানুষের আবির্ভাবে বাড়ীর সবাই তটস্থ। উর্মিলাদি ভয়ানক

বদরাগী আর আত্মাভিমানী,—পান থেকে চুন খসবার যো নেই। ছেলে দুটি বেপরোয়া। বড়টি জুতো প'রে যায় ঠাকুরঘরে, কিংবা ভাঁড়ারে, কিংবা রান্নাঘরে। স্বামী হলেন হরিশবাবু। তিনি ওই ছেলেটাকে দেখে আঙুল দেখিয়ে কাকে যেন বললেন, এটা সেই বাপখেগো ছেলেটা না ? যা, আমার জুতোটা বুরুশ কর্ দেখি ?

তথাস্তু। ফরমাশের গন্ধ পেয়ে আনন্দে ডিগ্‌বাজী খেয়ে চলল ছেলেটা। কী আনন্দ বড়লোকের তাঁবেদারিতে, কী উল্লাস ধনীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ানোয়। যা খেতে পায় না, যা চোখে দেখে না—তারই ছিটেফোঁটা পেয়ে যায় কপালঠুকে। গন্ধতেলের কৌটাটা, বড় মাছের কাঁটাটা, দুধের তলানি, দইয়ের শেষদাগটুকু, পানতুয়ার ভাঙ্গা অবশেষ,—ওই পেয়েই মাঝে মাঝে ছাগলছানার মতো অহেতুক আনন্দে সে ঘুরপাক খেয়ে আসে। সুপ্রসিদ্ধ জমিদার হরিশের জন্য বিড়ি কিনে আনা, পানের ডিবে এগিয়ে দেওয়া, গেঞ্জিতে সাবান মাখানো, কাপড়খানা শুকোলে হাতের কাছে এনে গুছিয়ে দেওয়া। মাপ্‌তে পাওয়া যায় কিনা, জুতোশেলাইয়ের মুচি যাচ্ছে কিনা, স্নানের জন্য তেল সাবান গামছা, স্নানশেষে আয়না চিরুনি, খেতে যাবার আগে পায়ের কাছে চটিজোড়াটা। দেখেশুনে সেজমাসিমা বললেন, ধন্যি ছেলে ! ওর চোখ আছে দ্যাখো সব দিকে। দিনরাত ফাইফরমাশ খাটছে,—মুখে রা নেই !

উর্মিলাদির যাবার দিন এলো। গতকাল ওঁর বড়ছেলেটা পাথরের টুকরো ছোঁড়াছুঁড়ি করতে গিয়ে ছেলেটার কপালে একটা পাথর এসে ঠাঁই ক'রে লাগে। চোখদুটো একেবারে অন্ধকার। কপাল ফুলে ওঠে নীল হয়ে,—হয়ত বা থাকবে। কিন্তু বহু চেষ্টায় আঘাতটাকে ছেলেটা লুকিয়ে রেখেছে, নচেৎ মারপিটের অভিযোগটা তাঁর বিরুদ্ধেই আসবে সে জানত।

উর্মিলাদিদিরা গাড়ীতে ওঠবার আগে আর একটা আহারাদির ঘটা লেগে গেল। ছেলেটা বিস্মিত ! এই ত একটু আগে ওঁদের মধ্যাহ্ন-ভোজনপর্ব শেষ হয়েছে ! ওঁরা বড়লোক, জমিদার,—ক্ষুধা কি তাই এত বেশী ?

গাওয়া-ঘিয়ের গরম গরম লুচি, গল্‌দা চিংড়ীর কালিয়া, বড় বড় বেগুন ভাজা, লেবুর গন্ধ মাখানো উৎকৃষ্ট ছানার সন্দেশ,—তার পাশে টাট্‌কা রসে ফেলা একহাঁড়ি পানতুয়া।

ছেলেটার দিকে ফিরে কে যেন বলল, যা চট্ ক'রে একখানা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়,—এখানে দাঁড়াসনে।

ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আনতে লাগলো দশ মিনিট। কিন্তু ভিতরে এসে

খবর দিতেই ঊর্মিলাদি বোধ করি হাত বাড়িয়ে ছেলেটার হাতে কিছু মিষ্টান্ন দিচ্ছিলেন। তৎক্ষণাৎ বাধা দিলেন সেজমাসিমা।—থাক্‌ থাক্‌, ওরা রয়েছে কল্‌কেতার সদরে···বাড়ীর দোরে ভালো ভালো মিষ্টির দোকান···ওদের ভাবনা কি? কত জুটে যাবে! তোর ছেলেদুটোকে বেশ ক'রে খাওয়া দিকি?—নে, খা বাবা!

ওই অনাদৃত ছেলেটার দিকে ফিরে সেজমাসিমা সহাস্যে বললেন, সেয়ানা ছেলে ছাখো···মুখ ফিরিয়ে নেছে। বলি, যা দিকি, সবাই মিলে তোরঙ্গ আর বাক্স এনে গাড়ীর ছাদে তোল্‌!···যা, আমি তোকে পয়সা দেবো, দই কিনে খাস!

ছেলেটার কপালের কালশিরাটা অনেক দিন পর্যন্ত মিলোয়নি।

পিচের রাস্তাঘাট হচ্ছিল চৌরঙ্গীর সাহেবপাড়া থেকে লালদিঘীর সাহেব-টোলার আশেপাশে। স্বদেশী আন্দোলন, বোমাবাজি, খুনখারাপি মধ্যে মাঝে শোনা যাচ্ছে, তাই সাহেবপাড়ার দিকে কেউ যায় না, পাছে গোয়েন্দা পুলিস ধরে! হগসাহেবের বাজারে ঢোকা ছিল দুঃসাহসের পরিচয়—ওখানে সাহেব-মেমরা ঘোরাঘুরি করে। পার্ক স্ট্রীট, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, লিণ্ডসে স্ট্রীট—এগুলোর নাম অভিজাত মহলে শোনা যায়। ওসব অঞ্চলের যানবাহন হল ভাড়াটে ফীটন গাড়ি—যার ঘোড়াটা একটু তেজী এবং যে গাড়ি সব সময় চকচকে আর ফিটফাট। ওসব গাড়িতে সাহেব ও মেম ছাড়া বিশেষ কেউ চড়ত না। ফীটনের চেয়ে হালকা এবং ফুরফুরে গাড়িগুলোকে বলা হত টমটম। টমটমে চড়ে তেজীয়ান ঘোড়ার রাশ ধরে ছুটিয়ে চলা—বড় আনন্দের। ফুর্তিবাজ সন্ধ্যার বাবুরা টেরি কেটে গোঁফ পাকিয়ে পামসু পায়ে দিয়ে টমটম হাঁকিয়ে ছুটে যেতো। রামবাগান আর ফুলবাগানের 'বউদিদিরা' নাকি ওদের পথ চেয়ে থাকে। মেয়েদের সমাজে 'মহিলা' শব্দটি তখনও চালু হয়নি। বলা হত মেয়েমানুষ বা মেয়েছেলে। ইংরেজিতে 'ফিমেল'। জননী জায়া ও ভগিনীদের সম্বন্ধে উল্লেখ করতে হলে মূর্খ পুরুষরাও বলত, আমার 'মাদার' বলছিলেন, কিংবা আমার 'ওয়াইফ'কে থিয়েটারে নিয়ে যাব, কিংবা আমার 'সিস্টারের' বিয়ে ইত্যাদি। বাপরা চটে যেত ছেলে যদি চিঠির আরম্ভে 'মাই ডিয়ার ফাদার'—না লিখত।

টাকমাথা সপ্তম এডোয়ার্ড মারা যাবার পর ভারত সম্রাট হয়েছিলেন পঞ্চম জর্জ। তিনি আসছিলেন কলকাতায়—এরপর নাকি হবে দিল্লীর দরবার। কী আনন্দ কলকাতায়! পাড়ায়-পাড়ায় বাড়িতে-বাড়িতে সাজসজ্জার ধুম

পড়ে গেছে। ওই যে ছেলেটা, যার নাম শ্রীমান রাম ওরফে খোকা— দুটো জড়িয়ে 'রামখোকা', তার মনে প্রবল উদ্দীপনা। সে রয়েছে নরেনদাদার পাশে পাশে। নানা রংয়ের কাগজের শেকল, 'গড সেভ দি কিং অ্যাণ্ড কুইন' মার্কা ফ্ল্যাগ, আতস বাজি, বাড়ির তৈরি ফানুস আর তুবড়ি, রংমশাল আর ছুঁচোবাজি —এসবের যোগাড় দিতে পেরে রাম ধন্য। সব রকম হুজুগে মামাতো ভাই নরেনদাদা ওরফে দাদা তার গুরু।

প্রায় বছর দুই পরে পাঠশালা ছাড়িয়ে ছেলেটাকে দেওয়া হয়েছে মিশনারি ইস্কুলে। ওই ছেলেটার জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে পুরনো কলকাতা। যতদূর দেখা যায় শুধু খোলাখাপরার চালাঘর—তাদের নাম নাপতিনীদের বস্তি, হরার মা আর শেতলদের বস্তি, হাড়ি-কাওরাদের বস্তি, অন্ধ বুড়োর বস্তি। ওই সব বস্তির ভিতরে-ভিতরে সেদিনের ওই নাবালকটির আনাগোনা। ওখান থেকেই শোনা যেত মাতালদের প্রলাপ, কাবুলিওলাদের লাঠি ঠোকাঠুকি আর বিতণ্ডা, মেয়েছেলেদের চেঁচিয়ে কান্না, চুরিদারির জন্য থানা-পুলিস। ওরা কাজ করতে যায় তেলকল আর আটাকলে, কেউ মুদি-মসলার দোকান, কেউ ঘরামি আর ছুতোরের কাজে, কেউ টিনের আর মাটির খেলনা ফিরি করতে যায়। মেয়েছেলেরা কাজ করে না কিন্তু বসেও থাকে না। চাল-ডাল ঝাড়ে, বিয়েবাড়ির কাজে আসে, বড়ি আর মাটির খেলনা শুকোতে দেয় রোদ্দুরে, ওদের মধ্যে পাজারি-মেয়ে বাজারে মাছ কেনা-বেচা করে, আবার অনেকে সন্ধ্যের পর কাঁচপোকার টিপ পরে সরুগলির মুখে হাসিখুশী হয়ে গা বাঁচিয়ে দাঁড়ায়—হঠাৎ এক-আধজন পুরুষ চক্ষের পলকে ওদের সঙ্গে ভিতরে ঢুকে যেন অন্ধকার কোন সুড়ঙ্গের দিকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে রাত্রে শোনা যেত গান-বাজনার আওয়াজ "যাও যাও ফিরে যাও মন বাঁধা যেখানে—"। সেই হারমনিয়ামের ভাঙ্গা-ভাঙ্গা আওয়াজটিকে যেন মাঝে-মাঝে বিদীর্ণ করে দিত কাওরাবুড়ির চিৎকার আর নোংরা গালাগালি—যার সব অর্থ ওই ছেলেটার বোধগম্য হত না ঘুমের আগে। শুধু দিদিমা এ বাড়ির দোতলার মেঝেতে শুয়ে বলে উঠতেন, দুগ্‌গা, দুগ্‌গা, কানে আঙুল দিতে হয়। থানায় দরখাস্ত না দিলে আর চলছে না।

কিন্তু থানা থেকে পুলিস-পাহারা মাঝে মাঝে এসে ঢুকত ওই সব বস্তির ভিতরে। তারা আসত অন্য কাজে। ওই সব বস্তিতে থাকত চোর-ছ্যাঁচড়। চোর ধরা পড়ত বস্তিতে। লালপাগড়ীরা ভিতরে ঢুকে কয়েকজনকে একেবারে কড়াকড় বেঁধে ফেলত। পুলিসের আনাগোনা দেখে পাড়ার লোকরা ঠকঠক

করে কাঁপত। বাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ হয়ে যেত এবং ছোট ছেলেরা পালিয়ে গিয়ে মায়ের পিছনে লুকোত।

দীপু গুণ্ডা পাশের বস্তিতে ডাক-সাইটে লোক। তার বিরুদ্ধে চুরি আর গুণ্ডামির অভিযোগ যখন তখন। রাত্রে সে নাকি তেল মেখে বেরোয়। হাতে-নাতে কেউ ধরলে সে নাকি পিছলিয়ে পালায়। সে লেংটি পরে, কুস্তির আখড়ায় যায় এবং কেরোসিন বেচতে বেরোয়। তার দেশ নাকি আরা, না ছাপরা জেলায়। এর মধ্যে কবে সে ভরদুপুরে এ বাড়িতে ঢুকে কিছু এঁটো বাসন আর কাপড়চোপড় চুরি করে নিয়ে গেছে। একখানা ধুতি কিনতে গেলে আজকাল দশ গণ্ডা পয়সা লাগে—সেদিন কি আর আছে যে কাপড়ের জোড়া এক টাকা? আর পেতল-কাঁসার বাসন তার ত আগুন দর! পেতলের সের বলে পাঁচ আনা—ইসলামপুরী কাঁসা আজকাল ন আনা সের।

যাই হোক সকলেরই সন্দেহ, এ কাজ দীপুর। কিন্তু কার এমন বুকের পাটা, দীপুকে চোর বলে? অবশ্য দু-একবার সে জেল খেটেছিল বটে। কিন্তু এখন নাকি সে পুলিসের গোয়েন্দা। এ পাড়ায় যারা স্বদেশী দলে মেশে তাদের প্রতি দীপু চোখ রাখে। ওর ভয়ে সবাই তটস্থ।

দিদিমা তারস্বরে চিৎকার পাড়তে লাগলেন—এবাড়ি ওবাড়ি সব জানাজানি। মামা তখন আফিমের মৌজে ছিলেন। তামাকের গড়াগড়া সরিয়ে তিনি ছুটে বেরিয়ে এলেন। চেঁচিয়ে বললেন, যদি হলপ করে বলতে পার দীপু চুরি করেছে, তবে তাকে ছুরি মেরে আমি ফাঁসি যাব।

দিদিমা তাঁর একমাত্র পুত্রের মুখের দিকে মুখ তুলে কি যেন নিরীক্ষণ করলেন। পরে বললেন, ফাঁসি যাবি? এই নিয়ে ক'বার ফাঁসি গেলি তুই?

মামা চেঁচিয়ে উঠলেন—আমি ফাঁসি গেলে তোমার গুষ্টিকে খোরপোষ দিত কে?

এবার বারুদে আগুন লাগল। দিদিমা উচ্চরবে বললেন, তুই দিচ্ছিস? তোর মুরোদ আছে কানাকড়ির? তোর না টিকে ধরাতে জামিন লাগে?

মামাও সমান তেজীয়ান। বললেন, সাবধান, আমার ইজ্জতে ঘা দিয়ো না।

তোর আবার ইজ্জৎ কিসের র‍্যা? জন্মে একটা আধলা তুই রোজগার করেছিস যে ইজ্জতের কথা তুলিস? তোর গাঁজা-আফিংয়ের পয়সা যোগায় কে?

তুমি যোগাও? আমার বাপ ফলনা ভটচার্যির ক্যাশ টাকা গাপ করেছে

কে ? সেই টাকায় তোমার গুষ্টি খাচ্ছে না ?

দিদিমা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, যা যা দূর হ। বলে, এক ব্যাম্নন, হুনে পোড়া। দূর হ সামনে থেকে। এক দানা বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর ! যা—

রই রই চিৎকার উঠেছে, এমন সময় ম্যামী এসে ধরলেন মামাকে। বললেন, নিত্যি নিত্যি কেলেঙ্কার আর সয় না। ঘরে চলো—

মামা রাগে কাঁপছিলেন। চেঁচিয়ে বললেন, হ্যাঁ যাচ্ছি। তবে ছুরিতে শান দিয়ে রাত্তিরে আবার আসছি দীপুর মতন তেল মেখে। এক সঙ্গে সব কটাকে নিয়ে ফাঁসি যাব।

মামী টানতে টানতে মামাকে ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিলেন।

এদিকে দিদিমা গরগর করছিলেন—বলে, আস্তনি সাহেবের দপদপা ! দীপুর সঙ্গে ওর সড় আছে, আমি কি জানিনে ? কথায় বলে, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে !

ঘরের ভিতর থেকে মামা চেঁচাচ্ছিলেন—যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই ! ছুরিখানা শান দিতে বসেছি।

দিদিমা গলা বাড়িয়ে জবাব দিলেন, কাল সকালেই খবর পাঠাব গোঁসাই কলুর কাছে। উত্তম-মধ্যম ছেঁচে দিয়ে যাবে।

কাল সকালে !—মামা হাঁকলেন, রাত কাটতে দেবো মনে করেছ ?

অতঃপর একে একে উভয় পক্ষ চুপ করে গেলেন।

সেদিনের নিশুতি রাত সাঁ সাঁ করছিল। পুরনো বাড়ির চুন বালি-খসা দেওয়ালের ইঁটগুলো অন্ধকারে পিশাচীর দাঁতের পাটি মনে হচ্ছে। কেউ জেগে নেই। ভাইবোনেরা সব ঘরের মধ্যে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ওই ওধার থেকে দিদিমা ও ন'মাসিমার নাক ডাকছে।

ছেঁড়া একখানা চাদর জড়িয়ে রাম শুয়েছিল মায়ের কোলের কাছে। চোখ বুজে চুপটি করে ছিল। হঠাৎ এক সময় চোখ খুলে চাপা কণ্ঠে ডাকল, মা ?

মা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, এখনো ঘুমোসনি ?

ছেলেটা আস্তে-আস্তে প্রশ্ন করল, মামা কখন্ বেরোবে ছুরি নিয়ে ? ওতে বুঝি খুব ধার আছে ?

অন্ধকারে মা হাসলেন কিনা জানা গেল না। শুধু ছেলেটার গায়ে হাত রেখে বললেন, কিচ্ছু ভয় নেই, ঘুমো—

মা জানতেন মৃদু মিহি ঘুমপাড়ানি গান। তার মধ্যে যেন সুদূর একটা

অন্তহীন কালের করুণ ব্যথা জড়িয়ে থাকত। সেই গান শুনতে শুনতে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল। যেন তলিয়ে গেল মধুরের ধ্যান নিবিড়তায়।

দুরন্ত ছেলেটাকে একা বাড়িতে রেখে কেউ কোথাও যেত না। ও যেন থাকত মৃত্যুর মুখোমুখি। চুপি চুপি করোগেটের চালায় উঠে তার উপর থেকে ঝাঁপ দিত বেলতলায়, পাঁচিল থেকে লাফ খেত উঠোনে, উপরের সিঁড়ি থেকে মাঝ সিঁড়িতে লাফিয়ে নামত। খোলার চালাঘরের মাথায় উঠে ঘুড়ি নিয়ে পালিয়ে আসত। চলন্ত ঘোড়ার গাড়ির পিছনে সহিসের দাঁড়াবার জায়গাটা আঁকড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে যেত অনেক দূর। চিন্তাবুড়ির বস্তি, গাঙ্গুলিদের রোয়াক, অক্ষয় মিস্তিরদের দরজা—দেখতে দেখতে পেরিয়ে যেত সব—সেই অর্জুন মুদীর দোকান পর্যন্ত। আর যদি যেত উত্তরে, তবে দীপুর ঘর, লালার দোকান, শেতলদের বস্তি, শীলেদের বাড়ি পেরিয়ে নাগেদের গলি, তারপর সরকারদের মস্ত বড় রাঙ্গা অট্টালিকা। তার ওপারে ডাফ চার্চ পর্যন্ত। ওই চার্চের রেভারেণ্ডের ছেলে তার এখন সহপাঠী।

চালাকি করতে গিয়ে সে চলন্ত গাড়ির গাড়োয়ানের ছিপটি খেয়েছে। খোয়ার রাস্তায় পড়ে গিয়ে থুঁৎনি কেটেছে, জামায় রক্ত মুছে আবার এসে বাড়ি ঢুকেছে চোরের মতন। ওর এখন একটু বয়েস বেড়েছে বইকি।

কিন্তু ওইটুকু ছেলে ঘুরল কি কম? লেখাপড়ায় মন্দ নয়, কিন্তু প্রকৃত পাঠ নিচ্ছে জীবনের থেকে। নিচ্ছে ইচ্ছায় আর অনিচ্ছায়। ওকে নিয়ে গেছে আরেক পিসির বাড়ি নৈহাটি, আর মাসির বাড়ি চুঁচুড়ায়। চৈত্র-বৈশাখের বৈরাগিনী ভাগীরথীর উপরে ঘনিয়ে উঠেছে কালবৈশাখীর ঝড়-তুফান। নৌকা টাল খাচ্ছে, চিৎকার করছে সবাই, ঘন ঘন দোলা দিচ্ছে। দেখতে দেখতে নৌকা এসে ভিড়ল চুঁচড়োর ঘাটে। কে যেন ওকে এবারের মতো মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাল।

ওকে নিয়ে গেছে কাঁকিনাড়ায় আর ভাটপাড়ায়, ষাঁড়েশ্বরতলায় আর শ্যামসুন্দরে। ওকে নিয়ে গিয়েছিল ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর ভাড়া-করা ইস্টিমারে চড়িয়ে সেই শ্রীরামপুরের ঘাটে—যেখানে রাজা কিশোরী গোঁসাই এসে বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করে রাজবাড়িতে নিয়ে যান। ওই ছেলেটা শুনে এসেছে, ব্যোমকেশ নাকি ওর বড় পিসেমশায়ের সহোদর। ঘাট থেকে রাজবাড়ি পর্যন্ত লাল গালচে পাতা। মামা ছিলেন বরযাত্রীর দলে। মামা বললেন, ব্যোমকেশ এতদিনে জাতে উঠল ছেলের বে দিয়ে। ভটচার্ষিবাগানে বাড়ি-বাড়ি ঘাড় হেঁট করে নমস্কারি দান-সামগ্রী দিতে হয়েছে। কাঁসার

থালা-বাসন, পেতলের ঘড়া, গরদের জোড়, পাঁচ টাকা করে দক্ষিণে। এক-এক সেট পেয়েছে পাড়ার সবাই। তবেই না জাতে তুলেছি, তবেই না এসেছি এই বিয়েতে। মনে নেই বাছাধন বিলেত গিয়ে একঘরে হয়েছিল ?

মামা ঈষৎ আফিংয়ের মৌজে ছিলেন। সেবার বাড়ি ফিরেছিল সবাই রাত একটার পর। ইস্টিমারের সারেঙকে তিনি যে সকল প্রাদেশিক ভাষায় কটূক্তি করছিলেন সেগুলি তাঁর ভাগ্নে মুখস্থ করে নিয়েছিল।

তখন নতুন ভবানীপুর তৈরি হচ্ছিল। ওই ছেলেটা সকলের সঙ্গে যেত বেলতলা রোডে দাশরথি সাণ্ডেলের বাড়ি। বড়মাসির দেবর তিনি। ভবানীপুরের ভিতরে-ভিতরে তখন বন-বাগান, ধানের ছোট ছোট ক্ষেত। ভিতর দিকে গেলে একটার পর একটা জলাশয়। সব গলিঘুঁজি, ঘোড়ার গাড়ির মেরামতি আড্ডা, মুড়ি-মুড়কি আর তেলেভাজার দোকান। পথঘাটে সর্বত্র তেলের আলো জ্বলে। তখনও গ্যাস আসেনি। বেলতলার মোড় থেকে আর কতকটা এগিয়ে ডান-হাতি হাজরা রোডে ট্রাম গাড়ি ঢুকে কালীঘাটে শেষ হত। ওখানে সব বস্তি পাড়া, ইঁট-চুন-সুরকির আড়ৎ, আদিগঙ্গার ধারে-ধারে নোংরা মেয়েছেলেদের গোপন গুহাগহ্বর, তার পরেই এসে পড়ে বলরাম বোসের ঘাট। সেখান থেকে পুব দিকের পথ ধরে ট্রাম রাস্তায় পড়লে চড়কডাঙ্গা।

দাশরথি সাণ্ডেল ছিলেন এডভোকেট এবং ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের বিশিষ্ট বন্ধু। দাশরথির বড় ছেলের বিয়েতে ওই নাবালক ছেলেটা তখনও ছিল খোকা। ভিড়ের মধ্যে আর আতর-গোলাপ-চন্দন-জুঁইয়ের সুগন্ধলোকে ছেলেটা ছিল আত্মহারা। কিন্তু তারই ফাঁকে এক পাশে বসে সে দেখল বাদুড়বাগানের শিশির কাকাদের সেই প্রথম থিয়েটার করা। পালা ছিল 'চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে'। কেন যে হাসির ফোয়ারা মাঝে মাঝে ছুটছিল, ও-ছেলেটা কিছু বোঝেনি।

ওইটে নিয়ে ভাবতে বসেছে ছেলেটা, এমন সময় একদিন হঠাৎ এসে দাঁড়ালেন তারাকুমার। ছেলেটার দুরন্তপনার খবর গিয়েছিল বাদুড়বাগানে ওদের বাড়িতে এবং ওই বাদুড়বাগানে যাবার পথে যে ছাতার কারখানাটা পেরিয়ে যেতে হয়, তারই বেড়ার ফাঁক থেকে ওই ছেলে একগাছা ছাতার বাঁট হাত-সাফাই করে এনেছে। ও না হয় বড় হয়ে পাকা চোর হবে, কিন্তু বাঁট দিয়ে এরই মধ্যে দুটো বেড়ালকে মেরে শেষ করেছে, একটা বুড়ো ইঁদুর মেরেছে, নর্দমায় নেড়ি কুকুর ঠেঙ্গিয়েছে রাস্তায় বেরিয়ে—ও সবাইকে শাসিয়ে বেড়াচ্ছে।

নিচের তলাকার মণ্টুকে এমন মেরেছে যে, বেচারির পিঠে উঠেছে বড় বড় কালশিরা। মেয়েটা কাঁদছিল আড়ালে গিয়ে।

মা বললেন, ওর কবে যে জ্ঞানগম্যি হবে—।

তারাকুমার হাসছিলেন। বললেন, ছেলে দুরন্ত না হলে মানায় না, বড়বউদি।

ওর সামনেই বলছ? তোমরা ওকে বড্ড আস্কারা দিচ্ছ।

না না, ও বড়দাকে খুব ভয় করে।—তারাকুমার বললেন, ওরে ওই, চল আমার সঙ্গে—বেড়িয়ে আসি। চল্ —

ছেলেটা তৎক্ষণাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। ওকে যেন এইটুকু সংসারযাত্রার মধ্যে ধরে না। ও পেতে চাইছে অবারিত একটা বাহির—একটা উচ্ছৃঙ্খল শাসন-বঁধনহীন উদ্দাম জীবন। সেখানে ঘোড়া ছুটবে, ধুলো উড়বে, ঘাম ঝরবে, রক্ত গড়াবে।

তারাকুমারের সঙ্গে সেদিন বিকালে ছেলেটা গেল মেছোবাজারে। সেই প্রথম বায়স্কোপ কলকাতায়। বাড়িটার নাম দিয়েছে 'এম্‌প্রেস থিয়েটার'। হাফ-টিকিট বুঝি দুআনা। ছেলেটা তার জীবনে সেই প্রথম ছবি দেখল। পিছন থেকে আলো এসে পড়ছে সাদা মস্ত পর্দাখানার ওপর। যেন হিজিবিজি বৃষ্টি হচ্ছে ঝিরঝিরে একপ্রকার শব্দের সঙ্গে। ওটা ছবির রীল্‌টার আওয়াজ। কিন্তু কী অপরিসীম কৌতুক। ছোট ছোট সাহেব মেম ছুটোছুটি করছে। কারও মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। লাফাচ্ছে, দৌড়চ্ছে, পাঁচিল টপকাচ্ছে, আবার গিয়ে ঘোড়ায় চড়ছে। তারপর দেখল সমুদ্র আর জাহাজ। সব ছবি তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছে। ছবির পৃথিবী যেন আশ্চর্য।

রাস্তায় বেরিয়ে কিছু চেনা যাচ্ছে না। এক জগৎ থেকে সে এল অন্য জগতে। কোন্‌টা বাস্তব, সে ভুলে গেছে। তারাকুমার ওকে এক দোকান থেকে গরম কচুরি খাওয়াল, তারপর এক বইয়ের দোকান থেকে ওকে কিনে দিল 'হাসিখুশী' আর 'ছবি ও গল্প'। কী বোকা সে। কিনতে পারল না 'চারু ও হারু'? এই ভালো, 'দাদামশায়ের থলে', 'ঠাকুরমার ঝুলি'।—ব্যস আর কি চাই?

সেদিন সে বাড়ি ফিরেছিল গৌরবগর্বিত চেহারা নিয়ে। সে যেন জয় ক'রে ফিরল আরেকটা জগৎ। ওই ক্ষুদ্র বালক তার জীবনের মধ্যে নতুন পাঠ নিয়ে এল। আজকের অভিজ্ঞতা যেন তার পাঁচ বছর বয়স বাড়িয়ে দিল।

দিদিমার বাড়ীতেই সবাই থাকত, কিন্তু তাঁর ওমহলে ভাড়াটে জুটতো না

অনেক সময়ে। লোকে দেখে যেতো, আসবো ব'লে চ'লে যেতো। শূন্য মহলে জঞ্জাল উড়ে বেড়াতো সারাদিন, দুপুরের রোদে বেলগাছের ঝরাপাতার সরসরানি শোনা যেতো, গোলা পায়রা এসে হয়ত বাসা বাঁধতো, হয়ত বা বিড়াল কেঁদে যেতো কোনো কোনো রাত্রে। দিনের বেলায় ওমহলটা ছিল ছোটদের দুরন্তপনার অবারিত ক্ষেত্র। জঞ্জালের মধ্যে ওরা খুঁজে পেত ঝরা পালক, কিংবা পুরনো তারিখের চিঠি, কিংবা ভাঙ্গা কাঁচের চুড়ি। বড়জোর পেয়ে যেত সীস-ভাঙ্গা পেন্সিলের টুকরো। ওদের আনন্দ, কিন্তু বাড়ীর লোকের দুর্ভাবনার শেষ নেই। কলকাতার মাঝখানে ভদ্রপল্লীতে এই দোতলা বাড়ী, ছ'খানা ঘর, মস্ত উঠোন, দুটো চালাঘর—ভাড়া মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা। ভাড়াটে না পেলে মালিকের অসুবিধে,—টেক্স খাজনা গুনতে হয়। সুতরাং দিদিমা বড়ই বিপন্নবোধ করতেন। ভাড়া বন্ধ হোলে হাঁড়িও যে বন্ধ হবে!

অবশেষে একদিন একটি লোক এসে জানালো, তাঁরা নীচের তলাকার একটি ঘর ভাড়া নিতে পারেন তিন টাকায়। থাকবেন স্বামী-স্ত্রী আর একটি বছর আষ্টেকের মেয়ে।

মামা বললেন, তিন টাকা! কলকাতায় গোয়ালঘর পাওয়া যায় না তিন টাকায়। আট টাকার কম আমি রাজী নই। অতঃপর অনেক দর কষাকষির পর দিদিমা রাজী হলেন পাঁচ টাকায়। ভাড়াটে-কর্তা মামার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। লোকটা বুঝি কালীঘাটের ওদিকে মাটির পুতুল আর টিনের খেলনা বিক্রি করতে যায়। এর আগে ওরা ছিল সাবেক কোন্ বাড়ীতে; সেখানে নাকি বাড়ীওয়ালার অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওরা চলে আসতে বাধ্য হয়। কথাটায় দুঃখের সুর ছিল, সুতরাং দিন তিনেকের মধ্যেই ওরা যেন এবাড়ির আপন জন হয়ে গেল। ছোট ছোট কয়েকজন ভাই বোন খেলার সঙ্গী পেয়ে গেল ওই ছোট মেয়েটাকে। মেয়েটার নাম নন্টু। নন্টু বড় সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী,—কিন্তু তার দোষ ছিল এই, সে সহজে জামা-কাপড় পরতে চাইতো না। এজন্য তার লাঞ্ছনা আর তিরস্কার হোতো অনেক সময়ে। কিন্তু নন্টু ছিল অবাধ্য, তাকে বাগ মানানো কঠিন। সুতরাং এ মহলে সে যখন ছিটকে আসতো, তখন এদিক থেকেও তার উপর তাড়না হোতো। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কোনোটাতেই তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

এ মহলের ছোটরা নন্টুর মার খুব প্রিয় ছিল। মহিলাটি এদের মা-মাসিমাদের চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু অত্যন্ত শান্ত। ঘোমটাটানা থাকতো সব সময়ে, এরা সেই ঘোমটার নিচে দিয়ে দেখত তাঁর বড় বড় কালো চোখ

আর পরিচ্ছন্ন দাঁতের মিষ্ট হাসি। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বলতেন, এসো বাবা এসো, তোমার জন্যে কমলালেবু রেখেছি—খাও গে।

আড়ষ্ট হয়ে ছেলেটা বলত, নন্টুকে দিন্ না লেবু।

নন্টু? ও গোড়ারমুখীর কথা আর বলো না। ভাত ছাড়া কিচ্ছু খায় না, তাও আবার নুন দিয়ে। ভাতের সঙ্গে আর কিছু ছোঁয় না। পোড়ারমুখী ভাত খায় চার পাঁচ বার।

নন্টুর মা পুনরায় বললেন, গরীবের ঘরে নুন-ভাত খাওয়াই ত সুবিধে, বাবা।

সুমধুর সঙ্গীতের মতন তিনি কথা বলতেন, কিন্তু সেদিন তাঁর সব কথার মানে ছেলেটা বুঝত না। শুধু মনে হোতো, এ মেয়ের জন্মানো উচিত ছিল কোনো বড় ঘরে, এ বাড়ীর এই আবহাওয়ায় ওঁকে যেন মানায় না।

ছোট ছেলেমেয়েরা নন্টুর প্রতি আকৃষ্ট ছিল নানা কারণে। নন্টু বেলগাছের ডালে উঠে কাকের বাসা ভেঙে দিত, নয়ত চড়াই পাখী ধ'রে তার পায়ে দড়ি বেঁধে ঘোরাতো। তার ভয়ে কুকুর বিড়াল পাড়া ছেড়েছিল। আবার কখনো বা নেংটি ইঁদুর ধ'রে কাকচিলকে ডাকতো তারস্বরে। তার মা একসময়ে হয়ত পরিয়ে দিত কালো ফুল-তোলা এক টুকরো বৃন্দাবনী শাড়ী, আর সে সেখানা কোমর থেকে খুলে হাতে জড়ো ক'রে নিয়ে উঠোনে গান গেয়ে বেড়াতো। আশ্চর্য, গানের গলা তার অতি মিষ্টি ছিল,—কিন্তু বেহায়া মেয়ে ছাড়া কেউ গান গায়?—সুতরাং এ মহলের ওপর নিষেধ ছিল কেউ যেন নন্টুর সঙ্গে না মেশে। দিন দিন সে যেন হয়ে উঠলো মূর্তিমতী এক সমস্যা,—সে ভয় পায় না, ভয় করেও না কাউকে। মার খায়, কিন্তু মুখের হাসি কমে না। তার এই সব চালচলনে এবং এই প্রকার স্বেচ্ছাচারের চেহারা দেখে ওই ছেলেটার ভিতরের অত্যুগ্র বিদ্রোহী বালক পরম কৌতুকবোধ করতো। সকলের চোখ এড়িয়ে সে গিয়ে দাঁড়াত তার পাশে,—সে ওকে শেখাতো কেমন ক'রে ভাঙ্গা পাঁচিলের উপর থেকে উঠোনে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হয়, কেমন ক'রে ভাঙতে হয় বেলগাছে কাকের বাসা। মেয়েটার চুল ছিল ছোট ছোট। মুখে চোখে ও সর্বাঙ্গে কেমন এক প্রকার সোঁদা বন্য গন্ধ! চাহনিটা যেন নেশা ধরানো, তার সঙ্গে অবাধ স্বাধীনতার হাওয়া। সে যদি হাত ধ'রে টানতো কখনো, ঠিক যেন অকূলে ভেসে যাওয়ার ভয় হোতো। শাসনের ভয়ে যখন ছেলেটার বুকের ভিতরে কাঁপতো তখন মেয়েটা ওকে বাইরের থেকে ডাক দিত ইশারায়,—বুকের ভিতর আবার কেঁপে উঠতো—

পাছে তার দুর্বার আকর্ষণে শাসন-শৃঙ্খল ছিঁড়ে সে বেরিয়ে পড়ে। তার জ্বালায় শিশুপাঠ্য কথামালায় ছেলেটার মন কিছুতেই বসতে চাইতো না।

দিনের বেলা নণ্টুর মায়ের রান্না চড়তো না, কেন না রান্নার উপকরণ জুটতো না দিনমানে। দারিদ্র্য তার কারণ। তাঁর কাজ ছিল শান্ত মনে পুরনো কাপড় শেলাই করা, কিংবা রামায়ণখানা নিয়ে একমনে ব'সে থাকা,—কিংবা অমনি একটা কিছু। সন্ধ্যার সময় যখন রেড়ির তেলের আলো জ্বলতো তাঁর দরজায়, তখন মধ্যে মধ্যে দেখা যেত নণ্টুর বাবা আসতো পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে। তখন ভাত চড়তো। সেই ভাতের গন্ধে জেগে উঠতো নণ্টু। একসময় হয়ত সেই লোকটি দীর্ঘ মিষ্টকণ্ঠে দেহতত্ত্বের গান ধরতো,—'মন যে আমার পথ হারালো মাগো—তোমার চরণ স্মরণ করি'।

লোকটার গলা ছিল মিষ্ট,—সেই গলায় সংসার-বৈরাগ্যের একটা করুণ আবেদন ছিল। এধার থেকে দিদিমা সেই গান শুনে সজল চক্ষে ব'লে উঠতেন, সবাইকে রেখে কবে যাবো মা? কাশী—কাশী—বিশ্বনাথ!

লোকটা কিন্তু সূর্যোদয়ের আগেই উঠে নিজের কাজে চ'লে যেতো। দিনের বেলায় কোনোদিন এ মহলের কেউ তাকে স্পষ্ট ক'রে দেখেনি। পুতুল বেচে তার যা রোজগার হয় তাতে দু'বেলা অন্ন জোটে না। তার ওপর আছে ঘরভাড়া, আছে কাপড়চোপড়,—কিন্তু সকাল-সন্ধ্যা তার অধ্যবসায় অসীম।

দিদিমা বলতেন, মুখে ভাত তুলবো কেমন ক'রে মা? মেয়েকে নিয়ে বউটি উপোস ক'রে রইলো—এতে যে ভিটের অমঙ্গল! দু'কুনকে চাল-ডাল তোরা দিয়ে আয় মা। এমন ভাড়াটের কাছে ঘরভাড়াই বা নেবো কেমন ক'রে?

নণ্টুর মাকে ডাকা হোতো, কিন্তু তিনি কিছুতেই এই অযাচিত দান গ্রহণ করতেন না। বরং হাসিমুখে বলতেন, আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমার হাঁড়িতে পান্তা ভাত আছে।

সহাস্য মুখে তাঁর কী দৃঢ়তা! সেই শান্ত হাসির কাছে এ মহলের দাক্ষিণ্য যেন ছোট হয়ে যেতো। সেজমাসিমা বললেন, বউটার অংখার দেখছ? রক্তের তেজ আছে বৈকি, নৈলে উপোস করে কিসের জোরে?

দিদিমা চুপ ক'রে থাকতেন। ছোট ছেলেমেয়েরা লুকিয়ে গিয়ে নণ্টুকে একবাটি ভাত খাইয়ে আসত। অত দারিদ্র্যের মধ্যেও মেয়েটাকে কোনোদিন মলিন কিংবা বিমর্ষ দেখা যেতো না। বড় কঠিন মেয়ে। দিদিমার এ মহলে ছিল কলরব, কলহ আর কোলাহল। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত হৈচৈ লেগে

থাকে। দারিদ্র্যের থেকে জন্ম চিত্তক্ষোভের, তার থেকে নিত্য অসন্তোষ আর অশান্তি। মামার বিকৃত চীৎকার, দিদিমার কটূক্তি, মামীর আচরণ নিয়ে কদর্য কোলাহল,—সমস্তটা মিলিয়ে আবহাওয়াটা থাকতো দূষিত। ও মহলটা কিন্তু সবসময়ে শান্ত। সেখানে যেন তপোবনের তপস্বিনী ব'সে থাকতো আত্মসমাহিত হয়ে। এই ছেলেটা এক একবার আড়াল থেকে নণ্টুর মাকে দেখে আসত। হয়ত ঘরে আলো জ্বালা। নণ্টু ঘুমিয়ে। আর নণ্টুর মা ব'সে রয়েছেন আলোটার দিকে চেয়ে,—তাঁর চক্ষের পলক পড়ছে না। হয়ত বা চোখের পাতায় থাকতো জলের আভাস, কিংবা স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকতেন কোনো জটিল ভাবনা নিয়ে। ছেলেটাও চেয়ে থাকত তাঁর দিকে একাগ্র চক্ষে, চেয়ে-চেয়ে আত্মবিস্মৃত হত, কিন্তু কি দেখত আজকে আর মনে পড়ে না।

নিচের তলাকার নণ্টু ছিল তার সমান বয়সের। একই দুরন্তপনার দুই সঙ্গী। ওরা চড়াই পাখি ধরে, বিড়ালকে জব্দ করতে দুজনে কুকুরছানা ধরে এনে পোষে, লগা দিয়ে বেলগাছে কাকের বাসা ভাঙে, আর ছেলেটা লুকিয়ে দিদিমার ভাঁড়ারে ঢুকে কুল বা তেঁতুলের আচার চুরি করে আনে—দু'জনে নিরিবিলিতে ব'সে খায়। একদিন ওরা একটা গোলা পায়রা ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু মামার বিড়াল 'পুষি' কোত্থেকে এসে পায়রাটাকে খুন করে যায়। সেই রক্তমাখা মরা পায়রাটাকে নিয়ে নণ্টু বলল, আয়, দেখবি আয়, কেমন নখ দিয়ে এটাকে ছিঁড়েছে। আয় না চালাঘরের ভিতরে, কেউ দেখবে না।

ছেলেটা বলল, ছেঁড়েনি রে, কামড়ে ছিঁড়েছে। ফেলে দে, মরা পায়রা! এ মা, তোর হাতে-গায়ে রক্ত!

নণ্টু বলল, আয় না দেখি, পায়রাটার নাড়িভুঁড়ি কেমন!

নণ্টুর পরনে থাকার কথা ছিল ছ'হাতি একখানা নীলপেড়ে ধুতি। কিন্তু ধুতিখানা সে বিশেষ পরত না, হাতে নিয়ে ঘুরত। তার সোঁদালি স্বাস্থ্যটা খুবই ভাল, গায়ের রংটা টকটকে ফর্সা, এবং তার উলঙ্গ স্বাস্থ্যের গড়নটা তার দরিদ্রা জননীর পক্ষে দুর্ভাবনার কারণ ছিল। সেইজন্য মার খেত সে প্রচুর এবং শুধু টাউ-টাউ করে নুন-ভাত খেত তার চেয়েও বেশি। ছেলেটার দিকের রান্নাঘরেও পান্তাভাত চুরি হয়ে যেত। নণ্টুর বন্য দুটো চোখের উপর ঝাকড়া চুলের রাশি ঝিলমিল করত।

চালাঘরের মধ্যে ঢুকে নণ্টু মরা পায়রাটাকে নিংড়ে-নিংড়ে রক্তরস বার

করে হঠাৎ ছেলেটার মুখে-গায়ে মাখিয়ে দিল। ছেলেটা বাধা দিল প্রবল শক্তিতে। তারপর দুজনে ধস্তাধস্তি, দ্বন্দ্বযুদ্ধ। দুজনে পড়ল মেঝের উপর যেন কুস্তি লড়ছে! ছেলেটা ছিল ডিগডিগে, একটু রোগাটে। মেয়েটা ওকে পাট করে ফেলে ওর গায়ের ওপর একবারে চেপে বসল। ঘোড়ার উপরে যেন জকি। কিন্তু কী হ'ল হঠাৎ, কী ঘটল উভয়ের মধ্যে। নণ্টুর গায়ের গন্ধ, নিঃশ্বাস, তার মাংসল দেহের ভিন্ন প্রকৃতি—সবটাই অন্যপ্রকার। ছেলেটা হঠাৎ থেমে গেল। ওকে সর্বাঙ্গ দিয়ে জড়িয়ে যেন পিষে ফেলছিল নণ্টু। এবার ওকে ছেড়ে দিল। সেই রক্তমাখা চেহারায় ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে এই প্রথম উলঙ্গ নণ্টুর দিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করল, নণ্টু হ'ল মেয়ে।

পলকের মধ্যে আগুন ঠিকরিয়ে এল ছেলেটার দুই চোখে। সে সহসা প্রচণ্ড শক্তিতে এক চড় মারল নণ্টুর মুখের ওপর। তারপর বেরিয়ে এসে কলতলার দিকে গেল। তার রক্তমাখা সর্বাঙ্গে যেন এক বন্য মেয়ের গন্ধ!

পিছন থেকে নির্লজ্জ মেয়েটা হি হি করে বিজয়গর্বে হাসছিল।

অত ঘনিষ্ঠতা, অতদিনের আনাগোনা আর ঘরোয়া বন্ধুত্ব,—কিন্তু সহসা একদিন যেন তার অবসান ঘটলো। ভিতরে ভিতরে একটা অসন্তোষ যেন রি রি ক'রে উঠলো। ছেলেমেয়েদের ওপর নির্দেশ এলো, ওমহলে যেন আর কেউ না যায়,—নণ্টুর সঙ্গে যেন আর বাক্যালাপ না করে। চাপা চাপা কথাবার্তা আর কানাকানিতে ভ'রে উঠলো এ মহল। এক এক জায়গায় এক এক দলের জটলা ব'সে গেল।

এ কথা চাপা রইলো না যে, ওরা মন্দ লোক। যে লোকটা সকাল-সন্ধ্যা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নির্বিরোধে পরিবার প্রতিপালন করে সে লোকটা নাকি শয়তান। যে নণ্টু এ মহলের সকলের নিত্য প্রিয় সঙ্গী—যার কলহাস্য আর আনন্দোচ্ছ্বাস এ বাড়ীর দূষিত অসাড় আবহাওয়াকে মুখর ক'রে রাখে সে নাকি মূর্তিমতী পাপ, আর তার মা নাকি বিষাক্ত সর্প অপেক্ষাও ভয়াবহ জীব। মামা বললেন, খবরদার,—ওদের মুখদর্শন করো না।

দিদিমার সঙ্গে মামার কোনোকালেই মিল নেই কিন্তু এখানে তাঁদের মধ্যে কোনো বিরোধই দেখা গেল না। দিদিমা বললেন, দুর্গা, দুর্গা, মুখ দেখাও পাপ।

সেজমাসিমা এসেছিলেন সেদিন চুঁচুড়া থেকে। তিনি শোনামাত্র বললেন, খ্যাংরা মেরে তাড়াও বাড়ী থেকে। ছোট মেয়েটা আসে এদিকে, তোরা যেন ওকে ছুঁসনে বাবা। কালনাগিনীর বাচ্চা!

কানাকানি থেকে জানাজানি। তারপর এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী,—এবং এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া। এই উপলক্ষ্যে যাদের মধ্যে বিবাদ ছিল, তাদের মধ্যে গলাগলি দেখা গেল। শাশুড়ীর পাশে বউ এসে দাঁড়ালো, মামীর পাশে মামা, মামার পাশে দিদিমা। সবাই ভালো, সবাই পরম বৈষ্ণব, সকলেই সমাজনীতি রক্ষার জন্য ব্যস্ত, কল্যাণ-কামনায় সকলেই একমত।

সেজমাসিমা চেঁচিয়ে বললেন, ভালোয় ভালোয় ওরা যদি ঘর ছেড়ে না যায় তবে পুলিশে খবর দাও, দাদা।

মামা তাঁর ছিলিমে শেষ টান দিয়ে এসে বললেন, তা আর বলতে? কলকাতার সব থানার দারোগা আমার মুঠোর মধ্যে। সাত দিনের মধ্যে যদি ঘর ছেড়ে না দেয় ত ঘুঘুর ফাঁদ দেখাবো। বুনো ওল দেখলে ভয় পাইনে, আমিও বাঘা তেঁতুল!

পাড়ার সমাজপতি চাটুয্যেমশাই একদিন এসে বললেন, ভট্‌চাষ, কি সব শুনছি? তোদের বাড়ীতে কেমন লোককে ভাড়াটে বসিয়েছিস?

মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, এবারটা মাপ কর। দুষ্টু গরু গোয়ালে এসে ঢুকেছে। গলায় দড়ি বেঁধে শিগগিরই বিদেয় করছি।

পাড়ায় নাকি আর মুখ দেখানো যাচ্ছে না। সমগ্র পল্লী নাকি অশুচি হয়ে উঠেছে নণ্টুদের অস্তিত্বে। সমাজবিধি, নৈতিক চেতনা, লৌকিক সংস্কার—সমস্তই তাদের জন্য নাকি বিপন্ন। সুতরাং সেদিনকার সেই অগণ্য নরনারীর সঙ্ঘবদ্ধ শাসন ও রক্তচক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে তিনটি নিরুপায় প্রাণী থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো।

একটা মর্মান্তিক ঘটনা থেকে একদিন আগুনটা জ্ব'লে উঠলো। গোপনে এক কাঁসি ভাত নিয়ে ওই ছেলেটা আড়ালে গিয়ে নণ্টুর থালায় ঢেলে দিচ্ছিল, কিন্তু মামীর সতর্ক চক্ষু সেটা লক্ষ্য করে। তিনি ছুটে গিয়ে একখানা খুন্তি এনে নণ্টুর কপালে এক ঘা বসিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ মেয়েটার কপাল বেয়ে ঝরঝরিয়ে নেমে এলো রক্তের ধারা। কিন্তু নণ্টু ভ্রূক্ষেপ করলো না, রক্তটা বাঁ হাতে মুছে ভাতের থালা নিয়ে পালিয়ে গেল। নণ্টুর মা অনেক সহ্য করেছিল, এবার কিন্তু আর বরদাস্ত করতে পারলো না। সেই শান্ত দেবীমূর্তি এবার চঞ্চল হয়ে উঠে কাঠের চ্যালা বার ক'রে নণ্টুকে প্রহার আরম্ভ ক'রে দিলো। এ মহলে ছেলেটার ওপর লাঞ্ছনা,—সে ত তাঁর সয়ে গেছে। ছেলেটাকে নাকি বশীকরণ করেছে নণ্টুর মা।

গলা বাড়িয়ে একসময় নণ্টুর মা বললে, মেয়েটাকে এমন ক'রে মারলেন

যে, একেবারে রক্তারক্তি? ভাত কি আমরা চেয়েছিলুম? ওকে আপনাদের ছেলেই ত ডেকেছিল। মামা জবাব দিলেন, গলার আওয়াজ করলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতে পারি তা জানো?

হোমাগ্নিশিখার মতো নণ্টুর মা কাঁপতে লাগলো। বলল, আপনারা না ভদ্রলোক?

মুখ সামলে কথা বলিস। জিব টেনে বার করবো। সতীপনা ধরা প'ড়ে গেছে তাই বুঝি এখন গলাবাজি? জানি জানি, সব জানি। শাক দিয়ে এতদিন মাছ ঢাকা ছিল!—মামীর মুখে আরও যে-সব অদ্ভুত ভাষা যোগাতে লাগলো, সে-সব সে-বয়সে ছেলেটা প্রথম শুনল।

এ নাটকের প্রধান নায়ক হলেন মামা। তিনি একদিন সন্ধ্যার পর নণ্টুর বাবাকে পাকড়াও করলেন। চোখ রাঙিয়ে বললেন, ঘর যদি ছেড়ে না দাও তবে গলায় দড়ি বেঁধে তুর্কি নাচন নাচাবো। মনে করেছ আমি শুধু গাঁজা-আফিংই খাই, আর কোনো গুণ নেই আমার? ইতিজাতের সঙ্গে আমি ঝগড়া করিনে, শুধু দাঙ্গা বাধাই—এ কথা মনে রেখো।

নণ্টুর বাবা সবিনয়ে বলল, অন্য জায়গা খুঁজে নেবার একটু সময় দিন্?

তিন দিন!—মামা হাঁক দিলেন, তিনি দিনের বেশী সময় দেবো না, তারপর গলাধাক্কা!

একপক্ষ মারমুখী, অন্যপক্ষ শান্ত। বাড়িওলারা অনেক নীচে নামতে পারে এ তারা জেনেছে। ভদ্রতার মুখোশ ওরা যে কোনো সময়ে খুলে ফেলতে পারে। লোকটা মামার মুখের দিকে তাকিয়ে ভিতরে চ'লে গেল।

পরম্পরায় কথাটা রটনা হতে লাগলো। কে যেন হলপ ক'রে বলল, নণ্টুর মা নাকি বাল-বিধবা। নণ্টুর বয়স যখন পাঁচ মাস, তখন তার স্বামীর মৃত্যু ঘটে। তার পর থেকে এই লোকটি ওদের প্রতিপালনের ভার নেয়। এই লোকটি নাকি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে,—যেন কোথাকার জমিদার! কিন্তু সব ছেড়ে এসে এখন খেল্‌না ফিরি করে, সকাল-সন্ধ্যা ঘুরে টাকাটা-সিকেটা যোগাড় ক'রে আনে। অনেক তুকতাক, অনেক মারণ-উচাটন জানে নাকি ওই নণ্টুর মা,—লোকটা তাই ওদেরকে ছেড়ে যেতে পারে না। ওই ডাইনী, ওই পিশাচীই হোলো যত নষ্টের গোড়া। ওই লোকটাকে নাকি পথের কাঙাল করেছে ওই শয়তানী।

তিন দিনের বদলে সাত দিন পেরিয়ে গেল, ওরা বাড়ী ছাড়লো না।

লোকটা পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। কখন আসে কখন যায়—কেউ জানতেও পারে না। সম্ভবত ঘর খুঁজে পায়নি। নণ্টুর মা পাথরের মতন দরজার ধারে ব'সে থাকে।

বেশ মনে পড়ছে সেটা বর্ষাকাল। আগের দিন সমস্ত রাত ধ'রে বৃষ্টি হয়েছে। পরদিন সকালেও জলকাদা দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তায়। এমন সময় পুলিস-পেয়াদা এসে হাজির হোলো বাড়ীর দরজায়। পাড়ার লোক এসে দাঁড়ালো ঘিরে। মামা বিজয়গর্বে বেরিয়ে এলেন। কারো মুখে ক্রূর হাসি, কারো মুখে ধিক্কার, কারো মুখে বা রসিকতা।

পুলিসের পেয়াদা নণ্টুর মা'র ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র টেনে রাস্তার জলকাদায় নামালো। হাঁড়ি, কলসী, কড়াই, ছেঁড়া মাদুর, ভাঙ্গা তোরঙ্গ আর থালা বাটি। মেয়ের হাত ধ'রে নণ্টুর মা পথে এসে নামতে বাধ্য হোলো। হঠাৎ সবাই চুপ। নণ্টুর মা'র মুখে চোখে এক প্রকার নিঃসঙ্কোচ প্রশান্তি—সেই প্রসন্ন মুখে যেন সকলের জন্য ক্ষমা। কুণ্ঠা নেই, অধোবদন নয়, নির্বিকার দৃষ্টি, আচরণে কোথাও নেই জড়তা আর আড়ষ্টতা,—তাঁর দিকে তাকিয়ে সবাই যেন থমকে গেল।

ওই ছেলেটাও থমকিয়ে গেল একান্তে দাঁড়িয়ে। হৃৎপিণ্ড ঠেলে গলার কাছে তার কান্না উঠে আসছে, কিন্তু সে শান্ত। হঠাৎ হত যদি সর্বনাশা ভূমিকম্প—খুশী হত সে। যদি হঠাৎ বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু ঘটতো, সে বেঁচে যেত। মনে মনে সে হয়ত ভাবছিল ওই অপমানিতা জননী সকলকে ক্ষমা ক'রে গেলেন, কিন্তু ওই ছেলেটা রইল ওদের পরিবারের সকলের বড় শত্রু, চিরদিনের শত্রু!

নণ্টুর মা সকলকে প্রণাম করতে গেল, কিন্তু যাঁরা বয়স্ক তাঁরা সরে দাঁড়িয়ে বললেন, থাক্, আর ছুঁয়ে কাজ নেই মা—ওখান থেকেই কাজ সারো। আশীর্বাদ করি তোমার সুমতি হোক।

নণ্টুর বাবা এলো অনেক বেলায়। চাষা-ধোপাপাড়ার কোন্ বস্তিতে নাকি একখানা ঘর পাওয়া গেছে। কিন্তু আকাশ ভেঙে নেমেছে তখন বৃষ্টি। ওরা সেই বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলো সপরিবারে পথে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাতে বাড়িওলার কি এসে যায়! ওদের বাড়ীর দরজা-জানালা সব আগেই বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। উত্তেজনার মধ্যে কেউ লক্ষ্য করেনি—পথের একান্তে দাঁড়িয়ে ছেলেটাও ভিজছিল বৃষ্টির জলে। শ্রাবণের ধারা বোধ হয় তারও চোখে নেমেছিল।

যারা সেদিন মারতে গিয়েছিল নণ্টুদের, তারা সবাই কালক্রমে মহাকালের বিশাল অজানায় হারিয়ে গেছে। হয়ত নণ্টুরাও হারিয়েছে! কিন্তু রেখে গেছে যা, তার দাম কম নয়। যে-শয়তানী পিশাচীকে পাড়াসুদ্ধ লোকে ধিক্কার দিয়ে গেছে, তার মুখখানাই ত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ওই অজানা মহাকাশে। পরনে রং-চটা শাড়ী, নধর হাতে কাঁচের চুড়ি, নত মুখের সামনে খোলা রামায়ণ, পাশে অস্ফুট পদ্মের মতো নণ্টু ঘুমিয়ে। মাটির পিলসুজের ওপর রেড়ির তেলের আলোটা জ্বলছে।

আলোটা আজও জ্বলছে! মুখখানা আজও হারায়নি!

॥ ৩ ॥

পুরনো কলকাতা এখানে ওখানে ভাঙতে আরম্ভ করেছে। শোনা যাচ্ছে, এ-পাড়ার গাড়ির আড্ডার পাশে কৈলেশ ভটচার্যিদের যে মস্ত হাজামজা ডোবাটা ছিল, তার মধ্যে নাকি মাটি ফেলা হচ্ছে—কারা যেন কিনেছে ওই ডোবা। এই ডোবা যখন ছিল সতেজ জলরাশিতে ভরা পুষ্করিণী তখন একদা ওই পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে দিদিমার ছোট-জা অর্থাৎ কৈলেশ ভটচার্যির স্ত্রী দিদিমার মুখের উপর শুনিয়ে ষষ্ঠিতাঁতির বউকে নিজের কনু উঁচিয়ে বলেছিলেন, গয়না-গয়না করছিস—এই ত্থাখ আমার হাতে পঞ্চাশ ভরির ফারফোরের তাগা। নগদ টাকায় করে দিয়েছে শুড়িপাড়ার প্যারী-স্যাকরা। আটশ' টাকা এর দাম। শুনবি তবে তোরা? পুকুর-বেচার দরুণ ওই হাজার টাকার ওপর হাত বাড়িয়েছিল ভোলা ভটচার্যিরা। হুমকি দিয়ে এসেছিল পাড়ায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবে ব'লে। উনি তার আগেই গোঁসাই কলুকে পঁচিশ টাকা খাইয়ে রেখেছিলেন। কোম্পানির রাজত্বে আজকাল ওসব ফক্কিকারি চলে না।

দিদিমা গরগর করতে করতে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। বললেন, আমার নাকের ডগায় তুই তাগা উঁচিয়ে দেখালি? ও-তাগা কি থাকবে? আমার মতন র াঁড়-হাত হবে না একদিন? অহঙ্কার ঘুচবে না?

অহঙ্কার ঘুচেছিল কুড়ি বাইশ বছর পরে। ওই ছেলেটা তখন খুব ছোট। মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল কৈলেশ দাদামশায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে। তাঁর ছিল এক বিশালাকার দেহ। উদুরির ব্যামোয় তিনি মারা যাচ্ছিলেন। ভটচার্যি বংশে ভাঙন ধরে গেছে।

শুধু তাই কেন, দিদিমার যাঁরা অতি পরিচিত, যারা কথায় কথায় ডাকত

'সেজখুড়ি' বলে—তাঁরা যাচ্ছেন একে-একে। তারক পরামানিক, রাধাচরণ পাল, বরদা বাঁড়ুয্যে, চণ্ডী বিশ্বাস, প্রতাপ মজুমদার—যাঁর ছেলে জিতেন মজুমদার দিদিমার বাড়ির হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, এবং তাঁর ছেলে প্রতুল ও জ্ঞান—যারা দুজন শ্রীমান রামের ওরফে বিভূতির ওরফে কালীনাথের ওরফে ছোট খোকার সহপাঠী। এর সঙ্গে সেবার গিয়েছেন ডি এল রায় এবং তারপর মিত্তিরদের বড় ছেলে চারু মিত্তির—যাঁর বাবার নাম ছিল দীনবন্ধু মিত্র—যাঁর দৌহিত্র সুধীর হল ওই ছেলেটার সহপাঠী। এর আগে, মানে ওই ছেলেটার জন্মের বছর তিনেক আগে—যারা গিয়েছেন নরেন দত্ত, যিনি পরে হন স্বামী বিবেকানন্দ, মামা মৌজে থাকলে যাঁকে দাবি করেন নিজের বন্ধু বলে—যাঁর সঙ্গে তাঁর ভগ্নিপতির ভাই দাশরথি সাণ্ডেলকে মিলিয়ে আড্ডা দেবার কথা তোলেন। দাশু সাণ্ডেলের বড় বৌদিদি, মানে রামখোকার বড় মাসিমার রান্নাঘরে ঢুকে নরেন পাত পেতে খেয়েছে কতবার। নরেনদের বাড়ি ত আর বেশিদূর নয়। এই পাশেই কিশোরী মুখুজ্যের গলি, গলির মুখে ট্রাম রাস্তা—ঠিক ওপারে শিমলা লেনে ঢুকতেই বাঁহাতি নরেনদের বাড়ী। ওর বাপ ছিল ডাকসাইটে উকিল। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ছোঁড়াটা পরাশুনোয় ভাল ছিল। শুধু নষ্ট হয়ে গেল সেই রাসমনির পাগলা পুরুতের পাল্লায় পড়ে। মন্মথ মাস্টার সব জানে। পরে শিমলা লেন হয়ে উঠল গৌরমোহন মুখার্জি লেন। ওই গলির মুখেই ছিল সেই তাম্বুলবাহার পানের দোকান। এক পয়সায় ছয় খিলি পান।

ওই ছেলেটা গা ঢাকা দিয়ে ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে নরেন দত্তদের বাড়ীতে ঢুকে বন্ধুদের সঙ্গে মার্বেল গুলি খেলত। ওদের উঠোন ছিল কাঁচা। বাড়িটা মস্ত, কিন্তু পুরনো। কেউ কিন্তু বাধা দিত না গুলি খেলায়। নরেন দত্তর ভাগ্নে ছিল ওর সমবয়সী, গুলি খেলায় ওস্তাদ। ওখানে বাজি রেখে লাট্টু, বসিয়ে লাট্টু, খেলাও চলত।

ছোড়দাদামশাই হরিদাস ভাদুড়ী একদিন মারা গেলেন। সবাই ছুটল বাদুড়বাগানের বাড়িতে। ছোটখোকাও গেল ওদের সঙ্গে। ওঁর মৃত্যুর সঙ্গে এ বাড়ীতে নাকি আরও দুর্দিন ঘনিয়ে এল। ভদ্রলোকের বয়স ছিল পঞ্চাশের বেশি। মুখে ছিল চাপদাড়ি, রং অতিশয় ফর্সা। ওরা সবাই টকটকে ফর্সা। তারাকুমারের বোন গৌরীপিসি যেন দেবীপ্রতিমা। শিশির কাকাদের ওই একই বোন, আর ছয়জন ভাই। রামের মা ওদের বাড়িতে গেলে প্রণামের হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। হরিদাস ভাদুড়ীর দাদা গোকুলচন্দ্র আগেই গেছেন।

মামা মন্তব্য করলেন, হ্যাঁ, দশজনের একজন ছিল বটে লোকটা। জাত ভদ্দর-লোকের গুষ্টি।

গোষ্ঠীর উল্লেখ ছাড়া মামা কথা বলতেন না।

বাড়ীর বিধবাদের একাদশীর আসরে একদিন বারাকপুর আর নৈহাটির গল্প জমে উঠল।

বরাহনগর আর বনহুগলী ছাড়িয়ে সেই পথ নাকি আরো অনেক দূর। লাল রঙের ঘোড়ার গাড়ী যদি বার-শিমলে থেকে একবার ছাড়ে তবে সারাদিন লাগে সেখানে পৌছতে। হাতীবাগান পেরিয়ে যেতে হয়, সেই গণৎকারদের পাড়াটা ছাড়িয়ে। পুবদিকে নয়—উল্টোডিঙ্গির বন-জঙ্গলের দিকে গেলে আর কোনো পথ নেই, সেখানে গেলে বেলগেছের জলাবিল পেরিয়ে ডাকাতরা হানা দেয়, ঘোড়ার গাড়ী আক্রমণ করে। সুতরাং হাতীবাগান পেরিয়ে সোজা উত্তুরে পথ। শ্যামবাজারের মোড় ছাড়িয়ে গেলে ধূ-ধূ প্রান্তর—সেই পথে সন্ধ্যে হয়ে এলে গা ছমছম করে। কোথাও কোথাও টিমটিমে তেলের আলো জলে, কোথাও এক-আধটি মুড়ি-মুড়কির দোকান, কোথাও বা কাটা কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফেরিওয়ালা। তারপর এগিয়ে যাও, দেখবে শুধু গরু-মহিষের খাটাল, আহিরীদের পাড়া, আর পাইকপাড়ার রাজবাড়ীর পাশ দিয়ে উর্মিলা দিদির শ্বশুরবাড়ী যাবার পথ। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে এলে সেই দুর্গম অঞ্চলের দিকে এগোবার মত বুকের পাটা আছে কজনের?

মামা ভয় দেখাতেন। ভাই-বোনদের পিছন দিকে ব'সে ভয়ে ভয়ে ছেলেটা শুনত সেই কাহিনী। চারিদিকে দস্যু আর ডাকাত, চারিদিক থেকে ঘিরে আসতো আতঙ্ক নাবালকের চোখে। মামা বলতেন, যাও না সিঁথি আর বরানগর ছাড়িয়ে বনহুগলী, নপাড়া আর পালপাড়া পেরিয়ে পেনেটির দিকে, অমনি বেরিয়ে আসবে বেলঘরের মাঠ পেরিয়ে ডাকাতরা,—আগে খুন করবে গাড়োয়ানকে, ভয় পেয়ে ঘোড়া ছুটো পালাবে যেদিকে খুশি,—জনমানব কেউ কোথাও নেই! তারপর পথের মাঝখানে একে একে সবংশে নিধন! তারা তরোয়াল দিয়ে কুচিয়ে কাটে, আর নয়ত, ভীমা ভয়ঙ্করী কালীর সামনে নিয়ে গিয়ে বলি দেয়। পেনেটি ছাড়িয়ে যাওয়া কি আর সোজা কথা? কিন্তু যদি যেতে পারো তবেই পাবে খড়দা,—তবেই দর্শন পাবে শ্যামসুন্দরের। সামনে গঙ্গা বইছে কুলুকুলু—চৈত্রমাসে 'সুখচর' উঠেছে জেগে!

লাল রঙের ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া হোলো কম, আর তার ঘোড়া ছুটো

হোলো নিরীহ। তারা ক্লান্ত পায়ে দৌড়য়, খেতে পায় না পেট ভ'রে—চাবুক মারলেও তাদের গতিবেগ বাড়ে না। সেই গাড়ীতে যাওয়া সুবিধে। কিন্তু সেই গাড়ীতে পেনেটি যাবার দুঃসাহস কারো নেই। যদি যেতেই হয় তবে কালীঘাটে যাওয়াই নিরাপদ।

তীর্থে যাওয়ার গল্প এমনি ক'রেই জমে উঠতো। ত্রিবেণী, ষাঁড়েশ্বরতলা, বর্ধমানের পাগলা কালী, তারকেশ্বর, বেলগেছের ওলাইবিবি, রামরাজাতলা, নবদ্বীপ—কত দেশের কত রকমের কাহিনী।

তারপরে একদিন স্থির হোলো দিদিমারা যাবেন শ্রীক্ষেত্রে। সামনে নতুন বর্ষাকাল,—শ্রীক্ষেত্রে রথের মেলা। সেখানে যেতে হোলে রেলগাড়ীতে সারারাত থাকতে হয়। পথে আছে ভদ্রক, ডাকাতেরা সেখানে নাকি লুঠপাট করে। ছোট ছেলেমেয়েরা সেখানে গেলে আর রক্ষে নেই, তাদেরকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে যায় মায়ের কোল থেকে,—নিয়ে যায় একেবারে কোন্ নিরুদ্দেশে। সেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসে না। বড় দুর্গম সেই তীর্থ, বিপদভঞ্জন মধুসূদন ছাড়া সেই ভয়ানক পথে আর কেউ নেই।

চুপ ক'রে বসেছিল ছেলেটা দিদিমার পিছনে আঁচল ধ'রে। কানা-কানিতে শুনতে পেল দিদিমারা যাবেন সাত-আটজনে মিলে,—মাও যাবেন সঙ্গে। চম্পটিদের গিন্নী যাবেন, ঝকোর মা যাবেন, আর যাবেন সেজো মাসিমা। সবাই মিলে বেশ একটি দল। সবাই যাবে শ্রীক্ষেত্রে রথের মেলায়। ধীরে ধীরে যাবার দিন এগিয়ে এলো।

কিছুদিন আগে নেড়ুদার সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। কাছাকাছিই তারা থাকতো ভিন্ন বাড়ীতে। মা আর দিদিমা তাদের ওখানে ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, নেড়ু, একে রাখতে পারবে ত? ছেলে কিন্তু বড্ড দুরন্ত।

নেড়ু বলল, ভয় পাচ্ছ কেন, দিদিমা? ও ত আমার এখানেই সারাদিন খেলাধুলো করে। তোমাদের দেরী হবে কদ্দিন?

ধরো না কেন, দিন পনরো। ভদ্রকে যাবো, ভুবনেশ্বরে নামবো,—শ্রীক্ষেত্রেও ধরো পাঁচ ছয় দিন। তুমি ওকে সাবধানে রাখতে পারবে ত?

বৌদিদি এসে ছেলেটাকে কাছে টেনে নিল। মা বললেন, ও কিন্তু বড্ড বেয়াড়া, বৌমা। না ব'লে বেরিয়ে চ'লে যায়। ওকে চোখে চোখে রেখো।

বৌদিদি বলল, কোনো ভয় নেই, আমি ঠিক রাখতে পারবো, মাসিমা।

দিদিমা বললেন, ওকে রোজ এক পয়সার দই কিনে দিয়ো, আমি পয়সা দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বড্ড দুরন্ত ভাই, কোথাও ওকে যেতে দিয়ো না।

রাত্তিরে ত মায়ের কাছে ওর শোওয়া অভ্যেস, ওকে তোমাদের কাছেই রেখো, নাত্‌বৌ।

নেড়ুদা বলল, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, আমরা দু'জনে ঠিক ওকে রাখতে পারবো।

বহু নিষেধ, বহু উপদেশ এবং বহুতর নির্দেশ দিয়ে নেড়ুদার কাছে ছেলেটাকে রেখে ওরা একদিন সেই লাল রঙের গাড়ী চড়ে চললো হাওড়া স্টেশনের দিকে। বেলা অপরাহ্ণ, মেঘ করেছিল সেদিন, নেড়ুদার বাড়ীর নীচের তলাটা যেন বড় শূন্য মনে হচ্ছিল। অন্ধকার জমে আসছিল আনাচে কানাচে। ছ্যাকড়া গাড়ীখানার আওয়াজ অনেক দূর গিয়ে কোথায় কেন হারিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটা সদর দরজার পাশে। কিন্তু তার ভিতর থেকে আরেকটা কেউ যেন ছুটে চলল ওই গাড়ীখানার পিছনে পিছনে। মিস্তিরদের বাড়ীর পাশ কাটিয়ে, চাটুয্যেদের গা ঘেঁষে, অর্জুন মুদির দোকান ছাড়িয়ে, কাঁসারিপাড়ার ভিতর দিয়ে গাড়ীখানা দৌড়চ্ছে, আর সেও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে যেন তার পিছনে পিছনে।

মা নেই সামনে, সুতরাং পৃথিবীও নেই। আছে শুধু চোখ আর কান, আছে শুধু চেতনা। মা কাছে নেই, তাই নোংরা নর্দমার পাশে আধমরা বিড়ালছানাটার কান্না কানে এসে বাজে, তাই বৌদি এসে পিঠের ওপর হাত রাখলে চোখে জল আসে। নিচের তলাটা বড় শূন্য, বড় শূন্য ছেলেটার দুটো চোখ। দই কিনে খায়, কিন্তু তার মধ্যে অমৃতের আস্বাদটা যেন মিলিয়ে গেছে। ঘন বর্ষা নেমেছে নীচের তলায়, কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দেয় নালার জলে, সেই নৌকো চ'লে যায় কত নদনদী পেরিয়ে, ভদ্রক ছাড়িয়ে ভুবনেশ্বরের পথ দিয়ে, শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রের তীরে তীরে। নালার পথ বেয়ে গেছে নৌকো, বৃষ্টির দিকে সে চেয়ে থাকে।

নেড়ুদার বিয়ে হয়েছে মাত্র মাস দুই আগে। বৌদিদি এসে ফিটফাট ক'রে ঘরখানা সাজিয়েছে। ঘর ওই একখানি। তার বাইরে একটুখানি রান্নার জায়গা আর দেওয়ালের একটু আড়ালে তাদের ভাঁড়ার ঘর। সামনেই নালার ধারে কলতলা। জায়গাটুকু খুব সামান্যই, কিন্তু ওরই ভাড়া মাসে ছ'টাকা। নেড়ুদা চাকরি করে উকিলের বাড়ী। মাইনে বুঝি তিরিশ টাকা। সকালবেলায় উঠে নেড়ুদা বাজার ক'রে দেয়, বৌদিদি রাঁধতে বসে, আর ছেলেটা ফাইফরমাশ খাটে। নেড়ুদা বেরিয়ে গেলে বৌদিদি সেই যে দরজা বন্ধ করে, আবার খোলে সেই ভর-সন্ধ্যেবেলায়— যখন নেড়ুদা ফিরে আসে

আপিস থেকে। দিদিমা যাবার সময় ছেলেটার খরচের জন্যে পাঁচটি টাকা বৌদিদির আঁচলে বেঁধে দিয়ে গেছেন। রাত্রে সে শুয়ে থাকে বৌদিদির পাশে। মায়ের কাছে শোওয়া অভ্যাস—সুতরাং ঘুম আসে না।

সকালবেলায় গরম গরম মুড়ি আর জিলিপি, ভাতের পাতে ঘি, বিকালে জলখাবার, রাত্রে পরোটা আর আলুর দম। বৌদিদির হাতে মাছের তরকারী চমৎকার রান্না হয়। তা'ছাড়া সারাদিন এটা-ওটা। তেঁতুলের আচার আছে ঘরে, হাঁড়ির মধ্যে থাকে তিলকুটো। আবার যদি বৌদিদির জন্যে তাম্বুলবাহার পান এনে দিতে পারে, তবে টক-মিষ্টি লজেন্স উপহার পায়। এত খাওয়া আর এত যত্ন—সত্যি বলতে কি—কোনোদিনই সে বাড়ীতে পায়নি। নেড়ুদা ওকে ক্যাম্বিসের বল উপহার দিয়েছে। বৌদিদি বলেছে, এবার পুজোর সময় ওকে সিল্কের জামা কিনে দেবে। ওরা দেখে অবাক হয়েছে, ছেলেটা অবাধ্য নয়, বাইরে একবারও পা বাড়ায় না, শ্লেট পেন্সিল নিয়ে একমনে আঁক কষে, ফার্স্ট বুক আর কথামালা মুখস্থ করে এবং বৌদিদির সঙ্গে সমস্ত কাজে লেগে থাকে। ওরা বলে ছেলেটা নাকি বদলে গেছে।

নেড়ুদা হাসিমুখে শুধু বলে, বেশী রাত্তির পর্যন্ত জেগে থাকতে নেই কিন্তু। একবার নিশি ডাকলে দেখবি তখন মজা!

নিশি কি?

গাধা কোথাকার! নিশি জানিসনে? তারা আসে মাঝ রাত্তিরে। জানলার পিছনে দাঁড়িয়ে নাকিস্বরে আওয়াজ করে—ছোট ছেলের নাম ধরে ডাকে! ব্যস্, জেগে আছিস জানতে পারলেই ডাবের মুখুটি বন্ধ ক'রে দিল! আর যাবি কোথা? তার পিছু পিছু যেতে হবে রাত্তিরে উঠে।

বৌদিদির পাশে ছেলেটা ভয়ে ভয়ে সরে বসে। নেড়ুদা বলে, আর রাত জাগবি?

না।

নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়বি ত আজ থেকে?

হ্যাঁ।

বৌদিদি ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, আমার লক্ষ্মী ঠাকুরপো। আর কোনোদিন জেগে থেকো না, কেমন?

ঘাড় নেড়ে সে সম্মতি জানায়। বৌদিদি হাসিমুখে উঠে গিয়ে নেড়ুদাকে আসন পেতে খেতে দেয়। দেখতে দেখতেই রাত ঘনিয়ে আসে।

মা-দিদিমার খুঁটি ছিল শক্ত, সেই জন্য ওর চুলের টিকি সারাদিনে দেখা

যেতো না। জানত, যেখানেই থাকে—একসময় তার ডাক পড়বেই। অনেক দূরে এগিয়ে যেত, কিন্তু বিশ্বাস অটুট থাকতো—পিছন থেকে টানবার মানুষ আছে। সেখানে নিশ্চিত জীবন, নিশ্চিত মন। সেখানে শাসনটা ছিল কঠিন বটে, কিন্তু বত্রিশ নাড়ীর দুশ্ছেদ্য বাঁধন ছিল। এখানে যত্নসমাদর প্রচুর পান থেকে চুন খসে না—কিন্তু এখানে কর্তব্য আর দায়িত্ব। এখানে অবাধ্য হোতে সে ভয় পায়, বাইরে যেতে ভরসা পায় না। সেখানে বেপরোয়া বিপ্লব বাধিয়ে তুললেও মায়ের বুকের মধ্যে তার নিশ্চিন্ত বাসা ছিল—এখানে বসবাসের স্বাচ্ছন্দ্য প্রচুর পরিমাণে থাকলেও জননীর সর্বক্ষমাশীল হৃদয়টি নেই। সেই কারণে কোনো একসময় একা প'ড়ে গেলেই তার মন আপন মনে কাঁদতে বসে। দিনমানের সমস্ত সময়টায় বৌদিদির সাদর প্রীতির পাহারার মধ্যে বারবার তার ঘুম এসে পড়তো, কোথাও বসে থাকলে চোখ ঢুলে আসতো—কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুতে গেলে সমস্ত তন্দ্রা যেতো ছুটে, দাদা আর বৌদি পাশে থাকলেও আশ্রয় খুঁজে পেত না। চোখ বুজে পড়ে থাকত নিঃসাড়ে, ঘোলাটে তন্দ্রা দুই চোখের পাতার মধ্যে কিলবিল ক'রে ঘুরতো এবং মাঝে মাঝে তার চাপা নিঃশ্বাসে কেমন যেন আন্তরিক উৎপীড়নের সংবাদ নিয়ে এক একটা অনিচ্ছুক আওয়াজ গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতো। বিছানাটার ওই বিস্তীর্ণ মরুভূমির বালু আর কাঁকড়ের মধ্যে শুয়ে সুদীর্ঘ রাত তাকে কাটাতে হোতো অসহনীয় অস্বস্তিতে।

হঠাৎ একদিন রাত্রে—রাত তখন গভীর—নেড়ুদা তার গায়ে সক্রোধে একটা চিমটি কাটলো। তিনটে আঙুল দিয়ে তার গায়ের চামড়াটা সে এমন মুচড়ে দিল যে, পরদিন সেখানে কালশিরার দাগ ফুটেছিল। অন্ধকারে সে মুখ বিকৃত ক'রে বলল, বদমায়েশ, শূয়োর কোথাকার! তোকে না রোজ রোজ ঘুমোতে বলি? ঘুমো বলছি এখনও। কাল থেকে হাতের কাছে বেতগাছটা রেখে দেবো।

অনড় পাথরের মতো ছেলেটা প'ড়ে রইল—নিঃশ্বাসটা রুদ্ধ হয়ে রইলো যন্ত্রণায়, কিন্তু একটুও সাড়া না দিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে রইল। সে অনুভব করতে পারে বৌদিদি জেগে রয়েছে। একটু আগে ওদের অতি মিহি আলাপও সে শুনেছে। বৌদিদি জেগে আছে, অথচ তার তাড়নায় বৌদিদির কোনো সমবেদনা নেই, তার লাঞ্ছনায় তার কোনো প্রতিরোধ নেই—এ আশ্চর্য! সে বুঝতে পারে ঘরের ভিতরকার বীভৎস অন্ধকারের কুণ্ডলীটা যেন বুকফাটা অবরোধে দম আটকে রয়েছে। কিন্তু উপায় নেই, রাত্রি বড় দীর্ঘ—দিনের

আলো ফুটতে তখনও অনেক দেরি। সে বুঝতে পারছিল, সে যতক্ষণ না ঘুমোয়—ওরা দু'জনে ততক্ষণ অবধি উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে। ছেলেটার শরীর খারাপ হলে ওদের পক্ষে লজ্জার কারণ আছে বৈকি।

সকালবেলায় সমস্তটা সহজ। মুখ ধুয়ে এসে পড়তে বসবার আগেই বৌদিদির হাতে গরম গরম চপ আর টাটকা মুড়ি। গত রাত্রে নেড়ুদা ছেলেটার জন্য এনেছিল একভাঁড় পানতুয়া—একবাটি দুধের সঙ্গে দুটো পানতুয়া সেই বয়স অবধি কখনো সে পায়নি। ওর মতো সুবোধ বালকের চিবুক নেড়ে দিয়ে মিষ্টি হেসে বৌদিদি বলে, এমন দেওর ক'জনের ভাগ্যে জোটে! আজ থেকে তোমাকে খুব ভালো গল্প বলবো—শুনতে শুনতে তোমার নাক ডেকে উঠবে—কেমন ভাই?

ছেলেটা খুশী হয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। নেড়ুদার দরুন কালশিরার দাগটা সে বৌদিদির দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখে। ওটা দেখলে স্বামীর আচরণে হয়ত সে দুঃখ পাবে।

বৌদিদি আবার রান্নার জায়গায় গিয়ে বসলো। বৃষ্টির জলের ছাটে থৈ থৈ করছে চারদিক। ঘরটি বাদ দিলে আর কোথাও শুকনো আশ্রয় নেই। সমস্ত রাত ধ'রে ঘরের বাইরে বড় বড় ইঁদুর আর ছুঁচোর উৎপাত চলে। ঘরের বিছানাটা ত্যাগ ক'রে রাত্রে অন্য কোথাও আশ্রয় নেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

নেড়ুদা বাজার থেকে নিয়ে এলো তরিতরকারী আর ভালো মাছ, তার সঙ্গে বর্ষাকালের ফল-পাকড়। সঙ্গে নিয়ে এসেছে একখানি সুন্দর টিনের রথ, তালপাতার বাঁশি, আর রংচঙে মাটির জগন্নাথ। উৎসাহিত হয়ে এসে বলল, আজ রথযাত্রা রে! এই নে বাঁশি বাজা, রথের ওপর ঠাকুর চড়িয়ে টানগে যা, —কেমন? আজ আমার ছুটি, বিকেলবেলায় তোকে মেলা দেখিয়ে আনবো —যাবি ত আমার সঙ্গে?

যাবো।

নেড়ুদা ঠাণ্ডা হয়ে বসলো এক জায়গায়। তারপর বলল, আজ এতক্ষণ শ্রীক্ষেত্রে দিদিমা আর মাসিমারা বেশ মজা ক'রে রথটানা দেখছে! ব্যস্, উল্টোরথের আগেই ওরা ফিরবে। হিসেব ক'রে দেখো, আর বড় জোর পাঁচ সাত দিন।

শ্লেটের ওপর সাতদিনের অঙ্কটা লিখে যাচ্ছিল ছেলেটা পরম যত্নে। সোম-বার থেকে রবিবার, শনিবার থেকে শুক্রবার, বুধবার থেকে মঙ্গলবার। যেদিন থেকেই ধরে, আগের তারিখে এসে সাতটা দিন মিলে যায়। প্রত্যেকটি দিনের

সঙ্গে রয়েছে তার অধীরতা, তার প্রাণান্তকর পিপাসা,—সে যেন শুকনো জিব দিয়ে চাটতে থাকে এক একটি তারিখ। তার জিহ্বার ঘর্ষণে যেন এক একটি তারিখের গায়ে রক্ত ফুটে ওঠে।

রথ টানল সে প্রাণপণে সারাদিন, সেই রথটানার ঘর্ঘরধ্বনি কি পৌছবে শ্রীক্ষেত্রে? বাঁশি বাজাল, কিন্তু তার সেই বিকৃত বেসুরো আওয়াজ তার মর্মচ্ছেদনের আর্তনাদ নিয়ে কি পৌছবে ভদ্রকের পথ দিয়ে ভুবনেশ্বরে? আষাঢ়ের অবেলায় যে বর্ষাধারা নেমে এলো, তার মধ্যে মাতৃহারার বিশ্বব্যাপী বেদনা কি চোখের জল ফেলছে না? আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে যত লোক ভাঙা গলায় কেঁদেছে, যত বিচ্ছেদের নিঃশ্বাস পড়েছে, যত সর্বহারা আর বৎসহারার বুক ভেঙেছে—তারা যেন সবাই এসে ভিড় করেছে ওর তালপাতার ওই বাঁশিতে।

বাঁশি থামলো। নেড়ুদার সঙ্গে রথের মেলায় গিয়ে কত খেলনা সে কিনে আনল। নীচের তলায় তখন সন্ধ্যার আলোটা জ্বালিয়ে রান্নাবান্না সেরে বৌদিদি পোশাকী শাড়ী প'রে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। আজ নেড়ুদার ছুটি, তাই বৌদিদি পান খেয়েছে, কপালে টিপ পরেছে, পাতা কেটে চুল বেধেছে। ছেলেটাকে কাছে টেনে নিয়ে বৌদিদি বলল, দাদা কেমন তোমাকে ভালোবাসে, দেখলে ত? ওমা, এত খেলনা নিয়ে কী করবে তুমি? দিদিমারা আর মাসিমারা এলে সব খেলা দেখিয়ো, কেমন? তোমাকে সব্বাই ভালোবাসে, না ঠাকুরপো?

হ্যাঁ।

মা এলে দাদার ভালোবাসার কথা বলবে ত?

বৌদির মুখের দিকে সে তাকাল। বলল, দাদা কিনে দিয়েছে টিনের গাড়ী, বুড়ো ঠাকুর্দা, কলের পুতুল,—এই ছাখোনা আরো কত!

বৌদিদি বলল, আমার কথা কী বলবে তাঁরা এলে?

বা রে, তুমি যে দিনরাত আমাকে খাওয়াতে জোর ক'রে? অত কি খাওয়া যায়?

বৌদিদি ওর কথা শুনে হাসিখুশী মুখে নেড়ুদার সঙ্গে ঘরে ঢুকলো, তারপর কী যেন চুপিচুপি দু'জনে কথা বলতে লাগলো।

খেয়ে দেয়ে ছেলেটা আগেই গেল বিছানায়। ঘুমে তার দুই চোখ জড়িয়ে এসেছে, পা দুটো টলে পড়ছে। কেউ যদি না ডাকে, কেউ যদি না থাকে—সে সাতদিন ধ'রে ঘুমোতে পারে। কিন্তু বিছানায় ওঠার পর আবার নতুন ক'রে বৃষ্টি নেমে এলো। কতক্ষণ নেড়ুদা আর বৌদিদি ঘরের বাইরে হাসি-তামাশা আর গল্প-গুজব নিয়ে ছিল,— কিন্তু বৃষ্টির ছাটের জন্য তাদেরকে এক-

সময়ে ঘরের মধ্যে উঠে আসতে হল। এই ছোট ঘরটি ছাড়া আর কোথাও পা বাড়াবার উপায় নেই। ঘরের মধ্যে কখন তারা খাওয়া-দাওয়া করেছে, কখন তারা সমস্ত কাজকর্ম সেরেছে এবং কখনই বা বিছানায় উঠেছে ছেলেটা টের পায়নি। তবু একসময় তার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চুপ ক'রে প'ড়ে রইল অসাড় হয়ে। ওর নিঃশ্বাসের ছন্দটা নষ্ট হোতেই বোধ হয় ওদের সন্দেহ হল। এক সময় নেড়ুদা একবার মৃদুকণ্ঠে তা'র নাম ধ'রে ডাকলো। সাড়া দিল না সে। আবার ডাকলো। তখনও তার সাড়া নেই। কিন্তু তিন বারের বার ডাকতেই সে উত্তর দিল, উঁ?

এখনও ঘুমোসনি?

চুপ ক'রে রইল সে। কিন্তু বুকের মধ্যে ধকধক করতে লাগলো।

নেড়ুদা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, তোর মতলব কি? কী ভেবেছিস?

বৌদিদি স্থির হয়ে প'ড়ে রয়েছে। ছেলেটা জানত, সে ঘুমোয়নি। অন্ধকারে নিজের পায়ের ওপর বৌদিদি পা ঘষছিল এতক্ষণ,—টের পাচ্ছিল সে। কিন্তু সে সাড়া দিল না। ছেলেটাও নেড়ুদার কথার কোনো জবাব দিতে পারল না।

নেড়ুদা আস্তে আস্তে উঠে মশারীর ভিতর থেকে বেরিয়ে নীচে নামলো, তারপর দেশলাই বার ক'রে পিদিমটা জ্বাললো। তখনও ছেলেটা কিছু বুঝতে পারেনি। কিন্তু সে যখন হাত বাড়িয়ে তার একখানা হাত ধ'রে হিড় হিড় ক'রে তক্তা থেকে নামালো, ছেলেটা ওর মুখ দেখে ভয় পেল। এ সেই দিনের বেলাকার নেড়ুদা নয়,—এ ক্রোধোন্মত্ত, প্রতিশোধপরায়ণ, পৈশাচিক নেড়ুদা! ছেলেটা যেন তার সকলের বড় শত্রু, যেন তার পথের কাঁটা, তার নৈশ জীবনের সব চেয়ে বড় বাধা।

তক্তা থেকে নেমেই সে দেখে, দপ দপ করছে নেড়ুদার দুটো চোখ। সে দৃষ্টি বিলোল বিহ্বল, রস ও রক্তের আভায় সেই দৃষ্টি অন্ধকারে জন্তুর মতো জ্বলছে। কিন্তু তাকে কিছু বলবার সময় না দিয়েই ঠাস ক'রে সে ওর গালে এক চড় মারলো। মার খেলে ছেলেটা সহ্য করতে পারত। এ গালে নেড়ুদা বসালো আর এক চড়—তারপর লাথি মেরে ওকে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়ে বলল, জুতিয়ে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়ে আসবো, তা জানিস? পাজি, শূয়োর, উল্লুক—

প্রশ্ন করতে পারত সে, রোজ রোজ এমন ক'রে মারছ কেন? এত মারধর সত্ত্বেও বৌদিদি তোমাকে বাধা দেয় না কেন?—কিন্তু একথা সে

উপলব্ধি করতে পারত সেদিন—তার প্রশ্নের জবাব দেওয়া ওদের পক্ষে কঠিন ছিল। একজনের কাছ থেকে সক্রিয় উৎপীড়ন, আর অন্য-জনের পক্ষ থেকে নিষ্ক্রিয় সমর্থন, সুতরাং কোনো রাত্রেই ছেলেটার স্নেহের আশ্রয় জুটতো না। কিন্তু সে কোনও প্রশ্ন করেনি।

বাইরে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধকারে। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে মশারীর মধ্যে বৌদিদির ছায়াটা নড়ছে। ও শুনতে না পায় এমনভাবে ওরা ফিসফিস ক'রে কথা বলছে—এবার কাছাকাছি হয়েছে দু'জনে। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরে হঠাৎ নেড়ুদা আবার বেরিয়ে এলো। ছেলেটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। কাছে এসে লালচক্ষে সে ওর চুলের মুঠি ধ'রে আবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল, তারপর তক্তার ওপরে সজোরে আছড়ে ফেলে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, রাত বারোটা বাজে, ঘুম নেই এখনো? ইচ্ছে করে বঁটি দিয়ে কেটে ফেলি!

বৌদিদির পাশে শ্রীমান্ রামখোকা আবার চুপ ক'রে প'ড়ে রইল অসাড় হয়ে। জানে বৌদিদিও জেগে আছে, কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না। নেড়ুদা অত্যন্ত হায়রান হয়ে অসীম আক্রোশ আর বিরক্তির সঙ্গে কুলুঙ্গি থেকে একখানা বই টেনে পিদিমের আলোয় পড়তে ব'সে গেল। বইতে মনোযোগ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু সে অন্যমনস্ক হতে চাইছিল। ছেলেটার ঘুম না আসা পর্যন্ত সে বই পড়তে চায়।

একসময় আলো নিবিয়ে নেড়ুদা আবার মশারীর মধ্যে উঠে এলো। হাঁসফাঁস ক'রে তার নিঃশ্বাস পড়ছিল। নির্মল সরকারদের বাড়ীর সেই মস্ত শিকারী কুকুরটা মাংস-ভাত খাবার আগে লালাসিক্ত জিব বার ক'রে এমনি ক'রে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়।

ছেলেটা প'ড়ে রইল কাঠের পুতুলের মতো। সমস্ত রাত অবধি পিঠে ব্যথা ধরেছে, পাঁজরে বেদনার কনকনানি লেগেছে, আড়ষ্ট হয়ে এসেছে শরীরের একাঙ্গ,—কিন্তু নড়েনি। পা ছড়ায়নি, হাত সরায়নি, গা ফেরায়নি, মাথা ঘোরায়নি,—অবিচল নিশ্চেতন দেহকে কঠিন কঠোর শাসনে সমস্ত রাত ধ'রে সে স্থির ক'রে রেখেছিল।

দু'জন মানুষই আবার বদলে যায় দিনের বেলা। তখন সহজ—তখন স্বাভাবিক। আগের রাতটা কারো মনে থাকে না, দিনের বেলায় তার স্মৃতি যেন একান্তই অলীক। কালশিরার দাগ পড়েছে ছেলেটার শরীরের অনেক জায়গায়, নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়েছে বালিশের ওপর, হাতপাখার আঘাতে রক্ত

ফুটেছে এখানে ওখানে। ঘরের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে নেড়ুদা বুঝতে পারতো ছেলেটা ঘুমোচ্ছে কিনা, বুঝতে পারতো তার ঘুমের গভীরতা কতখানি। চোখ বুজে ছেলেটাও বুঝতে পারত, ওরা ইশারায় কথা বলছে। ওরাও ছেলেটার নিঃশ্বাসের দিকে কান খাড়া ক'রে বুঝে নিত—চোখ বুজে থাকলেও চোখে তার ঘুম নেই।

সমস্ত দিনমান ধ'রে নেড়ুদা ও বৌদিদির সেই অপরিসীম আন্তরিক স্নেহ, কোথাও তার ত্রুটি ছিল না। খেল্‌না স্তূপাকার হয়েছে, ছবির বই এনেছে, এসেছে ওর জন্যে নতুন চটি জুতো। বৌদিদি ওর মাথায় টেরি কেটে দেয়, নেড়ুদা এনে দেয় ঘুড়ি আর লাটাই। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে ওদের দু'জনকে কাছাকাছি দেখলেই সে ভয় পায়,—যেমন ভয় পায় সন্ধ্যার আলো জ্বললে, শাঁখ বেজে উঠলে। দিনের বেলায় ওদেরকে চেনা সহজ, রাত্রে ওরা অচেনা —তখন ওদের চোখ জ্বলে, ওদের ভঙ্গী দেখলে দুর্ভাবনা আসে, ইশারা-ইঙ্গিতে আতঙ্ক জাগে। বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে কোথাও পালাবার পথ নেই, মুক্তি পাবার উপায় নেই, এড়িয়ে যাবার সুবিধা নেই। সুতরাং প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই ওকে মার খেতে হোতো মুখ বুজে। চীৎকার ক'রে কোনো মধ্যরাত্রে সে কাঁদতে পারত, কিন্তু তার সেই ভাঙ্গাগলার আওয়াজ কি শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত পৌঁছবে? অতএব মুখ বুজে সে প'ড়ে প'ড়ে মার খেত। মাঝখানে গিয়েছিল এক রবিবার। সেদিন দুপুরবেলায় ঘরে ঢুকে ওরা ভিতর থেকে জানালা-দরজা বন্ধ করেছিল। সেদিন ছেলেটা ছাড়া পেয়ে নিজের আনন্দে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছিল।

বৌদিদির জ্বর এলো সপ্তাহের শেষ দিকে। গায়ে মাথায় যন্ত্রণা, শীতের কাঁপুনি ধরেছে,—দেখতে দেখতে জ্বরও বেড়েছে। নেড়ুদা শশব্যস্ত। ডাক্তারের কাছে খবর দিয়ে ওষুধ আনলো, নিজের হাতে রান্না করলো, রোগীর সেবায় লেগে গেল,—তারপর কাপড় কাচলো, বাসন মাজলো। সেদিন ছেলেটার সঙ্গে নেড়ুদার খুব ভাব। সে তার দক্ষিণ হস্ত। ও গিয়ে বৌদিদির মাথা টিপে দিল, সাগু খাওয়াল, পায়ের সেবা করতে ব'সে গেল। রাত্রের দিকে নেড়ুদা মেঝের উপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়লো। ছেলেটা শুলো বৌদির পাশে এবং সেদিন ঘুমিয়ে রইল অকাতরে। বৌদিদির বদলে যদি নেড়ুদা থাকতো একা বিছানায়—তা' হোলেও সে এইভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারত।

তিনদিন বৌদিদির বেহুঁস জ্বর ছিল, ওই তিনদিন ছেলেটাও বেহুঁস হয়ে ঘুমিয়েছে। নতুন কালশিরের দাগ আর পড়েনি, নতুন ক'রে বেতের দাগ আর

গায়ে ফোটেনি। জ্বর অবস্থায় বৌদিদি তার ওপর খুশী ছিল না, তাকে দেখলে সে খিট্‌ খিট্‌ ক'রে উঠতো। নেড়ুদা সেই দৃশ্য দেখে বরং একটু লজ্জিতই হত। কিন্তু ছেলেটা ছিল খুশী, পরম খুশী। নিশ্চিন্ত মনে সে ঘুমিয়ে পড়ত। ভাবত যতদিন মা-দিদিমা না আসে, ততদিন যেন বৌদিদির জ্বর না ছাড়ে। ততদিন যেন নেড়ুদা মেঝের বিছানায় শুতে বাধ্য হয়।

বৌদিদির জ্বর যেদিন ছাড়লো, ঠিক তার পরের দিন সকালে ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ পেয়ে ও ছুটে গেল সদর দরজায়। ভুল তার হয়নি—গাড়ী এসে থামলো ওর সামনে। মা-দিদিমারা এসেছেন। সমস্ত লাঞ্ছনা আর উৎপীড়ন পলকের মধ্যে ভুলে গেল সেই সেদিনকার নাবালক। কোনো দাগ নেই দেহে, কোনো দাগ নেই মনে। দইয়ের মধ্যে ফিরে এলো আবার অমৃতের আস্বাদ; আবার ফিরে এলো বিশ্বাস।

মা শুধু ওর দিকে স্থিরচক্ষে তাকিয়েছিলেন। নেড়ুদা বলতে লাগল, মাসিমা, ছেলে তোমার একটুও দৌরাত্ম্যি করেনি, একটুও অবাধ্য হয়নি,—এমন শান্ত হয়েছিল যে, সবাই অবাক।

সমস্ত খেলনাগুলি প'ড়ে রইলো বিভীষিকার স্মৃতি নিয়ে। দিদিমা পরে আসছেন। মায়ের সঙ্গে ছেলেটা বেরিয়ে পড়ল মামার বাড়ীর দিকে। ওর আনন্দের কান্নাটা অধীর হয়ে উঠছিল দুই ঠোঁটের মধ্যে।

দিদিমার বাড়ীর উত্তরদিকে ছিল বহুদূর অবধি খোলার খাপরা আর বস্তিপল্লী। দক্ষিণ দিকে সম্ভ্রান্ত সমাজের পাড়া। ছোটবেলা ওইটুকুই ছিল চেনা জগৎ। ভূগোলে দেখা যেত উত্তর দিকে হিমালয় পর্বত,—চিরদিন বরফে ঢাকা। কিন্তু খৃস্টানদের গির্জা পেরিয়ে উত্তর দিকে আর ছেলেটার দৃষ্টি যেতো না—ওইটেই ছিল উত্তর মেরু। দক্ষিণ মেরুতে ছিল গলির প্রান্তে অর্জুন মুদির দোকান। এই দুইয়ের মাঝখানে তার বাল্যকাল নিজের মনে জাল বুনে যেত তার অজ্ঞাতে। চেতনার মধ্যে পেত সে অনেক, কিন্তু বুদ্ধি আর যুক্তির দ্বারা বিচার ক'রে কিছু পাওয়া যেতো না। উত্তরদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে খোলার খাপরার বস্তিতে দিনরাত্রির নিত্যকলরব লেগে থাকতো। সেখানে পাওয়া যেতো পাল্‌কির বেহারা, কেরোসিন তেলওয়ালা, নাপিত, লোহার কারখানার লোক, তেলকলের মজুর, ঝি-চাকরের বাসা, হাড়িমিস্ত্রী, চাঁচাড়িবোনা ডোম, কাওরাগোষ্ঠী, এবং আরো বহুজাতের মেয়ে পুরুষ। তখন ইতর-ভদ্রের পার্থক্য ছিল অনেক বেশী। শোনা যেত ওই বিশাল পল্লীতে

থাকতো অনেক গাঁটকাটা, সন্ধ্যার পরে অনেক অন্ধকারের মানুষ টলতে টলতে আনাচে-কানাচে হানা দিত। অনেক সময়ে শোনা যেত খুন-খারাপির খবর, চুরিদারির সংবাদ।

কিন্তু ওই বস্তির জটিল গোলকধাঁধার মধ্যে ওই বালককে বাধ্য হয়ে যেতে হত কোনো কোনোদিন ভর সন্ধ্যায়। ওখানে কোন্ এক ঘরে থাকতো এক অন্ধ জরা-স্থবির বৃদ্ধ—সে 'জলপড়া' জানতো, আবার ওঝার কাজও করতো।

শনিবার অমাবস্যার সন্ধ্যায় তেশূন্যে দাঁড়াতে গিয়ে কার ওপর ভর হয়েছে, কোন্ পোয়াতি বউ কোন্ তিথিতে না জেনে পানের বোঁটা ভেঙে খেয়েছে, কোন্ শিশুর গায়ে লেগেছে 'হাওয়া', রাত গভীর হলেই কোন্ মেয়েটা যেন ভরিয়ে ওঠে, নীচের তলায় অন্ধকারে নামতে গিয়ে কে যেন হাউমাউ ক'রে উঠেছে,—প্রাচীন বাড়ীর জরাজীর্ণ ইটকাঠের গন্ধের মধ্যে ব'সে ওই ছেলেটা বিশ্বাস করত সমস্ত অবাস্তব ঘটনায়। ওকে যেতে হত একঘটি জল আর একটি খড়কে কাঠি নিয়ে সেই অলিগলি বস্তির আঁকাবাঁকা গহ্বরে।

একটি খোলার চালার নীচে এসে সে দাঁড়াত। রেড়ির তেলের পিদিম হাতে নিয়ে একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক টিপপরা পানখাওয়া মুখ নিয়ে এগিয়ে এসে ছেলেটার দিকে চেয়ে বলতো, সেই বাউনদের ছেলেটা! কি হয়েছে?

গলা পরিষ্কার ক'রে ছেলেটা বলত, হাওয়া লেগেছে!

কার?

সেই পাঁচুঠাকুরের দোরধরা ছেলের।

স্ত্রীলোকটি বলে, ঘটিটা রাখো। পয়সা পাঁচটা এনেছ?

ওর হাতের মুঠোর মধ্যে পাঁচটা পয়সা ততক্ষণে গরমে আর ঘামে ভিজে উঠেছে। পাঁচটি পয়সা দাওয়ার ওপর রেখে সে কাঠ হয়ে দাঁড়াল।

ঘরের ভিতরে ইঁটের পায়া দেওয়া তক্তপোশ মটমট ক'রে উঠলো। ছিমছিমে রেড়ির তেলের আলোয় দেখতে পায় এক কৃশকায় অন্ধ বৃদ্ধ—নাকটা তার মস্ত, হাত দুখানা শুকনো কাঠের বরগার মতো লম্বা। দীর্ঘ দেহযষ্টি—দেওয়াল আর দরজা ধ'রে ধ'রে আন্দাজে এগিয়ে আসে। চোখ দুটোয় কালো তারা নেই, সবটাই হলদে আর ঘোলাটে। লোকটা ধীরে ধীরে ব'সে পড়ে।

ঘটিটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বুড়ো ধীরে ধীরে দু'একটি ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পর বীজমন্ত্র আরম্ভ করে। সে মন্ত্রের শব্দ আছে, কিন্তু ভাষা দুর্বোধ্য। সেই মন্ত্রপাঠ চলে বহুক্ষণ,—বিজবিজ করে, ফিসফিস করে, ফুৎকার দেয়, হাত ঘোরায়, আবার এক পর্ব চলে। ছেলেটা চেয়ে থাকে শান্ত চক্ষে,—

দেশ কাল জরা মৃত্যু ব্যাধি কুসংস্কার,—সমস্তর বাইরে তার ছুই মূঢ় অজ্ঞান আচ্ছন্ন চক্ষু অন্ধ বুড়োর দিকে মেলে থাকে। লোকটি মন্ত্র পড়তে পড়তে একসময়ে ঘুমিয়ে নাসাধ্বনি ক'রে ওঠে, আবার ঘটিটা ধরে শক্ত হাতে। অবশেষে এক সময়ে খড়কে কাঠিটি নিয়ে আলোর দিকে হাত বাড়ায়। সময় বুঝে স্ত্রীলোকটি খড়কের মুখে আলোটা ধ'রে সেটি পুড়িয়ে দেয়, বৃদ্ধ সেই পোড়া কাঠি জলের মধ্যে ডুবিয়ে ধরতেই ছ্যাঁক্ ক'রে ওঠে। এইরূপ তিনবার। তিনবারের পর সেই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। স্ত্রীলোকটি বলে, নিয়ে যাও, দু'ঝিনুক খাইয়ে দাও গে।

জামার তলায় সেই ঘটি লুকিয়ে নিয়ে একসময়ে ছেলেটা বস্তি থেকে বেরিয়ে আসে। অন্ধকার পেরিয়ে আসে আলোর দিকে, মৃত্যুর থেকে জীবনের প্রান্তে। সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

সেই জলপড়া শিশুকে খাওয়াবামাত্র অসুখ সারে। শিশু ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোলের কাছে—আর একটুও কাঁদে না। ছুই ঝিনুক খেতে না খেতেই একেবারে ধন্বন্তরী।

দিদিমা নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, বুড়ো আছে ব'লেই সব দিক রক্ষে। নৈলে কি দশাই হত ছেলেপুলের!

মামা ছিলেন পাশের ঘরে ঘড়ি সারাবার কাজে ব্যস্ত। চোখ থেকে পরকলার ঠুলিটা নামিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ব'লে ওঠেন, গুষ্টির মাথা! তিনবার জলে ফুঁ দিলেই অমনি পেঁচোয় ছাড়ে! কবচ না ধরালে বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।

দিদিমা চেঁচিয়ে ওঠেন, থাম্ তুই থাম্···ক্ষণে অক্ষণে তুই কথা বলিসনে। নিব্বংশ হ'লে তুই থাকবি, তোকে যেতে হবে না নিমতলায়?

আমি গেলে কি রেখে যাবো তোমাদের? ফল্‌না ভট্‌চার্যির বাড়ীতে ঘুঘু চরাবো, দারোয়ান ছোটাবো—তবে!

খবরদার—দিদিমার গলা ঝনঝনিয়ে ওঠে,—মুখ সামলে কথা বলিস। এ বাড়ী তোর নয়, তুই এর মালিক ন'স—এ বাড়ী স্ত্রীধনে কেনা সম্পত্তি··· খবরদার!

মামা গর্জন ক'রে উঠেন, স্ত্রীধনে কেনা? এলো কোত্থেকে স্ত্রীধন? রমেশ মিত্তিরকে ঘুষ খাইয়ে জাল উইল রেজেস্টারি হয়নি? হাটে হাঁড়ি ভাঙবো তবে?

দিদিমা বলেন, ভাঙ্, যত হাঁড়ি তোর আছে একে একে ভাঙ্! বড্ড

বাড়িয়েছিস তুই! তোর রোজগারে বাড়ী কেনা? তুই টাকা দিয়েছিলি?

মামা বলেন, আর দেরি নেই। সব কাগজ বার করেছি। এবার নালিশ ঠুকবো হাইকোর্টে। গরু বাছুরের দল তাড়াবো সব বাড়ী থেকে।

দিদিমা বলেন, তাই করিস। তোর যা ক্ষমতা তাই দেখাস। বাড়ী-ভাড়ার সাতটাকা ক'রে তোকে মাসে মাসে দিই তাও বন্ধ করবো চোতমাস থেকে। তোকে আমি পথের 'বেগার' ক'রে তবে ছাড়বো।

মামা জামা-কাপড় প'রে দুম দুম ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। যাবার সময় শাসিয়ে বলেন, রাতটা পোয়াক, দেখবো কাল সকালে! ছুরিখানা ততক্ষণে শান দিয়ে আনি।

মামা চ'লে যেতেন সদর দরজার দিকে। মামী সেই সময়ে চক্ষের নিমেষে এসে দাঁড়াতেন দিদিমার সামনে। বলতেন, দু'আনা পয়সা দিলেই ত ঝগড়া মিটে যায়!

দিদিমা চোখ পাকিয়ে ওঠেন, কিসের পয়সা? আমার কি কুবেরের ভাঁড়ার আছে?

মামী বলেন, আপিঙের পয়সা নেই, তাই নিত্যি কেলেঙ্কার। আমারও আর সয় না। দু'আনা দিলেই ডাকাত শান্ত হয়।

গালমন্দ কটুকাটব্য ক'রে দিদিমা দু'আনা পয়সা বার ক'রে দেন। মামী সেই পয়সা নিয়ে সদর দরজার দিকে অগ্রসর হন। মামা সেখানে ভূতের মতন দাঁড়িয়ে।

ওই দু'আনার পর শানানো ছুরি আবার ভোঁতা হয়ে আসে, জাল উইল প্রমাণিত হয় না, হাইকোর্টে নালিশ ঠোকার প্রয়োজন ক'মে আসে,—এবং তারপর দেখতে দেখতে আবার সাময়িকভাবে সব নিরস্ত হয়। খানিক রাত্রে নিমীলিত নেত্রে অত্যন্ত মিষ্টভদ্র মেজাজে মামা ভিন্ন মানুষ হয়ে ফিরে আসেন। সিঁড়ির কাছে ওই ছেলেটা আলো দেখায়। তিনি উঠে এসে সস্নেহে বলেন, গুয়োটা, এখনও জেগে আছিস? নে তবে—এই ব'লে চাদরের ভিতর থেকে শালপাতা মোড়া ছোট একটি আম-সন্দেশ বার ক'রে দেন।

ঘুঘু চরানোর কথায় ঘুঘুর ডাক ছেলেটার মনে প'ড়ে যেত। ঘুঘুর ডাকের মধ্যে হয়ত করুণ সুর আছে তাই লোকে ভয় পায়। চৈত্রের দুপুরে বেলগাছের ঝিলিমিলি ছায়ায় ক্লান্ত কাকের কণ্ঠে একপ্রকার বিকৃত স্বর শোনা যায়,—সেটাও নাকি অলক্ষণে। কিন্তু ছেলেটা থাকত কান পেতে, শুনত ওদের মধ্যে বুকফাটা সঙ্গীত, দুপুরের উদাসী হাওয়া ওর হৃৎপিণ্ডকে ছিঁড়ে

নিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে যেত।

হঠাৎ নীচের তলায় শোনা যেত চীৎকার। বেঁকি তার কোলের মেয়েটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে কলতলায়।—মর, ম'রে যা—ওলাউঠোয় শেষ হয়ে যা। কেঁদে কেঁদে সেই থেকে—বলো দিকি তোমরা—আমার হাড়মাস খেলে। ম'রে যা না? মরতে পারিসনে?—এই ব'লে সে নিজেই নিজের মাথা ঠোকে।

বেঁকির ভালো নাম সরলা। পায়রাটুনিতে তার শ্বশুরবাড়ী। সে চার পাঁচটি ছেলেপুলের মা। সবাই মিলে তাকে ক্ষ্যাপাতো। এ বাড়ীতে বেঁকি এসে প্রায়ই দেওয়ালে মাথা ঠোকে। করোগেটের বাল্তি শানের ওপর আছড়ে ভাঙে; আগুন জ্বালিয়ে দেয় ঘরকন্নায়। তার উচ্চকণ্ঠের কান্না শুনে প্রতিবেশীরা এসে জড়ো হয়। পরে দেখা যায় কিছু খেতে পেলেই বেঁকি শান্ত। দিদিমা তাকে ডেকে আড়ালে দুখানা রুটি দিলে সে ভারী খুশী হয়ে খেতো। ছেলেপুলে হোলেও স্বাস্থ্য তার তখনও ঝরেনি।

আগুনের ফিন্‌কি ফুটতো মামার দৈনন্দিন ব্যবহারে। কিন্তু এক একবার জ্বলে উঠতো দাবানল। তাঁর দানবীয় দাপাদাপিতে সপরিবারে গিয়ে প্রতিবেশীর বাড়ীতে সকলকে আশ্রয় নিতে হতো। সেদিন একবেলা হাঁড়িচড়া বন্ধ। খবর দেওয়া হতো অক্রূর চাটুয্যেকে।

অক্রূর চাটুয্যের ছিল পিছন দিকে লম্বা শাদা চুলের রাশি, সামনের দিকে পাকা দাড়ি। কপালে লাল সিঁদুরের ফোঁটা, চোখে চশমা,—স্বাস্থ্যবান দীর্ঘকায় দেহ। চোখ দুটো ভয়াবহ। তিনি এসে হাঁক দিতেন, ভট্‌চায?

মামা অমনি শান্তকণ্ঠে জবাব দিতেন, হুজুরে হাজির।

চাটুয্যে বললেন, তুই নাকি সেজখুড়ীকে আবার জ্বালাচ্ছিস?

মামা বললেন, আর আমি যে জ্বলে পুড়ে গেলুম?

চাটুয্যে হেসে বললেন, কল্‌কের আগুনে পুড়ছিস নাকি? বুড়ো হতে চললি, এখনও টাকার জন্যে মা-র সঙ্গে ঝগড়া? হতভাগা, যা আর অশান্তি বাধাসনে। টাকা পাবি।

অক্রূর চাটুয্যের পর আসে গোসাঁইকলু। গোসাঁইকলু আসছে শুনলেই সবাই লুকিয়ে পড়ত। তার শরীরের ওজন নাকি সাড়ে চার মণ। বয়স কত তার কেউ জানত না। একটা পাঁঠা নাকি সে খায় একা। পাঁচসের খাঁটি দুধ। সেই অনুপাতে আর সব খাদ্য। তার মাথায় চুল গজায় না, কিন্তু সর্বাঙ্গে তামাটে রঙের লোম। তার গায়ের বর্ণ আর চোয়াল দেখলেই মনে

পড়ে জলহস্তীর কথা। এককালে সে নাকি কুস্তির পালোয়ান ছিল। তাকে আসতে দেখলেই পাড়ার কুকুরগুলো ভয়ানক ডাকাডাকি করতো,—যেমন ডাকাডাকি করতো কাবুলীওয়ালাকে দেখে। গুণ্ডা-সর্দার গোঁসাইকলুকে সবাই চিনতো।

তার গলার আওয়াজে একপ্রকার ভগ্নস্বর শোনা যেতো। দরজার কাছে এসে গোসাঁইকলু ডাকতো, সেজখুড়ি?

দিদিমা বেরিয়ে আসতেন। অভ্যর্থনা ক'রে বলতেন, এসো বাবা এসো। শরীর ভালো ত।

দিদিমার পিছন দিকে একটি নেংটি ইঁদুর—সে ওই ছেলেটা। সে গোসাঁইকলুর শরীরের দিকে তাকাত,—সে দেহের আদি অন্ত নেই। কোথাও কিছু ঘা, কোথাও হাজা, কোথাও বা কোনো আঁচড়ের দাগ। গালের উপর একটা দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন। কবে নাকি কার ছুরির ফলা ঢুকেছিল ওই গালে। বাঁ-পায়ে ছেঁড়াচুলের সঙ্গে কড়ি বাঁধা। সর্বাঙ্গ তেলা-তেলা।

গোসাঁইকলু বলল, শরীর ভালো থাকবে কেমন ক'রে বলো, সেজখুড়ী? খাবার জিনিস কী আক্রা! মানুষ বাঁচবে কী খেয়ে? তিন টাকা মণ চাল, আড়াই টাকা মণ ডাল। মাংস সাত আনা, দশ পয়সা দুধ, চৌদ্দ পয়সা সরষের তেল। একসের ঘি কিনতে গেলে বারো গণ্ডা পয়সা লাগে—খাবো কি?

তোমার শরীর এবার একটু কাহিল দেখছি বাবা।

ডেকেছ কেন, সেজখুড়ী?

দিদিমা কেঁদে বললেন, দস্যিকে নিয়ে আর ত পারিনে বাবা। প্রাণে মরতে বসেছি!

গোসাঁইকলুর চোখ লাল হয়ে উঠলো। বলল, তুমি দস্যির ভয়ে প্রাণে মরবে, আর আমি বেঁচে থাকবো, সেজখুড়ী? তোমার কর্তার অন্নজল এখনও আমার পেটে আছে তা জানো? কই ডাকো দেখি তোমার সুপুত্তুরকে। ভাবলুম খাঁদাকে পাঠাই, কিন্তু তুমি ডেকেছ,—আমি নিজে না এলে চলবে কেন?

মামা এসে দাঁড়ালেন অন্যদিক থেকে। গোঁসাইকলু বলল, তুমি ভেতরে যাও, সেজখুড়ী—রান্নাবান্না করোগে।

দিদিমা চ'লে গেলেন আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে। ছেলেটা তখনও উঁকি মারছে দেখে জলহস্তী করাল চক্ষে একবার তার দিকে কটাক্ষ করলো। নেংটি ইঁদুর অমনি পালাল ফুড়ুৎ ক'রে।

মাঝের দরজার ফুটো দিয়ে চেয়ে দেখছে সে ওদের দু'জনের দিকে। দেখতে পাচ্ছে মামা গম্ভীর মুখে ভক্ত শিষ্যের মতো ব'সে রয়েছেন গোসাঁইকলুর পায়ের কাছে। একসময়ে গোসাঁইকলু একটি কাগজের মোড়ক বার ক'রে দিয়ে বলল, সাজ একহাত, ছিলিম আছে ?

কোটের পকেট থেকে মামা একটি সরু কলকে বার করেন। কাগজের মোড়কে শিকড়সুদ্ধ শুকনো একটা জট। তাই ছিঁড়ে-ছিঁড়ে কলকেয় ভ'রে আগুন ধরান। ময়লা একটুকরো ন্যাকড়া কলকের তলায় জড়িয়ে নিয়ে আগে গোসাঁইকলু সুদীর্ঘ টান দিল। সেই ধোঁয়া আর সহজে বেরোয় না। সে-ধোঁয়া যেন সেই বিশাল দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে কিছুক্ষণের জন্য পথ হারালো—তারপর ঘুরে বেরিয়ে এলো নাকের ভিতর দিয়ে।

মামা টানলেন তারপর। তাঁরও সেই একই ইতিবৃত্ত। এক সময় দপ্ ক'রে কল্কের মাথাটা জ্বলে উঠলো।

গোঁসাইকলু বলল, ভট্‌চায, তোমার দাড়ি পাকলো, এখনও আক্কেল হোলো না ?

মামা বললেন, তোমার দিব্যি, মাইরি—আমার কোনো দোষ নেই।

তবে সেজখুড়ী কাঁদেন কেন ?

মামা বললেন, জামাই মরেছে তাই কাঁদে।

তুই ঝগড়া করিস ?

রাম বলো !—মামা আবার কলকেয় টান দেন। তাঁর কণ্ঠে যেন মাধুর্য ফুটে ওঠে।

গোসাঁইকলু বলে, ঘড়ির কাজ করিস। কত পাস ?

আট দশ টাকা হয়।

তবে আবার ঝগড়া কিসের ? বেশ ত চলে।

মামা বললেন, দশ টাকায় কী হয় আজকাল ?

না হয় আমাদের কাছে নিবি। মাকে জ্বালাস কেন ?

মামা যেন এবার একটু সহাস্য মুখে বলেন, অল্পে সুখ নেই, ভাইরে।

গোসাঁইকলু বলল, বেশী পেলেও সুখ নেই। তুই ত বড় লোকের ছেলে ছিলি। পাঁচটা মেয়েছেলে রেখে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারতিস। লেখাপড়া শিখতে গিয়েই ত মাটি করলি,—যত কুবুদ্ধি ঢুকলো মাথায়। এই নে, টাকা পাঁচটা রেখে দে। আপিঙের চেয়ে গাঁজা ভালো মনে রাখিস। আর ঝগড়া করবি ?

মামা বললেন, না।

আর আমাকে আসতে হবে না ত ?

না।

নে, হাতখানা ধর—উঠে দাঁড়াই।

মামার সাহায্যে গোসাঁইকলু সেদিনকার মতো উঠে দাঁড়ালো। সবাই বুঝে নিল, আগামী মাসখানেকের জন্য এ বাড়ীতে শান্তি বিরাজ করবে।

পথে নেমে গোসাঁইকলু বলল, সেজখুড়ীর পাতের চারটি পেসাদ আমাকে পৌঁছে দিবি। জগৎজননী মা আমার। খবরদার ভট্‌চায, এবার বাঁদরামি করলে তোকে আর আস্ত রাখবো না।

মামা আপাতত বললেন, যে আজ্ঞে।

সরলার কাহিনীটুকু কিন্তু ওখানেই শেষ হয়নি।—

পায়রাটুনি নামক পল্লীটি নাকি কলকাতার কোন্ পূর্ব প্রান্তে। বাগমারী আর কাঁকুড়গাছি ছাড়িয়ে নাকি সেই বস্তি। সেখানে সেই বস্তির ধারে কোন্ সরকারী জলের কলের পাশ দিয়ে আর নর্দমার ধার দিয়ে গেলে পাওয়া যেতো সরলার শ্বশুরবাড়ী। দুখানা করোগেটের ঘরে নাকি থাকতো লক্ষ্মীবাবু, আর কাজ করতো উল্টোডিঙ্গির তেলের কলে। মাইনে ছিল পঁচিশ টাকা। দুটাকা যেতো ঘরভাড়া আর একটাকা লক্ষ্মীবাবুর পকেট খরচা। বাকী বাইশ টাকায় পাঁচটা ছেলেমেয়ে সুদ্ধ পরিবার নিয়ে দিব্যি সংসার চ'লে যেতো। ধার-দেনা ছিল না।

সেই সরলা হঠাৎ একদিন বিধবা হয়ে দিদিমার সামনে এসে দাঁড়ালো। কোলের সেই দেড় বছরের মেয়েটাকে সে সঙ্গে এনেছে, ওপরের ছেলে-মেয়েগুলোকে রেখে এসেছে দেওরের কাছে। দেওর নাকি নিঃসন্তান। সরলার মস্ত বড় দাঁতের পাটিটা প্রায়ই থাকে মুখের বাইরে, এবং জিবটা একটু বেশী রকম লম্বা ব'লে বাইরে আসে। তাকে দেখলে কালীঘাটের করালবদনী কালীকে মনে পরে যেত।

এ বাড়ীতে সরলার পূর্বপরিচয়টা খুব গৌরবের ছিল না, সেই জন্য সে যখন সদ্যবিধবা হয়ে এসে দাঁড়ালো, তখন অল্পস্বল্প চোখের জল ফেললো এ বাড়ীর বিধবারা। আর সবাই এদিক ওদিক মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে আড়ালে আবডালে স'রে গেল। দিদিমা মিনিট খানেকের জন্য কান্নাকাটি করলেন। কিন্তু কান্নার চেয়ে তাঁর গলার আওয়াজটা ছিল বড়, এবং আন্তরিকতার চেয়ে

লৌকিকতা ছিল বেশী। তিনি ক্ষেদোক্তি ক'রে একবার বললেন, আবাগী, নাত্‌জামাইটাকে খেয়ে এলি, শাঁখা সিঁদুর নিয়ে নিজে তুই যেতে পারলিনে ?

সরলার সেই পূর্বপরিচিত ঝঙ্কার শোনা গেল,—তোমরা বাপু সবাই মিলে বড্ড আমার মরণ ডাকো ! মরেছে, তা আমি কী করবো ? আমি মেরেছি ? একটা পয়সা মুড়কি খেতে চাইলে হাত তুলে দেয়নি কখনো ! অমন মানুষ থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি ?

মামা চীৎকার ক'রে বললেন, আমি পারবো না ! পাঁচ ছ'টাকা যা আমার রোজগার তাতে আমারই চলে না। আমি পারবো না বিধবা পুষতে !

দিদিমা হুঙ্কার দিলেন, গরুবাছুর তবে কি আমার গোয়ালে ঢুকলো ? তোদের মতলবটা কি শুনি ?

আর সবাই চুপ। সরলা ঢুকলো দিদিমার হেঁসেলে। কোলের মেয়েটার নাম বুনি। সে খায় যত, কাঁদে তার চেয়ে অনেক বেশী। মাথায় তখনও চুল হয়নি, দেড় বছরের জীবনে আজও জামা ওঠেনি গায়ে। চেহারাটা কদাকার, চোখ দুটো ছোট ছোট।

সরলার দাদা বলল, চোদ্দটি টাকা আমার মাইনে। আমি এর থেকে দেবো কেমন ক'রে ? একখানা থান কাপড়ের দাম দশ বারো আনা—দেবো কোত্থেকে ?

দিদিমা বললেন, কেউ কিছু না দিলে ও কি ভিক্ষে করতে বেরোবে ?

দাদা বলল, চাষাভুষোরা ভিক্ষে করে না, বামুন-কায়েতের বিধবারাই হাত পাতে। যাক্ না কেন আনন্দময়ীতলায়, সেখানে আঁচল পেতে বসুকগে।

পিছন থেকে সরলা চেঁচিয়ে ওঠে, মুখ সামলে কথা বলিস। তোর খাই না পরি ? বোন ব'লে মিষ্টি হাতে দিয়েছিস কখনো ? বিধবা হয়ে এলুম, একবেলা হবিষ্যি করতে ডেকেছিস ?

দাদা গা ঢাকা দেয়।

দিদিমাই অবশেষে সরলার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। বললেন, ঘরকন্নায় এসে ঢুকেছ, বেশ—খেটে খাও। কুট্‌নো, বাট্‌না, বাসন মাজা, ঘর ধোয়া, কাপড় কাচা—আজ থেকে সব করবি। একবেলা দুটি ক'রে খাবি আর ওই বারান্দায় প'ড়ে থাকবি। বছরে চারখানা কাপড় আর একখানা গামছা।

মামা বললেন, কোলের মেয়েটার কি দশা হবে ?

দিদিমা বললেন, পাত কুড়িয়ে এঁটোকাঁটা খেয়ে মানুষ হবে। আর আমি কী করবো ?

নীচের তলায় হঠাৎ দুমদুম ক'রে শব্দ আরম্ভ হোলো। ঠিক তারই সঙ্গে সরলার চীৎকার।—মর্ না মর্ না তুই, তোর জন্যেই ত হাড়ে-নাড়ে জলে পু'ড়ে যাচ্ছি! মর্, গুলাউঠোয় মর্!

শিশুসন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহের শাসন সেটা নয়—সে যেন ভিন্ন চেহারা। প্রহারের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে কেউ কেউ নীচে কলতলায় এসে উঁকি মারতো। কলতলায় থৈ-থৈকার এঁটোকাঁটা আর নোংরা বাসনের মাঝখানে বুনি ব'সে ব'সে কী যেন মুখে তুলছে, এবং সরলা বিনা নোটিশে মেয়েটার বিনা অপরাধে হঠাৎ তার ওপর হিংস্র প্রহার আরম্ভ করেছে। আঘাত খেত সে বাইরের থেকে, বিক্ষোভ দাহন জমে উঠত তার মনে—আর সুবিধামতো তারই প্রতিশোধ তোলে মেয়েটার ওপর। মেয়েটাও তেমনি। মার খেয়ে সহজে আর কাঁদে না, মুখে একপ্রকার শব্দ করে। কেন্নোর গায়ে টোকা মারলে সেটা যেমন কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়, মেয়েটাও ঠিক সেই ভঙ্গীতে গুটিয়ে থাকে। যত মারো লাগে না তার। মাঝে মাঝে সবাই ওই মেয়েটার ছোট ছোট চোখ দুটোর ভিতর চেয়ে দেখত। শিশু মেয়ে বটে, কিন্তু চোখ দুটোর বয়স যেন অনেক বেশী। ও যেন সব জানে, শুধু কথা বলে না। ও যেন মানুষের নোংরামি, ধূর্ততা, অসাধুতা—সব বোঝে। কিন্তু কথা বললে পাছে সবাই ভয় পায়, তাই চোখ দিয়ে কথা বলে। সবাই বলতো পেঁচোয় পাওয়া মেয়ে—ওর কাছে কেউ একলা থাকে না যেন। কেউ কেউ বলে, মেয়েটা একলা থাকলে নিজের মনে ফিস ফিস ক'রে কার সঙ্গে যেন কথা কয়, ও নাকি অন্ধকারে মাঝের সিঁড়িতে নেমে ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে ও-বাড়ীর জনশূন্য কলতলাটার দিকে চেয়ে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লে গা ছমছমিয়ে আসে। বাড়ীর সমস্ত ছেলেমেয়েরা ওকে দেখলেই পালায়।

একাদশীর কাছাকাছি তিথি এলেই বাড়ীতে যেন একপ্রকার আড়ষ্টতা দেখা দিত। সেদিন সরলা কোনো কাজ করতে চাইতো না, এবং তাই নিয়ে দেখা দিত অশান্তি। বেলতলার ছাদের এক কোণে গিয়ে সরলা বুনিকে সামনে বসিয়ে নিজে ব'সে থাকতো গুম হয়ে। কারো কথা বলবার সাহস হোতো না। অবাক করতো ওই বুনি—ওই দেড় বছরের মেয়েটা। ওই মেয়েটাও একাদশী করতে বাধ্য হোতো মায়ের সঙ্গে। সরলা অপেক্ষা করতো মেয়েটা কাঁদবে কতক্ষণে। মেয়েটা সহজে কাঁদতো না, কেননা সে জানে কাঁদলেই তার ওপর মায়ের অবশ্যম্ভাবী আক্রমণ। সে-আক্রমণ বাৎসল্য অথবা স্নেহের কোনো তোয়াক্কা রাখতো না, সেই আক্রমণে সন্তানের প্রতি

দয়া-দাক্ষিণ্যের লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যেতো না। বাইশ-চব্বিশ বছরের নারীর বলিষ্ঠ বাহুর দিকে তাকিয়ে মেয়েটা কাঁদতো না, ঠকঠক ক'রে কাঁপতো। মেয়েটার মুখে ভাষা নেই, চোখে কান্না নেই—কিন্তু তার আচরণে থাকতো কেমন একটা আবেদন, সে-আবেদন ক্ষুধার আর তৃষ্ণার। মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ হয়ে যেতো—বুনি ব'সে আছে সরলার পায়ের কাছে। কখনো ঘুমিয়ে পড়েছে, কখনো বা জেগে নেড়ি কুকুরের মতো মাথা ঘষছে ধুলোয়। ক্ষুধাটাকে জানানো চাই, জানানো চাই মনুষ্যত্বের দরবারে মৃদু অভিযোগ।

অভিযোগ! দড়াম ক'রে এক চাপড় বুনির পিঠের ওপর। লুকিয়ে সবাই দেখে আসত, কচি পিঠের ওপর পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ। সরলা সবাইকে শুনিয়ে গলা উঁচিয়ে বলতো, মলো যা—রাত-দিন ক্ষিধে। কে আছে তোর যে, পেটপুরে খাওয়াবে? মর, পা-চাটছে দেখো তখন থেকে!

মেয়েটা কুঁকড়ে প'ড়ে থাকতো মায়ের পায়ের তলায়।

অপরাহ্নের দিকটায় অসহ্য হোতো সকলের। দিদিমা বেরিয়ে এসে বলতেন, একবাড়ী লোক থাকতে তুই কি স্ত্রীহত্যে করবি, আবাগী?

এই সুযোগটাই সরলার দরকার ছিল। নিস্তব্ধ বাড়ীটা তার কণ্ঠস্বরের ঝনঝনানিতে কেঁপে উঠতো। বলতো, ওই ওর জাতের স্বভাব, কেবল খাবো! হাড় খাবো, মাস খাবো! কে খাওয়াবে শুনি? তার চেয়ে ম'রে যাক্ না!

তাই ব'লে তুই ওকে খেতে দিবিনে, হতভাগী?

কথায় কথায় বিবাদটা প্রচণ্ড চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। মেয়ে-পুরুষ ছুটে আসে। কেউ আনে লাঠিঠেঙ্গা, তামাকের টিকে ধরাবার চিম্‌টে হাতে নিয়ে মামা আসরে ঝাঁপিয়ে পড়েন, আর সরলা ছুটে গিয়ে মাছ কোটার বঁটিখানা তুলে নিয়ে আসে। বাড়ী কম্পমান, পাড়াঘরের দরজা জানালা খুলে যায়। আকাশের দেবতারা ভয়াকুল, রণরঙ্গিনীর নাচনের দাপাদপিতে সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যাবে। এই অবসরে কে যেন হঠাৎ পিছন থেকে এসে বুনিটাকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে পালায়। মেয়েটার সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, তেলাতেলা, অথচ কালোর ওপরে কেমন চিকণ, পিচ্ছিল। গায়ে হাত দিলে হাতখানা ধুয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। মেয়েটা কথা বলতে শেখেনি, হাসতেও শেখেনি। কেবল আছে তার চাহনি, সে চাহনি অর্থপূর্ণ।

কিন্তু মায়ের হাত থেকে নিয়ে কত দূরে পালানো যায়? আঁসবঁটি হাতে নিয়ে সরলা তখনই ঘুরে দাঁড়ালো। বলল, আমার মেয়ে কই? কোথায়

আমার মেয়ে ? শিগগির ফিরিয়ে দাও বলছি—নৈলে—

অস্ত্র হাতে নিয়ে রক্তচক্ষে সরলা এদিক ওদিক তাকায়। অবশেষে দাদা এসে পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে বঁটিখানা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়। মামী এসে দিয়ে যায় বুনিকে ওর পায়ের কাছে। তার পরের দৃশ্যটা বীভৎস। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে বুনির ওপর। বুনি মুখে শব্দ করে আর কাঁপে। সরলা তাকে ওপরের সিঁড়ি থেকে নীচের দিকে লাথি মেরে গড়িয়ে দেয়। একতাল জীবন্ত মাংসপিণ্ড সিঁড়ির ধাপে ধাপে চোট খেয়ে-খেয়ে মাঝের বড় সিঁড়িতে গিয়ে পড়ে। বড় সিঁড়িতে প'ড়ে বুনি কাঁদে না, উপর দিকে তাকায়। মাথাটা বারবার ঠুকেছে বটে, কিন্তু এটুকুতে তার কিছু হয় না !

দিদিমা সমস্তটা লক্ষ্য ক'রে বললেন, হুঁ। বুঝতে পেরেছি সব। পাপপুণ্যি যা হয় ওর হবে, আমার কি ? সরলাকে এখন থেকে আর একাদশীর উপবাস করতে হবে না ! .

সেই দিনই সন্ধ্যার পর দেখা গেল, বেলতলার ছাদের অন্ধকারে এক কাঁসি ভাত নিয়ে বসেছে সরলা এবং মায়ের পাশে ব'সে বুনিও টাউ টাউ ক'রে পান্তাভাত আর নুন গিলছে।

শ্রাবণের বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ঘিরে। বেলাবেলি কাজ সেরে সবাই উঠেছে ঘরে। কিন্তু সরলা কোথায় ? তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন ? অবশেষে কে যেন তেতলার ছাদে গিয়ে আড়াল থেকে দেখলো, সরলা নুন দিয়ে পাকা তেঁতুলের গাঁট চুষছে অসীম তৃপ্তিতে আর ছোট মেয়েটা ছাদের ঠিক মাঝখানটিতে ব'সে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারায় হাবুডুবু খাচ্ছে। মেয়েটার আপত্তি নেই, প্রতিবাদ নেই, কোনো কাতরোক্তি নেই,—সে জানে, এমনি ক'রে জলে ভেজাটাই হোলো তার মায়ের ইচ্ছা।—তারও হাতের মুঠোর মধ্যে তেঁতুলের একটা গাঁট। তবু ত খাদ্য, তবু ত এটা তার মায়ের বদান্যতা ! মেয়েটা বোধহয় ওতেই খুশী !

সেজমাসিমা বলেন, ভাইনী আবার তাকায় কেমন ক'রে ছাখো না। শ্যাওড়াগাছের তলায় বসিয়ে দিয়ে এলেই হয়। মেয়েটা জাত শ্যায়না !

শ্যাওড়াগাছ পাড়ায় কোথাও ছিল না। কিন্তু সরলা ওকে নিয়ে গিয়ে বসায় তেশূন্যে—যেখানে খোলা আকাশ। কার্তিক মাসের রাত্রে হিম পড়ছে —সেই ঠাণ্ডায় সরলা ওকে খোলা জায়গায় ঘুম পাড়ায়। প্রহারের আতঙ্কে বুনি সেই অন্ধকার ছাদের মেঝের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ে। নিজে গায়ে মাথায় মুড়ি দিয়ে সরলা সেখান থেকে উঠে আসে। খানিক রাতে যদি কখনো

লেগেছে খোঁজ পড়ে, অমনি ফোঁস ক'রে ওঠে সরলা,—তোমাদের অত মাথাব্যথা কেন বলো দিকি? আমাকে না খোঁটা দিলে তোমাদের চলে না, কেমন?

কেউ হয়ত বলল, এই ঠাণ্ডায় মেয়েটাকে কোথায় শোয়ালি বল্ না কেন?

সরলা পাড়া মাথায় ক'রে বলে, ভারি দরদ! মা-র পোড়ে না পোড়ে মাসির,—তোমাদের ঘাড়ে ত আর চাপাইনি? আমার ছাগল আমি ল্যাজে কাটবো।

আর কেউ কথা বলতে সাহস করে না। কিন্তু মাঝ-রাত্তিরে সরলা নিজেই উঠে পা টিপে টিপে গিয়ে পুবদিকের ছাদে উঁকি মারে। রাত জেগে ছেলেটা দেখত সরলার গতিবিধি। মেয়েটা ঠাণ্ডায় জমে চর্বির ডেলার মতো হয়ে উঠে অন্ধকারে ব'সে ঢুলছে। সেই দৃশ্য দেখে সরলা হঠাৎ আগুন হয়ে উঠতো। কাছে গিয়ে সে কি করতো দেখতে পাওয়া যেত না, কিন্তু বুনি ডুক্‌রে কেঁদে উঠে ছট্‌ফট্ করতো। তখন চীৎকার পাড়ত সরলা,—একফোঁটা ঘুমোতে দেবে না! এমন হারামজাদী মেয়ে। সেই থেকে শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর! কোত্থেকে ওকে সারারাত খেতে দিই বলো দিকি তোমরা? মর মর—নিপাত যা—

বেদম প্রহারে মেয়েটার বোধহয় ভালোই হোতো। গরম হয়ে উঠতো তার ছোট্ট দেহটুকু। ঢুলতে ঢুলতেই মেয়েটা মুখের শব্দ করে। দিদিমা আর থাকতে না পেরে একসময়ে বলেন, দুখানা রুটি আছে কুলুঙ্গিতে, মেয়েটাকে খাওয়াবি না? এই নে দেশালাই, পিদিমটা আগে জ্বাল্!

সরলা তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে বলে, আলো আর দরকার নেই, দেখে নিতে পারবো।—এই ব'লে মেয়েটাকে নিয়ে সে ছোট ঘরের দিকে চ'লে যায়। কুলুঙ্গি থেকে রুটি বার করতে তার একমুহূর্তও দেরি লাগে না। ওটা যেন তার জানা জায়গা।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সে মেয়েটাকে নিয়ে আবার ফিরে আসে। সবাই তখন নিদ্রিত। দিদিমা প্রশ্ন করেন, খাওয়ালি?

অসীম তৃপ্তির সঙ্গে সরলা বলে, সে আর বলতে? রুটি ছিঁড়তে তর সয় না—বলবো কি, একেবারে টাউ টাউ ক'রে খেলো! সাতজন্মে যেন খায়নি কিছু! একটু তরকারী থাকলে চেটে খেতো!

বুনি তখনো মুখের শব্দ করছে। দিদিমা বললেন, পেট ভ'রে খেয়ে আবার কাঁদে কেন তবে?

সরলা ঠনাৎ ক'রে মেয়েটার কপালে এক ঘা মারলো। তারপর বলল, শুয়োরের পেট যে, ওতে কি আর ভরে? বলে, জাতস্বভাবে কাড়ে রা!

মেয়েটা কথা বলতে শেখেনি, তাই মুখের শব্দ করে মাত্র। তার সেই অন্তর্ভেদী আর্তকণ্ঠ অন্ধকারে সকলের কানে যেত। তারা নিশ্চেতন পাথরের মতো প'ড়ে থাকত।

মামীর ঘর ছিল এক কোণে। কিন্তু তাঁর চোখ কান ছিল অত্যন্ত প্রখর। রাত্রে ইঁদুরের পায়ের শব্দও তিনি টের পেতেন। হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে তিনি ধড়মড় ক'রে উঠে এলেন। পৌষ মাসের প্রচণ্ড শীতে সবাই লেপের মধ্যে কুঁকড়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। মামী হাউমাউ ক'রে উঠলেন, তোমরা সবাই ওঠো, সবাই শোনো—সরলার মতলব কিন্তু ভালো নয়!

ভীত ত্রস্ত হয়ে সবাই উঠে পড়লো। রাত তখনও ভোর হয়নি। মামী কাঁপতে কাঁপতে বললেন, নীচে গিয়ে গ্যাখোগে, মেয়েটাকে গলা অবধি চৌবাচ্ছার জলে ডুবিয়ে রেখেছে—তোমরা পুলিস ডেকে আনো! পেটের মেয়েকে এমনি ক'রে মারবে, আর কেউ কিছু বলবে না? শেষকালে সকলের হাতে দড়ি পড়বে যে!

রাত শেষ হবার আগেই সেদিন বাড়ীতে আগুন জ্ব'লে উঠলো।

সেই আগুনের লেলিহান শিখা অনেকদিন পর্যন্ত দাউ দাউ ক'রে জ্বলেছিল। সেই আগুনে পুড়েছে নারীধর্ম, পুড়েছে বৈধব্যের বিধি-নিষেধ, পুড়েছে নিষ্ঠা ও সংস্কার। অবশেষে সেই আগুন থেকে যে-চিতা রচনা করা হয়েছিল সেই চিতায় পুড়েছিল সরলা। সরলা মারা গিয়েছিল ওলাউঠায়!

আর বুনি? মায়ের মৃত্যুর পরেও সে বেঁচেছিল কিছুকাল। তাকে পায়রাটুনির বাড়ীতে রেখে আসা হয়েছিল। তার ভাষা ছিল না, ছিল মুখের শব্দ। সে নাকি ব'সে থাকত কলতলায়, শুধু জল খেতো। কতদিন ধ'রে জল খেয়েও তার তৃষ্ণা মেটেনি, বলা কঠিন। কেউ বলে, তাকে নাকি শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে। হয়ত খবরটা সত্য, কেন না হত্যা ছাড়া আর কোনো উপায়ে তার মৃত্যু ছিল না।

ভটচার্যি বাগানের সেই পাড়ার চাটুয্যে গিন্নি যেদিন কপালে সিঁদুর এবং হাতের নোয়া নিয়ে মারা গেলেন, কেবলমাত্র সেইদিনই জানতে পারা গেল তিনি পুণ্যবতী, দানশীলা এবং ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন।

চাটুয্যেদের বাড়িতে ওই নাবালক ছেলেটার একটি সমবয়সী বালক ছিল খেলার সাথী। কিন্তু ও-বাড়ীর গিন্নীর হাঁকডাক, কর্কশ চেহারা এবং অতিশয় কলহ-কোলাহলের জন্ত চাটুয্যেবাড়ীর জানালা দিয়ে ভিতর দিকে উঁকি মারারও সাহস হত না। তাঁর মুখের ভাষা ছিল নোংরা, এবং তার চেয়েও নোংরা ছিল বাড়ীর ঝি-চাকরের প্রতি তাঁর আচরণ। সুতরাং তাঁর বাড়ীতে অনেক সময়ে অতি সন্তর্পণে এবং অতি গোপনে আনাগোনা করতে হোতো।

চাটুয্যে গিন্নীর মারা যাবার দিন পাড়ায় পাড়ায় অশ্রুর বন্যা বইতে লাগলো। তিনি পুণ্যবতী—কেননা নিরীহ স্বামীটি তাঁর আঁচলে বাঁধা ছিল; অর্থাৎ সাতচড়েও স্বামীর রা ছিল না মুখে। তিনি দানশীলা—যেহেতু উচ্চকণ্ঠে ভিখারীদের বাপান্ত না ক'রে একমুঠো ভিক্ষা দিতেন না। তাঁর দরজায় ভিখারী এলেই হাঁকডাকে পাড়ার লোক হত তটস্থ। এ ছাড়াও নাকি তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণা। তার মানে কপালে চওড়া সিঁদুর মেখে কস্তাপেড়ে শাড়ী প'রে কমণ্ডলু হাতে ক'রে পাড়ার ঠানদি আর রাঙ্গাদিকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতেন নিমতলার ঘাটে। পথে আনন্দময়ীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে ঠন্ ক'রে সকলের মাঝখান দিয়ে আনি-দু'আনি ফেলে দিতেন শ্বেতপাথরের মেঝের উপর, সেটা অহঙ্কারের টুকরোর মতো গড়িয়ে যেত মা আনন্দময়ীর পায়ের কাছে। সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে বলতো, আহা, তা হবে না? বড় ঘরের বউ যে?

এ হেন চাটুয্যে গিন্নীর গঙ্গাযাত্রা দেখে ওই ছেলেটা পর্যন্ত কেঁদে ভাসাল। কান্না হল ছোঁয়াচে। সেকালের মাতৃভক্ত ছেলে অথবা পত্নীভক্ত স্বামীরা মৃতদেহকে শ্মশানে শুইয়ে এত ফটোও তুলতো না, অথবা জালানি কাঠ কেনা মুলতবী রেখে খবরের কাগজে খবরটি ছাপাতেও ছুটতো না। মৃতব্যক্তির সুখ্যাতিটা পাড়ার সমাজের মধ্যে কিছুকাল চালু থাকলেই সবাই সুখী হত।

যাই হোক, মৃত্যুর পরে দানসাগর শ্রাদ্ধের আয়োজন চললো। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। ব্রাহ্মণ বোষ্টমকে দু'হাতে দান, অতিথি অভ্যাগত নিমন্ত্রিতদের সেবা,— অতএব পাড়ায় পাড়ায় লুব্ধ ব্যক্তিরা ওৎ পেতে ব'সে রইলো। সকালে সভারোহণ, কীর্তন, পাঁচালী আর কথকতার আসর। সুন্দরী সালঙ্কারা বেদানাবালা দাসী এলেন মহাসমারোহে। চিক-আড়ালে সব পাড়ার বৌঝিরা ব'সে গেল। ও পাড়ার অথর্ব বিহারী ভটচার্যি এলেন পাল্কীতে চ'ড়ে। মস্ত ঘটা চাটুয্যেবাড়ীতে। পাড়ায় পাড়ায় ধন্ত ধন্ত রব।

সকল পর্ব শেষ হবার পর বাকি রইল কাঙ্গালী-ভোজন। কাঙ্গালী ভোজন

সেই প্রথম দেখল ছেলেটা। চাটুয্যেরা নাকি বেশী পারবে না—মাত্র দু'হাজার কাঙ্গালী-ভোজন করাবে। দুই হাজার সংখ্যাটা কত, ছেলেটা সেদিন অতটা বোঝেনি। কিন্তু মনে হয়েছিল অনেক। শোনা গেল কাঙ্গালীদের সর্দার যেন কোথায় থাকে, তাকে খবর দিলেই অমুক তারিখে অত সংখ্যক কাঙ্গালী পাওয়া যাবে। কলকাতায় দেখা যেত ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজ,—কেউ তারা মধ্যবিত্ত, কেউ স্বল্পবিত্ত,—কেউ বা ধনী। কিন্তু কাঙ্গালীরা থাকে কোথায় জানা যেত না। এও জানা যেত না, খবর পাবামাত্রই তারা কোন্ গহ্বর থেকে পিল পিল ক'রে পিপীলিকার মতো বেরিয়ে আসে! তারা কে, কোন্ জাতি, কোন্ সমাজের লোক, কী ভাষা তাদের, কেমন তাদের জীবনযাত্রা,—সব মিলিয়ে ওই ছেলেটার ছিল অসীম কৌতূহল। প্রথম তাদের দেখল ওই চাটুয্যে গিন্নীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে। যে-পথ দিয়ে তারা আসছে সেই পথের দু'ধারের দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। তারা নাকি নোংরা, তারা নাকি ঘৃণ্য। সে চেয়ে দেখল প্রথম শত শত কাঙ্গালীকে। অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, কদাকার মেয়ে-পুরুষের এবং বালক-বালিকার দল—সকল বয়সের। কারো পরনে লেংটি, কারো ছিন্ন-ভিন্ন নোংরা কাপড়ের টুকরো, কারো কম্বলের চিলতে, কেউ বা কোমরে জড়িয়ে রয়েছে ছেঁড়া ময়লা জামা। কারো চোখ নেশায় লাল, কারো মাথায় বন্যচুলের রাশ, কেউ বা সর্বহারা। আর মেয়েছেলেরা? ওরা কি লজ্জা পাচ্ছে না নিরাবরণ দেহ নিয়ে? ওদের কোলে কাঁকালে উলঙ্গ শিশুর পাল। কুরূপা, বীভৎসা, নীতিভ্রষ্টা শত শত মেয়েছেলে। এরা নাকি সবাই কাঙ্গালী। সেদিনের কাঙ্গালী-ভোজন আজও আছে, তবে ভিন্ন নামে,—আজ এর নাম হয়েছে দরিদ্রনারায়ণ সেবা!

কাঙ্গালীদের মধ্যে শালপাতা আর মাটির গেলাস বিতরণ আরম্ভ হল। তখন কলকাতার পথঘাট খোয়া-পাথরের, ধুলো-বালির। তারই ওপর এক এক সারে শতশত শালপাতা আর গেলাস প'ড়ে গেল। ভাত দিলেই ডাল দিতে হয়, এবং ডালের সঙ্গে তরকারী। তার খরচ বেশী। ফ্যান্ গাল্‌তে গেলে চালের পরিমাণও বেশী লাগে। সুতরাং অপরাহ্ণকালে খিচুড়িই সব দিক থেকে সুবিধাজনক। তার সঙ্গে শাক-সব্জির কিছু একটা ঘ'াট। কুটনোর খোসা, শাকের গোড়া, পচা আলুর টুকরো, বেগুন কাঁচকলার বোঁটা, তার মধ্যে দু' চার তাল হলুদ আর লঙ্কাবাটা,—এই সব নিয়ে সেই ঘ'াট। খিচুড়ির মধ্যে খুদ আছে, ধান আছে, বুকুড়ি চাল আছে, ভুসিসুদ্ধ ডাল আছে,—সব মিলিয়ে গরু-মহিষের খাদ্য। কিন্তু ওই খাদ্য খাবার জন্য কাঙ্গালী সমাজের কী লালায়িত

লালসার আকুলি বিকুলি! ছেলেটা স্তব্ধ কৌতুহল নিয়ে পথের একান্তে দাঁড়িয়ে রইল।

খিচুড়ির সেই বিরাট সমারোহের পর এক একটি পাই পয়সা অথবা আধলা ছিল বকশিশ,—অবশ্য এটা ছিল বিশেষ ধনীসমাজের রেওয়াজ। তাই পাবার জন্য কাঙ্গালীদের কী কাড়াকাড়ি আর মারামারি!

অন্ধকার রাত্রে নাবালকের তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের সামনে দিয়ে ছবির মতো ভেসে যেত ওই ক্ষুধিত বঞ্চিত নরপালের দৃশ্য। বুকের ভিতরে কোথায় কন্‌কন্‌ করতো,—কেন করতো সে বুঝতে পারত না। ওরা কোন্ দেশের, কোন্ কালের? ওরা কি চিরকালের? যখন শ্রাদ্ধ কিংবা বিবাহ থাকে না,—ওরা খায় কী? যায় কোথা?—দেখেছে সে নিজের চোখে,—ভিখারীরাও ওদেরকে ঘৃণা করে, কেননা ওরা কাঙ্গালী। ওদের ঘর নেই,—ওরা ভেসে বেড়ায়, খেয়ে বেড়ায়,—ওদের জন্মমৃত্যু হলো পথে পথে।

সহসা নিজের মনেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত। ইচ্ছা হত সেই রাত্রে বাড়ীর দরজা খুলে পথে বেরিয়ে সে একাই চীৎকার ক'রে বলে, না, মিথ্যে কথা, চাটুয্যে-গিন্নীর স্বর্গলাভ হয়নি! এটা স্বর্গলাভের পথ নয়! ধানের সঙ্গে বুক্‌ড়ি চাল আর ভুসিডাল সিদ্ধ—ওটাকে কিছুতেই খিচুড়ি বলতে পারবো না, কুটনোর খোসায় আর বেগুনের বোঁটায় আর শাকের গোড়ায় যা সিদ্ধ হয়েছে তাকে বলতে পারবো না তরকারী! ওটা মিথ্যে, ওটা ফাঁকি, ওটা চাটুয্যে-গিন্নী নিজেও খেতে পারত না!

উঁচু থেকে হাত বাড়িয়ে নীচের দিকে জঞ্জালে ফেলে দেওয়া—এটাকে কি দানপুণ্য বলবে? এ যে ভয়ানক প্রবঞ্চনা! বিষম ফাঁকি! ক্ষুধাতুর কাঙ্গালী-দের ক্ষুধার দিকে তোমার চোখ ছিল না, শ্রদ্ধা ছিল না তাদের মানবত্বের প্রতি, —তুমি শুধু প্রকাশ করেছ তোমার সম্পদের আত্মাভিমানকে। কেন খাওয়ালে ওদের? কেন ওই অখাদ্য বিতরণ ক'রে ওদের সবাইকে অমন অপমান করলে? তোমার ওই নির্লজ্জ অন্ন খুঁটে-খুঁটে খাবার আগে ওদের মৃত্যু হলো না কেন? মিথ্যে কথা, চাটুয্যে-গিন্নীর কিছুতেই স্বর্গলাভ হয়নি!

বালকের চক্ষু জ্বালা ক'রে জল এসে পড়তো। কাঙ্গালীরা সেদিন যদি চাটুয্যেবাড়ী লুটতরাজ ক'রে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যেতো তবে বোধ হয় সে একটু খুশীই হত।—

রামখোকার পড়াশুনো চলছিল মিশনারি ইস্কুলে। মাস্টার মশাই বই হাতে নিয়ে পড়াচ্ছিলেন:

"সত্য বটে, রাজা রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠিরাদি বড় বড় রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব ক'রে গিয়েছিলেন! তাঁরা ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং সত্যপালনের জন্য বনে জঙ্গলে ঘুরেছিলেন। তাঁদের আমলে চোর ডাকাত জন্মায়নি, সেজন্য প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল। ইতিহাসে দেখা যায় সেই সব রাজাদের রাজত্ব-কালে এ দেশের লোকেরা কতকটা ধার্মিক ছিল বটে, কিন্তু সভ্য ছিল না। একথা সকলেই স্বীকার করবেন, এ দেশে প্রথম সভ্যতা আনলো ইংরেজ। আগে ছিল শুধু ধর্ম, কিন্তু ইংরেজ শাসন-কর্তারাই এ দেশে প্রথম আনলেন ন্যায়ধর্ম!"

স্কুলপাঠ্য এই "বর্তমান ভারত ও ইংরাজ শাসন" নামক বইখানার দাম তখন ছিল তিন আনা। বইখানার লেখক ছিলেন স্বয়ং ওদের খ্রীস্টান হেডমাস্টার। এই অবশ্যপাঠ্য বইখানি অনেককে বিনামূল্যেও দেওয়া হতো। এখানা মুখস্থ না থাকলে সেদিন ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে যেত। কানমলা খেয়ে বেঞ্চের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো।

রাজা রামচন্দ্রের আমলে রেলগাড়ী ছিল কি? রাজা যুধিষ্ঠিরের আমলে টরে-টক্কা টরে-টক্কা টেলিগ্রামে খবর আসতো কি? আগে না হয় জলে ভেলা ভাসতো, কিন্তু কলের জাহাজে চ'ড়ে বিলেতে যাওয়া যেতো কি? চোর ডাকাতে দেশ ভরা ছিল, গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঠগরা যথাসর্বস্ব কেড়ে নিত— নিশ্চিন্ত শান্তিতে লোকের বসবাস করবার উপায় ছিল না—এমন সময়ে এলো ইংরেজ। সত্যি বলতে কি, রাম-রাজত্বের পরেই বৃটিশ-রাজত্ব। মাঝখানের ইতিহাসে অনেক ভুল আছে কে না জানে! ভারতবাসীর উন্নতির জন্যেই ইংরেজ 'অন্ধকূপে' দম আটকে মরেছে!

মিশনারী ইস্কুলের নীচের ক্লাসে ব'সে বাচ্চারা মুগ্ধ হয়ে বক্তৃতা শুনত, আর বাইবেল মুখস্থ ক'রে সমস্বরে গান ধরত—'প্রভু যীশু নাম, অশেষ গুণধাম, প্রণিপাত করি তব চরণে!'

ম্যাকলীন সাহেবের বাবুর্চির ছেলে আলতাবুদ্দিন ছোটদের সঙ্গে পড়তো, সে মুখে হাত চাপা দিয়ে বলতো, "যীশু পরম দয়ালু শীতকালে খায় শাঁকালু—"

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অবতার এবং প্রিয়তম পুত্র যীশুখ্রীস্ট শীতকালে শাঁকালু খেতেন কিনা, একথা বাইবেলে সেদিন লেখা ছিল না, কিন্তু হঠাৎ আচমকা রামখোকার গালে এক থাপ্পড় দিলেন বাইবেলের মাস্টার। সেই নাকি আলতা-বুদ্দিনকে ওই কবিতাটি শিখিয়েছে।

মার খেয়ে কাঁদবার হুকুম ছিল না। ওতে নাকি স্কুলের নিয়মানুগত্য নষ্ট হয়। যীশুখ্রীস্ট মার খেয়েছেন, কিন্তু কাঁদেননি! বরং যারা অপরাধ করেছে, তাদের জন্ত তিনি পরম-পিতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছেন, হে ঈশ্বর, তুমি ওদের ক্ষমা করো। ওরা জানেনা ওরা কি করলো!

বাড়ী ফিরে গালের ওপর থাপ্পড়ের দাগটা দেখে ছোড়দি পরম পুলকে চীৎকার ক'রে সবাইকে জানিয়ে দিল। বুঝতে পারা গেল রাস্তার কলের জল অনেকবার গালে বুলিয়েও দাগটা মিলোয়নি।—হে পরম পিতা, পরের দুঃখে ছোড়দি মজা পেয়েছে, তুমি ওকে ক্ষমা করো প্রভু!

বাইবেলের কথাগুলি দিনরাত খোকার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতো।

তেলে ভাজা বেগুনি আর এক ঘটি জল খেয়ে যেদিন পেট গরম হোতো, সেদিন রাত্রে সে স্বপ্ন দেখত, জ্যোতির্ময় পুরুষ দশ আজ্ঞা বিতরণ ক'রে বলছেন, লোভ করিয়ো না, চুরি করিয়ো না!—কিন্তু পরদিন চুরিকরা মার্বেলের গুলী ক'টা মালিকের কাছে ফেরত দিতে হাত কাঁপতো। কেননা, সে ব্যক্তির বাইবেল পড়া ছিল না। ক্ষমা যদি সে না করে? ইংরেজের মতো ন্যায়বিচার করতে গিয়ে সে যদি অপরাধীকে শাস্তি দেয়? থাক্, অত সাধু সেজে কাজ নেই!

ইংরেজি ভাষায় ছেলেটা কাঁচা। তার জন্য তার ওপর উৎপীড়ন চলত। একদিন তামাকের গড়গড়ার থেকে মুখ সরিয়ে মামা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, লেখাপড়া না গুষ্টির মাথা! ঘর জামাইয়ের গুষ্টি—ওদের সাতপুরুষে প্রথমভাগ ধরেনি! শোন্, তালুকদারের ঘরে বে থা' করবি—পাঁচটা মেয়েছেলে পুষবি, খাবিদাবি—বগল বাজিয়ে ঘুরে বেড়াবি! বলি, লেখাপড়া কিসের? কিছু না পারিস, আমার মতন সাকরেদ জোটাবি! বছরে মাথাপিছু এক টাকা—দশ হাজার শিষ্য! পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খাবি! কথায় বলে, নরানাং মাতুলক্রম।

দিদিমা বলতেন, আ মর, কু-মন্তরণা দিচ্ছে গ্যাখো! যমের অরুচি!—

কথাগুলো দিদিমা নিজের দাঁতে দাঁতে ঘষতেন, তাই মামা সঠিক শুনতে পেতেন না।

এ বাড়ীর দক্ষিণ দিক থেকে এসে উত্তর দিকে চ'লে গিয়েছে সরু গলিপথ। সালার দোকান পেরিয়ে শেতলদের বস্তি ছাড়িয়ে শীলেদের বাড়ী বাঁ দিকে রেখে সোজা গেলেই বড় রাস্তা। নদী গিয়ে পড়ে যেমন সমুদ্রে—যেমন ভূগোলের মাস্টার শেখাতেন—তেমনি বাল্যকালের ওই গলি গিয়ে মিশে যেত মস্ত চওড়া পথে—যেখানে অবারিত মুক্তির আস্বাদ। হাতে একরাশ বই, পায়ে ফিতে বাঁধা জুতো—জামাকাপড় অনেক জায়গায় ভিন্ন রঙের সুতোয় সেলাই করা। ফিতে বাঁধা জুতো—মানে, চটিজুতো পরার জো ছিল না। পথে বার হতে গিয়ে যদি চটিজুতো ছটকে যায়? যদি সেই মুহূর্তে গাড়ী এসে পড়ে? সুতরাং চটিজুতো প'রে ইস্কুলে যাবার রেওয়াজ ছিল না সেদিন! বর্ষায় ভিজে যেতে হবে—ছাতা নেওয়া চলবে না। শ্রাবণের মুষলধারা, চৈত্র আর বৈশাখের টা টা রোদ—মাথা বেয়ে জল পড়ুক, কপাল বেয়ে ঘাম ঝরুক, —ওতে বরং ছেলে বাঁচবে, কিন্তু ছাতার আড়াল দিয়ে ত আর গাড়ী এসে চাপা দেবে না!

দুর্গা দুর্গা,—ওরে গাড়ী ঘোড়া দেখে যাস—ফুটপাথের ওপর দিয়ে চলিস। এদিক ওদিক দেখে তবে রাস্তা পার হোস।

প্রতিদিনকার এই উপদেশ যেন যেত ছেলেটার পিছনে পিছনে। পিছনের শাসনের চক্ষু তার সামনের পথ বেঁধে দিত। যতক্ষণ না বড় রাস্তায় প'ড়ে একটু বাঁ দিকে বেঁকত ততক্ষণ অবধি সাহস হত না পিছন দিকে ফিরবার। হয়ত গোয়েন্দা-চক্ষু, আর নয়ত ছোড়দা আসছে পিছনে পিছনে। ওরা ওৎ পেতে থাকতো কতক্ষণে সে একটা অপরাধ করবে; ওরা কান পেতে থাকতো পড়তে ব'সে ঠিক কখন্ একটা ভুল উচ্চারণ করবে, কখন্ বা পড়তে পড়তে ক্লান্তিতে তার চোখ ঢুলে আসবে। ওদের সতর্ক চোখ-কান সর্বদা পাহারায় থাকতো।

কিন্তু ইস্কুল যাবার ওই পথটাই ছিল খোকার মুক্তির অবকাশ। রায় বাগানের গলি দিয়ে মিশনারী ইস্কুলে গিয়ে পৌছবার নির্দেশ থাকত তার ওপর। গলিতে-গলিতে যাওয়া—যে পথে ভয় কম। মিনিট দুই সময় যদি বেশী লাগে লাগুক—কিন্তু গরীবের অনাথ ছেলের দাম অনেক বেশী। কোনোমতে একটা পাস করলে তবে এনে খাওয়াতে পারবে। আর যদি সদাগরী অফিসে একটুখানি বসবার জায়গা পায় তবে ত পাথরে পাঁচ কিল। দুর্গা—দুর্গা—ওরে, ফুটপাথ ধ'রে যাবি। এদিক ওদিক দেখে তবে রাস্তা পার হবি। দুর্গা—দুর্গা—

দুর্গা নাম করতে গিয়ে মায়ের গলায় আওয়াজ কেমন কাঁপতো। সেই কাঁপন ছুঁয়ে থাকতো ছেলেটার গলার মধ্যে। সাবধানে পথ চেয়ে চলত। কোনোমতে একটা পাস করা, তার পরেই একটা যেমন-তেমন চাকরি!

কিন্তু গলি পেরিয়ে হঠাৎ যেন সে এসে পড়ত সমুদ্রের ধারে। হেদুয়ার ফুটপাথে উঠে দেখত, পৃথিবী অনেক বড়। বিশাল জলাশয়, তার যেন এপার-ওপার নেই। ওপারে দেবদারু গাছের সারি—তার নীচে দিয়ে চ'লে গেছে ট্রাম রাস্তা। সে-রাস্তা গেছে কতদূর—সে তার খোঁজ জানে না। কতক্ষণ পরে পিছন ফিরে সে দেখত। না, শাসন কোথাও নেই, কোনও সতর্ক চক্ষু তাকে অনুসরণ করছে না। তখন সে থমকে দাঁড়িয়ে দেখত চারিদিকে। সে একা। তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার মতো ডাইনে-বাঁয়ে কেউ নেই। এদিক ওদিক তাকিয়ে পথ থেকে ঢিল তুলে নিয়ে সে ছুঁড়ত পশ্চিম দিকে—সেটা হেদুয়ার জলের মধ্যে গিয়ে পড়তো। লোহার রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে যাবার সময় মালীকে লুকিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা জবাফুল তুলে নিয়ে যেত। শাসনের চাপে দুরন্তপনাটা থাকত শেকলে বাঁধা, সুযোগ পাবামাত্র সেটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতো।

মিশনারী ইস্কুলে সাড়ে দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ফটক বন্ধ হয়ে যেত। তারপর যদি কোনো বালক ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির হত, তার কপালে কী লাঞ্ছনা সেদিন! বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হত কতক্ষণ, কিংবা তা'রো চেয়ে সাংঘাতিক,—দশ মিনিট ধ'রে পুরনো পড়া মুখস্থ ব'লে যাও। যদি একটি ভুল যায়, তবে তৎক্ষণাৎ ব্ল্যাক্-বুকে নাম উঠবে—সাবধান!

প্রহারের ভয় অপেক্ষা পুরনো পড়ার ভয় ছিল বেশী। চুরির দায়ে ধরা পড়লে সব চেয়ে কঠিন শাস্তি ছিল পুরনো পড়া মুখস্থ বলা। এবং সেই মুখস্থটা ফার্স্ট বুক থেকে হওয়া চাই। ছোটবেলাকার সব চেয়ে বড় শত্রু ছিল ওই তিন আনা দামের সাংঘাতিক ইংরাজি বইখানা। চোখের জলে, তাড়নায়, অপমানে, অনাচারে—ওই বইখানা ধরতে হত। ওর মধ্যে উদ্ভট উচ্চারণ, জটিল বানানের কায়দা, একই শব্দের বিভিন্ন অলিগলি। মুখস্থ বলতে গেলেই মন আর বুদ্ধি পথ হারায়। তখন আর রক্ষা নেই,—ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, তারপর মুসলধারে বর্ষণ।

ঘরের ভিতর থেকে হাঁক দিয়ে মামা বলেন, গুষ্টির মাথা শিখছে! বাপ-দাদা কত ইংরেজি শিখেছিল? গুয়োটা, প্রথম দুপাতা প'ড়ে রাখ্—আমি মন্মথ মাস্টারকে ব'লে তোকে ক্লাসে উঠিয়ে দেবো। সে আমার এক

কেলাসের ইয়ার।

দিদিমা এক পাশ থেকে ফোঁস করে উঠতেন, থাম, ভারি মুরোদ তোর! বলে, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তা'র মাইনে চোদ্দ সিকে! লেখাপড়া না শিখলে খেতে দেবে কে? তুই দিবি?

মুখখানা বিকৃত ক'রে মামা আগুন হয়ে বলেন, আমি না দিলে দিচ্ছে কে? মাতামহ গুষ্টির খেয়ে ওরা মানুষ হচ্ছে না?

দিদিমা দপ ক'রে জ্বলে ওঠেন, তোর পয়সায় মানুষ হচ্ছে?

আমার বাপ ফল্‌না ভট্‌চায্যির পয়সায়!

কি দিয়ে প্রমাণ করবি?

মামা লাফিয়ে উঠে চীৎকার করেন, প্রমাণ? প্রমাণ হাইকোর্ট, প্রমাণ তোমার ওই জাল-উইলের ধাপ্পাবাজি, ওই স্ত্রীধনে কেনা সম্পত্তির ফক্কিকারি!

দিদিমাও হাঁক দেন্—হাইকোর্টে যাবার খরচ নেই? কোন্ 'তেরোজন্নির' ঘর থেকে টাকা পাবি?

দিদিমার মুখ থেকে এই ইংরেজী শব্দটা শুনলেই মামা ক্ষেপে ওঠেন, এবং সেই ক্ষিপ্তোন্মত্ত অবস্থায় একটা সুবিধা হয় এই যে, ফার্স্ট বুকখানা বন্ধ ক'রে সকলের অলক্ষ্যে ছেলেটা গা ঢাকা দিতে পারে। মনে মনে মামার প্রতি শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ একদিন মামা ডাকেন, ওরে ওই গুয়োটা, এদিকে আয়।

ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে সে দাঁড়ায়। প্রহ্লাদ যেমন গিয়ে দাঁড়িয়েছিল হিরণ্যকশিপুর সামনে। মামার ভয়ানক মুখখানার ওপর যেন দুটো রক্তচোখ বসানো। করাল সেই চক্ষে একটু আদরের আভাস এনে মামা বলেন, লেখাপড়া শিখবি, না দোকান ক'রে খাবি? দোকানে কিন্তু কাঁচা পয়সা!

দোকানের ওপর ছেলেটার চিরদিনের শখ। মনের মধ্যে খুশী চেপে রেখে বলল, দোকান করতে টাকা লাগে যে?

টাকা লাগে!—মামা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, আমি জানিনে সে কথা? টাকার ভাবনা আমার, তুই শুধু দোকানে বসবি! বেনে মসলার দোকান। দু হাতে লুটবি! ওরে গুয়োটা, মুখের দিকে তাকাস কি? কাবলীঅলা থাকতে আবার টাকার ভাবনা? কত টাকা চাস?

ভয়ে ভয়ে ছেলেটা প্রশ্ন করল, ওরা দেবে?

মামা এক প্রকার হাসলেন। কথামালার খেঁকশিয়ালের একখানা ছবি মনে

প'ড়ে গেল। তারপর বললেন, এই যে দাড়ি রেখেছ মুখে, কেন বল্ দিকি, আবাগের বেটা? তবে শোন্। হাওড়ায় গাঁজা আফিংয়ের দোকান দেবো ব'লে তিনশো টাকা নিয়েছিলুম কাবলীঅলার কাছ থেকে। হাওড়ায় না গিয়ে সোজা গেলুম দার্জিলিংয়ে! দুবচ্ছর গায়েব! তারপর সেই কাবলী এসে একদিন আমাকেই জিজ্ঞেস করে, লোগিন বাবু কোথায়! বেটাকে সেদিন নিমতলার শ্মশান দেখিয়ে দিয়েছিলুম! এসব কাজ যদি পারিস তবেই আমার মতন লেখাপড়া শেখ্।

ক্ষণজন্মা মাতুলের এই আত্মগৌরবে ছেলেটার বুকের ছাতি যেন চওড়া হয়ে উঠত। জীবনের একটিমাত্র কামনা নিজের অন্তরেই সে উপলব্ধি করত, মাতুলের আদর্শেই যেন তা'র ভবিষ্যৎ গ'ড়ে ওঠে। টাকা ধার ক'রে দোকান দেওয়া ছাড়া সে আর কিছু ভাবতে পারত না।

যাই হোক, বাৎসরিক পরীক্ষার কালে রাত্রে মা ঘুমোতেন না। শেষরাত্রে উঠে কনকনে শীতের মধ্যে রেড়ির তেলের আলো জ্বালিয়ে ছেলেটা পড়তে বসত। ছেঁড়া লেপের একটা অংশ মা তার গায়ে তুলে দিতেন। পিদিমে তেল ফুরতো, আর মুখ তুলে উত্তর দিকের নিমগাছের ফাঁক দিয়ে সে দেখত, ভোর হয়েছে—কিন্তু কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কাক ডেকে উঠেছে সেই নতুন পৃথিবীতে। এই বুকচাপা অবরোধের থেকে বাইরে, এই অঙ্ক-ব্যাকরণ-জ্যামিতির থেকে অনেক দূরে—একটা স্নিগ্ধ শীতল মুক্তির ইশারা। হিমালয়ের হিমের হাওয়া যেন এসে লাগতো মুখে চোখে। পিদিমের শুকনো শল্‌তেটা নিভে আসতো ধীরে ধীরে। রাঙা রোদ এসে ছুঁতো নিমগাছের আগডালে। প্রভাতের পাখীরা যেন তাকে ডেকে যেত।

পরীক্ষার ফল বার হবার পর আবার সেই নতুন বইয়ের সমস্যা। সেই পুরনো বইয়ের দোকানে ঘুরে বেড়ানো, সেই ধনী আত্মীয়ের দরবারে আবেদন জানানো। আছে কি কোনো শিক্ষা বইয়ের বাইরে? এমন কোনো বিদ্যে, যা বইতে নেই? বন্ধুসমাজের মধ্যে বলাবলি হয়, কেউ যাবে বিলেত, কেউ আমেরিকা,—কেউ বা হবে ইঞ্জিনীয়র। কারো মামা পড়াবে ডাক্তারি, কারো বাবা ওকালতি। কারো কাকা অমুক সাহেবের বন্ধু, কারো দাদামশাই হাইকোর্টের এটর্নী। তুই কি করবি?

ঢোক গিলে খোকা বলত, আমি? আমার মামা মস্ত ব্যবসায়ী। আমি জাহাজ কিনে আদা চালান দেবো বিলেতে। নয়ত হনলুলুতে।

ছেঁড়া জামার দিকে তাকিয়ে ওদের ধনী প্রতিবেশীর ছেলে সুবোধ বলত,

তোর মামাকে ত চিনি। জাহাজ কেনার আগে একটা জামা কিনিস।

ছেলেটার অকিঞ্চন মুখখানার দিকে চেয়ে বন্ধুমহলে হাসাহাসি প'ড়ে যেত।

কেউ বা অপরকে প্রশ্ন করত, তুই পাস ক'রে বেরিয়ে কি করবি?

খ্রীস্টান বন্ধু যতীন জবাব দিত, আমি পালাবো।

কোথায়?

জাহাজের কুলি সেজে পালাবো দেশ ছেড়ে। যে দেশে খুশি!

সবাই সাগ্রহে শুনতো ওর কল্পনার দৌড়টা। যতীন বলতো, মুসলমান সেজে যাবো। আগে হবো কুলি, তারপর খালাসী। নতুন দেশে নেমে হবো ফেরার। হোটেলে চাকরি নেবো, নয়ত বেচবো খবরের কাগজ। কিছু না করতে পারি, হাত দেখে ভাগ্য ব'লে দেবো—কত খদ্দের জুটবে! এমনি ক'রে টাকা জমিয়ে যাবো কালিফর্ণিয়া।

তারপর?

তারপর সেখান থেকে প্যাসিফিক্ পেরিয়ে জাপান। জাপান থেকে সাইবেরিয়া। তারপর বেরিং পেরিয়ে আলাস্কা। প্যাসিফিক্ পেরিয়ে অস্ট্রেলিয়া!

তারপর কিন্তু সে আর জবাব দিত না। বন্ধুরা সবাই অনেকটা পরাজয় স্বীকার ক'রে যে যার পথে চ'লে যেত। হেদুয়ার উপর নেমে আসতো সন্ধ্যা। যতীনের ওই হাতখানা ধ'রে চলবার জন্য ছেলেটা মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠত।

গোলা পায়রারা বাসা বেঁধেছিল ওদিকের শূন্য মহলে। ছাদের নীচে কার্নিস—তারই তলায় তলায়। সন্ধ্যের পর ওদের চোখ কানা হয়, সেই সময়ে মই রেখে উঠতে পারলে ঠিক ধরে আনা যায়। অনেকদিন ধরে ছেলেটা এই মতলব এঁটেছিল মনে মনে। পায়রারা উড়ে যায় যখন আকাশ নীল থাকে, আর থাকে রোদ্দুর, আর থাকে সুন্দর মিষ্টি হাওয়া,—উধাও শূন্যে ওরা উড়ে যায়,—আর ডোমটার নীচে দাঁড়িয়ে কচিদের বাড়ীর থেকে নীচের ঠোঁট মুচড়িয়ে "সিটি" দেয়। ছোড়দি বলে, ওরা যে সুখের পায়রা—জানিসনে বুঝি? বিষ্টিবাদল দেখলেই ওরা কোটরে ঢুকে বক্‌বকম্ করে!

কথাটা সত্যি! কিন্তু সে জিজ্ঞেস করত, কেন রে?

প্রশ্ন শুনে মুখ বেঁকিয়ে ঠুক্‌রে যেতো ভাইবোনেরা—কেন কেন করিসনে,

হ্যাংলা কোথাকার! ওরা যে মটরের দানা গিলে খায়, তাই ওরা ডিম পাড়ে।

প্রশ্নের জবাব সে পেত না। জিজ্ঞাসা জমতো মনে মনে, উত্তর পায়নি কোনোদিন। শরৎকালে পুজো আসে কেন, পুজোর সময় বৃষ্টি থামে কেন, টিকটিকিরা দিনের বেলা ঘুমোয় কেন, আর বর কেন আসে বিয়ে করতে, আর কাবুলীওলার হাতে লাঠি থাকে কেন—এসব কথার জবাব ছিল না।

পায়রারা অন্ধকারে বক্‌বকম্ করে উঠছে ও-মহলের কার্নিসের নীচে। ওদের সুখের মধ্যেও স্বস্তি নেই, মায়ের বুকের পাশে শুয়েও ওদের তৃপ্তি নেই। চারিদিকে এত মানুষের এত কোলাহল, আর ওরা ভাবছে ওদের কেউ আদর করল না। আর সুখের পায়রাই যদি হবে তবে উড়ে যায় কেন অত দূর শূন্যে? কী আছে সেখানে? বাসা নেই, সীমা নেই, সান্ত্বনা নেই, সঙ্গ নেই,—আকাশের টানে ছুটে গেলে কোথা সুখ?

ভালোবাসা শব্দটা ওদের বাড়ীর ভিতরে কোথাও শোনা যেত না। ও কথাটা নাকি শুনতে ভালো নয়। ভালো যে নয় তার প্রমাণ ছিল ছেলেটার চারিদিকে। মামার চোখ ছিল রক্তরাঙ্গা, ইস্কুলে হেড মাস্টারের চোখ ছিল লাল, মামার কথায় দিদিমার চোখ হতো রাঙ্গা, পাশের বস্তির দীপু—নেশা করলেই তার চোখ দুটো হতো লাল, গোঁসাইকলু এসে দাঁড়াতো রাঙ্গা চোখে, আর ওই দীপুর বস্তিতে থাকতো ক্যাওরা বুড়ী আর হরার মা,—ওরা পাড়ার লোকের বিরুদ্ধে দিদিমার কাছে নালিশ জানাতো লাল চোখ নিয়ে। রক্ত ফেটে পড়তো ওদের চোখে।

ছোড়দি বলতো, ভালবাসার তুই কি বুঝিস? তোর না ন' বছর বয়েস? এঁচোড়ে পেকেছিস, না? ফুলশয্যের ঘরে যেতে তোর লজ্জা করে না? মেনিমুখো!

ফুলশয্যের ঘরের ভিতরটায় উজ্জ্বল আলো, বাইরেটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে সবাই ভিতর দিকে জানালার ফাঁক দিয়ে। বাড়ীর মেয়েরা ছাড়া জুটেছে পাড়ার মেয়েমহল। ওরা জানে ওরা কী দেখছে! ওদের চোখের পাতা পড়ছে না—কেননা যা দেখলে খুশী হয় তা দেখতে পাচ্ছে না কিছুতেই। শ্রাবণ মাসের বিয়ে। বৃষ্টির ছাট লাগছে, মশা কামড়াচ্ছে, ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ, ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসছে পা,—তবু ওদের দেখা চাই ভিতরে। বিধবারা যাবে না ওদিকে, কেননা অলক্ষণ! গিন্নীরা যাবে না ওখানে, কারণ ওটা ছেলেমানুষি। ছেলেরা যাবে না, কারণ অসভ্যতা। কর্তারা যাবে না, কেননা যেতে নেই ওখানে!

তবে ওখানে কী ?

তারুদিদি বলল, বুঝলিনে, ওদের যে প্রথম ভালবাসার দিন ! ছি, ওখানে গিয়ে উঁকি মারতে নেই। যা তুই ঘুমোগে যা।

বিছানায় গিয়ে সে ঢুকল একা একা। ঠাণ্ডা দরিদ্র বিছানা শুধু নয়, বিয়ে-বাড়ীর হট্টগোলে ওটার কোনো প্রাধান্য নেই। অনাদরে একধারে কুণ্ডলী পাকানো ছিল, তাতে লেগেছে বৃষ্টির ছাট। অন্ধকারে ওটাই আশ্রয়, ওটার মধ্যেই সমস্ত জিজ্ঞাসাগুলো ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে পাঁজরের কোণটা একটু গরম হয়ে ওঠে—তবু সুখের পায়রা মাঝরাত্তিরেও কেঁদে উঠে বক্‌বকম্ করে। সুখে ওদের স্বস্তি নেই, যেমন ছেলেটার চোখে ঘুম নেই। ভালোবাসা ! ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে জেগে ওঠে সারাদিনের সমস্ত ক্লান্তি ছাড়িয়ে। সেই যে সেই হানাবাড়ীর গল্পটা সে শুনেছিল ! সেখানে এক সাহেব পুষেছিল একটা বাঘের ছানা,—সেই ছানাটা তার ধারালো জিব দিয়ে একদিন রাত্তিরে সেই সাহেবটার পা চাটছিল। পায়ের ওপর রক্ত ফুটে উঠলো, আর সেই ছানাটা সেই রক্ত চাটতে চাটতে এক সময়ে লাল চোখে সাহেবের দিকে জ্বলজ্বল করে তাকালো। সাহেব বুঝতে পারলো, বাঘের বাচ্চাটা রক্তের স্বাদ পেয়েছে !

ভালোবাসা,—ওই শব্দটা সে সারারাত ধরে সেই বাঘের বাচ্চাটার মতন চাটতে লাগল। ওটার স্বাদ হয়ত সে ওই প্রথম জানল। বাড়ীর মধ্যে ওটা কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতো না বলেই ওটা যেন হঠাৎ নতুন খবর নিয়ে এলো। খবরটা মনে মনে সে চেপে রাখত—যেমন চেপে রাখতে হত পৃথিবীর সব জিজ্ঞাসাগুলো।

বাড়ী থেকে ইস্কুলের সমস্ত পথটাই প্রায় একা একা। বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু আশ্চর্য ওই জলদাঁড়ানো আঁকাবাঁকা গলিপথটা। শুধু-পায়ে কেবল যে জল ঠেলে সে যায় তাই নয়—কোঁচার খুঁটের নীচে বইখাতা সযত্নে নিয়ে দারিদ্র্য-টাকেও ঠেলে ঠেলে যায়। খাওয়া হয়নি কিছু সকাল থেকে। আশা আছে ভিজে কাপড়জামা দেখালে ছুটি পাওয়া যেতে পারে। পথটা নির্জন। নীচের দিকে থৈ থৈ জল আর উপর দিকে বিষণ্ণ মেঘ—বড় দরিদ্র পৃথিবী, বড় দরিদ্র জীবন। পাখীরা ওড়ে না—গির্জার বাগানে গাছের ডালে ওরা ভিজে ডানায় চুপ করে বসে থাকে, আর ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ে। আর ওই গাছের ছায়ার মধ্যে কেমন যেন কান্না জড়ানো, হেদুয়ার অথৈ জলেও যেন আকাশ জোড়া বিষাদের ছায়া নেমেছে। ইস্কুল যাবার পথে একা একা তার কান্না পেয়ে

যেত। সামনে কেউ নেই, পিছনে কেউ নেই—শ্রাবণের এই শোকাচ্ছন্ন দিনে কেউ কোথাও নেই তার!

পুরনো কলকাতার পথঘাট ভাঙছে এবং তার সঙ্গে আগেকার অনেকের মৃত্যুর খবর শোনা যাচ্ছে। অবিনাশ কবিরাজ গেলেন, আর গেলেন বুঝি গঙ্গাপ্রসাদ সেন। যাই-যাই করছেন হাতিবাগানের হারাণ কবিরাজ। উনি ছিলেন বাতব্যাধিগ্রস্ত এবং এক-এক পা ক'রে হেঁটে যাবার সময় একটি চাকর ওঁর মাথায় ছাতা ধ'রে চলত। এখন শুধু পাড়ায় রইলেন ডাক্তার স্যার কৈলাস বসু। মারোয়াড়ি মহলে ওঁর প্রচুর খ্যাতি। উনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। দিদিমাকে বলতেন, সেজখুড়ি। মাকে নাম ধ'রে ডাকতেন। ওঁর বাড়ির দরজার ভিতরে ঢুকে হাঁ হাতি ঘুরলেই দুর্গাদালান। তখন বারোয়ারি পুজো কেউ ভাবত না। কৈলাস বসুর বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। তারপর হরমোহন চাটুয্যের বাড়ির ঠাকুর। তখন প্রতিমার চালচিত্র থাকত পটভূমিতে। পৌরাণিক ব্যাখ্যা ও ব্যঞ্জনা অনুযায়ী প্রতিমা গড়া হত। সব প্রতিমাকেই 'ডাকের সাজ' দিয়ে সাজানো হত। কৈলাস বসুর প্রতিমা যেন শত সহস্র বৈদূর্যমণিতে ঝলমল করত।

এই সময়ে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ বেধে উঠল। আগস্ট ১৯১৪।

সামনে নন্দ চৌধুরীর গলিপথে অক্সফোর্ড মিশনে, লালার দোকানে, শেতলদের বস্তিতে, শুঁড়িপাড়ায়, সুরেদের বাড়ির রোয়াকে, মিমিদের ডাফ চার্চে—সব জায়গায় যুদ্ধের খবর ছড়িয়েছে। মামার বাড়ির সবাই বিমর্ষ। সর্বনাশ হবে, এই কলকাতা ছারখার হয়ে যাবে—যদি ইংরেজ হেরে যায়। কোম্পানির রাজত্ব শেষ হয়ে গেলে বাচ্চা-কাচ্চারা দাঁড়াবে কোথায়? চারদিকে তখন 'অরাজক' দেখা দেবে, ভাত জুটবে না কারও। সদাগরি আপিসে চাকরি দেবে কে? হাইকোর্ট-আদালত সব বন্ধ হবে।

পাড়ায়-পাড়ায় নাম সংকীর্তনের দল বেরোলো। নবগ্রহযজ্ঞ ব'সে গেল জোড়াসাঁকো আর পাথুরেঘাটায়। রাজারাজড়ারা চাঁদার খাতা খুললেন। সমাজপতিরা মিটিং করতে লাগলেন। বড়বাজারে নাকি মারোয়াড়ি মহলে যাগ-যজ্ঞ, বিশ মণ ঘি পুড়বে।

সেটা বোধ হয় শ্রাবণের শেষ ভাদ্রের আরম্ভ। এবার শ্রীদুর্গা আসছেন অশ্বারোহণে—তারপরে দেবীর দোলায় গমন। ফলং মড়কং ভবেৎ। সবাই মরবে।

সকাল-সকাল বাড়ি ফিরছে সব। নরেনদা ঢুকেছে ইলেকট্রিক আপিসে, বড়দা নতুন চাকরিতে। একজনের মাইনে চোদ্দ টাকা, আরেকজনের কুড়ি। দুজনেরই বিয়ে হয়েছে। ঘরে দুটি বউ এসেছে। ঘটকালি করেছে লক্ষ্মী ঘটকী। পিশাচীর মতন কালো চেহারা তার, যক্ষীবুড়ির মতন একরাশি শাদা চুল। কালো হাতে দু'গাছা সোনার বালা।

ওই ছেলেটা একদিন প্রশ্ন ক'রে বসল, বালা পরো কেন?

শোনো কথা, মা। কী স্থায়না ছেলে! হাতে সোনার বালা না থাকলে গেরস্থ ঘরে ঢুকতে দেবে কেন?

লক্ষ্মী ঘটকীর কথায় তার প্রশ্নের সঠিক জবাব পাওয়া গেল না। কিন্তু ওই ধরনের কিছু একটা হবে। নাবালক চুপ ক'রে গেল।

নতুন দৈনিক 'বসুমতী' বেরিয়েছিল। মামাকে খবরগুলো কেউ হয়ত পড়ে শুনিয়ে থাকবে। তিনি ভরসন্ধ্যেবেলায় তামাক কিনে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ী ফিরলেন, তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলেন। দিদিমা বসে ছিলেন মাঝপথে। মামা বললেন, বলি খবর কিছু শুনেছ?

দিদিমা মুখ তুললেন।

চারদিকে ধরপাকড় চলছে—পাড়ায় পাড়ায় কান্নার রোল—

দিদিমা বললেন, কেন?

কেন!—মামা চেঁচিয়ে উঠলেন, ওই জন্যেই বলে বারো হাত কাপড়েও মেয়েমানুষের কাছা নেই। এখন জেলে পুরছে, কদিনের মধ্যে নিয়ে যাবে হাওড়ার ফাঁসীতলার মাঠে। বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। যেখানে যত গেরস্থ ঘর—সবাইকে পিঠমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। কানাই মিস্তিরি সব আমার কাছে ফাঁস ক'রে দিল।

দিদিমা সব শুনলেন। পরে বললেন, তোকেই ত তাহলে আগে বাঁধবে। ধর্মের ষাঁড় বলে তোকে রেহাই দেবে?

আমাকে?—মামা বললেন, আমাকে নিয়ে গেলে তোমার গুষ্টির পাহারায় কে থাকবে?

দিদিমা খোঁটা শুনলে চটে যান। বললেন, তুই পাহারা দিচ্ছিস? কে তুই? আধ পয়সার মুরোদ নেই তোর। টিকে ধরাতে তোর না জামিন লাগে? বলে, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে—!

মামা চেঁচিয়ে উঠলেন—ইজ্জতে ঘা দিয়ো না বলে দিচ্ছি। বেশ, তাহলে আমার আর দোষ নেই। পুলিসের বড় সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হবে

কাল। ছানাপোনা গাই-বাছুর যে ক'টা আছে এ বাড়িতে, সব কটাকে নিয়ে গিয়ে তুলবে এক খোঁয়াড়ে। এ যুদ্ধে কেউ বাঁচবে না।

মামা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সেখান থেকেই বলে উঠলেন, এরপর আর ফাঁসী নয়, স্রেফ হাঁড়িকাঠ! শুনে এলুম ভজার দোকানে। 'স্বদেশী' ব্যাটাদের এক দড়িতে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে কালীঘাটে।

ছোট ছেলেটা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে সব শুনছিল। মনে মনে সে গুনছে এ বাড়িতে ক'জন আছে সবসুদ্ধ। যদি সব্বাইকে ধরে নিয়ে যায় কে থাকবে এ বাড়িতে? নন্টুদের তাড়িয়ে দিয়েছে এ বাড়ি থেকে। ওরা বেঁচে গেল।

রাত্রে রেড়ির তেলের আলোটা দেখতে দেখতে নিবে গেল। সারাদিন বৃষ্টির পর অনেক রাত্রে একটু থেমেছে। ব্যাং আর ঝিঁঝিঁ ডাকছে। ছেলেটার চোখের সামনে অগণিত প্রশ্ন যেন অন্ধকারে চামচিকের মতো আনাগোনা করছিল।

মা?

জননী জবাব দিলেন, কি বল?

মামাকে কি সকলের আগে নিয়ে যাবে?

না, মামাকে নেবে সব শেষে।

ছেলেটা ভীতচক্ষে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। পরে এক সময় আবার ডাকল, মা—?

আঃ, ঘুমো বলছি?

হাঁড়িকাঠ কি মা?

মা বললেন, যেখানে ছাগলের মুণ্ডু ঢুকিয়ে কচ ক'রে কাটে। তার ধড়টা ছটফট ক'রে থেমে যায়। মুণ্ডুটা আলাদা। তখন একেবারে রক্তগঙ্গা।

ছেলেটা চুপ করে ছবিটা কল্পনা করতে লাগল।

বেলতলার ছাদের আল্‌সের উপর ছিল মামার দরুণ টিনের কানেস্তারায় একটি শিশু ডালিম গাছ, তা'র ডালে ডালে ধরেছে লাল রংয়ের ফুল—আর ফুলের নীচে ছোট ছোট ফলের গুটি। ফল কোনদিন বড় হয় না—ফুলের সঙ্গেই প্রায় কোন একদিন অলক্ষ্যে ঝ'রে পড়ে। টিনের কানেস্তারায় মাটি যেটুকু ধরে; এবং ওইটুকু মাটির রসে ওই গাছটির যতটুকু বাড়-বাড়ন্ত হওয়া সম্ভব,—কিন্তু ওর বেশী গাছও এগোয় না, ফলেও পাক ধরে না। বেলতলার ছাদের ঠিক মাঝখানে,—বেলগাছের একটা ডাল যেখানে ঝুঁকে পড়েছে—সেই পাঁচিলের একটি পিল্‌পের ওপর বসানো রয়েছে ওই ডালিম গাছের কানেস্তারা।

ওটা দূরের থেকে দেখতে পারো, কিন্তু কাছে যাবার হুকুম নেই। কোথা থেকে যমদূতের মতন মামা আসবেন তেড়ে। দূরের থেকে গাছটার দিকে যদি কেউ তাকিয়ে থাকে, মামা আসবেন হুমকিয়ে,—কাছে গিয়েছিলি কেন? কাছাকাছি কেউ যদি যায় তবে দাঁত খিঁচিয়ে তিনি বলবেন, তোর বাবার গাছ? গাছে যে হাত দিলি? আর যদি ডালিম গাছের গোনাগুনতি ফুলের থেকে একটি কখনো অদৃশ্য হয়, তাহ'লেই সর্বনাশ! বাড়ীতে লাগলো আগুন, পাড়াময় হৈ চৈ, মাথার উপরে কাক-চিল ওড়ে, বাড়ীসুদ্ধ মেয়ে-পুরুষের হৃৎকম্প, সৃষ্টি যায় রসাতলে,—ত্রাহি মধুসূদন!

সুতরাং অশান্তির থেকে বাঁচবার জন্য সবাই মিলে ওই ডালিম গাছটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছিল। ওই গাছের ডালে মধ্যে মাঝে চড়াই পাখী এসে বসে, কাক-কোকিল এসে গুটিফল ঠুকরে যায়, ভিজে কাপড় শুকোতে গিয়ে হয়ত কোনো ডালে আঘাত লাগে,—আর সবাই ঠকঠক ক'রে কাঁপতে থাকে। মামা বুঝি এইবার তাঁর ছুরিতে শান দেবেন।

ইহলোকে মামার দ্বিতীয় আকর্ষণ হোলো, একটি ধূসর বর্ণের বিড়াল। যতক্ষণ মামা বাড়ীতে থাকেন ততক্ষণ সেই জন্তুটি তাঁর আশেপাশে ঘোরে। চোখ দুটো তা'র কটা আর শান্ত। মামা বাড়ীতে আছেন, আর বিড়ালটাকে তুমি লোভ দেখাও,—সে ফিরে তাকাবে না। মাছের কাঁটা দেখাও, দুধের বাটি দাও, থালার উচ্ছিষ্ট বাড়াও,—গ্রাহ্যও করবে না। হয়ত একবার ফিরে তাকাবে,—কিন্তু তার তপস্বীর মতো দুই চোখ। সেই চোখ জরা, হিংসা, লোভ, মোহ—সমস্তর অতীত। বুঝতে পারা যায়, মনিব ছাড়া আর কোনো ব্যক্তির মায়ামমতায় তার বিশ্বাস নেই। বিড়ালটার নাম হলো পুষি!

আয় পুষি, আয়।—মামার ডাকে পুষি কোথা থেকে ছুটে এলো পায়ের কাছে। মামা তাঁর কোঁচার খুট দিয়ে পুষির মুখখানা মুছিয়ে দিয়ে বললেন, নাকে দাগ কেন রে? ওই গুয়োটারা কেউ তোকে বুঝি মেরেছে?—যা, এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়!

বিড়ালটা মামার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন করুণ কণ্ঠে ডাকে। উভয়ের চারিটি চোখ, চারটিই কপিশবর্ণ। মামা বলেন, পারবিনে, কেমন? তবে যা, মাগিকে ডেকে দে'। বলি কোথায়?

মামীকে তিনি 'কোথায়' ব'লে ডাকেন। 'কোথায়' শব্দটা শোনামাত্র পুষি যায় ঘর থেকে বেরিয়ে। কিন্তু দিদিমার এ তল্লাটে আসে না, কেননা জন্তুটা হলো অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক। জানলা পেরিয়ে সে নামে বারান্দায়,

সেখান থেকে খোলার বস্তির চালে, সেখান থেকে আঁস্তাকুড়ের ধারে,—আবার সেখান থেকে লাফিয়ে ওঠে মামীর রান্নাঘরের জানলার গরাদে। সেখান থেকেই ডাকে,—ম্যা···ও।

মরণ আর কি! দেবো অমনি খুন্তির বাড়ি তু'খানা ক'রে!—মামী তখনি খুন্তি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ান্। কিন্তু পুষি জানে, খুঁটিটা তা'র শক্ত। সুতরাং মামীর শাসনে সে কেবল চোখ বুজে থাকে। যেন মামীর কণ্ঠসঙ্গীতে সে একেবারে মুগ্ধ।

কোথায়?—উপর থেকে হাঁক আসে।

মামী ছুটে বেরিয়ে চ'লে যান। ততক্ষণে উপরতলা থেকে পুনরায় ডাক আসে, তামাক দিয়ে যাও।

তাড়াতাড়ি তামাক ধরিয়ে কল্‌কেটা হাতে নিয়ে মামী যখন ঘরে গিয়ে দাঁড়ান্—মামা ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, পুষির নাকে দাগ কেন?

মামী বিরক্তকণ্ঠে বলেন, ওকেই জিজ্ঞেস করো না?

হ্যাঁ করবো, তার আগে বাড়ীসুদ্ধ নির্ব্বংশ করবো! দাঁড়াও, ছুরিখানা আগে শানিয়ে নিই।

এমন সময় বিড়ালটা আসে জান্‌লা টপকিয়ে। মামা তাকে কাছে নিয়ে বলেন, কে মেরেছে তোকে?

ম্যাও।

আচ্ছা, বুঝলুম। কি করেছিলি তুই?

ম্যা······ও!

কিচ্ছু করিসনি, তবু মারলো? কে কে মেরেছিল?

মামা রাগে ফুলছিলেন, আর পুষি তাঁর কোলে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে চোখ বুজে ঘরঘর ক'রে নাক ডাকছিল! মামী বললেন, লোকে মারবে না কেন? একটা পোষা পায়রাকে খুন ক'রে এলো, তিনটে চড়াই পাখী খেলে সারাদিনে! ওদের ঘরে দুধের বাটি রাখার জো নেই, রান্নাঘরে একখানি মাছ খুঁজে পায় না ওরা—মার খাবে না?

থাম্!—মামা ধমক দিলেন,—তোর মতন ছিঁচকে চোর? পোষা বেড়াল চুরি ক'রে খায়? মায়ের কথা মাসিকে শেখাচ্ছিস? ওর কি জন্মের দোষ আছে?

ম্যাও!—কোলের ভিতর থেকে বিড়ালটা মামার অভিমতকে সমর্থন ক'রে উঠলো।

মুখে আগুন কথার!—ব'লে মামী সেখান থেকে চলে গেলেন হনহনিয়ে। মামা তামাক টানতে টানতে এক সময় চেঁচিয়ে বললেন, পাঁচ জনকে যদি খুন করি, তবে একেবারের বেশী ফাঁসী হয় না। একথা হাইকোর্টের জজও জানে!

হঠাৎ এধার থেকে দিদিমা হাঁক দিয়ে ওঠেন, তুই কা'কে খুন করার ভয় দেখাস র‍্যা?

মামা অধিকতরো উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করেন, তোমার গুষ্টিকে।

আমার গুষ্টি তুই ন'স? নিজের গলা কাট্ তুই আগে! নৈলে এখনই তোকে গো-টু-হেল্ করবো!

তামাক ফেলে মামা এগিয়ে আসেন। বলেন, ভোঁতা ছুরি দিয়ে আগে সবাইকে কাটবো কুচিয়ে, তারপর ফাঁসী যাবো!

ওঃ, লম্বা লম্বা কথা!—দিদিমা হেঁকে ওঠেন, আণ্টনী সাহেবের দপদপা দেশে থানা-পুলিস নেই, উকীল-মোক্তার নেই—?

আছে, সাক্ষীও আছে! একজোড়া ক'রে চটিজুতো কিনে দিলে দশজন সাক্ষী পাবো! বলবো, হুজুর ধর্মাবতার—আমার বাপের নাম ফল্না ভট্চাযি! ধুঁতরো বিচি খাইয়ে এই মাগি তাকে পাগল ক'রে জাল-উইলে সই করিয়ে নেয়। হুজুর, এ মাগি আমার কেউ নয়!

দিদিমা চীৎকার করলেন, মুখ সামলে কথা ক'স! এ আমার স্ত্রীধনে কেনা সম্পত্তি,—এক কড়া দাবি-দাওয়া নেই তোর! যদি বেশী কিছু করিস তবে তোকে প্রথের 'বেগার' ক'রে ছাড়বো!

হাইকোর্ট, হাইকোর্ট,—মামা বিদীর্ণ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, হাইকোর্টে সব নিয়ে ফেলবো! এক দড়িতে বেঁধে নিয়ে যাবে সব! ঘুঘুর ফাঁদ দেখাবো! ওই তোমার এটর্নী যারা সই করেছে জাল উইলের সাক্ষী হয়ে—ওদের বাপের নাম ভোলাবো।

যা, যা তুই—যা খুশি করগে! তোর ভারি খ্যামোতা! মরগে যা—

যাবো, তা'র আগে তোর গুষ্টিকে হাঁসপাতালসই ক'রে যাবো! বলে, যার ধন তা'র ধন নয়, নেপোয় মারে দই!

মামা ঘরে গিয়ে ঢোকেন, দিদিমা যান আহ্নিকের ঘরে।

ডালিম গাছ, বিড়াল, জাল-উইল আর হাইকোর্ট,—এ ছাড়া মামার প্রাত্যহিক জীবনে আর একটা বিতর্ক ছিল। সে হলো মামীর চরিত্র রক্ষার জন্য সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা!

কোথায় ?—উচ্চকণ্ঠে মামা হাক্ দেন্।

মামীর কোনো সাড়া নেই। মামা তৎক্ষণাৎ গড়গড়ার লম্বা চিম্‌টেটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। আবার হেঁকে ওঠেন, খুন করবো! বলি, কোথায় ?

পড়ি ত মরি ক'রে মামী ভিজে কাপড়ে ছুটতে ছুটতে আসেন। মুখ বিকৃত ক'রে মামা বলেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

চুলোয়! দেখতে পাচ্ছ না কাপড় কাচতে গিয়েছিলুম ? চোখের মাথা খেয়েছ ?

হুঁ, কাপড় কাচতে! কলতলার ঘুলঘুলি দিয়ে ভাড়াটে বাড়ীর দিকে তাকিয়ে ছিলিনে ? ও-বাড়ীতে কে আছে তোর ?

মামী হাত নাড়া দিয়ে বলেন, যম আছে!

যম নয়! সে তোর—

মামা একটি প্রাদেশিক শব্দ প্রয়োগ করেন—যেটি বাড়ীর পাশের খোলার বস্তিতে প্রচলিত। পুনরায় বললেন, জানি, সব জানি—হাতেনাতে যেদিন ধরবো, সেদিন একেবারে কচুকাটা! ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে কোথায় যাস, বল্ দেখি তামাকের আগুন ছুঁয়ে ?

আ মর,—মামী মুখখানা ঝট্‌কা দিয়ে সরিয়ে নেন। বলেন, বুড়ো হয়ে মরতে চললো, কথা দেখো! নিত্যি অপমান, নিত্যি নিত্যি সন্দ'! বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর! দুবছর হতে চললো একখানা কাপড় দেয় না, এক পয়সার সাবান কিনে কাপড় কাচাবার মুরোদ নেই!

মামা আবার চীৎকার করেন, পকেট মেরে পয়সা নিসনে ? কা'র হাত দিয়ে পয়সা পাচার করিস ? দুপুর বেলা কোথায় গিয়ে দেখা হয় তোদের ? আমি কি জানিনে কিছু ?

মামী কাপড় ছাড়তে ছাড়তে একেবারে জ্বলে ওঠেন,—মুখ প'চে যাবে, ধোয়া ছাতারে ধুয়ে যাবে! দশ বছরের মেয়ে এসেছি তোমাদের ঘরে, ভদ্দর নোকের ঘর দেখে বাপে বে' দিয়েছিল,—তারপর থেকে নিত্যি কেলেঙ্কার!

তামাক টানতে টানতে মামা বলেন, দোষ ক'রে ফের গজর গজর কচ্ছিস ?

কিসের দোষ আমার ? বলো, আজ বলতে হবে—নৈলে এখানে স্ত্রীহত্যে হবো! আজ এসপার-ওসপার হোক।

এঃ এসপার-ওসপার!—মামা মুখ খিঁচিয়ে বলেন, সতীপনা বাজিয়ে বেড়াস সবার সামনে! আমি জানিনে ইঁদুর-বেড়ালের লুকোচুরি খেলা ? চুল এলিয়ে ছাদে কাপড় শুকোতে যাস,—রাস্তা থেকে দেখিনে ?

মুখে আগুন তোমার।—মামী তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যান্।

অন্ধকারে মামীকে ব'সে থাকতে দেখলে মামা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। আর যদি দেখা যায় মামী আপন মনে কাঁথা সেলাই করছেন—তবে ত সোনায় সোহাগা। অমনি মামা বলতে থাকেন, হুঁ। মতলব আঁটা হচ্ছে মনে মনে, কেমন? নীচের তলায় একা গিয়েছিলি কি করতে? আজ বুঝি দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি?

দেখা-সাক্ষাৎ—! মামী অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকান্। বলেন, কার সঙ্গে?

মামা আগুন হয়ে বলেন, কা'র সঙ্গে! আমার মুখ দিয়ে না শুনলে বুঝি মিষ্টি লাগে না? ঘরের দেয়ালের কান আছে তা জানিস? সেদিন কলতলায় কা'র পায়ের দাগ পড়েছিল? মাঝ রাত্তিরে জানলায় টোকা দিয়েছিল কে? আমার মাথার পাশের জানলা আধখানা ভেজানো ছিল কেন?

মামী হতাশ হয়ে বলেন, নাঃ এ একেবারে ভিমরতি! আজ একটা কেলেঙ্কার বাধিয়ে তবে ছাড়বে!

মামা তাঁর কপিশ চোখ দুটো ঘুরিয়ে বলেন, বলবো তবে? হাটে হাঁড়ি ভাঙবো দেখবি? সেদিন ভোরবেলা চান্ ক'রে এলি কেন? মনে করেছিস বুঝি আফিঙ খাই তাই ভোরবেলা ঝিমোই?

মামী আর রাগ সামলাতে পারেন না। ব'লে ওঠেন, ভোরবেলা গিয়ে চান্ করতে হয় কেন জানো না? কচি খোকা? বুড়ো হয়ে মরতে চললুম, এখন ধম্ম তুলে খোঁটা দাও?

দেবো না? তোর আবার ধম্ম কি? আমার পঞ্চান্ন, আর তোর পঞ্চাশ—এই ত তোর খারাপ হবার সময়! তুই নাতি কোলে করলেও তাকে বিশ্বাস করবো না তা জানিস? 'মরবে নারী উড়বে ছাই, তবেই নারীর গুণ গাই!'

মামী ব'সে ব'সে মেঝের উপর আঙুল দিয়ে দাগ টেনে বললেন, আমিও ব'লে রাখলুম একবার যদি কেষ্টনগরে যেতে পারি, তবে আর কোনো জন্মে পা দেবো না এই ভট্টচাযি্য বাগানে! সৎমা আমার আজও বেঁচে আছে, আজও ভাই আছে দেশে!

মামা চেঁচিয়ে বলেন, বল্ কবে যাবি তুই, সেদিন গোবর জল ছড়া দেবো।

মামী বলেন, যাবার সময় হলেই যাবো? কা'রো তক্কা রাখবো না। পায়ের দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়বো।

চল্লিশ বছর আগে মামী শ্বশুরবাড়ী এসেছিলেন বিয়ের কনে। তারপর থেকে বাপের বাড়ী আর তাঁর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

হঠাৎ সন্ধ্যার পর মামা একদিন ফিরে এসে ডাকেন, কোথায় ?

মামী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তামাক সেজে দেবার আয়োজন করতে থাকেন। মামা বলেন, কোথা ছিল গা ঢাকা দিয়ে ?

টিকে ধরিয়ে পাখার বাতাস দিয়ে মামী বলেন, বেলতলার ছাদে।

বেলতলার ছাদে ? দখ্‌নে হাওয়া গায়ে লাগানো হচ্ছিল বুঝি ? কা'র জন্যে পথ চেয়ে ছিলি ?

মামী বলেন, আ মর, কথার ছিরি দেখো ! একাদশীর দিনে একটু মহাভারত শুনছিলুম, তা'তেও সন্দ' !

মামা ঘাড় বেঁকিয়ে বলেন, হুঁ, মহাভারত শোনা হচ্ছিল, না দ্রৌপদীর সতীপনায় মজা পাচ্ছিলি ? তুই ঘুরিস ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়, তা জানিস ? ঘরে এত পুরুষ্টু গন্ধ কেন ? কে এসেছিল ঘরে ?

মামী দপ ক'রে জলে ওঠেন। বলেন, মুখখানা আস্তাকুড়েতে গিয়ে ঘ'ষে এসো,—যদি পরিষ্কার হয় ! বলে, দরবারে মুখ না পায়, ঘরে এসে মাগ ঠ্যাঙ্গায় ! গাঁজায় দম দিয়ে এলে বুঝি ?

কল্‌কেটা ফুঁ দিয়ে ধরিয়ে মামী গড়গড়ার মাথার উপর বসিয়ে দেন্। মামা এবার একটু গুছিয়ে ব'সে তামাক টানেন। দেখতে দেখতে পুষি বিড়ালটা এসে তাঁর কাছ ঘেঁষে বসে।

মামা এক সময় বলেন, ঘরে কেউ আসেনি বলতে চাস ? তাহলে ওই গেলাসটা চিৎ করা কেন ? কে জল খেয়েছিল ? ঘরে মাদুর পাতলে কে ? দেশালাইয়ের কাঠি প'ড়ে রয়েছে কেন ? বল্ দেখি পুষির মাথায় হাত দিয়ে তোর ক্যারেক্‌টার ঠিক আছে কি না ?

মামী ঘৃণায় পিছন ফিরে ব'সে থাকেন, কোনো কথার জবাব দেন না। স্বামীর দিকে মুখ তুলে কথা কইতে তাঁকে কখনই দেখা যায়নি ; এঁর মুখ উত্তরে ওঁর মুখ দক্ষিণে। এক সময় মামী উঠে আবার বেলতলার ছাদের দিকে চ'লে যান্। মামা মুখ ফিরিয়ে বলেন, হুঁ, আর দেরি নেই ! থলের মধ্যে পুরে মুখ বেঁধে বেড়াল-বিদেয় করবো। রাত্তিরে ঘরে ঢুকলে হয়,—সতীপনা ঘোচাবো।

ম্যা…ও !—বিড়ালটা হঠাৎ একবার ডেকে ওঠে।

পুষির দিকে তাকিয়ে মামা বলেন, কি বললি ?

পুষি আর কোনো জবাব দেয় না। মামার মন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। তিনি

তৎক্ষণাৎ ডাকেন, কোথায় ?

কণ্ঠস্বরের কঠোরতায় বাড়ীশুদ্ধ লোক চমকে ওঠে। সুতরাং মামী হন্তদন্ত হয়ে আবার এসে দাঁড়ান। বলেন, আবার কোন্ ছাদ্দের জন্যে ডাক পড়লো ?

কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে মামা বলেন, ডালিমগাছের ফুল তিনটে আছে কিনা দেখে আয়।

তিনটে আবার কোথায় ? দুটো ফুল দেখলুম ত বিকেলে !

দুটো ! বেরোবার সময় তিন-তিনটে দেখে গেলুম, আর তুই বলিস দুটো ? চোখে ধুঁতরো ফুল ফোটাবো ! শিগগির দেখে আয়।—আচ্ছা চল্, আমিই যাচ্ছি—আলো ধর—

কেরোসিনের ডিবেটা হাতে নিয়ে মামী চললেন আগে আগে বেলতলার ছাদে। মহাভারতের আসর তখন ভেঙ্গে গেছে। একাদশীর বিধবারা এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে সারাদিন ধ'রে শুকিয়ে। আলোটা উঁচুতে ধ'রে দেখা গেল, একটামাত্র ফুল আছে ডালিমগাছে, আর নীচের দিকে প'ড়ে আছে দুটো। মামা বললেন, কে ফেলেছে ফুল ছিঁড়ে ? কা'র বাবার গাছ ?

আসন্ন ঝড়ের আভাস পেয়ে এদিকে দিদিমা উঠে বসলেন। সারাদিনের নির্জলা উপবাস সত্ত্বেও তিনি প্রস্তুত। বাচ্চারা সবাই যে-যার গর্তে গিয়ে ঢুকে মুখ বাড়িয়ে রইল। সকলের বুকের মধ্যে দুরু দুরু কাঁপন। আগুনের ফিন্‌কি কখন্ আসে ছুটে ! অগ্নিকাণ্ডের আর দেরি নেই।

কিন্তু সন্ধ্যার পরে মামার চোখ দুটো থাকে মাদকের রসে নিমীলিত। চেঁচামেচিতে হয়ত বা মৌজটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুতরাং তিনি এবার দাঁত কিটিয়ে বললেন, আচ্ছা, আজ যেমন আছে থাক্। কাল সকালে উঠে পাখীর বাসা ভাঙ্গবো !

তিনি তাঁর ডালিমগাছের দুরবস্থার চিন্তা আজকের মতন স্থগিত রেখে সেখান থেকে স'রে আসেন। কিন্তু ওই কেরোসিনের ডিবের আলোয় মুখ ফিরিয়ে দেখতে পান, দিদিমা ব'সে আছেন শুদ্ধ আগ্নেয়গিরির মতন। তাঁকে দেখেই মামার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। কাছে দাঁড়িয়ে বলেন, এই হল তোমার গুষ্টির বদমায়েসী। কাল সকালে একেবারে ঢাকি সুদ্ধ বিসর্জন দেবো !

দিদিমা প্রশ্ন করেন, তুই দেবার কে ?

মামা বলেন, ফলনা ভট্চার্যির বাড়ী—আমি তা'র ওয়ারিশ—

বটে ! আর আমি যদি গোঁসাই কলুকে ডেকে কাল তোকে গলাধাক্কা দিয়ে বা'র ক'রে দিই ?

বেশ, দিয়ো। কিন্তু যাবার আগে তোমার গুষ্টিকে সাবাড় ক'রে তবে বাড়ী থেকে বেরোবো। লাঠিতে তেল মাখানো আছে, ছুরিতেও শান দিয়ে রেখেছি!

মামী কোনোমতে মামাকে টেনে-টুনে ঘরের দিকে নিয়ে চ'লে যান। দিদিমা সেইখানে ব'সে রুদ্ধ আক্রোশে ঠকঠক ক'রে কাঁপতে থাকেন। আজ রাত্রের মতো ঝড়ের আশঙ্কাটা কমলো, কিন্তু মেঘের ঘনঘটা রয়ে গেল। কাল সকালে কি-হয় কি-হয়।

সেদিন রাত্রে কে যেন জানলার ধারে ওৎ পেতে শুনে এলো, মামী ফিস ফিস ক'রে অনেক কথা মামাকে শুনিয়ে চলেছেন।

হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় মামী চীৎকার ক'রে উঠলেন,—দেখো, দেখো তোমরা, সবাই মিলে দেখো,—আমাকে মেরে ফেললে, রক্তগঙ্গা করলে। দেখো তোমরা সবাই।

বাড়ীময় হুলুস্থূল প'ড়ে গেল। যেখানে যে ছিল, চারিদিক থেকে ছুটে এলো। মামী হাউমাউ ক'রে কাঁদছেন,—বিনাদোষে মারলো! সকালবেলা বাসি মুখে উঠে কাজ করতে নেমেছি, মুখে একটি রা কাড়িনি! খুন করলে আমাকে, রক্তগঙ্গা করলে! তোমরা পুলিস ডাকো, থানায় খবর দাও,—ডাকাতকে ধ'রে গারদে নিয়ে যাক্। ওগো আমার মা গো, ওগো কে কোথায় আছো গো! ওগো আমাকে একেবারে মেরে ফেলেছে গো—

ব্যাপারটা জানাজানি হ'তে আর বাকি রইলো না। মামার নাকি হুকুম ছিল ভোরবেলা তাঁকে না জানিয়ে মামী যেন শয্যাত্যাগ না করেন। তবুও মামীর অবাধ্যতার জন্য মামা নিজের পৈতার গোছায় মামীর আঁচলের খুঁট বেঁধে রাখেন। কিন্তু মামার মাদকজনিত নিদ্রা ভাঙতে একটু দেরী থাকার দরুণ মামী অতি সন্তর্পণে আঁচলের গেরোটি খুলে বাইরে চ'লে যান্। কতক্ষণ পরে ছাঁৎ ক'রে মামার ঘুম ভেঙ্গে যায়, এবং পাশে শূন্য শয্যা দেখে তিনি চিমটেটা হাতে নিয়ে ধাওয়া করেন।

কী কান্না মামীর! ডুকরে-ডুকরে কান্না, চল্লিশ বছর ধ'রে জীবনের ব্যর্থতার কান্না!—ওগো তোমরা এর হেস্তনেস্ত করো, নৈলে আমি নিজে থানায় যাবো। পুলিস ডাকো, বাড়ী ঘেরাও করো, খানাতল্লাসী হোক, আসামীকে বাঁধুক…

মাসিমারা এলেন, দীপু এলো ছুটে, ভাড়াটে বাড়ীর রাঙ্গাবৌ এলো, মিত্তির-দের বরদা ঝি এলো, কার্তিক স্যাকরা আর বেহারী-বুড়োর ছেলেরা, এলো ললিতবাবুর বউ। বাড়ীতে হাঁড়িচড়া বন্ধ। দিদিমা এলেন, মা এলেন, এলো

সবাই। বাড়ীর বাইরে লোক দাঁড়িয়ে গেল। পাড়ায় পাড়ায় খবর রটারটি।

লোহার চিম্‌টে দিয়ে মামীর মাথার ওপর এক ঘা মেরেছেন মামা। সেজ-মাসিমা সকলের আগে মামীর মাথায় জল ঢাললেন। বললেন, রক্ত কই, বউ?

মামী ফুঁপিয়ে বললেন, রক্ত কি আর আছে মিলির মা—চল্লিশ বছরে সব রক্ত চুষে খেয়েছে ওই ডাকাত—

চুলের রাশির মধ্যে অনেক খোঁজাখুজি ক'রে সত্যই পাওয়া গেল একটুখানি ক্ষত, এবং এও সত্য—সেই ক্ষতে রক্তের আভাস রয়েছে। তবে কিনা চীৎকারের পরিমাণ একটু বেশী হয়ে গিয়েছে বটে! আর এত যে লোক জড়ো হয়েছে চারিদিকে, তাদের চোখে মুখে যেন কতকটা কৌতুকের ছায়া। মামী একটু যেন বাড়াবাড়িই ক'রে ফেলেছেন। রক্তগঙ্গা অথবা খুনজখম—কোনোটাই নয়। ওটা চিম্‌টের একটা সামান্য খোঁচামাত্র। থানা পুলিস, থানাতল্লাসী, আসামীকে গ্রেপ্তার—এসব কথা ওঠে কি?

পাড়ার লোকেরা একে একে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। মামী তখন বলতে আরম্ভ করলেন, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুললে কোম্পানীর রাজত্বে পাঁচ বছর জেল্। আমি ওকে জেলে পাঠাবো।

দিদিমা এবার বললেন, আচ্ছা, থাম্ এখন, অনেক কেলেঙ্কারি হয়েছে। তিলকে আর তাল করিসনে!

মামী হৈ চৈ ক'রে উঠলেন, কেন করবো না? স্ত্রীহত্যে দেখলে কি তোমাদের মন খুশী হতো? আমি কিছুতেই অল্পে ছাড়বো না!

কি করতে চাস?

সকলের সামনে তোমার ছেলে ঘাট মানুক। তারপর একজোড়া শাড়ী এনে দিক্। একপো নারকেল তেল, একখানা গামছা, দুখানা সাবান! নৈলে এই ঘা আমি শুকোতে দেবো না,—খোঁচা দিয়ে জিইয়ে রাখবো। পাড়াসুদ্ধু লোককে দেখাবো!

এইবার মামা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি বিগত রাত্রির ঘটনার সূত্র ধ'রে বলেন, মাঝরাত্তিরে কে তোকে ডাকছিল ইশারায়, সত্যি কথা বল্।

সেজমাসিমা বললেন, দুর্গা দুর্গা…যত সব নোংরা কথা! যাও, ঘরে যাও!

মামী বলেন, ডাকছিল তোমার যম!

মামা পুনরায় বলেন, আমি সাড়া দিয়ে বললুম, কে রে? কোন্ আবাগের বেটা? মাগি আমাকে বোঝায়, ও হোলো টিকটিকি! টিকটিকি কি রে

মাগি? একান্নটা টিকটিকি ম'রে তবে আমার মতন একটা তক্ষপ হয়, তা জানিস? আমি তখনি বললুম, দাঁড়া গুয়োটা,—ছুরিখানা আগে ধরি বাগিয়ে! অমনি ব্যস—তক্ষপের ভয়ে টিকটিকি একেবারে গাঁ ছাড়া! ধরেছিলুম প্রায় একেবারে হাতেনাতে! সতীপনা দেখে নিত পাড়ার লোকে!

অতঃপর স্ত্রীর চরিত্ররক্ষার চেষ্টায় মামা এবার স্থির করলেন, এ পাড়া ছেড়ে তিনি এমন এক স্থানে যাবেন, যেখানে গেলে দুষ্ট ব্যক্তিরা মামীর কোনো খোঁজ পাবে না। তাছাড়া মামীর পক্ষেও ধর্মে মতি থাকা এ বয়সে দরকার বৈ কি।

খড়দায় আছেন শ্যামসুন্দর, তাঁর মন্দিরের চারিদিকে পাড়া পল্লী। কাছাকাছি গঙ্গা, শ্যামসুন্দরের ঘাট। সামনেই সুখচর। মামা গিয়ে শ্যামসুন্দরের পল্লীর কাছে কোথাও একখানা ঘর ভাড়া ক'রে এলেন। ভাড়া নাকি তিন টাকা। তিনি নেশাপত্র ছাড়বেন, এবং বাকি জীবন গঙ্গাস্নান ক'রে কাটাবেন। শ্যামসুন্দরের নাটমন্দিরে ব'সে সকাল-সন্ধ্যা তপশ্চর্যা করবেন।

একখানা গরুর গাড়ী ডেকে এনে মামা তাঁর লটবহর তুললেন, এবং বিদায় নেবার আগে সকলকে একচোট গালমন্দ করলেন। গরুর গাড়ীর আগায় গাড়োয়ানের পাশে বসলেন মামা, মাঝখানে পুষি বিড়াল, এবং গাড়ীর ল্যাজের দিকে বসলেন মামী। জোড়াতালি দেওয়া পুরনো ছাতাটা খুলে মামা ধরলেন নিজের মাথার ওপর। গাড়ী ছেড়ে দেবার পর তিনি বললেন, হাইকোর্টে নালিশ করবো, জাল-উইল ধরিয়ে দেবো, তারপর গুষ্টিসুদ্ধুকে পথে বসিয়ে একদিন এসে ফল্না ভট্‌চার্যির সম্পত্তি দখল করবো।

কিন্তু আরেকটা কারণ ছিল, সেটা মামা আর চেঁচিয়ে বলতে সাহস করেন নি। ভাগ্নেরা নাকি সাবালক হয়েছে, তাদের কারো কারো আঠারো বছর পেরিয়ে গেছে,— সুতরাং এ বাড়ীতে মামীকে নিরাপদে রাখা আর সম্ভব নয়। লাঠি এবং ছুরির দ্বারা হয়ত সম্পত্তি রক্ষা করা যায়, কিন্তু মামীর চরিত্ররক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি— কোনো যুগের মামীরা নাকি বিশ্বাসযোগ্য নয়—এই হোলো মামার ধারণা! দেখতে দেখতে গরুর গাড়ীটি অলিগলি পেরিয়ে চোখের আড়ালে চ'লে গেল। গাড়ীর মাঝখানটিতে শান্তভাবে বসে ছিল পুষি—সেও কলকাতার শোভা দেখতে দেখতে তীর্থযাত্রা করলো।

বর্ষাকালের পর আশ্বিনের দুর্গাপূজো। কার্তিক মাসের হিম পড়লো

খড়দায়। বাবা শ্যামসুন্দর ছাড়া আর সকলেই প্রায় ম্যালেরিয়া জ্বরে বিছানা নিল। মামা প্রচুর আফিঙ সেবন করেন। তাঁকে যদি সাপে কামড়ায়, তবে সাপই মরবে—তাঁর কিছু হবে না! কিন্তু ম্যালেরিয়া সাপ অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর—সুতরাং মামারও জ্বর হ'তে লাগলো। মামা বলতেন, মামী নাকি সাপের চেয়েও সাংঘাতিক, তাই ওর জ্বর হয়নি একটি বারও।

সে যাই হোক, মাস চারেক পরে অগ্রহায়ণের গোড়ার দিকে মলিদাখানা গায়ে জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে মামা আবার একদিন এসে এ বাড়ীতে নামলেন গরুর গাড়ী থেকে। মালপত্রগুলো সবাই মিলে হাতাহাতি ক'রে ভিতরে নিয়ে এলো। মামার তখন জ্বর এসেছে, উবু হয়ে তিনি বসলেন দরজার পাশে। হাইকোর্টে নালিশটা আপাততঃ স্থগিত থাক্, কিন্তু গরুর গাড়ীর ভাড়াটা এখন না পেলেই চলবে না। দিদিমা গালমন্দ দিতে দিতে টাকা বা'র ক'রে দিলেন। কথা রইলো এই, ফল্গুনা ভট্‌চার্যির সম্পত্তিটা ফেরত পেলে এ টাকা মামা শোধ ক'রে দেবেন!

মামা শয্যাগ্রহণ করলেন, এবং মামী হলেন তাঁর সেবাদাসী। কিন্তু যে-ব্যক্তির কখনো অসুখ করে না, সে-ব্যক্তি অসুস্থ হ'লে বড়ই উতলা হয়। সুতরাং মামা ধরে নিলেন, এ যাত্রা তিনি আর বাঁচবেন না। মামী সকলকে ডেকে বোঝাতে চাইলেন, ও ঠিক বাঁচবে, ও দস্যুর কিছুতেই মরণ নেই!

মামা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, বাঁচলে তোর ভারি সুবিধে, না? মাথার সিঁদুরটাও থাকে, সতীপনার মুখোশটাও থাকে—কেমন?

সাগুর বাটি মুখের সামনে ধ'রে মামী বলেন, তুমি মরলে সব পুড়বে, মুখখানা শুধু পুড়বে না—এই ব'লে রাখলুম।

মামা বলেন, তোর জন্যে মুখ পুড়েছে চিরকাল, পোড়া মুখ আবার পুড়বে কেমন ক'রে?

মামী তাঁকে ওষুধ খাইয়ে গা মুছিয়ে গায়ে ঢাকা দেন্। তারপর একসময় বেরিয়ে যান্ নিজের কাজে।

সেজমাসিমা কাছে গিয়ে বসলে মামা তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে কথা তোলেন। সেজমাসিমা ব্যস্ত হয়ে বলেন, ছি ছি, ও সব কথা বলতে নেই··· চুপ করো তুমি!

আরে শোনোই না,—ভারি মজার কথা,—মামা বলতে লাগলেন, সত্যি কথা বলছি! রোজ মাঝরাত্তিরে কেউ-না-কেউ এক বেটা ঠিক আসতো! টোকা দিয়ে ডাকতো মাগিকে দরজার বাইরে থেকে। আমার জ্বর, উঠতে

পারতুম না। কিন্তু ছুরিখানা ঠিক বাগিয়ে রাখতুম।

সেজমাসিমা মামার দিকে তাকালেন।—

মামা বললেন, বোঝো কাণ্ড! এপারে খড়দা, ওপারে হল এঁড়েদা—আর মধ্যিখানে আগড়পাড়া! এঁড়েদা শালা আগড় পেরিয়ে এসে খড়ের আঁটিতে টান্ মারবে,—আর আমি বরদাস্ত করবো! ধরতে পারলে বাপের বিয়ে দেখিয়ে ছাড়তুম!

জ্বরের ঘোরে মামার চোখে তন্দ্রা আসে; সেজমাসিমা উঠে চ'লে যান্।

বলা বাহুল্য, গাঁজা-আফিঙের গুণে সেবার মামার ম্যালেরিয়া পালিয়েছিল।

কিন্তু সংসারে অভাব অনটন কিছুতেই আর ঘোচে না। বাড়ী ভাড়া যা পাওয়া যায়, তা'তে দিন পনেরো কোনমতে আধ পেটা খেয়ে চলে, বাকি পনেরো দিন হরিমটর! চাল-ডাল যদি বা জোটে, কয়লার অভাবে রান্না চড়ে না; আর তেল-নুন যদি বা জোটে, পোস্ত কেনার পয়সা নেই। সুতরাং দিদিমা স্থির করলেন, এ বাড়ী বেশী টাকায় সম্পূর্ণ ভাড়া দিয়ে অন্য কোথাও সস্তায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকা! নাবালকরা মানুষ না হ'লে সমস্যার আর কোনো প্রতিকার হবে না।

সস্তায় ঘর ভাড়া কোথা? তিন চারখানা ঘর নিতে গেলে পনেরো টাকার কম কোথাও হবে না। তা ছাড়া এ বাড়ীর টেক্স-খাজনা আছে, ধারদেনা আছে, অসুখ-বিসুখে ডাক্তার-বদ্যিও আছে। কাঁসারীপাড়ার রায়েরা এ বাড়ী ভাড়া নিতে চায় সত্তর টাকায়। এ বাড়ী পুরনো বটে, কিন্তু দোতলা মিলিয়ে মোট চোদ্দখানা বড় বড় ঘর। উঠোনে চালাঘর। তিনটে কলতলা। সামনের মাসের দোসরা তারিখে রায়েরা এ বাড়ীতে আসতে প্রস্তুত,—এই কথা শুনে দিদিমা রাজি হলেন।

সবাই মিলে অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে মামা এসে খবর দিলেন, বাঘমারীতে একখানা একতলা বাড়ী আছে, খানচারেক ঘর, ভাড়া দশ টাকা। তবে কিনা বাড়ীটি একটু পুরনো, আর কলের জল নিতে হবে রাস্তার থেকে।

অনেক প্রকার বিচার-বিবেচনার পর বাড়ীটি ভাড়া নিতে দিদিমা রাজি হলেন। সেকালে মানিকতলার খাল পেরিয়ে কোন্ দিকে গেলে যেন পাওয়া যেতো বাঘমারীর জঙ্গল। যতদূর যাওয়া যেতো তাল-তেঁতুল আর নারকেলের

বনবাগান, আসশেওড়া আর গাব গাছের ঝোপ, চারিদিকে জলা বিল। সেখানে দিনমানে ঘুরে বেড়াতো মাছরাঙা আর শঙ্খচিল। ওই জলাবিলের মাঝপথ দিয়ে চলে গেছে রেলপথ, তার বাঁশী বেজে যেত চৈত্র-বৈশাখের নির্জন দুপুরে,—ঘূর্ণিধুলোর হাওয়ার হাহাকারে সেই বাঁশীর সুর বহু দূর পর্যন্ত ভেসে চ'লে যেত,—যেদিকে বিদ্যাধরী নদী জলের অভাবে বুকফাটা তৃষ্ণায় মুখ থুবড়ে প'ড়ে রয়েছে। তখনকার অনেকেই জানে বাঘ আসতো ওই বাঘমারীতে। ওখানকার বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতো নাকি রঘু ডাকাত তার দলবল নিয়ে। তাদের চেহারা নাকি এই পাট্টা-পালোয়ান, গোঁফে চাড়া দিত, আর তেল মাখা লাঠির ওপর ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠতো দোতলায়,—যেখানে জমিদারের ঘর। পাইক-পেয়াদাদের সঙ্গে লেগে যেত তাদের মল্লযুদ্ধ। কিন্তু শেষকালে জয় হত রঘু ডাকাতের। ধনরত্ন লুণ্ঠন ক'রে তারা বীরদর্পে হৈ হৈ রৈ রৈ ক'রে চ'লে যেতো। সুতরাং বাঘের ভয় আর ডাকাতের ভয়ে বাঘমারীর দিকে যাবার কারো সাহস হত না। সেদিকে ডাঙ্গায় আছে অজগর সাপ, আর বিলের মধ্যে কুমীর।

এই সমস্ত ভয়-ভাবনা থাকা সত্ত্বেও একদিন কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়াতে হোলো। মামা দিন দুই আগে দু টাকা দিয়ে সেই বাড়ী বায়না ক'রে এলেন। এবাড়ী ছেড়ে দেবার পরের দিনই কাঁসারীপাড়ার রায়েরা এসে এই বাড়ী দখল করবে এইরূপ স্থির ছিল। সুতরাং একাদশীর দিন সবাই যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে জিনিসপত্র বাঁধাছাদা ক'রে নিল

বাঘমারী! নামটা শুনে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানরা বলল, পাঁচ টাকার কম যাবো না। গোয়াবাগানের পাল্‌কির বেহারারাও বলল, খালের ওপারে যেতে তা'রা অপারগ। অতএব সবাই মিলে হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই। কেবল মালপত্র বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্য এলো তিন চারখানা গরু-মহিষের গাড়ী। গরুর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই গৃহস্থকে পায়ে হাঁটা পথেই যেতে হবে। যাচ্ছে সবাই সেই কোন্ ডাকাতের দেশে। কা'র ভাগ্যে কি আছে বলা কঠিন। অনেকেই বলে, বাঘমারীর দিকে গেলে আর কেউ ফেরে না। সেখানে পিছন থেকে গলায় ফাঁস টেনে দেয়; দিনদুপুরে নিরীহ পথচারীর কাটা মুণ্ডু পথের ধারে গড়াগড়ি যায়; ডাকাতে-কালীর মন্দিরে তান্ত্রিকরা সেখানে নরবলি দেয় এবং শাঁকচুন্নিরা রাঙা পাড় শাড়ী প'রে তেঁতুল-তলায় আর শেওড়ার ঝোপে-ঝাড়ে অবাধে বিচরণ ক'রে বেড়ায়। ঘোড়ার গাড়ী আর পাল্‌কি যে সে-তল্লাটে যাবে না, এ ত জানা কথা।

একাদশীর দিন ভোর হ'তেই সকলের বুকের মধ্যে কাঁপতে আরম্ভ করেছিল। নিশ্চিত মৃত্যুর সময়টা জানতে পারলে মানুষের মনের অবস্থা কেমন হয়? পিছনে প'ড়ে রইলো ওদের ওই বাড়ি। বেলতলার ছাদটার ওই কোণে পুতুল খেলার ঘর, এই চিরপরিচিত ভিটের ছোট ছোট আঁকবাঁক,—যেখানে ওদের প্রাণের লীলাক্ষেত্র। রইলো উত্তর-পূবের ওই নিম গাছটা—যার দিকে চেয়ে চেয়ে কত অন্যমনস্ক দিন কেটেছে; রইলো তেতলার ছাদ—যেখান থেকে শিশুর চক্ষু আপন জগতের বাইরে গিয়ে বিশ্বের দিগ-দিগন্তকে কতবার দেখে এসেছে। ওই আকাশ-পথে আসতো ঝুলন-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, আসতো বিজয়া দশমীর বিচ্ছেদের সুর, আসতো হেমন্তের প্রথম স্নিগ্ধ হাওয়া, আর শোনা যেত দোলের রাত্রির ফাগুয়ার গান। এবার ছেড়ে যেতে হচ্ছে সব—নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে না গিয়ে ওদের আর কোনো উপায় নেই।

যাবার আগে বাড়ীময় কেঁদে বেড়ালো প্রায় সবাই।

পায়ে হেঁটে সবাই চলেছে ঈশান কোণের দিকে। ঈশানীর ভ্রূকুটি-কুটিলতা ওদের ভাগ্যকে যেন অবশ্যম্ভাবী বিনাশের দিকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে চলেছে। পথে যেতে যেতেও অনেকের চোখে জল গড়াচ্ছিল।

পুঁটিবাগান পেরিয়ে চারখানা সারিবন্দী গরু-মহিষের গাড়ী চলেছে মাণিকতলার রাস্তার দিকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদ্দুর, পথও অনেক দূর। কারো হাতে বাল্‌তি, কারো হাতে ডাল আর মসলার পুঁটলী, কেউ নিয়েছে ভিজে কাপড়ের বোঝা। গাড়ীগুলির সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে হন্ হন্ ক'রে যেতে হচ্ছে। রঘু ডাকাতকে আজো কেউ দেখেনি, কিন্তু গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান-গুলোকে দেখে ওরা রঘু ডাকাতের খানিকটা আঁচ পাচ্ছে। ওরা গাড়ীগুলোকে ছুটিয়ে যদি এই দুপুর রোদ্দুরে পালায়, তবে সবাই দাঁড়ায় কোথায়? ওদেরকে চোখে-চোখে রেখেছে বটে, কিন্তু ওরা যদি বাগমারীতে গিয়ে সেই নির্জন জঙ্গলের প্রান্তে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে রঘু ডাকাতের দলের সঙ্গে যোগ দেয়, তবে সকলের চুলের টিকি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে কি?

জলের ঘটি তুলে সবাই জল খেয়ে নিল।

বড়দাদা নিয়েছে হাতে এক গাছা লাঠি। অজগর সাপ আর বাঘের পক্ষে এই লাঠিই যথেষ্ট। মামার কাছে মস্ত এক ছোরা, সেটি তিনি গোপন রেখেছেন,—কেননা রঘু ডাকাত নাকি ছুরি-ছোরাকে ভীষণ ভয় করে। ওদের ঘরবসতি মালপত্রাদি এবং চেহারা-চরিত্র লক্ষ্য করলে সেদিন পৃথিবীর কোনো ডাকাত যে লুট-তরাজে উদ্বুদ্ধ হতে পারতো না, একথা ওদের কারো মনে

হয়নি। কিন্তু বাইরে কোথাও ভয় না থাক্‌, ভয় আছে মনে। দিদিমার বাক্সে 'আছে লক্ষ্মীর ঝাঁপি,—তাতে আছে সিঁদুর মাখানো পাঁচটি টাকা আর শালগ্রামের সোনার পৈতে। এ ছাড়া মেয়েদের নাক-কানের নোলক আর মাকড়ি; বাবা তারকনাথের দরুণ সোনা বাঁধানো কবচ,—এ ছাড়া আছে বৈকি সব টুমটাম। বাড়ীর পাট্টা আছে, ঠিকুজি-কোষ্ঠী আছে, কুলজি আছে, আরো সব কি কি; ডাকাত পড়লে আগে কাটবে গলা, তারপর লুটপাট।

বাঘমারী অনেক দূর। ধুলোয় রোদ্দুরে আর ঘামে সবাই শ্রান্ত। মানিকতলার খাল পেরোতেই কলকাতা শহর শেষ হয়ে গেল। অতঃপর বনবাগান আর একটু-আধটু খোলার বস্তি। গরু চরছে কোথাও, কোথাও বা ভেড়া ছাগলের পাল চলেছে। পথ এবার নিরিবিলি। সকলের মুখে চোখে আসন্ন আতঙ্কের ছায়া। ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট। গরুর গাড়ীরা চলল ঢালু খোয়ার রাস্তায় গড়গড়িয়ে।

মামা ছিলেন প্রধান দলপতি। কবে যেন তাঁর সেই পুরনো ছাতা ছিল, এখন আর ছাতা নেই, আছে শুধু সেই ছাতার বাঁট। সেই বাঁট এখন তাঁর লাঠির কাজ করে। বাঘমারীর পথে ঢুকে ভাড়াটে বাড়ীর কাছাকাছি এসে মামা হাঁক দিলেন, খবরদার। সকলের আগে আমি, মনে রাখিস।

সবাই উৎসুক হয়ে তাঁর দিকে তাকালো। মামা সেই বাঁট তুলে বললেন, যদি আসে তা'রা, আমি এগিয়ে যাবো সকলের আগে। এই লাঠি—অন্তত তিনটেকে ঘায়েল করবো ব'লে রাখছি।

অনেকে ডরিয়ে উঠলো মামার নির্ভীক চেহারার দিকে তাকিয়ে। মামা তাঁর করাল দৃষ্টি ফিরিয়ে পুনরায় বললেন, রঘু আমাকে চেনে, তা'র গাঁজার কল্‌কে অনেকবার এই হাতেই সেজে দিয়েছি! আর তা'র দলবল? আসুক না তারা একে একে? বাপের বেটা যদি হয়, তবে একে একে ল'ড়ে যাক্‌ দেখি? কিন্তু খবরদার, আমি সকলের আগে।

দিদিমা তাঁর একমাত্র পুত্রকে চিনতেন। ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, একলা পারবি? ভয় নেই তোর?

মামা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, ভয়! আমি কি মেনিমুখো যে, ভয় পেয়ে আঁচলের আড়ালে ঢুকবো? পিঠের দিকে কাছা গুঁজলেই আর পুরুষ মানুষ হয় না, মনে রেখো।

মামা ছাড়া আরো পাঁচটি পুরুষ ওদের দলে আছে। কিন্তু রঘু ডাকাতের দল অতর্কিতে আক্রমণ করলে এই পাঁচজনের কয়জন সক্রিয় থাকবে, এইটি

ছিল প্রশ্ন। পাঁচটির মধ্যে তিনটি একেবারেই নাবালক। চতুর্থটির বয়স ষোল। যিনি পঞ্চম, তিনি ডাকাত পড়ার সংবাদ শোনামাত্র কোথায় থাকবেন, পূর্বাহ্নে বলা কঠিন। অতএব মামাই হলেন ওদের একমাত্র ভরসাস্থল। খুঁটি হিসাবে তিনি বেশ মজবুদ, তবে কিনা সেই খুঁটি শক্ত ক'রে ধ'রে রাখা চাই।

বড়দাদা তা'র লাঠি নিয়ে এগিয়ে এলো। বলল, ভয় কি! মামার পরে আমি!

তুমি?—দিদিমা বললেন, তুমি না সেদিন কাবলীঅলাকে রাস্তায় দেখে পেছন দিকে লাঠি লুকিয়েছিলে? তোমাকে আমি চিনি।

বড়দাদা একটু বিমর্ষভাবে অন্যত্র স'রে গেল।

জরাজীর্ণ একখানা একতলা বাড়ীর ধারে এসে গরুর গাড়ীটা থামলো। বেলা তখন প'ড়ে এসেছে। বাড়ীর সামনে কোনো আব্রু নেই, পাঁচিলগুলো ভেঙ্গে পড়েছে, উঠোনের উপরে প্রাচীন ভিটের স্তূপাকার ভগ্নাবশেষ। আশপাশের নিরিবিলি অঞ্চল ঝোপ আর জঙ্গলে আকীর্ণ। কাছাকাছি পাড়া পল্লী বিশেষ নেই। পরম্পরায় শোনা গেল এদিকে সাপখোপের ভয়ে সন্ধ্যার আগেই লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা হাসাহাসি করছিল, দিদিমা সেটি লক্ষ্য করেছেন। এক সময় বললেন, অ-ছেমু, জিনিসপত্তর নামাবার আগে তোমাদের বঁটিখানা আমার কাছে রেখে যেয়ো ত মা?

কিন্তু রাশি রাশি ঘর-বসতি জিনিসপত্র নামতে লাগলো সেই ভগ্নস্তূপের জটলার আশেপাশে। ঘরগুলি দেখে সবাই আঁৎকে উঠলো। অন্ততঃ দশ বছর এই ঘরে মানুষের বসবাস নেই। মেঝের উপর গাছ উঠেছে, কড়িকাঠের ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায়, সমস্ত দেওয়ালে উইপোকার দড়ি নেমেছে। ঘরের কোণে-কোণে মস্ত মস্ত গভীর গর্ত। সেখানে সাপ অথবা শিয়ালের বাসা থাকা বিচিত্র নয়। কোনো ঘরে জানলার কপাট নেই, কোনো ঘরের দরজা খুলে নিয়ে গেছে। একখানা ঘরে কোনো এক জন্তুর একটি ক্ষুদ্র কঙ্কাল দেখা গেল,—বোধ করি কুকুরে টেনে এনেছে। বড় বড় বাদুড় আছে সব ঘরে। যেটার নাম রান্নাঘর, সেটার কাছাকাছি গিয়ে উঁকি মেরে সবাই ভয়ে পালিয়ে এলো। কি যেন একটা নড়ছে সেই ঘরের বুকচাপা অন্ধকারে। তা'র পাশে কূয়ো, তা'র ভিতর দিকে তাকালে গা ছমছম করে। এই বাড়ীটি বাসের উপযোগী ক'রে তুলতে অন্তত পনেরো দিন লাগবে। কিন্তু অপরাহ্নের কুটিল আলোয় ভিতরে এসে দাঁড়াবার মতো বুকের পাটা কা'রো ছিল না।

গন্ধ।

কে একজন মেয়েছেলে যাচ্ছিল পথ পেরিয়ে। সে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, এ ভিটেতে তোমরা কেন এলে, মা?

আমরা এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছি, বাছা।

ভাড়া নিয়েছ? এ যে হানাবাড়ী মা? বিশ বছর হতে চললো এ বাড়ীতে মানুষ ঢোকেনি! মালিকরা সবাই মরেছে ওলাউঠোয়। এ বাড়ী কা'র কাছে ভাড়া নিলে?

মামা চেঁচিয়ে উঠলেন—তুমি যাও বাছা, পথ দেখো। আমাদের ঘর আমরাই গুছবো!

স্ত্রীলোকটি চ'লে গেল। মামা গলা নামিয়ে বললেন, বুঝতে পারলে কিছু? এরা হোলো রঘু ডাকাতের চর! খবর নিতে এসেছে।

দিদিমা মামাকে চিনতেন। এবার একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, দু' টাকা দিয়ে তুই কা'র কাছে এ বাড়ীর বায়না করেছিলি?

ওই নাও! সাপের খোলস এবার ছাড়লো!—মামা হেঁকে উঠলেন, কারো ভালো করতে নেই! বায়নার টাকা না দিলে সস্তায় বাড়ী ভাড়া পেতে কোথায়?

দিদিমার কণ্ঠ মামা অপেক্ষা দুর্বল নয়। তিনি চীৎকার করলেন, টাকা তুই কা'র হাতে দিয়েছিস, তাই বল্? টাকার রসিদ কই, বা'র করে দে।

রসিদ! দেবো কাল সকালে! রসিদ দিলেই ত তুমি বলবে জাল রসিদ! ওই মাগির কথা শুনে তুমি আমাকে চোর ব'লে ঠাওরাতে চাও, কেমন?

দিদিমা চোখ পাকিয়ে বললেন, কাল তোর আপিঙের পয়সা ছিল না বলছিলি, আজ আপিঙ পেলি কোত্থেকে?

জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে চারিদিকে ছড়ানো। রাত্রে ঘরে ওঠবার কোনো উপায় নেই। আহারাদির কোনো রকম আয়োজন করা সম্ভব নয়। সন্ধ্যা আসন্ন হয়ে এসেছে। পথে আর বিশেষ লোক চলাচল দেখা যাচ্ছে না। ওরা সবাই কুণ্ডলী পাকিয়ে এক জায়গায় ব'সে রইল। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে মেঘ করেছে।

এটা বাড়ীর উঠোন বটে। কিন্তু পাঁচিল এবং সীমানা না থাকার জন্য সামনের মাঠ আর গলিপথের সঙ্গে এই উঠোন একাকার। ওরা সবাই পথে ব'সে আছে-বললে ভুল হবে না। এমন সময় মামা গলা তুলে সতর্কবাণী

উচ্চারণ করলেন, চুপ। বলি, শুনতে পাচ্ছ কিছু?

কি?

জঙ্গলের ভেতরে ফিসফাস কানাকানি? গাড়োয়ানগুলো মাল খালাস করতে করতে হাসছে কেন, বুঝলে কিছু?

একটু আগে মামার প্রতি চৌর্যবৃত্তির বদনাম দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু এই নিদারুণ দুর্দিনে তিনি ছাড়া আর কে ভরসা? সবাই কান পেতে শুনল, জঙ্গলের মধ্যে কানাকানিই ত বটে। গাড়োয়ানদের সঙ্গে যে ওই জঙ্গলের অলক্ষ্য সম্প্রদায়ের যোগসাজস আছে, এতে আর সন্দেহ কি?

জন দুই গাড়োয়ান যমদূতের মতো গুটিগুটি কাছে এগিয়ে এলো। মুখে তাদের হাসি। হাসি দেখে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলের গা ভৌল হয়ে এলো। মামা তাদের সেই ভয়ানক স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে ফস ক'রে বললেন, আমি ওই জঙ্গলের দিকে পাহারা দিইগে, তোমরা এদের সামলাও।

মামা তাঁর ছাতার বাঁট নিয়ে ভগ্নস্তূপের দিকে এগিয়ে গেলেন। গাড়োয়ানরা বলল, ডর লাগা বুড়িমা?

খবরদার!—দিদিমা হাঁক দিলেন, আর এক পা মৎ আগাও। ওরে, আঁসবঁটিখানা নিয়ে আয় ত?

গাড়োয়ানরা হাসছিল। বলল, রাগ করিয়েছে বুড়িমা। আচ্ছা, আচ্ছা, হাম্ লোককা ভাড়া দেও, হাম্ চল্ যায়গা।

কত ভাড়া তোদের?

চার গাড়ী কো ছয় রুপিয়া!

দিদিমা প্রতিবাদ জানালেন। পাঁচসিকা ক'রে চারখানা গাড়ীর ভাড়া হোলো পাঁচ টাকা। ওরা এখন চাইছে ছয় টাকা। ওদের মতলব ভালো নয়। কিন্তু এই নিয়ে বচসা দেখা দিল। গাড়ী ভাড়া ছাড়াও ওরা চায় জলপানি আর মালখালাসীর মজুরী। পাঁচ টাকার উপর আরো অন্তত দুটো টাকা।

মস্ত সমস্যা দেখা দিল। এ বাড়ীতে কোনোমতেই থাকা সম্ভব নয়। আজ রাত্রি নিরাপদে কাটবে কিনা বলা কঠিন, কিন্তু আসছে কাল ভোরে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে। ওরা সবাই ব'সে আছে খোলা আকাশের তলায়, সকলের হাত-পা ভয়ে জড়োসড়ো। আসছে কাল কোথায় যাওয়া হবে কেউ জানে না। কাঁসারীপাড়ার রায়েরা কাল সকালে এসে দিদিমার বাড়ী দখল করবে, সুতরাং সেখানে আর ঠাঁই হবে না।

ময়লা হারিকেনটা জ্বালা হোলো। কিন্তু আলোটা যেন চারিদিকের আতঙ্কটাকে আরো বেশী বাড়িয়ে তুললো। বরং অন্ধকারই ছিল ভালো। চারখানা গরুর গাড়ী বোঝাই মালপত্র—কোন্‌টা কোনদিকে প'ড়ে রয়েছে এখন আর ঠাহর করা যাচ্ছে না।

হারিকেনের কালিপড়া আলোটায় গাড়োয়ানের দলটাকে দেখলে মনে দুর্ভাবনা আসে। যতশীঘ্র সম্ভব ওদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। সুতরাং ওদের সঙ্গে আর বচসা না বাড়িয়ে দিদিমা তাঁর কোমরের ঘুন্‌সীর থেকে বাক্সের চাবিটা খুলে কা'র হাতে যেন দিলেন। সাতটি টাকা নিয়ে ওরা এখনই দূর হয়ে যাক্।

সবাই যে ভয় পেয়েছে এবং এই হানাবাড়ীতে এসে যে ভুল করেছে, এ কথাটা গাড়োয়ানরাও বুঝতে পেরেছিল। ওরা টাকা নিয়ে যখন একটু দূরে স'রে গেল, মামা তখন ওধার দিয়ে ঘুরে সকলের চোখ এড়িয়ে ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। উদ্দেশ্যটা কি, জানা শক্ত। কারো দৃষ্টি তখন অত্যন্ত প্রখর হ'লে সে বুঝতে পারতো, গাড়োয়ানরা মামার চেনা লোক,—ওরা থাকে পুঁটিবাগানের লোহাপটিতে। উভয়পক্ষে যেন লেন-দেন চলছে।

কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণের জন্য। তারপরেই মামা আবার সেখান থেকে স'রে গেলেন। পাঁচ টাকার বদলে গাড়োয়ানরা সাত টাকা কেন আদায় ক'রে নিল, মামার সঙ্গে তাদের কোনো গোপন চুক্তি ছিল কিনা,—এ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাতে চাইলো না। সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর সকলেই তখন অবসাদে আর হতাশায় আচ্ছন্ন।

আকাশে মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ। অজানা অঞ্চল, মাঝে মাঝে শৃগালের ডাক, আশেপাশে বনভূমি, ক্বচিৎ শকুনের ডানা ঝটাপটি, কখনো দূরের কুকুরের ডাক, হানাবাড়ীর ভিতর থেকে মধ্যে মাঝে অলৌকিক শব্দ সাড়া—সমস্তটা মিলিয়ে রাতটা যেন বড় দুর্যোগের মনে হচ্ছে। চারিদিকে রাশি-রাশি অনাবশ্যক জিনিসপত্রের জঞ্জাল, নিষ্প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অতিবাহুল্য—যেন সমস্তটা ওদের মোহবন্ধন দশার একটা ছবি। বুঝতে পারা যায়, ওদের দলের মধ্যে কেউ কেউ অন্ধকারে ব'সে কাঁদছে। হয়ত ভগ্নী, হয়ত মা, হয়ত বা মাসী। কেউ কাঁদছে আসন্ন গভীর রাত্রির ভয়ে, কেউ বা কাঁদছে আগামীকালের দুশ্চিন্তায়। এমন দুরবস্থার জন্য দায়ী হলেন মামা, কিন্তু এই দুর্যোগের রাত্রে তাঁর সঙ্গে কেউ বিবাদ করতে প্রস্তুত নয়। আরও এক বিপদের কথা, গাড়োয়ানরা অদূরে গিয়ে এক গাছতলায় গাড়ীগুলোকে

হয়ে গেল, সমস্ত মালপত্রকে ভিজিয়ে গেল। কিন্তু তবু কেউ সাড়া দেয়নি, কেননা শেষরাত্রে রঘু ডাকাতের দলবল এসে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। বৃষ্টির পরে ওরা সবাই ভোরের প্রতীক্ষা ক'রে রইল।

একটি সমগ্র ভয়ার্ত রাত্রে সবাই অন্ধকারে জন্তুর মতো লুকিয়েছিল।

এমন সময় ভোর হোলো। কাক-কোকিল ডেকে উঠলো। উষার কণকচ্ছটার স্পর্শে সকলে প্রাণলাভ ক'রে চোখ মেলে তাকাল। ভয় আর দুর্যোগের রাত অতি দীর্ঘ মনে হচ্ছিল।

ওই মানিকতলাতেই বল্‌দে-পাড়ায় বাড়ীভাড়া খুঁজে পাওয়া গেল। নতুন বাড়ীতে এসে পৌঁছতে হল গত রাত্রির ওই গাড়োয়ানদেরই সাহায্যে। এবারেও তা'রা নিল সাত টাকা, এবারেও মামা গিয়ে তাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে মিটমাট করলেন।

দ্বাদশীর উপবাস-ভঙ্গের দিন ছিল। কিন্তু জল-গ্রহণ করার আগেই দিদিমা মামার উদ্দেশে চীৎকার ক'রে উঠলেন, বাঘের ভয় দেখিয়ে কাল রাত্তিরে তুই বাক্স-প্যাটরা ভেঙ্গেছিলি? তোকে আমি পুলিসে দেবো!

মামা হাঁক দিলেন, বিপদ কাটিয়ে এবার বুঝি আমার ওপর ফণা তুলতে চাও?

মুখ সামলে তুই কথা বলিস—দিদিমা তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—তুই চিরকেলে চোর-ডাকাত, তোর কোনো ধর্ম নেই! তুই ঠগ, তুই জোচ্চোর,—রঘু ডাকাতের ভয় দেখিয়ে তুই গাড়োয়ানদের কাছে দালালি খেয়েছিস। আমি তোকে জেলে দেবো।

মামা দর্পভরে বললেন, আমিও তবে এই চললুম। কামার বাড়ী থেকে আগে ছুরিখানা শানিয়ে নিয়ে আসি। ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখোনি!

দিদিমা হাঁকলেন, শিগগির তুই সোনাদানা টাকাকড়ি ফেরত দে,—নৈলে এখনই থানায় যাবো।

মামা জবাব দিলেন, যাওগে তুমি থানায়,—আমিও এই চললুম হাইকোর্টে।

বল্‌দে-পাড়ার বাড়ী থেকে মামা আর মামী পুরনো তোরঙ্গ আর ময়লা বিছানার পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দিদিমা সর্বস্বান্ত হয়ে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন।

পরে জানা গেল, মামা কাঁসারীপাড়ার রায়েদের সঙ্গে ভাব ক'রে নিজের বাড়ীতেই উঠেছেন। তিনিও হাইকোর্টে যাননি, দিদিমাও থানা-পুলিস আর করেন নি।

বাড়ী বদলের ব্যাপারে মামা কিঞ্চিৎ লাভবানই হয়েছিলেন।

॥ ৫ ॥

ইউরোপে ঘোরতর যুদ্ধ চলছিল অনেকদিন ধরে। পঞ্চম জর্জ আর জার্মানির কাইজার—এরা নাকি সম্পর্কে দুজন মাসতুতো ভাই! ঠিক যেমন এ বাড়িতে খাঁদা আর খোকা! যুদ্ধে যাচ্ছে বাঙ্গালী পল্টন। যারা যেতে চায় তারা নাম লেখাতে যাচ্ছে এস-কে-মল্লিকের আপিসে—এই কাছেই বিডন স্ট্রীটে। এখন যারা যুদ্ধে যাবে ইংরেজ তাদের মাথায় তুলে নাচবে। যদি বেঁচে ফিরে আসে, আখেরে ভাবনা থাকবে না!

কাশী থেকে কিশোরদাদা চলে গেলেন যুদ্ধে মেসোপোটেমিয়ায়। বাগদাদ থেকে তাঁর চমৎকার চিঠি এসেছে। তিনি গেছেন দু'বছরের জন্য। সেজমাসিমা বুকফাটা কান্না কেঁদে কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা মানত করলেন।

সবাই নাম লেখাচ্ছে। পাড়ায়-পাড়ায় উদ্দীপনা। ওই নাবালকের রক্তে সেদিন ঝড় উঠেছিল। তার কৈশোরের উপকণ্ঠে প্রবল এক বন্যার তাড়না আছাড়ি-পিছাড়ি করছিল। সে মিশনারি ইস্কুলে ফ্রি পড়ে, প্রতি বছরে প্রমোশন পাবার পর পুরনো বইয়ের দোকান থেকে বই কেনার জন্য এখানে-ওখানে তাকে হাত পাততে হয়! ভাত জোটে একবেলা, অন্য বেলায় শুকনো রুটি। বড়লোকরা নাকি জলখাবার খায়। কিন্তু তাদের ঘরে থাকে শুধু তেঁতুল, বড়ি আর ঝোলা গুড়। তিন পয়সা এক দিস্তে বালির কাগজ, অন্তত তিনমাস চলা চাই। কোনওদিন এক পয়সা দামের আস্ত একটা উড-পেন্সিল তার ভাগ্যে জোটেনি। ইস্কুল যাবার জুতো আছে, বাকি সময় শুধু পা। চুল কাটার দাম দু' পয়সা, তাই বাড়িতে চুল কেটে দেয়। ছুটির দিন সকালে পান্তাভাত আর তেঁতুল। একটা জামা এক বছর।

রায়বাগানের ভিতর দিয়ে এসে ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে বিডন স্ট্রীট ধ'রে কতকটা এলে নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীট। সেটা ছাড়িয়ে আরেকটু এগোলে এস-কে-মল্লিক। পা কাঁপছে, মন কাঁপছে, সমগ্র অস্তিত্বের মূল যেন থরথর ক'রে কাঁপছে। সে গেলে কাঁদবে সবাই—কাঁদুক। শুধু মায়ের জন্য তার মন কাঁদবে নিশিদিন। একথা ভাবতে গিয়ে তার দুই চোখে হুহু ক'রে জল এল।

তবু তার হাতে তলোয়ার ঝলসিয়ে উঠবে, তা'র বন্দুকের গুলীতে মরবে সবাই, তার কামানের গোলায় ধ্বংস হবে সব। রক্তের প্লাবনে সে সব ভাসিয়ে

কেবলই ঘুমোবার চেষ্টা করত, নিজের অবাধ্যতাকে শান্ত করবার জন্য নিজেকে ভোলাত।

বনেদীবংশের লোকেরা অনেক বেলা অবধি ঘুমোয়। কর্তা উঠতেন তখন বেলা দশটা। উপরতলায় যেতে বাধা ছিল না। ছেলেটা গিয়ে পড়ত ওদের সকলের মাঝখানে। ছেলেমেয়েদের অতি সুশ্রী রূপ দেখে কুণ্ঠা ও লজ্জায় সে আড়ষ্ট হয়ে থাকত এক পাশে। যে মেয়েটি বড়, সে ওদের সমবয়সী—তা'র নাম সুলতা। বাকু ছোট। বাপের ফাইফরমাস নিয়ে আছে সুলতা। কর্তার চোখে মুখে নির্মল প্রসন্নতা। চৌকির উপরে ব'সে তিনি স্নান করেন, সুগন্ধ সাবান আর তেল, নধর একখানা মোটা তোয়ালে। এদিকে কোঁচানো মিহি ধুতি আর গেঞ্জি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঘাঘরা পরা হাস্যমুখী সুলতা। লোকটার গায়ের রং থেকে যেন গোলাপের আভা ফুটে ওঠে।

হঠাৎ একদিন ওদের মাঝখানে গল্পের আসরে ব'সে সুলতা বলল, তোরা এত কালো কেন, ভাই?

ওরা কালো? অবাক কাণ্ড! মামার বাড়ীর পাড়ায় সবাই যে বলে, ওরা নাকি ফুটফুটে? আর দেখোনি বুঝি আমাদের বড়দিদির ছেলেমেয়েকে? কী রং বড় জামাইবাবুর! আর সেই আমাদের টেঁপিকে দেখলে তোদের চোখ ঠিকরে যাবে! দেখতে চাস আমাদের ভাগলপুরের পিসিমাকে? দেখেছিস শিশিরকাকাদের? আমাদের কালো ব'লে বুঝি তোরা ঘেন্না করিস?

অভিমানে বোনেরা একেবারে ফুলে-ফেঁপে উঠতো। সুলতা হাসিমুখে বলতো, আচ্ছা বেশ, তোরা না হয় ফর্সা! কিন্তু আমার মতন গানের খাতা আছে তোদের? পাতায় পাতায় কেমন সুন্দর জলছবি লাগিয়েছি! দেখবি?

অনুরোধের অপেক্ষা না রেখেই সুলতা ছুটে গিয়ে তা'র গানের খাতা নিয়ে আসে। কত গান লেখা সেই খাতায়। কোনো গানের সত্য অর্থ নেই, কোনোটার অর্থ বা ঝাপসা। কিন্তু সকলের মাঝখানে ব'সে হঠাৎ এক সময় মুখ তু'লে ছেলেটা বলত, তুই বুঝি ফুলেল তেল মেখেছিস?

ফুলেল তেল!—সুলতা হেসে উঠতো, দূর, আমরা কলু না বেনে যে, তেল মাখবো?

বোনেরা আবার ফুঁসিয়ে উঠতো। বলতো, আমরা তেল মেখে নাইতে যাই, আমরা বুঝি কলু? তুই ভাই বড্ড ঝগড়া বাধাস! বাঁকা বাঁকা কথা তোর!

ওর কোথায় বাঁকা কথা রে? তোরাই ত ঝগড়া বাধাস,—বলতে বলতে ছেলেটা নিত সুলতার পক্ষ।

এক বোন চেঁচিয়ে উঠতো, তুই ফের এসেছিস মেয়েদের মধ্যে কথা কইতে? ব'লে দেবো মা'কে?

গা ঢাকা দিয়ে তখনকার মতন খোকা স'রে যেত বটে, কিন্তু ওই ফুলেল তেলের মতন গন্ধটা যেত তার সঙ্গে সঙ্গে। ও গন্ধটা নতুন, ওটার মধ্যে দারিদ্র্যের স্যাঁতাপড়া বিকার নেই,—ওটায় যেন অভিজাত বনেদীর একটা আমেজ থাকতো; থাকতো যেন কেমন দুরাশার নিঃশ্বাস। কিন্তু সেই দুরাশা কি—অনেক সময়ে সে ভাবত নিজের মনে। হঠাৎ মনে প'ড়ে যেত গল্প। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া,—রাজপুত্র যেন চলেছে কোন্ বনে মৃগয়ার অন্বেষণে, আর কোন্ সাতসমুদ্র তেরো নদী পারের দেশে রাজকন্যা থাকতো সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে। সোনার কাঠির ছোঁয়া না পেলে কিছুতেই সে জাগবে না। এমনি ক'রে কল্পনাটি ছুটিয়ে নিয়ে যেত যেন কোন্ দিকে ওর ওই গায়ের গন্ধ,—কোন হদিস পেত না তার। এই নীচের তলাকার আবছা অন্ধকারের থেকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে যেত ওকে নিরুদ্দেশ পথের দিকে। মুক্তি পেত কষ্টক্লিষ্ট জীবনের থেকে।

মনে প'ড়ে যেতো সেই নণ্টুকে। সেও কাছে এলে এমনি গন্ধ পাওয়া যেত। সে-মেয়েটা ছিল খাদ্যলোভী, স্বভাবনিষ্ঠুর—কিন্তু উদ্দাম! প্রবল অটুট স্বাস্থ্য তা'র—কিন্তু গায়ে ছিল তার বন্য মাংসের গন্ধ। নণ্টু কাছে এলে সে আড়ষ্ট হত, সুলতা এসে দাঁড়ালে আনন্দ পেত। কিসের আনন্দ—কে জানে! সুলতার চোখ দুটো বিড়ালের মতো কটা—যেন দুই বিন্দু আকাশের আভা। ওর দুই চোখে দুর্লভ ঐশ্বর্যের সন্ধান পাওয়া যেত।

হঠাৎ নীচে এসে দাঁড়ালো সুলতা। হাতে তা'র একগোছা বই। ডাকলো, মাসিমা?

মা বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, কেন মা?

আপনার ছোট ছেলে নতুন ক্লাসে উঠেছে, তাই বাবা ওকে এই বই ক'খানা কিনে দিলেন।

দোলাই গায়ে জড়িয়ে খোকা পাশে দাঁড়িয়ে। মা কতক্ষণ শান্ত অপলক চক্ষে সুলতার দিকে চেয়ে রইলেন। পরে বললেন, ওর হাতেই দাও, মা!

গঙ্গার ঘাট থেকে মা এনে দিলেন বাসুর জন্য 'আহ্লাদী' পুতুল। দুটি পরিবার দেখতে দেখতে একাকার হয়ে গিয়েছিল। নীচের তলাকার ভাড়া

হোলো নয় টাকা। কিন্তু মাস তিনেক পরে সুলতার মা বললেন, ছেলে যখন চাকরি করবে তখন বাড়ী-ভাড়ার টাকা দিয়ো—এখন থাক্।

মা বললেন, সে কি কথা? তোমার টাকার দরকার নেই?

মাসিমা বললেন, থাকলেই বা, চ'লে ত যাচ্ছে? তোমাকে আজ বাদে কাল মেয়ের বে' দিতে হবে, মনে নেই?

মা চুপ ক'রে যান্। খোকা তাকিয়ে দেখে, তাঁর চোখে যেন কান্না আসে। দরিদ্র ভাই বোন ওরা, কষ্টের সংসার, দুঃখের দিনযাত্রা। কিন্তু ওরা ওর মধ্যেই দেখে, নীচেকার রান্না-তরকারী উপরতলায় যায়, আর দ্বাদশী কি পূর্ণিমায় মিষ্টান্ন ইত্যাদি আসে উপর থেকে নীচে। চেয়ে দেখত একটা মস্ত বনেদী বংশের শাখা ক্ষয় হতে-হতে এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে নীচের তলায়। কিন্তু চরিত্রের আভিজাত্যের গুণে আত্মাভিমান কোথাও জায়গা পায়নি। সুতরাং নীচের তলার সঙ্গে ওরা মিলে গিয়েছিল অতি সহজে।

রাত সেদিন অনেক। শীতের সেই রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল। হু হু ক'রে বইছে উত্তরের বাতাস। আর সেই বাতাসের ধাক্কায় কোথায় একখানা করোগেটের টিন মাঝে মাঝে ঝনঝন ক'রে আওয়াজ করছিল। ওই আওয়াজে ছিল একটা ভয়—ওটা কেবলই যেন ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছে। নিশুতি রাত্রের দুর্যোগের মধ্যে কে যেন কঠিন হাতে ওই করোগেটের ঝুঁটি ধ'রে নাড়া দিচ্ছিল। পাড়াপল্লীতে কোথাও কোন সাড়া নেই।

এমন সময়ে বাইরের দরজায় ধাক্কা পড়লো। মেসোমশাই অতি মিষ্টি মিহি কণ্ঠে ডাকলেন, বানু, মা আমার, দরজাটা খোলো ত মা?

বাতাস বইছে দুরন্ত বেগে। লেপ আর কাঁথার মধ্যে সবাই জড়োসড়ো। কেউ জেগে আছে এমন কোনো প্রমাণ ছিল না। তবু উপর থেকে সাড়া এলো—যাই।

বানু ওঠে না কোনোদিন, তবু বানুকে ডাকতে ওঁর ভালো লাগে। ওই নামটির মধ্যে আছে তাঁর হৃদয়ের সুর, বাৎসল্যের সঙ্গীত। দেখতে দেখতে এক সময় আলো হাতে নেমে এলেন মাসিমা।

বৃষ্টি হচ্ছে। তবু ওর মধ্যেই গুনগুনিয়ে গান ধরেছেন মেসোমশাই। কী মধুর কণ্ঠ তাঁর, কী যে কান্না ফুঁপিয়ে উঠছে তাঁর বুকের ভিতর থেকে! জলধারার সঙ্গে যেন চোখের জলেও বুক ভিজে যাচ্ছে সেই গানের।—"ওগো কাঙ্গাল, আমারে কাঙ্গাল করেছ, আরো কি তোমার চাই"—

এ মেসোমশাইকে ওদের জানা নেই। দিনের বেলা তাঁকে কখনো কেউ

গান গাইতে শোনেনি। তিনি গম্ভীর, তিনি প্রসন্ন, তিনি স্বল্পবাক্। উপর-তলায় তাঁর অস্তিত্ব সারাদিনে টের পাওয়া যায় না। সারাদিন পড়াশুনো নিয়েই তিনি থাকেন। মোটা মোটা বই—যা সচরাচর চোখে পড়ে না। সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙ্গলা,—তাঁর সমস্ত বিছানাটার ওপর বই ছড়ানো থাকে। চশমা চোখে দিয়ে তিনি যেন ডুবে যান বিদ্যার সমুদ্রে। দিবানিদ্রার অভ্যাস তাঁর নেই। পান, তামাক, চুরুট,—কোনোটাই তিনি স্পর্শ করেন না। সুতরাং, যাঁর গলার আওয়াজ কোন সময়ে শোনা যায় না,—অথচ নিশুতি রাত্রে তাঁর গান শোনা যায়, এ সকলের কাছে বিস্ময়। যেন বিগলিত মাধুর্যের কান্না কেঁদে ওঠেন তিনি—সে কান্না যখন কারো কানে পৌছবে না! তাই বড় লোভ, ওঁর মুখের চেহারাটা খোকা দেখে নেয় ওঁর গানের সময়।

বিছানাটা ছেড়ে পা টিপে টিপে সে এল জানালার ধারে। সামনের উঠোন দিয়ে ওঁকে পেরিয়ে যেতে হবে। কেরোসিনের ডিবে হাতে নিয়ে সর্বাঙ্গে মুড়ি দিয়ে মাসিমা পা টিপে টিপে দরজা খুলতে গেলেন। ওদের ঘরের দিকে এক-বারটি তাকিয়ে যেন মাসিমার চোখে মুখে আড়ষ্টতা আর সঙ্কোচ দেখা গেল। অতি সন্তর্পণে গিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খুট ক'রে দরজাটা তিনি খুললেন।

কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরেই ছেলেটা দেখে মাসিমার বাঁ হাতে আলো, আর ডান হাতখানা মেসোমশাইয়ের হাত ধরা। মেসোমশাই তখনো গাইছেন —"ওগো কাঙ্গাল, আমারে—"

'আঃ থামো—হয়েছে! শুনবে যে ওরা! লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে বসেছ?'—মাসিমা চাপা গলায় ধমক দিলেন।

মেসোমশাইয়ের পা টলছিল। এলিয়ে পড়ছিলেন তিনি এপাশে-ওপাশে। আলোটায় খোকা দেখল তাঁর দুই নিমীলিত টানা টানা চোখ। সেই চোখে নিবিড় স্নেহ উচ্ছলিত। বিগলিত দেহতত্ত্বের রসবিহ্বলতা যেন সেই সুন্দর মুখখানাকে অপরূপ ক'রে তুলেছে। চিরকালের ভিখারী ভোলানাথ যেন চলেছেন সর্বস্বান্তের আনন্দ নিয়ে। এ গান সত্য হয়ে উঠেছে ওঁর ওই চেহারায়। মুগ্ধ চক্ষে ছেলেটা চেয়ে রইল। দূরের থেকে কেবল মাসিমার চাপা কণ্ঠস্বর কানে আসতে লাগলো, শীতের ঠাণ্ডা পেয়ে বুঝি আজ বেশী মাত্রায় চড়ানো হয়েছে? মরণ আর কি!

সঙ্গীতের সুরে তার জবাব পাওয়া গেল—"আরো কি তোমার চাই!"

মেজবোনের বিয়ে হয়ে গেল ওই নীচের তলাটায়। নদীয়া জেলার এক গ্রাম থেকে এসেছে পাত্র। চেহারাটা গ্রামের সঙ্গে মেলানো, তার ওপর

আছে কলকাতার বউবাজারের ছাপ। তেল না মাখলে টেরি কাটা যায় না। সাগর-ছেঁচা মাণিক এলো ঘরে।

আসরের পাশে এসে দাঁড়ালো সুলতা। সেই সুলতা এ নয়। পরনে তা'র শাড়ী, গায়ে জামা। বেণী দোলানো সেই সুলতা নয়; এর এলো-খোঁপা পিছন দিকে। গতকাল পর্যন্ত যার দুরন্তপনা সবাই দেখেছে, আজ তা'কে দেখে সম্ভ্রমবোধ জাগে। বালিকারা চক্ষের পলকে বড় হয়ে যায়—আর হাফপ্যান্ট পরা সমবয়স্ক বালক নির্বোধ চক্ষু মেলে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। সুলতার কাছে যেন খোকা ছোট হয়ে গেল। প্রসন্ন হাস্যে মহীয়সীর চেহারা নিয়ে সে দাঁড়ালো ওর সামনে।

চোখে তার চঞ্চলতা নেই,—চলনটা শান্ত। বিয়ের ব্যাপারটা চুকে গেল দুদিনে, কিন্তু বদলে দিয়ে গেল সুলতাকে। সহাস্য শাসন ছিল সুলতার দুই চক্ষে, এখন এলো শান্ত স্নেহ। আগে সে আগেভাগে এসে নাবালকদের আসরে জায়গা জুড়ে বসতো, এখন সে জায়গা নিয়েছে বড়দের মহলে। স্নানের সময় সবাই মিলে ওরা জল ছোঁড়াছুঁড়ি করত, এখন সুলতা স্নান করতে যায় মেয়েদের দলে। মনের ভুলে যদি বা কখনো হঠাৎ ছিটকে আসে সামনে—কিছুক্ষণের পর হঠাৎ উঠে আবার চ'লে যায়। দূরে যাচ্ছে সে দিনে দিনে! কিন্তু কেন সে দূরে যাচ্ছে, কেনই বা দিনে দিনে এত ব্যবধান বেড়ে উঠছে, একথা কোন দিন খোকা জানতে পারত না। ওর সংশয়াচ্ছন্ন মন একাগ্রভাবে উৎকর্ণ হয়ে থাকতো। মন কেঁদে উঠতো জিজ্ঞাসায়।

কালোয়ারি বস্তির আনাচে-কানাচে আছে কি ওর প্রশ্নের উত্তর? লোহার ছেনির সাহায্যে লোহার হাতুড়ি মেরে লোহার কড়ি কাটা হচ্ছে—যে আঘাতে শোনা যাচ্ছে কঠিন যন্ত্রণার আর্তস্বর,—ওই সঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যাবে কি প্রশ্নের জবাব? কাঁসারিরা যায় ভরা দুপুরে ঠন্‌ঠন্ ক'রে কাঁসি বাজিয়ে,—সেই বাদ্যের শেষ ধুয়াটায় পাওয়া যায় করুণ একটা কাতরতা। মধ্যাহ্নকালের কাকের ক্লান্ত কণ্ঠে; চুড়িওয়ালীর কাঁচের চুড়ির ঝনৎকারে, দূরের রেলের বাঁশীতে, সন্ধ্যারতির মঙ্গল ঘণ্টায়—ওদের মধ্যে পাওয়া যাবে কি ওর ক্ষুধার্ত প্রশ্নের সদুত্তর?

সদ্য বিবাহিত মেজবোন গেছে শ্বশুরবাড়ি, আর ছোড়দি থাকতো ঘরকন্নার কাজ নিয়ে। সুলতার ছোট ভাইটি চাটুয্যেদের গলিতে সারাদিন গুলিখেলা নিয়ে থাকে। খোকার গতিবিধি ছিল আনাচে-কানাচে।

সুলতা বলে, আমাকে মাথার কাঁটা এনে দিবি—? ওই যে ডাক্তারবাড়ীর

গায়ে মনোহারির দোকান, ওখানেই পাবি। কাঁটা এনে দিলে তোকে দইয়ের পয়সা দেবো।

লোভটা সামান্য নয়। খোকা বলল, তুই ত দোকান চিনিস, আন না কেন?

আমার যে বাড়ী থেকে বেরোনো বন্ধ হয়ে গেছে রে!

কেন?

কী বোকা তুই!—এই বলে সুলতা তিনটি পয়সা ওর হাতে দেয়। ওর মধ্যেই এক পয়সার দই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পছন্দসই চুলের কাঁটা হাতে পেয়ে সে খুশী হয়ে বলে, জলছবিগুলো নিবি?

কই, দে!

সুলতা তার কাগজের বাক্সের থেকে একে একে সমস্ত জলছবিগুলি ওকে বের ক'রে দেয়। এই মহামূল্য রত্নরাজি নিয়ে কতবার যে সাংঘাতিক মনোমালিন্য হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। কিন্তু আজ তার এই অকৃপণ দাক্ষিণ্য দেখে ছেলেটা যেন হতবুদ্ধি। এই দান মনে আনে দুর্ভাবনা, কিছু বা বেদনাবোধ। সে চেয়ে দেখছে, মন তার নির্বিকার,—সব যেন সুলতা দিয়ে দিচ্ছে। এমন দুর্লভ কিছু তার পাওয়া হয়েছে, যার জন্য আজ সম্পূর্ণ রিক্ত হবার তার ভয় নেই। যে জলছবি পাবার জন্য ছেলেটার উগ্র বাসনার অন্ত ছিল না, অপ্রত্যাশিত সেই বস্তু হাতে পেয়ে আজ যেন নেবার উৎসাহও আর রইলো না। তবু নিল। কিন্তু নেবার সঙ্গে সঙ্গে ওর সমগ্র সত্তা যেন অস্বস্তিতে রি রি করতে লাগলো। কান্না এলো চোখে।

সুলতা হঠাৎ ভুলে গেল পুতুল খেলা। পড়ে রইলো তার 'নেত্য' আর 'কালাচাঁদ', পড়ে রইলো পুঁথির মালা আর বর-কনে—সমস্ত ফেলে সে চ'লে গেল। তিন চারজন মিলে পাথরের ঘুঁটি খেলার যে প্রবল প্রতিযোগিতা,—সেদিকেও সুলতার আকর্ষণ গেল ক'মে,—সবচেয়ে আশ্চর্য এই! এই খেলায় সে এমন ক্ষিপ্রহস্ত ছিল যে, তার জুড়ি মিলতো না। ক্যারম্ বোর্ডে সে খোকার সঙ্গে বসতো, কিন্তু সেই শূন্য বোর্ডটা আজ যেন মরুভূমির মতো মনে হল—তার যেন এপার ওপার নেই।

দিদির বাড়ীতে ছেলেটা গিয়েছিল ম্যালেরিয়ার দেশে। সপ্তাহখানেক বাদে যখন ফিরে এল, শুনল—সামনের বুধবার সুলতার বিয়ে। সন্ধ্যালগ্নে কাজ।

ময়ূরের পেখম মেলে নেচে উঠল সবাই আনন্দে। শুধু ওরা নয়। প্রতিবেশী মহলে স্থলতা ছিল সকলের অতি প্রিয়, তারাও উল্লসিত। এত অল্প বয়সে বিয়ে শুনে সবাই আশ্চর্য। কিন্তু মেয়ের বাড় নাকি কলাগাছের মতো—বিয়ে না দিলেই নয়। কাপড় প'রে এসে দাঁড়ালে স্থলতা নাকি মস্ত ডাগর মেয়ে। পাত্রপক্ষ গিনি দিয়ে মেয়েকে আশীর্বাদ ক'রে গেল সোমবারে। কপালে চন্দন-চিত্রাঙ্কন নিয়ে স্থলতা সকলের মাঝখানে সলজ্জ হাস্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পাকা দেখার কল্যাণে খোকার ভাগ্যে জুটে গেল একখুরি দই।

দৈবক্রমে নীচের তলায় ওরা পড়ে গিয়েছিল। সেই নীচেটার নিম্নস্তরে গভীরতা, সেখানে অন্ধকারে আলো জ্বালবার কেউ ছিল না, সেখানে দরিদ্রের গুহা, বিদুরের খুদ। সেই অনেক নীচের থেকে ওরা তাকাত উপরদিকে—যেখানে আলোকের উৎসব, এক ফালি আকাশের যেখানে আশ্বাস, যেখানে দৈন্যের থেকে অসীম মুক্তি। যদি উঠতে পারত সেই গভীর অন্ধকারের থেকে উপরের দিকে, তবেই স্থলতার ধরাছোঁয়া পেত। কেননা অর্থহীন দুরাশায় মনটা কাঙ্গাল হয়ে উঁচুর দিকে হাত বাড়াতো।

শোনা গেল, বিয়ে ত এ বাড়ীতে নয়—জেলেটোলায় ওদের আদি বাড়ীতে। সেখানে বনেদী ব্যবস্থা, মস্ত পূজোর দালান আর নাটমঞ্চ। অনেক লোকের ভিড় হবে সেখানে; অনেক আত্মীয় কুটুম্ব মিলে সেখানে শুভ বিবাহের উৎসব। অতএব স্থলতারা সবাই মিলে চলে যাবে জেলেটোলার বাড়িতে। সেখানেই যা কিছু।

মাঘের শীত তখনো বেশ। কয়েকদিন আগে হয়ে গেছে সরস্বতী পুজো। হঠাৎ মনে পড়ে যায় সরস্বতীর সঙ্গে স্থলতার কোথায় যেন মিল আছে। ওর হাতে যদি থাকতো বীণা, আর পায়ের কাছে থাকতো রাজহাঁস—আর যদি থাকতো ওর খোলা এলো চুল—তবে ওকে ফুলের গয়না পরিয়ে মঙ্গল ঘণ্টা বাঁ হাতে নিয়ে আর ডান হাতে পঞ্চপ্রদীপ ধরে আরতি করা চলতো।

অতিশয় আনন্দে মাতামাতির ফলে খোকার জ্বর এলো ঠিক গায়ে-হলুদের দিনে। ম্যালেরিয়া জ্বর এলো কাঁপতে কাঁপতে; কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুতে হল অন্ধকার নীচের তলাকার মাঝের ঘরের এক কোণে। জ্বরে সে বেহুঁশ। জ্বর তার নিজেরই নিয়মে ছাড়বে, স্থতরাং চিকিৎসাদির কথা আপাতত ওঠে না। গায়ে-হলুদটা হয়ে গেছে বেলায়, কিন্তু হলুদে-রংটা রেখে গেছে খোকার দুই চোখে। ঘোলাটে চোখ দুটো মাঝে মাঝে খুলে আবিল অন্ধকারেও সে দেখতে

প্যাচ্ছে হল্‌দে ছায়া। সরস্বতী পূজোর দিনে ওর রংটায় কাপড় ছুপিয়ে পরেছিল মেয়েরা—ওটা নাকি বাসন্তী রং। সুতরাং জ্বরে অচেতন থেকেও অর্থহীন দুই চোখ মেলে যেদিকে সে তাকায়, সেদিকেই দেখে বাসন্তী রংয়ের বন্যায় ছেয়ে গেছে তার পৃথিবী।

পরদিন অপরাহ্ণে বিয়ে বাড়ীর উদ্দেশে বাড়ীসুদ্ধ সবাই চ'লে গেল। কেবল রইলো পাশের ঘরে ছোড়দাদা—কেননা তার পাসের পড়া। ছেলেটা পড়ে রইল ছেঁড়া তোশক আর কাঁথা জড়িয়ে। জ্বরে অচেতন। কিন্তু ঠিক মনে নেই, সকাল থেকে বিকারের ঘোর ছিল কিনা। সেই বিকারের মধ্যে হয়ত যাবার আগে সকালের দিকে কোন্ এক সময় মাথার কাছে এসে সুলতা হেঁট হয়েছিল। পিছনে পিছনে রাজহাঁসটা হয়ত এসেছিল, বীণার বিলাপ বেজেছিল হয়ত তার কানে। বাসন্তী রংয়ের দুই দৃষ্টি মেলে হয়ত সে দেখে ছিল সুলতার সর্বাঙ্গে ফুলের গয়না, মাথায় মরকত মুকুট, চক্ষে বরাভয়, অঙ্গে অঙ্গে ভূষণের শোভা। সে হয়ত বলে থাকবে, বিয়ে বাড়ীতে তুই যেতে পারলিনে, তোর জন্যে ঠিক আমি দই পাঠিয়ে দেবো, দেখে নিস।

নীচের তলাটায় অন্ধকার হয়ে এসেছে ভরসন্ধ্যায়। ছোড়দাদা আলো জ্বালালো পাশের ঘরে। মাঝখানে একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেল, খোকা নিঃশব্দে পড়ে আছে।

হঠাৎ সে উঠে বসল এক সময়ে। লগ্ন বোধ হয় আসন্ন। হয়ত সানাই বেজে উঠেছে, বর আসছে চতুর্দোলায়—ইংরেজী বাজনা বাজছে তার আগে আগে। দোলাইখানা মুড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ীর থেকে। পা দুটো যেন আজ ঠিক নেই। এলোমেলো পা—যেন মেসোমশাই! ওই গানটা আজ তারও মুখে আসছে গুনগুনিয়ে—'ওগো কাঙ্গাল, আমারে কাঙ্গাল করেছ, আরো কি তোমার চাই?'

জেলেটোলার বাড়ী সে চিনত। ইস্কুল যাবার পথে ওই পথটা থাকতো বাঁ হাতি—যেদিক দিয়ে মা যেতেন নিমতলার ঘাটে। সে যেত সঙ্গে। কেউ না দেখতে পায়—এমনি করে দোলাই মুড়ি দিয়ে খালি পায়ে সে এসে ঢুকল বাড়ীতে। সামনেই মস্ত উঠোন, আর দুর্গাদালানে কারবাইডের আলোয় বসেছে বিয়ের আসর। ঘন সবুজ বেনারসী পরা সুলতা—বড় বড় সোনালি ফুল সেই বেনারসীতে। পিঁড়ির উপর সে বসেছে অল্প ঘোমটা টেনে। সামনের পিঁড়িতে বসেছে বর। বহু মেয়ে পুরুষ বালক বালিকায় আসর ভরে উঠেছে।

দোলাই ঢাকা ছিল সর্বাঙ্গে, পাছে বাড়ীর লোক দেখতে পায়। শুধু চোখ দুটো ছিল খোলা—সেই চোখ জ্বরে কাঁপছে। উৎসাহ ছিল না-দেখা পর্যন্ত। দেখার পর কী ক্লান্ত অবসাদ। কিন্তু কী দেখতে এসেছিল, মনে আছে কি? মনে আছে কি, জন্মজন্মান্তরের কোনো ধারাবাহিকতা? তার চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল আবিল নিদ্রায়। ঘামের ফোঁটা নেমেছে কপাল বেয়ে, দুই চোখ বেয়ে নেমে এসেছে লোনা জলের ফোঁটা ঠোঁটের দুই কোণে।

চাকর-বাকর দলের আড়ালে একপাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে দেখল শুধু নিজেকে। কিন্তু আর নয়। এ দৈন্য নিয়ে এখানে আর দাঁড়ানো চলে না। কেউ যেন না জানে, লুকিয়ে এখানে সে এসেছিল কাঁদতে। না জানে কেউ, ম্যালেরিয়া জ্বরে খাদ্যের দিকে ওর টান ছিল!

জ্বর ছেড়েছিল প্রায় সপ্তাহখানেক পরে। বিয়ে হয়ে যাবার পরেও বিয়ের আলোচনা চলে অনেক কাল পর্যন্ত। কিন্তু ওর মধ্যেই এক সময়ে ছেলেটা শুনতে পেয়েছিল, বিয়ের পরদিন শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে স্বলতা সত্য সত্যই ওর জন্য খানিকটা দই পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঋণ পরিশোধ সে ক'রে গেছে বৈ কি।

দইয়ের আর এক নাম হল অমৃত! ওর স্বাদ নাকি মৃত্যুহীন!

বছরখানেকের ওপর কেটেছিল পুঁটিবাগানে। কিন্তু খরচ কুলিয়ে উঠছে না। ঘরভাড়া আরো কমাতে না পারলে ঘর চলছে না। অতএব ওরা একদিন ট্রামরাস্তা ছাড়িয়ে বাহির শিমলা পেরিয়ে এসে উঠল এক বোষ্টমের একতলা একখানা বাড়ীতে। বাড়ীর কর্তার নাম হল নিবারণ বোরেগী।

ছোট্ট একতলা। পূর্ব-পশ্চিম দুটি অংশ। মাঝখানে পরিষ্কার সিমেন্টের ঝরঝরে উঠোন। বাড়ীটি থেকে ট্রামরাস্তা অনেকটা দূরে। ডানহাতি পোস্টঅপিসের বাড়ী ছাড়িয়ে বাঁ হাতি গলি। সেই গলি এসেছে এঁকে-বেঁকে পশ্চিমে। পথেই পড়তো খেলার মাঠ, আর সেই মাঠের কোণে ছিল বাঙ্গলা-মাস্টার হেমবাবুর বাড়ী। নিরারণ বোরেগীর বাড়ীটির দক্ষিণেও ছিল খোলা অনেকটা জায়গা, আর তারই দক্ষিণ প্রান্তের পথের ধারেই ছিল জীবন দাসেদের মস্ত বাড়ী।

ওদের ওই বিস্তৃত খোলা জায়গাটা,—ওটা হল পুকুর ভরাট করা মাঠ। ওই মাঠে আশপাশের বাড়ীর সমস্ত ঝাঁটানো জঞ্জাল জমা হত।

ওখানে সমবয়স্ক সঙ্গী জুটে গেল কয়েকজন, এবং কিশোরদলের খেলাধুলোর জায়গা হল ওই নোংরা মাঠে ওই জঞ্জালের স্তূপের আশেপাশে,—এবং সেজন্য খোকারা ছিল অস্পৃশ্য। এমনই অস্পৃশ্য যে, রাস্তা পেরিয়ে সামনে ওই বড় বাড়ীর পাথর বাঁধানো রোয়াকে কখনো যদি বসতে যেত,—কোথা থেকে যমদূতের মতন তেড়ে আসতো জীবন দাস!

—হারামজাদা, পাজি,—দূর হ্ আমার র'ক থেকে!

ভয়ে ভয়ে ছেলেটা উঠে আসত। জীবন দাসের রাগের কারণ ছিল। তার একটিমাত্র ছেলে নীলু নাকি ওরই জন্য নষ্ট হ'তে বসেছে। নীলুরা বড়লোক, তাদের ওই পাথুরে বড় বাড়ীর নীচের তলায় রাসপূর্ণিমায় পুতুলের মেলা বসে, কীর্তন কথকতা হয় তাদের ঠাকুরদালানে, সময় অসময়ে জুড়িগাড়ী এসে তাদের দরজায় দাঁড়ায়; মোটা মোটা ঝলমলে মেয়েছেলে তাগা-তাবিজ প'রে গাড়ী থেকে নামে। ওরা নাকি তাঁতি। ওদের বাড়ীতে সেদিন বিয়ে উপলক্ষ্যে চার রকম মিষ্টান্ন নাকি পরিবেশন করা হয়েছিল। খোকা দাঁড়িয়েছিল ওদের দরজায় বিয়ের দিনে বিকালবেলায় বর আসবার আগে। নীলু পরেছিল জরির বুটিদার রেশমী পাঞ্জাবি, হাতে রেশমী রুমাল, মুখে সুগন্ধী পান,—পায়ে নতুন কালো পাম-সু। এ নীলু সে নয়। আজ সকাল পর্যন্ত খোকার জীবনে যে এত অন্তরঙ্গ ও এত মধুর ছিল, সর্বপ্রকার দুরন্তপনায় যার অবাধ সাহচর্য পেত,—আজ সন্ধ্যার এই নীলু সে নয়,—আজ রাজবেশে দাঁড়িয়ে পথের কাঙ্গালকে সে যেন চিনতে পারে না!

কখন্ যে পিছন থেকে এসে পড়েছিলেন জীবন দাস সে বুঝতে পারেনি। হঠাৎ কঠিন আঙ্গুলে ওর একটা কান ধ'রে তিনি দাঁত কিটিয়ে বললেন, ফের!

ছেলেটা হকচকিয়ে গেল। তিনি কান ধ'রে কিছুদূর টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, মানা করেছি না? ভাগ্...!

কান ধ'রেই তিনি ওকে জঞ্জালের বালতির দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, শুয়োর, হ্যাংলার মতন দাঁড়িয়েছিস দরজায় গিয়ে,—এঁটোকাঁটা যা পাবি চাটবি—কেমন?

বর আসার উলুধ্বনি শোনা যেতেই তিনি তাড়াতাড়ি চ'লে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। একবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, ফের যদি কথা কইবি নীলুর সঙ্গে, তবে কুকুর লেলিয়ে দেবো।

নোংরা মাঠের প্রান্তে চুপ করে সে দাঁড়িয়ে রইল। বর এসে পৌঁছলো জীবন দাসের দেউড়ীতে। তখন ইলেকট্রিক হয়নি। দেউড়ীর দুপাশে দুটো

গ্যাসের আলো দেওয়া হয়েছে। দূরের থেকে সেই আলোর আভা পড়েছিল খোকার দুই চোখে। সেই চোখে ছিল কিছু সজলতা, কিছু বা বন্যতা।

একজন ধনী ব্যক্তির বিষদৃষ্টি তাকে সমস্তদিন ধ'রে সহ্য করতে হত। অনেক সময় কারণ থাকতো না, অনেক সময় কৈফিয়তও খুঁজে পেত না। হয়ত নিজের ছেলের সঙ্গে দরিদ্র বালকের অসমান বন্ধুত্ব তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না, হয়ত বা তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত করতো।

কিন্তু নেংটি ইঁদুর সকলের অলক্ষ্যে ঢুকে পড়তো দেউড়ীর কোন ফাঁকে। বাড়ীখানা ছিল মস্ত, মহলের পর মহল, ঘরের পর ঘর। অন্দর মহল কোন্ দিকে তার জানার দরকার ছিল না। কিন্তু বাইরের মহলের নীচের তলার অন্ধকার ঘরগুলিতে থাকতো ঝুলপড়া রাসের পুতুল,—নানা ঠাকুর দেবতা। তাদের গায়ে জরির সাজসজ্জা, নারকেলের আঁশ দিয়ে তৈরী ঘন কালো চুল, আড়ং-ধোয়া কাপড়-চোপড়। নীলু তাকে বোঝাতো সব, বর্ণনা করতো কত কিছু। সেই সব ঘরে কত বিচিত্র বস্তুসম্ভার, কত আশ্চর্য রূপকথার উপকরণ! লোভের মোহের আনন্দের অসংখ্য সামগ্রী—ওরা যেন তার রসকল্পনার এক একটি প্রতীক্। সমস্ত নীচের মহল এবং কক্ষের পর কক্ষ ঘুরে বেড়িয়ে এক সময় গা-ঢাকা দিয়ে সে চ'লে আসত। কিন্তু রাত্রে বিনিদ্র চোখের সম্মুখে দেখত সেই সব ছবি। দেখত বৃন্দাবনের সেই অশ্বত্থ ছায়াতলের কালীয়-দমনের ঘাটের সোপানশ্রেণী, দেখত কংসরাজার দেশ, দেখত কলঙ্কিনী রাধার লাঞ্ছনা। কিন্তু জীবন দাস? দাসবংশের সর্বশেষ উত্তরাধিকারী নীলু! ওদের সে ভালোবাসত মনে মনে। ওদের ঘর, ওদের দালান, ওদের রাসমঞ্চ—ওরা নৈলে ওর এ দেখা সম্ভব হত না। জীবন দাসের ঘৃণা সে বহন করত নির্বিকার মনে।

বড় বড় চুল জীবন দাসের, দাড়ি ছিল গালভরা, চোখ দুটি ছিল ভাঁটার মতো। কী ঘৃণা ফুটতো ওর মুখে! কি বিজাতীয় হিংস্রতা ওর দুই চোখে! দূরের থেকে যদি দেখতে পেত, শরীর রোমাঞ্চ হত। মুখের সেই স্নেহলেশ-হীন কাঠিন্য—সে-মুখে কোথায় নীলুর প্রতি বাৎসল্য? সে-মুখের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে থাকে গুপ্ত ক্ষীরধারা,—যে-ধারা সন্তানের প্রতি উপচিয়ে পড়ে? খোকা যেন সেই আবিষ্কারের আশায় উদগ্রীব হয়ে থাকত। কিন্তু ওর সেই আশা অতৃপ্ত থেকে যেত। চেয়ে দেখত হিংসাকে। সেই হিংসা শাসনের নয়, শমনের। সে হিংসা মানুষের চেয়েও যারা নিষ্ঠুর—তাদের।

পাড়ায় কখনো যদি কোনো গোলমাল দেখা যেত, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে

আসতো জীবন দাস। চোখে তার আগুন, মুখে বীভৎস কটূক্তি। ছেলের দলে মারামারি বেধেছে, কারো বাড়ী ছিঁচ্‌কে চুরি হয়েছে, পাড়ার কোনো বুড়ীকে কেউ ক্ষেপিয়েছে, কেউ ঢিল ছুঁড়েছে কা'রো বাড়ীতে,—জীবন দাস আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত খোকাকে। বলা বাহুল্য, এর ফলে পারিবারিক ও সামাজিক লাঞ্ছনার ঝড় বয়ে যেত ছেলেটার পিঠের উপর দিয়ে। অনেক সময় ওর অপরাধ থাকতো না, অনেক সময়ে নীলুকে অপরাধী করা চলতো, কিন্তু সে হল জীবন দাসের একটিমাত্র সন্তান,—সে হল দাস বংশের উত্তরাধিকারী,—তার কোন অপরাধ হয় না।

নিবারণ বোরেগীর ওই একতলার উঠোনে জল দাঁড়াতো বর্ষার দিনে, ওতে সাঁতার শেখার স্থবিধা হত। সেই উঠোনে সকালবেলা আহ্নিক সেরে নিবারণ বোরেগী সূর্যপ্রণাম করবার জন্তে এসে দাঁড়াতেন, আর ওরা দেখত তাঁর চোখ-ওল্‌টানো কর্কশ মুখখানা, আর গলায় তাঁর বৈষ্ণবের কণ্ঠী—পাঁচনরী। তিনি নিজে ছিলেন পরম ভক্ত বৈষ্ণব, কিন্তু তাঁর মুখের চেহারা দেখলে কারো ভক্তি হত না। গায়ে শাদা উড়ুনী, পায়ে খড়ম, মাথায় টিকি,—সকল সময় শুচি-শুদ্ধ, কিন্তু তিনি সকলের ভয়ের পাত্র ছিলেন, প্রীতির পাত্র ছিলেন না। তাঁর শাদারঙের একটা কুকুর থাকতো দরজার কাছে বাঁধা—আর ছিল একটা পোষা বেজী, সেটা থাকতো বারান্দা থেকে নামতে গেলে যে-সিঁড়ির ধাপ—সেই ধাপের নীচে একটি গর্তে। কুকুরের ভয়ে চোর আসত না বাড়ীতে, আর ঘরের মধ্যে সাপ ঢুকতো না ওই বেজীর ভয়ে। দুটি জন্তু এমনি ক'রে সদাসর্বদা পাহারা দিত তাদের প্রভুকে।

প্রভু কে?—নিবারণ তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অভিভূত কণ্ঠে বলতেন, প্রভু কে বলো ত? প্রভু হলেন সেই বৃন্দাবনের গোপাল, সেই রসিকশেখর শ্যামমনোহর। গৌর গৌর!

স্বামী আর স্ত্রী দুজনকে পাশাপাশি দেখে খোকারা অনেক সময়ে অবাক হত। স্বামীর গায়ের বর্ণ অবশ্য বৃন্দাবনের গোপালেরই মতন, এবং স্ত্রীর চেহারাটা রাধাভাবে বিভোর। রং খুব ফর্সা, বয়স প্রায় আঠারো। ওর দিদিদের সঙ্গে খুব ভাব। বড়দিদি ওকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করতো, আচ্ছা কেষ্টদাসী, তুমি বুঝি ওঁর দ্বিতীয়পক্ষের বউ?

কেষ্টদাসী হাসতো। বলতো, সবাই তাই বলে, কিন্তু সত্যি নয়। সংসারে ওঁর মন ছিল না, তাই পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত বৃন্দাবন আর নবদ্বীপ ছুটোছুটি করেছেন। মন ত এখনো বসেনি!

কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমাদের ?

কপালে মস্ত সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে সিঁদুর, সুন্দর নাকের ওপর গঙ্গামাটির তিলক, গালে গলায় আর হাতে শাদা চন্দনের লেপন,—কেষ্টদাসী কপালে একটু ঘোমটা টেনে জবাব দিত, এই ছ' বছর হল। যাই ভাই, ওঁর পূজোর যোগাড় ক'রে দিইগে।

মা বলতেন, বউটার রূপ একেবারে ফেটে পড়ছে। অমন অনামুখোর হাতে পড়েছে, মেয়েটার দশা কি হবে জানিনে।

সকাল থেকে পাঁচ-সাতবার নিবারণের ঘর থেকে স্বামী স্ত্রীর মিলিত কণ্ঠের কীর্তন শোনা যেতো। ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরেকৃষ্ণ হরেরাম ! হরেকৃষ্ণ হরেরাম রাধে গোবিন্দ ! জয় গৌর জয় গৌর !

এইটুকু বলতে লাগতো অনেকক্ষণ, দীর্ঘক্ষণ—আর খোকার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতো। কতক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে কেষ্টদাসী, আর সে রান্নাঘরের আড়ালে গিয়ে ওর হাত থেকে পাবে শশা-কলা আর আম-সন্দেশ। কিন্তু বেরিয়ে আসে না, সময় চ'লে যায়—ঘরের মধ্যে স্বামী স্ত্রী একেবারে নীরব। সুতরাং খোকা যায় পা টিপে টিপে বারান্দার ওপর, পায়ের শব্দ না পান্ নিবারণ। ঘরের দরজার ফাঁকটুকুতে দেখা যায় দুজনে চোখ বুজে ব'সে আছে সেই কখন্ থেকে। কেষ্টদাসীর চোখ দিয়ে নেমে এসেছে জল, আর নিবারণের চোখ দুটো জোর ক'রে বন্ধ করা। সামনে দুখানা বাঁধানো ছবি। শ্রীগৌরাঙ্গ দু'হাত তুলে উপর দিকে তাকিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছেন, মহাপ্রভুর গলায় পৈতা, কাঁধের উড়ুনি হাওয়ায় ভেসে-যাওয়া,—আর তাঁর মাথার পিছনে জ্যোতির্ময় সূর্যগোলক। দ্বিতীয় ছবি হল, ওঁকারের মধ্যে কৃষ্ণরাধা একত্র বিজড়িত। পায়ের কাছে ময়ূর আর হরিণ, পিছনে বসন্তপ্রকৃতি বৃন্দাবনের। ছবির ওপর চন্দনের ছিটে দেওয়া। কুমারটুলির ঘাটে এ ছবি অনেক দোকানে বিক্রি হয়। ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ সে দেখতে পেত বেজীটাও মুখ বাড়িয়ে আছে দরজার ফাঁকে। নৈবেদ্যর একটা অংশ সেও পায়। কিন্তু ছেলেটা একটু হাত নাড়তেই ফুড়ুক ক'রে সেটা পালায়। ওকে সে বন্ধু মনে করে না। অনেকক্ষণ পরে কেষ্টদাসী থমথমে গম্ভীর মুখ নিয়ে বেরিয়ে আসে। এই সময়টায় নাকি বিশেষ কারো সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। হাতে তার নৈবেদ্যর থালা। পায়ের কাছে বেজীটা ঘোরে। খোকা তখন রান্নাঘরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে। ফল আর মিষ্টি হাতে নেবার সময় রাম প্রশ্ন করল, এত দেরি হল কেন ?

কেষ্টদাসী বলল, আমি কি এখানে ছিলুম ?

মুখ তুলে তাকাতেই সে আবার বলল, গিয়েছিলুম বৃন্দাবনে ব্রজের রাখালের সঙ্গে !—কেষ্টদাসীর দুই চক্ষে তখনও বৃন্দাবনী বিহ্বলতা।

সন্দেশ আর কলা নিয়ে ছেলেটা তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দেবার সময় একবার থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, কাঁদছিলে কেন তখন ?

স্নিগ্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কেষ্টদাসী বলল, ও কি কান্না রে, ও হ'ল প্রেমাশ্রু !

ওর মেজদি হাসতে জানতো, এবং বড়বৌদি হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়তে জানতো। পাশের ঘর থেকে মা বলতেন, তোমাদের অত হাসাহাসি কিসের ? ছি, অত হাসতে নেই !

ওরা দুজনে এঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিত, তারপর বিজয়া দশমীর দিনে যেমন সিদ্ধি খেয়ে মানুষ অকারণে হেসে গড়াগড়ি দেয়,—তেমনি ওরা দুজনে মেঝেতে আঁচল লুটিয়ে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরিয়ে দিত। একবার ক'রে বলতো, প্রেমাশ্রু,—আবার হাসতে হাসতে লুটোপুটি।

দশ গজের মধ্যেই কেষ্টদাসীদের মহল, মাঝখানে কোনো আড়াল-আবডাল নেই,—কেষ্টদাসীরা কোনো কথা কি মন্তব্য শুনতে পেলে আঘাত পাবে, মায়ের মনে এই ছিল ভয়! ছেলেটা গিয়ে এক পাশে ব'সে নৈবেদ্যর ফল মিষ্টি খেত, আর কেষ্টদাসীর বিষণ্ণ মুখখানার রহস্য ভাববার চেষ্টা ক'রে কূলকিনারা পেত না।

স্ত্রীকে অনেকে অনেক রকম ক'রে ডাকে। কেউ নাম ধরে, কেউ বলে ওগো ; কেউ ডাকে, শুনতে পাচ্ছ ? নিবারণ স্ত্রীকে ডাকেন, কোথা গেলে ? কোথা গেলে বললেই কেষ্টদাসী ছুটে যায় ঘরে। নিবারণ বলেন, কে যে কোথায় যায় ! কেউ যায় শ্রীক্ষেত্রে, আবার কেউ বা যায় শ্রীধামে ! শ্রীবাসের অঙ্গন আজ যে শূন্য !—বলতে বলতে তিনি গুনগুনিয়ে ওঠেন,—জয় রাধে কৃষ্ণ, শ্রীরাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ রাধে।

এটি নিবারণের সান্ধ্য আরাধনার ভূমিকা। কেষ্টদাসী গিয়ে হাত জোড় ক'রে স্বামীর কাছাকাছি ব'সে পড়ে। সামনে তেলের প্রদীপ জ্বলে। খোকা গিয়ে পশ্চিমের জানলাটার নীচে দাঁড়ায়। কথায় কথায় সাধনার কথাটা সে শুনত। সাধনাটা কি বস্তু সেটি তার জানা চাই বৈ কি।

নিবারণ তাকিয়ে আছেন সেই মহাপ্রভুর দু'হাত তোলা ছবিখানার দিকে, কেষ্টদাসী কোলের উপর হাত জোড় ক'রে চুপ ক'রে ব'সে আছে। পুষ্পপাত্র আর নৈবেদ্যর রেকাব সামনে। দু'গাছা ফুলের মালা, ধূপ থেকে ধোঁয়া ওঠে, আর ওপাশে টাইমপিস ঘড়িটার থেকে টিকটিক শব্দ হয়। এমন সময় ওই বেজীটা মুখ তুলে তাকায় নিবারণের দিকে—একটু অপেক্ষা করে, তারপর কি যেন মুখে নিয়ে নিবারণকে প্রদক্ষিণ ক'রে চ'লে যায়।

ছেলেটা বাইরের আবছা অন্ধকারে জানলার পাশে—উইপোকায় খাওয়া ফুটো—সেই ফুটোর ভিতর দিয়ে দেখত, ওরা আলোর সামনে ব'সে। চোখ বুজতেন নিবারণ, তারপর হাসতেন। কালো কালো লম্বা দাঁত, একটার থেকে একটা দূরে। হাসির আগেই সেগুলি বেরিয়ে আসতো। কিন্তু সে-হাসি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নয়, সে-হাসি নিজের মনের, সে-হাসি আত্মদর্শনের। যেন কিছু দেখছেন চোখ বুজে, কিছু আমোদ পাচ্ছেন। এক সময় চোখ বুজেই হেসে বলেন, এই ত ধরেছি। বল্ দেখি তুই ননীচোর, না মনোচোর?

নিবারণের প্রশ্নের জবাব ঘরের কোন্ দেওয়াল থেকে আসে শোনবার জন্য ছেলেটা উৎকর্ণ হয়ে থাকত। কিন্তু এক সময় নিজেই নিবারণ গুনগুনিয়ে উঠতেন, তুমি নদীয়ার গোরা, ছিলে মনোচোরা,...কোথা গেলে?—হঠাৎ তিনি চোখ খোলেন।

এই যে!—কেষ্টদাসী জবাব দেয়।

নিবারণ তৎক্ষণাৎ দুই চোখ বুজে আবার গুনগুনিয়ে ধরেন, তুমি রাধিকার পারা, কোটি শশীতারা...

এতক্ষণ পরে ভাবে বিভোর হয়েছেন নিবারণ। কেষ্টদাসী আস্তে আস্তে ঘর থেকে উঠে আসে। ছেলেটা ততক্ষণে বাইরের দরজার কাছে সরে গেছে। কেষ্টদাসী বারান্দার থেকে নেমে এসে আঁচল থেকে দুটো পয়সা খুলে ওর হাতে দিয়ে বলে, যা নিয়ে আয়। ছাদে যাবি ভাই লুকিয়ে।

মাঠ পেরিয়ে ছেলেটা ছুটে যেত হরিসাধনের দোকানে। এক ঠোঙ্গা তেলেভাজা পেঁয়াজের বড়া কিনে সবাইকে লুকিয়ে চ'লে যেত ছাদে। নিবারণ তখন পুরোপুরি সাধনায় বসেছেন। এ মহলে তখন রান্নাবান্না চড়েছে। মেয়েরা আছে ঘরকন্নার কাজে। বড়দা আপিস থেকে ফেরেনি।

কেষ্টদাসী এলো ছাদে ছায়ার মতন! তারপর বড়াগুলি দুজনে খাওয়া চললো অনেকক্ষণ। কেষ্টদাসী বলল, কারোকে যেন বলিসনে ভাই,—আমাদের এসব খেতে নেই কিন্তু।

তুমি ত' সধবা, মাছ খাও না কেন?

মাছ! তৎক্ষণাৎ কেষ্টদাসীর চোখ উল্‌টে গেল। সে বলল, মাছ! জীবের মধ্যে যে প্রেমময়, সর্বজীবে তাঁর লীলা!—চুপ!

সিঁড়িতে যেন কার পায়ের শব্দ হল। কেষ্টদাসী অমনি তিনটে বড়া একসঙ্গে মুখে পুরে দিল। গরম গরম বড়াগুলি অতি সুস্বাদু।

ছেলেটা বলল, আমাকে কের্তন শিখিয়ে দেবে?

কেষ্টদাসী বলল, তোর সময় কি হয়েছে?

কিসের সময়?

গৌর গৌর গৌর!—কেষ্টদাসী নিঃশ্বাস ফেলে বলল, নাম জপ চাই যে! নাম জপো, নাম ভজো, নাম করো সার রে। প্রভু যখন নাম করেন, দেখিসনি ওঁর মুখ কেমন ঢলঢল করে? দেখিসনি আমার জ্যোতির্ময় শ্রীগুরুকে?

গুরু, কই গুরু?

নিবারণের ঘরের দিকে তাকিয়ে কেষ্টদাসী বলল, ওই-যে, ওই-যে আমার পরম গুরু। আমার বাসুদেব।

উনি ত তোমার স্বামী!

পেঁয়াজের বড়া মুখে, কিন্তু কেষ্টদাসীর চোখে যেন বিভোর মনের ঘন ছায়া পড়েছে। কেমন যেন স্বর্গীয় হাসি হেসে বলে, যেই গুরু সেই স্বামী, আবার সেই ত আমার বাসুদেব!—এবার যাই।

কেষ্টদাসী তা'র একরাশ এলোচুলের ওপর এবার ঘোমটা টেনে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যায়। ছেলেটা ভাবত, ও মেয়ে পৃথিবীর মানুষ নয়। ওর মিষ্ট হাসি, মিষ্ট চোখ, মধুর স্নেহ,—সেগুলো এ পৃথিবীর বাইরের জিনিস। তাকে কোনো কাজে কেষ্টদাসী ফরমাস করলে সে নিজেকে ধন্য মনে করত।

ছেলেটা কীর্তন শেখবার চেষ্টা করতে লাগল। ছাদের আড়ালে, মাঠের কোণায়, হেদুয়ার নিরিবিলি বেঞ্চে, শেষ পর্যন্ত কুমারটুলির গঙ্গার ঘাটে গিয়ে—কীর্তনের চরণ আওড়াত। অমনি ক'রে গুনগুনিয়ে ওঠে যেন ওর ওষ্ঠাধর, অমনি ছায়া যেন ওর চোখে নামে, শ্রীরাধাভাবে অমনি ক'রে রাঙা হয়ে ওঠে যেন ওর ঘামের ফোঁটানামা মুখ—ও যেন দেখতে দেখতে কেষ্টদাসী হয়ে উঠে।

ওদের মহলে মাছ মাংস আসতো না,—কুকুরটা খেতো দুধভাত, আর বেজীটা খেতো দুধকলা। নিবারণ খড়ম পায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেই এক পাশ দিয়ে আসতো শাদা কুকুর, আর বেজীটা এসে ঘুরতো পায়ের তলায়। শিক্ষার

গুণে দুটো জন্তুই ছিল সাম্প্রদায়িক। কেষ্টদাসীর সৎমা ছিল সংসারে, আর ছিল নিবারণের ভাগ্নে, আর ভাগ্নেবৌ। ভাগ্নেবৌ শ্যামবর্ণ আর হাসিখুশী, আর স্বামীর জন্ত একপাশে গিয়ে সে মাছ রাঁধে। এপাশে কেষ্টদাসীরা খায় নিরামিষ, নিবারণের জন্য দুধের মালাই পায়স পিঠে। মাছ রান্নার গন্ধ পেলেই নিবারণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন, গৌর গৌর—কোথা গেলে ?

কেষ্টদাসী সব ফেলে ছুটে আসে। নিবারণ সেই গতিভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলেন, উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী আমার প্রাণ রে!—এবার যে তেল সেবা হবে! তুমি বুঝি বৌমার রান্নার জায়গায় বসে 'নাম' করছিলে ?

এরা এ মহলে একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠত। কেন আড়ষ্ট হত, তা'র রহস্য প্রকাশ পেতো অনেক রাত্রে। ভাগ্নেবৌদের ঘর নিশুতি হয়ে যেত। সৎমা ঘুমিয়ে থাকতো উত্তর পূবের কোণের ভাঁড়ার ঘরে। এদের এ মহলে আর কা'রো সাড়াশব্দ পাওয়া যেতো না। কিন্তু হঠাৎ ক'রে এই ছেলেটার ঘুম ভেঙ্গে যেত মায়ের কাছাকাছি শুয়ে। মা ততক্ষণে উঠে বসেছেন। ও মহল থেকে আসতো দাঁতে দাঁত ঘষা রুদ্ধ আক্রোশের আওয়াজ, শুনতে পাওয়া যেত নিরুদ্ধ আর্তকণ্ঠ! শোনা যেত নিবারণ আর কেষ্টদাসীর ঘরখানা ঝড়ের তাড়নায় আলোড়িত। বাইরে কেবল শাদা কুকুরটা অন্ধকারে ঘরে ঢুকতে না পেরে গোঁ গোঁ করছে রাগে। ছেলেটা আবার ঘুমিয়ে পড়ত। ঘুমের ঘোরে শুনত মায়ের চাপা কণ্ঠস্বর, দুর্গা দুর্গা!

সকালবেলায় দেখত কেষ্টদাসীর সেই মূর্তি। স্নান করা খোলা চুলের উপর অল্প ঘোমটা টানা, কপালে মস্ত সিঁদুরের ফোঁটা, পরনে রাঙ্গাপাড় শাড়ী, নাকে তিলকমাটির দাগ। কীর্তনের আসরে বসে খোকা শুনেছিল, শ্রীরাধা নাকি একশো বছর ধ'রে কেঁদেছিলেন। কেষ্টদাসীর মুখে সে দেখত, একশো বছরের কান্নার পরের বিষণ্ণতা। ওদিকে কিন্তু নিবারণের নামকীর্তন সেই কোন্ সকালে আরম্ভ হয়ে গেছে।

হঠাৎ ওই নামকীর্তনের ভিতর থেকেই আওয়াজ আসতো কর্কশ কণ্ঠে, কোথা গেলে ?

ভাগ্নেবৌয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে কেষ্টদাসী ছুটে যেতো পূজোর ঘরে। ফুলের রাশি এনেছেন সৎমা গঙ্গার ঘাট থেকে। সেই ফুলের একটি মালা মহাপ্রভুর জন্যে, আর একটি নিত্যানন্দের। সেই মালা গাঁথতে ব'সে যেতো কেষ্টদাসী। মালা দুজনের, কিন্তু দুইয়ে মিলে এক। ভাবো মনে মনে। ও যে শ্রীধাম

নবদ্বীপ। নয় দ্বারবিশিষ্ট দ্বীপ, তারই মাঝখানে চৈতন্যের উদয়! গৌর গৌর। 'ও যে প্রেমে ঢল ঢল ঢল গল গল গল ছল ছল ছল অরুণ নয়ানে দুটি ভাই! ও তা'র একটির নাম গৌরহরি আরেকটির নাম হয় নিতাই! ও যে পথে পথে ধায়, হরি হরি গায়...জয় গৌর জয় গৌর!

সুর যেখানে পঞ্চমে ওঠে সেখানেই নিবারণ থেমে যান, কেননা তারপর গলা চিরে যেতে থাকে। কেষ্টদাসী মালা গেঁথে চলে আপন মনে। আর ছেলেটা মনে মনে নিবারণের ওই কীর্তনের চরণগুলি গুনগুনিয়ে ভেঁজে মুখস্থ করে রাখে।

কাঁদছো কেন গো অমন ক'রে?

হঠাৎ নিবারণের গলায় আওয়াজে রান্নাঘরে মায়ের হাতের খুন্তি থেমে যায়। মা উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। বুঝতে পারা যায় তাঁর চাহনির মধ্যে আছে নিরতিশয় উদ্বেগ, তাও বুঝতে দেরি হয় না। কিন্তু তারপরেই নিবারণের কণ্ঠস্বর যায় বদলে—ও, নয়নসলিলে বসন তিতাওল! চোখের জলে মুখ ভেসে যায়, বুক ভেসে যায়! আহা, ব্রজের শুষ্ক রজ ওতে কি সিক্ত হবে?—প্রেমজলে ডুবুডুবু লোচনতারা!

নিবারণ নিজের কণ্ঠে কাঁপন মিলিয়ে কীর্তন গেয়ে ওঠেন। পূজার আয়োজন আছে, কিন্তু ঠিক পূজা নেই। পাট আছে, মন্ত্র নেই। সুতরাং আয়োজনটা সম্পূর্ণ হলেই অনুষ্ঠানের শেষ হয়। সন্ধ্যাবেলা শুধু আরতি, আর মঙ্গলঘণ্টা। নিবারণ ভাবে বিভোর থাকেন। কিন্তু কেউ কি জানে, এই ফাঁকে ছাদের সিঁড়িতে ব'সে দুদিক পাহারা দিয়ে খোকা আর কেষ্টদাসী গরম গরম মাছের চপ আর মটন্ কাট্‌লেট খেয়ে নিচ্ছে? কেউ কি জানে, সমস্ত পূজার আয়োজনের আড়ালে ছেলেটা আমিষ খাদ্য সংগ্রহ ক'রে উদ্‌গ্রীব হয়ে ব'সে থাকে ছাদের সিঁড়িতে, কতক্ষণে কাপড় তুলে আনার অজুহাতে আসবে কেষ্টদাসী? মা থাকেন সন্ধ্যাহ্নিক নিয়ে, ওদের সংমা সারাদিনের পর ঘুমে কাতর, ভাগ্নেবৌ তা'র শিশুকে নিয়ে ঘুম পাড়ায়, আর নিবারণ সুর ক'রে পড়েন চৈতন্যচরিতামৃত। বড়বৌদি আছে রান্নাঘরে।

একতলায় ছাদ। পশ্চিমের বাড়ীটায় দেয়াল উঠেছে অনেক উঁচুতে। চাঁদের আলো আড়াল করেছে ওই মস্ত দেওয়াল, সুতরাং তা'র নীচে একতলার ছাদটা অন্ধকার। হঠাৎ যদি কেউ ছাদে উঠে আসে? আসুক—তা'রা দেখবে কেষ্টদাসীকে, খোকা চক্ষের পলকে উত্তর দিকের গলির নীচে নেমে যেতে পারবে, কেউ জানবে না।

ছেলেটা হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল, রাত্তিরে তোমাদের ঘরে অত শব্দ হয় কেন ?

ওর কাঁধের ওপর থেকে হাতখানা সরিয়ে কেষ্টদাসী বলল, গুরুর যে ভর হয় !

ভর কি ?

হর্ষ কম্প স্বেদ পুলক ! হাসিতে কান্না, কান্নায় হাসি ! তাকে বলে ভর !

তাহলে অত দাপাদাপি কেন ?

কেষ্টদাসীর দুই চক্ষু ভক্তি-বিহ্বলতায় যেন ঝলমল করে। জ্যোতির আভা যেন তা'র সর্বাঙ্গে। বহুদূরের থেকে সে যেন মিষ্ট কণ্ঠে বলে, তিনি যে নাচান্, তিনি কাঁদান্, তিনি ভেঙ্গে খান্ খান্ ক'রে দেন্, তিনিই আবার গ'ড়ে তোলেন ! কান্নায় তিনি গলেন না, যন্ত্রণায় তিনি টলেন না।

ছেলেটা বলল, কই আমি ত ভর হওয়া একবারও দেখিনি ?

কেষ্টদাসী বলল, দেখো সোমবারে।

সোমবারে কি ?

সোমবারে যে মহাপ্রভুর জন্মতিথি এবার। সেদিন আমাদের সকাল-সন্ধ্যে আসর ! রঘুনাথ গোস্বামী আসবেন। ঘটা হবে খুব।

সারাদিন ভয়ানক গরমের পর এবার বাতাস বইছে ছাদের ওপর। ছাদের মেঝে তখনও গরম। সেই হাওয়ায় কেষ্টদাসীর চুল উড়ছিল, আর সেই চুলের গন্ধ পেয়ে ছেলেটা মনে মনে ভাবছিল, কেষ্টদাসী কোন্ তেলটা মাথায় মাখে ! সেই তেল পাওয়া যায় কোন্ দোকানে ! বোধ হয় দিনরাত চন্দন গায়ে মাখলে তবেই কেষ্টদাসীর মতন স্বভাব পাওয়া যায়। ও এসে পৌঁছবার আগেই সুগন্ধ তেল আর চন্দনের সুবাস আসতো খোকার নাকে। খোকার কাঁধে হাত রেখে কেষ্টদাসী যখন সচকিতভাবে গলগলিয়ে তা'র বক্তব্য ব'লে যেত, খোকার বন্য প্রকৃতি ততক্ষণের জন্য যেন শান্ত নম্র হয়ে থাকতো।

উঠোনটা দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ মহলের যাতায়াতের পথটুকু রেখে বাকি অংশটায় আটচালা বাঁধা হয়েছিল। উপরটা তেরপল দিয়ে ঢাকা। খোকাদের এদিক থেকে ওদের আর কিছু দেখা যায় না। খোলের উপর চাঁটি পড়েছে। আজ সোমবার, মহাপ্রভুর জন্মতিথি। ওদের মহলে গিয়ে ফাইফরমাশ খাটতে পেয়ে খোকা ধন্য হয়ে গেছে। কীর্তনের আসর বসেছে

উত্তর দিককার বড় ঘরখানায়। রঘুনাথ গোস্বামী এসেছেন দলবল নিয়ে। অন্যান্য আখড়া থেকে আরো এসেছেন অনেকে। আহারাদির পালাটা বিয়ে বাড়ীর মতন। আয়োজন প্রচুর। খোকা ও-মহলে গিয়ে চন্দন পরেছে, কিন্তু নাকে তিলক কাটতে সাহস পায়নি। কণ্ঠী গলায় দেবার ইচ্ছাটা তার অনেকদিনের, কিন্তু জীবনের অনেক ভালো ভালো ইচ্ছাই অপূর্ণ থেকে গেছে।

খোল আর করতালের আওয়াজে সমগ্র পল্লীটা মুখর হয়ে উঠেছে। সকল কীর্তন-কথার আগে গোরাচাঁদের বন্দনা ক'রে নিতে হয়। তাই ওর নাম গৌরচন্দ্রিকা। ব্রজবিহার, তরণী-যাত্রা, বন-ভ্রমণ, মাথুর—একটির পর একটি পালা। খোকার ওসব জানা নেই, তাই মাঝে মাঝে কেষ্টদাসী এসে কীর্তনের এক একটি বিষয় ওকে জানিয়ে দিচ্ছে। নিবারণ আছেন সকলের মধ্যমণি হয়ে। আজ তাঁর পরনে গরদের ধুতি, কাঁধে বৃন্দাবনী চাদর, সর্বাঙ্গে তিলক-সেবা।

প্রভাতে যে খোল করতালের প্রচণ্ড ঝনৎকার আরম্ভ হয়েছিল, তার সাময়িক বিরতি হল মধ্যাহ্নের পর। কেউ আছেন রাধা ভাবে, কেউ শ্রীকৃষ্ণে, কেউ গোপাল-গোবিন্দে, আবার কেউ বা সুবল সখায়। রঘুনাথ গোস্বামী ছিলেন শ্রীমতী ভাবে। তিনি এক সময় উঠলেন নেচে-নেচে। রং কালো, কদম ফুলের মতন মাথাটা ছাঁটা, গোঁফ দাড়ি কামানো নেই, গলায় আছে পৈতা, কোমরে গামছা বাঁধা—শ্রীমতীর ভাবে-তিনি ভাববিহ্বল! এইটি খোকার প্রথম অভিজ্ঞতা, সুতরাং দৃষ্টি তার সজাগ ছিল, এবং ভক্তিতে আপ্লুত ছিল।

'শ্রীমতী' উঠলেন চোখ বুজে হেসে-কেঁদে। কোথায় তিনি যাবেন, এবং কোথায় গিয়ে থামবেন, তা কা'রো জানা নেই। কিন্তু নেচে নেচে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তিনি এগোচ্ছেন। বুঝতে পারা গেল, গোস্বামীজির ওপর 'ভর' হয়েছে। এখন তিনি কৃষ্ণভাবিনী, কৃষ্ণকামিনী।

আটচালাটা ছোট। ওপাশে কলতলা, পূবদিকে বারান্দা, এদিকে আনা-গোনার পথ। আবার এইটুকুর মধ্যে কাজের বাড়ীর নানাবিধ সামগ্রী থৈ থৈ করছে। কিন্তু শ্রীমতীকে ত যেতে হবে। বৃন্দাবন থেকে মথুরা,—সে যে অনেক পথ! তিনি যাবেন কেমন ক'রে? মাটির খুরি, গেলাস, কলাপাতা এক পাশে, অন্য পাশে জলের জালা, দই মিষ্টির হাঁড়িগুলো একধারে, এক পাশে গামলায় রয়েছে আলু-কুমড়োর ছোকা, এপাশে গরম গরম লুচির চেঙ্গারী,—

কিন্তু শ্রীমতীকে ত যেতে হবে! কত অরণ্য, কত হিংস্র শ্বাপদ আর সরীসৃপ, কত বা দুর্জন আর গুরুজনের ভয়! পথ অন্ধকার, মেঘ-মেদুর আকাশে শ্রাবণের বজ্রগর্জন, অশ্রুজলে তিনি দিশাহারা, বিবশা, বিলোলবসনা! হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ব'লে তিনি যাবেন, মথুরা নগরের প্রতি ঘরে ঘরে। ও বিশাখা, ওরে ও ললিতে! আমি যোগিনী হইয়ে যাবো সেই দেশে যেথায়··· !

বিশাখা আর ললিতা ধরলো রঘুনাথকে। রঘুনাথের জ্ঞান নেই। মথুরা তখনো অনেক দূর। তাঁকে ধ'রে বারান্দায় তোলা হল। হাসছেন তিনি যেন কা'র সঙ্গে! কাঁদছেন যেন কা'র জন্যে! তাঁর চোখ উলটিয়ে গিয়েছে কা'র স্বপ্নে! অচেতন অঙ্গ তাঁর!

উঠোন থেকে খোলের ওপর চাঁটি পড়লো—হরি হরি বল্, হরি হরি বল্! বিশাখা আর ললিতা—মানে, মদনমোহন দাস এবং আরেকজন ছোকরা বোষ্টম, —রঘুনাথের টাল সামলাচ্ছে অতিশয় সন্তর্পণে। আপশাশে তোরঙ্গ বাক্স, হাঁড়ি কড়াই, বিছানা বাসন,—একেবারে একাকার। ওর মাঝখান দিয়েই শ্রীমতীকে যেতে হবে অভিসারে। কিন্তু রঘুনাথ বাধা মানবেন না আজ! ভক্তিরসে বিহ্বল হয়ে নিবারণ শিবনেত্রে চেয়ে রয়েছেন সেইদিকে। সবাই তটস্থ, স্তব্ধ, আকুলিত। মাঝে মাঝে ডুকরে কেঁদে উঠছে অনেকে।

ছেলেটা ভাবছিল শ্রীমতী থামবে কোথায়! কোথায় পথের শেষ!

অবশেষে থামলেন তিনি ঘরে গিয়ে। ললিতা আর বিশাখা তাঁকে ধরাধরি ক'রে কোনোমতে দাঁড় করালো কুশাসনের উপর—যেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পাতা পড়েছে। তিনি লুটিয়ে পড়ছিলেন প্রায় দুজনের হাতের মধ্যে, কিন্তু তা'রা রঘুনাথকে বসিয়ে দিল আসনে। শ্রীমতীর সামনের পাতে গরম গরম লুচি-তরকারি পড়েছে।

ছেলেটা মুখ ফিরিয়ে তাকাল কেষ্টদাসীর দিকে। বুঝতে পারেনি, এতক্ষণ সে খোকারই পিছনে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদছিল। তা'র কান্না দেখলে পাষাণ গ'লে যায়।

কাঁদছো কেন অমন ক'রে?

হঠাৎ হুঁস হল কেষ্টদাসীর। বলল, অ্যাঁ?

ছেলেটা বলল, এত চোখের জল কোথায় থাকে তোমার?

চোখ মুখ তা'র যেমন ফোলা, তেমন রাঙা। আঁচলে মুখ মুছে কেষ্টদাসী শুধু বলল, এ যে প্রেমাশ্রু! এর কি শেষ আছে?

প্রহার এবং উৎপীড়ন ছাড়া মানুষ কাঁদে কেমন ক'রে—একথা সেদিন

ছেলেটার জানা ছিল না। অহেতুক যন্ত্রণাবোধও যে মানুষকে অনেক সময় কাঁদায়, একথা কি সে জানত সেই বয়সে? সুতরাং সংশয়াচ্ছন্ন মন নিয়ে সে কেষ্টদাসীর কাছ থেকে স'রে গেল। মাঠের সামনে ওই রাসবাড়ীর জীবন দাস ওকে আড়ালে পেয়ে কান ম'লে থাপ্পড় দিত—কেননা ওর ছেলে নীলুর সঙ্গে সে খেলে বেড়াত, এবং তা'তে নীলুর স্বভাবচরিত্র নাকি নষ্ট হত। জীবন দাসের প্রহারটা সয়ে যেত, কিন্তু নীলুর সঙ্গে বিচ্ছেদের কল্পনাটা তার সইতো না। আড়ালে গিয়ে একটা কানের জ্বালার সঙ্গে তার ভিতরের যন্ত্রণাটা মিলে যেত, এবং হু হু ক'রে জল এসে পড়তো দুই চোখে। সে জল নীলুর জন্যে। ওরই নাম কি প্রেমাশ্রু!

অমন জল অনেকের জন্যই পড়েছে আগে আর পরে। দীপু গুণ্ডা যেদিন মার খেলে পুলিশের হাতে, বস্তিদের বাড়ীর হীরেন এম-এ পড়তে পড়তে যেদিন হেদোয় ডুবে আত্মহত্যা করলো, নন্টুর মাকে যেদিন কপালে কলঙ্ক মাখিয়ে বাড়ী থেকে তাড়ানো হল, সুলতা যেদিন প্রথম শ্বশুরবাড়ী গেল, বুড়ো পূর্ণ পণ্ডিতকে নিয়ে যেদিন গঙ্গাযাত্রা করলো,—জল পড়েছে বৈ কি চোখ দিয়ে। কিন্তু সে-জল তা'রা কেউ দেখে যায়নি, এ ছেলের চোখে জল আসতে পারে একথা কেউ স্বীকার করতো না।

এই যেমন আজকে। কেষ্টদাসীর মনে বোধ হয় এই আশা ছিল যে খোকার চোখেও নামবে ওদের ওই প্রেমাশ্রু। কিন্তু ও চ'লে গেল বাইরে, ওদের লুচির চেঙ্গারীর প্রতি যেন আজ ওর লোভ ছিল না। তার মনে বিক্ষোভ জ'মে উঠেছিল কেন, সে বেশ জানে। বৈশাখের রোদে কেষ্টদাসীর টকটকে মুখখানা, তা'র ওপরে দরদর ঘাম। সকাল থেকে জল পড়েনি ওর মুখে। এতগুলো বোষ্টমের সেবা, এতটুকু বিশ্রাম নেই। কথায় কথায় আবার ওর ওপর নিবারণের চাপা তাড়না, তা'র ফলে মুখে ওর বিষণ্ণতা! এর ওপর আবার যদি দেখা যায় ঝরো ঝরো প্রেমাশ্রু, তবে অসহ্য। সুতরাং বিক্ষোভ আর তিক্ততা নিয়ে সেই দুপুরে ছেলেটা চ'লে গেল কোন্ গলি থেকে কোন্ গলি পেরিয়ে। যদি সেদিন রাস্তার যে কোনো লোকের গালে চড় মারতে পারত তবে সে খুশী হত।

দিদিমা এলেন অনেক দিনের পর। দিদিমা যেন সকলের মুক্তি, উদ্দাম স্বাধীনতার প্রতীক্। চঞ্চল অধীর বালক ছুটে গিয়ে বসলো তাঁর পাশে। পরিশ্রান্ত পথিক এসে বসলো যেন গঙ্গার উদার স্নিগ্ধ হাওয়ায়। এখানে তাপ

শীতল হবে, তৃষ্ণা মিটবে।

দিদিমা বললেন, কই রে, তোরা কোথায়? কেমন আছিস সব? অনেক দিন আসতে পারিনি! সত্তর বছর বয়েস হ'তে চললো, আর কি অত হাঁটতে পারি? কেমন আছিস বাপি?

সেদিন দিদিমার নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিতে সে পারেনি, কেননা ওই প্রেমাশ্রুটায় হয়ত তার গলা বন্ধ হয়ে যেতে পারতো। কেউ কোনো প্রশ্ন না ক'রে ওকে উপলব্ধি করলে তৃপ্তি পেত। লাঞ্ছনা আর উৎপীড়নের দাগ তার সর্বদেহে মনে। ব্যথা তার নিবিড়—যেন একশো বছরের ব্যথা! কত কাল ধ'রে সে যেন মার খাচ্ছে—কত যুগ-যুগান্তর। ব্যথা তার ছড়িয়ে আছে এখানে, ওখানে—সমস্ত কলকাতায়।

মা এসে দাঁড়ালেন। দিদিমা বললেন, এসো মা এসো। পোড়া চোখে কাল থেকে ঘুম নেই। শেষ রাত্তিরে স্বপ্ন দেখলুম, তোদের এখানে যেন অসুখ। তাই আর থাকতে পারলুম না। একটা চোখে দেইতে পাইনে, তবু ভাতে-ভাত দুটো মুখে দিয়ে এলুম ছুটতে ছুটতে। হ্যাঁ গা, ছেলেটা কাঁদে কেন, বল্ দিকি?

আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মা বললেন, ও তোমার কাছে থেকে ইস্কুলে যাবে তাই দু'দিন বায়না ধরেছে।

দিদিমা হাসলেন। বললেন, ওমা, তার জন্যেই ত এলুম! তোদের আর ভাড়া দিয়ে এখানে থেকে কাজ নেই মা। মাসে মাসে এগারো টাকা ভাড়া গুনবি কোত্থেকে? আমি তোদের নিতে এলুম। চল্, বাড়ী মেরামত আমার হয়ে গেছে।

মা রাজী হলেন। সকলের ফিরে যাবার দিন স্থির হয়ে গেল। খোকা নেচে উঠল এবং তেতে উঠল। আবার যাবে দিদিমার বাড়ী, আবার ফিরে পাবে সেই পল্লী,—যার সঙ্গে তাদের দেড় বছরের বিচ্ছেদ।

ওদের যাবার কথা শুনে নিবারণ দুঃখিত হননি। কেননা তাঁর ধারণা, এ-মহলটা ভাড়া দিলে তিনি পনেরো টাকা নিশ্চয় পেতে পারেন। ওদের জন্য তিনি এতদিন ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছেন।

যাবার আগের দিনও খোকা হরিসাধনের দোকান থেকে খাবার এনেছিল। লোকচক্ষের আড়ালে ভাগ্নেবৌ আর কেষ্টদাসী দুজনেই এসে চোরা ভোজনের আসরে যোগ দিল। কিন্তু কাপড়চোপড় প'রে নেমন্তন্নে বেরোবার আগে নিবারণ যে কলতলাটার দিকে হঠাৎ আসতে পারেন, এ ওদের কল্পনার বাইরে ছিল। একেবারে সামনা-সামনি হাতে-নাতে ধরা পড়া। সুস্বাদু কাট্‌লেটের

উপরে কেষ্টদাসী সবেমাত্র কামড় দিয়েছে, সেই মুহূর্তে নিবারণের আবির্ভাব। কাট্‌লেটের সুগন্ধ তাঁর জানা ছিল।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে নাকি এসব একেবারেই নিষিদ্ধ। তার ওপর আবার এসব বাইরের দোকানের জিনিস, যা ছুঁলে গঙ্গাস্নানে যেতে হয়। তাঁরা স্বামী স্ত্রী মিলে অত্যন্ত কঠোর ব্রত পালন ক'রে থাকেন। আজ সমস্তটাই অশুচিতে ভ'রে উঠলো। কিন্তু প্রচণ্ড আক্রোশ আর উত্তেজনা সত্ত্বেও নিবারণ কিছু বললেন না,—সামনে ভাগ্নেবৌ! তিনি একবার তাকালেন খোকার দিকে,—তারই হাতে ঠোঙাটা; পরে তাকালেন কেষ্টদাসীর দিকে। তারপর যেমন এসেছিলেন তেমনিই চ'লে গেলেন।

ভাগ্নেবৌ স্তব্ধ, কেষ্টদাসী আড়ষ্ট, ছেলেটা হতবাক। নিষিদ্ধ ভোজনের ফলে যে-ধর্মচ্যুতি ঘটলো, তা'র প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে? সে যে ভয়াবহ পরিণাম!

পরদিন সকাল থেকে কেষ্টদাসীকে আর দেখা যাচ্ছিল না। ভাগ্নে, ভাগ্নেবৌ, সংমা এবং পরিশেষে নিবারণ নিজে এসে ভাড়াটেদের কাছে বিদায় নিলেন। ওদের মালপত্র গরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে চলেছে। খোকার চোখ ছিল এখানে ওখানে। সে বুঝতে পাচ্ছে কেষ্টদাসী আজ শোবার ঘর থেকেই বেরোয়নি।

কেন বেরোয়নি সে-জবাব এক ফাঁকে নিজেই এসে দিল কেষ্টদাসী। ভাড়াটেকে বিদায় ক'রে দিয়ে নিবারণ তেল সেবা করতে গিয়েছেন কলতলায়, সেই দুর্লভক্ষণে ছেলেটার ভিতরের ক্রুদ্ধ সাপটা আবার এলো ঘুরে ফিরে মাথার মণি খুঁজতে। ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো কেষ্টদাসী, এবং পাছে গলার আওয়াজ করলে নিবারণ শুনতে পান্, এজন্য হঠাৎ গায়ের কাপড় সরিয়ে দিয়ে সে বলল, দেখে যা রে! এ শাস্তি পেয়েছি মহাপ্রভুর হাত থেকে। এ তাঁর প্রেমের চিহ্ন!

ব্যাধের বাণ বিদ্ধ হয়েছে একটির পর একটি রক্তিম শ্বেতবর্ণ রাজহংসীর সর্বাঙ্গে। গলায় পিঠে হাতে বুকে কালশিরার দাগ। ছেলেটা শিউরে উঠল। ইশারায় প্রশ্ন ক'রে জানতে চাইল, কি জন্য তা'র এত বড় শাস্তি!

শূন্য মহলের দিকে চেয়ে কেষ্টদাসী সরে এসে ছেলেটার কানে কানে বলল, চলে যা। গুরুর আদেশ, কিছু বলতে নেই!

জল ঝরছিল তা'র চোখে। খোকা তাকাল এই সতেরো আঠারো বছরের মেয়েটার ভিজা মুখখানার দিকে। কিন্তু সেই অনর্গল অশ্রুটা কিসের, আজকে আর কেষ্টদাসী সে কথা বলতে পারলো না। সে-অশ্রুর ভাষা অশ্রুত থেকে গেছে।

রুদ্ধ বিষশ্বাস নিয়ে সাপটা বেরিয়ে চলে গেল মাঠের দিকে। পিছন ফিরে আর সে দেখেনি সেই দুটো প্রেমাশ্রুভরা চোখ।

॥ ৬ ॥

দিদিমার বাড়ীতে ফিরে এসে আবার ওই ছেলেটা পেয়েছিল সেই প্রাচীন পরিচিত মধুর জীবন। ছোটবেলাকার সমস্ত চিহ্ন এখানে ওখানে জেগে রয়েছে। সেই বৈশাখের দুপুরে ফেরিওয়ালা হেঁকে চলে যায় পুরোনো পাড়ার সরু পথ দিয়ে। শিশুকালের চক্ষে ওই পথটাকেই মনে হত কত দীর্ঘ,—যেন ও-পথটা হারিয়ে গেছে কোনো তেপান্তরে গিয়ে।

মামা একদিন বাড়ী ফিরে এসে বললেন, এবারে আর সাতশো রাক্ষুসীর ঘরে হাঁড়ি চড়বে না—ব'লে রেখে দিলুম।

দিদিমা বললেন, অলক্ষণের কথা শোনো! বলি কেন, কি হয়েছে শুনি?

মামা চোখ-মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, কলিযুগের শেষ হবে এবার! বড়বাজারে নবগ্রহের যজ্ঞ বসেছে, খবর কি কিছু রাখো? মহামারী, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প। তোমাদের পাখীর বাসা ভাঙবে এবার। এই যুদ্ধে সব শেষ।

দিদিমা বললেন, কোথায় যুদ্ধ?

মুখ বেঁকিয়ে মামা বললেন, ইউরোপে—তোমার বাপের বাড়ীতে! ইউরোপ কোথায় জানো?

দিদিমা মুখ তুলে চেয়ে রইলেন। মামা বললেন, এ যুদ্ধে আর কাউকে বাঁচতে হবে না! সব আমি শুনে এলুম গোবর্ধনের দোকান থেকে। ছেলে-পুলে রাস্তায় যদি বেরোয় আমি বাঁচাতে পারবো না। হেদোর মোড়ে সব সেপাই ব'সে গেছে। টুঁ শব্দটি করেছো কি একেবারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর!

মামা আরো ব'লে দিলেন, এ যুদ্ধে ইংরেজ যদি হারে তবে বংশে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না। দেশে অরাজকতা আর প্রলয়। আর যদি জেতে, তবে দেখে নিয়ো তোমার মেজ জামাইয়ের মতন আমিও রায়-বাহাদুর টাইটেল পেয়ে যাবো।

মামা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

রামখোকার মাসতুতো ভাই শ্রীমান্ নন্দদা। তাকে ঘিরে ছিল এক অন্ধ অপরিণামদর্শী মাতৃস্নেহ,—খোকা সেটি ভোলেনি। নন্দদার চোখ দুটো লাল। বড় বড় তারা দুটোয় রক্তের দাগ জেগে থাকতো। কবে যেন

কোন্ ডাক্তার বলেছিল, এখন থেকে যদি চোখের চিকিৎসা না করা হয় তবে ভবিষ্যতে চোখ দুটো নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

খুনী মাসিমা কেঁদে উঠলেন। তাঁর ওই একটিই ছেলে। ওকে নিয়েই তিনি বিধবা হয়েছেন আজ বছর পাঁচেক হল। খুনী মাসিমা ডাক্তারের কথা শুনে প্রথমে কাঁদলেন চেঁচিয়ে যাতে সবাই শোনে। তারপর কাঁদলেন ডুকরে-ডুকরে। তারপরে কাঁদলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কিন্তু যে ব্যক্তির চোখের অসুখ, সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে চড়িভাতি করতে গেল, কিংবা ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে ছাদে উঠলো, কিংবা পাড়ার ছেলের কাছে সাইকেল বাগিয়ে নিয়ে গেল তখনকার বালীগঞ্জের দিকে বেড়াতে। খোকারা রইল খুনী মাসিমার আশেপাশে। সমস্ত রাত্রি ধ'রে তিনি বারান্দার ধারে পড়ে অত্যন্ত করুণ নিঃশ্বাস ফেলেন, একা ব'সে থাকলে তাঁর চোখ বেয়ে জল পড়ে,—এরা কেউ কাছে গিয়ে বসলে তিনি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চ'লে যান্। তাঁর নিজের ছেলেটির যদি দুই চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়, তবে অপরের দিকে তাকাতে তাঁর ভালো লাগবে কেন?

ডাক্তার বলেছিলেন, চোখ দুটোর রীতিমতো চিকিৎসা না হওয়া পর্যন্ত খুব বেশী পড়াশুনো করাটা ভালো হবে না। ওতে নাকি দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হওয়া সম্ভব।

নন্দদা এর আগে নীচের ক্লাসে ফেল করেছিল বার দুই। ইস্কুল যাবার নাম ক'রে সে যেত গঙ্গায় সাঁতার কাটতে,—সঙ্গে তা'র থাকতো গুলু ওস্তাগর লেনের বন্ধু—জলিস আর কেষ্টা—ওরা তিনজনে মিলে হাফপ্যান্ট পরে সারাদিন ধ'রে গঙ্গায় সাঁতার কাটতো, আর বাড়ী এসে পৌছতো ঠিক বেলা চারটের সময়ে যখন ইস্কুলের ছুটি হয়। হাতে বই খাতা, পরনে ধুতি আর জামা। চোখ দুটো লাল। সেই লাল চোখ দেখে খুনী মাসিমা আবার ডুকরে কেঁদে উঠতেন। বলতেন, পড়াশুনো করতে গিয়ে আমার ছেলের চোখ দুটো যদি যায়, তবে নাইবা হোলো পড়াশুনো! চোখ যদি বাঁচে, তবে ভিক্ষে করেও খেতে পারবে! নন্দ, বাবা—বই-খাতা তুই আর ধরিসনে।

খুনী মাসিমার কান্না দেখে নন্দদা চোখ পাকিয়ে ব'লে উঠতো, একজামিন্ দিতে হবে না? আমার হয়ে তুমি পাস করবে? লেখাপড়া ছাড়লে খেতে দেবে কেউ?

নন্দদার নাকটা টেপা—চোখ দুটোর সঙ্গে প্রায় সমতল। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তা'র এমন নিবিড় অনুরাগ দেখে খুনী মাসিমা আবেগে অধীর

হয়ে আঁচলে চোখ মুছতেন। খোকা জানত ইস্কুলে না গিয়ে নন্দদা রাস্তায় রাস্তায় গুলি খেলে আর লাট্টু ঘোরায়; জলিল আর কেষ্টর সঙ্গে এমন সব জায়গায় সে আনাগোনা করে আর তাস খেলতে ব'সে যায়, যেখানে কখনো যেতে নেই! নন্দদা কোত্থেকে যেন টাকা আনে, আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে খাবারের দোকানে ঢোকে, কিংবা গাড়ীভাড়া দিয়ে টিকিট কিনে খেলা দেখতে যায়। লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে থিয়েটারেও যেতে দেখা গেছে। কিন্তু এ সব খবর খোকার মুখ দিয়ে বেরোলে আর রক্ষে নেই। নন্দদার নামে যদি কা'রো মুখ থেকে নিন্দে রটে, তবে খুনী মাসিমা চিৎকার ক'রে তা'র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন—এই ছিল ভয়। সবাই জানতো, লেখাপড়ায় নন্দদার এতটুকু মনোযোগ নেই, এবং পাড়ার অনেকগুলি ছেলে নন্দদার দলে মিশে একেবারে নষ্ট হতে বসেছে। পাশের বস্তির পিছনে গিয়ে হাওয়া-গাড়ী-মার্কা সিগারেট খাওয়া, মতি মিস্তিরদের বাগানে গিয়ে লুকিয়ে ময়লা তাস সাজিয়ে জুয়া খেলা, কেষ্টদের ঘরে গিয়ে হারমোনিয়ম বাজানো—আর নয়ত এক একদিন অনেক রাত পর্যন্ত থিয়েটার দেখে বাড়ী ফেরা। এ সমস্ত কথা যদি কখনো খুনী মাসিমার কানে উঠতো, তবে তিনি চিৎকার করতেন। বিধবার এক ছেলের বিরুদ্ধে পাড়াপ্রতিবেশী সবাই যে একজোট হয়েছে, এই সত্য আবিষ্কার করতে তাঁর এক মিনিটও দেরি হত না।

নন্দদার চোখের চিকিৎসা হয় না, কিন্তু খুনী মাসিমা ছুটে যান গোয়াবাগানের শীতলাতলায়, কাঁসারিপাড়ার ঠাকুরবাড়ীতে, ঠনঠনের কালীতলায়, আনন্দময়ীর মন্দিরে,—আর নয়তো কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা মানৎ করতে। বনের পশুপক্ষী কেঁদে যায় খুনী মাসিমার দুঃখে। গরীবের ছেলে, মাথার ওপর কেউ নেই, ভবিষ্যতের সংস্থান নেই, উপার্জন ক'রে খাওয়াবার মতন মানুষ নেই,—এর ওপর চোখ দুটি যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে মাতাপুত্রে দাঁড়াবে কোথায়?

খুনী মাসিমা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হন্। অন্নজলের দিকে তাঁর রুচি থাকে না, ঘরকন্নার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, পরিবারস্থ সকলের প্রতি তাঁর ভ্রূক্ষেপও নেই,—মুখের উপরে কাপড় মুড়ি দিয়ে তিনি এক কোণে পড়ে থাকেন। সমস্ত বাড়ীটায় অশান্তি আর উদ্বেগ যেন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

নন্দদা গিয়ে কাওরাপাড়ার বস্তিতে ঢোকে। সেখানে পাঁচু পালের সঙ্গে ব'সে তুবড়ী আর ফানুস তৈরী করে, আর নয়তো সবাইকে নিয়ে ব'সে বটতলার বই পড়তে পড়তে হেসে খুন হয়। খোকা যায় অনেক সময় নন্দদার পিছু পিছু...

তবে তার ডিগডিগে চেহারাটার জন্য শান্তির ভয় ছিল প্রচুর। পাচু পাল নন্দদাকে পয়সা যোগাড় ক'রে আনতে বলে। ওরা ঝুপসি ঘরের মধ্যে ব'সে বিড়ি টানতে থাকে।

ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে নন্দদা যখন ছাদে ওঠে, খুনী মাসিমা যান্ তার সঙ্গে সঙ্গে। খোকা লাটাই ধরে, নন্দদা ঘুড়ি ওড়ায়, আর ছাদের সিঁড়ির শেষ ধাপটির ওপর ব'সে খুনী মাসিমা ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে কাঁদেন। খোকা ভাবত তিনি কাঁদেন কেন! একদিন খুনী মাসিমা এগিয়ে এসে নন্দকে ডাকলেন,—'নন্দ, বাবা, ঘুড়িটে কি ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছিস?

নন্দদা তখন তিনকড়ি চাটুজ্যের ঘুড়ির সঙ্গে প্যাঁচ খেলছিল। অন্যমনস্ক ভাবে বললে, হ্যাঁ, একটু একটু পাই।

ব্যস!—কেঁদে উঠলেন খুনী মাসিমা, মধুসূদন, নারায়ণ! তুমি বাছার চোখ দুটি রেখো বাবা! সিদ্ধেশ্বরী কালীকে আমি সোনার চোখ গড়িয়ে দেবো! নন্দ, বই পড়তে কি খুবই কষ্ট হয়?

আঃ তুমি যাও এখান থেকে!—নন্দ কঠিন লাল চক্ষে খুনী মাসিমাকে ধমকে ওঠে। তার চোখের তারা দুটোর নীচে শাদা অংশটায় রক্তের রেখা দেখা যায়। তারপর বলে, একশোবার বলেছি না যে, তেমন কষ্ট হয় না! শুধু চোখ দুটো জ্বালা করে, জল পড়তে থাকে, আর মাথা ঘুরে বমি আসে!

আঁৎকে ওঠেন খুনী মাসিমা! বলেন, অ্যাঁ, কি বললি?

বলবো আবার কি? ঘ্যানঘ্যান ক'রো না এখানে। লেখাপড়া করতে গিয়ে যদি মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে যাই, তা'তে তোমাদের ক্ষতি কি? লেখাপড়া হলেই হল!—ভো কাটা! দুয়ো—দুয়ো—

তিনকড়ির ঘুড়ি কেটে গেছে। নন্দদা আনন্দে চীৎকার ক'রে ওঠে। পিছনে ফিরে দেখা যায়, খুনী মাসিমা তখন আবার ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। নন্দদার সুগভীর অভিমানের কথা শুনে তাঁর বুকের মধ্যে সমুদ্র উথলে উঠছে। তিনি নন্দদার চক্ষুরত্ন দুটির জন্য মন্দিরে-মন্দিরে ঠাকুরের পায়ের তলায় মাথা কুটছেন বটে, কিন্তু চিকিৎসা করবার চেষ্টা একবারও করেন নি, তাই নন্দদার এই অভিমান।

খুনী মাসিমা চোখের জল মুছে নীচে নেমে গেলেন।

পরদিন সকালে বহু চেষ্টার পর চারটি টাকা যোগাড় ক'রে খুনী মাসিমা নন্দদার হাতে দিয়ে চোখের ডাক্তারের কাছে পাঠালেন। খোকাকে যেতে বললেন সঙ্গে। কিছুদূর গিয়ে নন্দদা খোকাকে এক মনোহারির দোকানের

সামনে দাঁড় করিয়ে গেল ডাক্তার-বাড়ীর দিকে। প্রায় পনেরো মিনিট। তারপর সে ফিরে এসে দু আনা খরচ ক'রে এক শিশি ভেসেলিন পমেড কিনলো, এবং রাস্তার কলের জলের সাহায্যে লেবেলটি তুলে ফেলে বাড়ীর দিকে চললো। খোকাকে এক সময় শাসিয়ে রাখলো, খবরদার, আমার বিষয় কোন কথা তুই বাড়ীতে বলবিনে। এই নে, চার পয়সার দই খাস।

চারটি পয়সা নন্দদা ওর হাতে দিল। সেই পয়সা পেয়ে খোকা কেবল যে পরম কৃতার্থ বোধ করল তাই নয়। ও ভাবল, এত বড় দাতাকর্ণও ভূভারতে নেই।

যাই হোক, বাড়ী ফিরে আসতেই খুনী মাসিমা আলুথালু হয়ে ছুটে এলেন, —ডাক্তার কি বললে, নন্দ?

নন্দদা নিঃশ্বাস ফেলে ধপ ক'রে মেঝের ওপরেই ব'সে পড়লো। সেই হতাশ মুখ দেখে মায়ের প্রাণ হাউ হাউ ক'রে উঠলো। নন্দদা বলল, চোখ নষ্ট হওয়ার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভালো!

অ্যাঁ! আত্মহত্যে? কেন, বাবা? কি বললে ডাক্তার?

ডাক্তার বলল, তেমন আশা নেই। তবে অনেক দিন ধ'রে ওষুধ চালাতে হবে—এই ব'লে নন্দদা সেই লেবেল তোলা পমেডের শিশিটা বা'র করলো। পুনরায় বলল, চার টাকাই ডাক্তার নিল, আর এই ধার ক'রে ওষুধ এনেছি—আড়াই টাকা! ওবেলা টাকা দিয়ে দিয়ো।

মেশোমশায় মারা যাবার আগে কিছু রেখে যাননি। সামান্য কিছু জামা কাপড়, কতকগুলো পেতল কাঁসা, গোটা তুই তিন বাক্স-প্যাঁটরা, মাকড়ি-নাক-ছাবি, বাঁধানো-শাঁখা-নোয়া এবং দড়িহার মিলিয়ে আন্দাজ শতখানেক টাকার সোনাদানা। তিন চার মাস ধ'রে নন্দদার চোখের চিকিৎসার পর দেখা গেল, চোখের উন্নতি তেমন কিছু হয়নি বটে, তবে মাসিমা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তিনি কালীঘাটে যে জোড়া পাঁঠা মানত করেছিলেন,—সেই ছাগল দুটি কিনতে গেলে অন্তত পাঁচ ছয় টাকা লাগবে বৈকি! কিন্তু সে টাকাও বর্তমানে যোগাড় করা আর সম্ভব নয়।

অবশ্য এই চার মাসের মধ্যে নন্দদার অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছিল। পাঁচু পাল নাকি তা'কে উপহার দিয়েছে সিল্কের পাঞ্জাবি আর রেশমী রুমাল, জলিল তা'কে নাকি দিয়েছে ফাউন্টেনপেন আর পামসু জুতো। কেষ্ট দিয়েছে দুই শিশি এসেন্স। নন্দদা মাথায় এতদিন ধ'রে লাগিয়েছে ভেসেলিন পমেড, আর আলবোট কেটে টেরি বাগিয়েছে। তার রেশমী পাঞ্জাবীর পকেটে

হাওয়াগাড়ী সিগারেটের বদলে কাঁচি সিগারেটের বাক্স আর দেশালাই খড়খড় করে। থিয়েটার দেখে সে বাড়ী ফিরে আসে অনেক রাত্রে। অনেক রাত্রি হলে কিন্তু অসুবিধা নেই, কেননা কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। সমস্ত দিনের বেলাটা সূর্যের আলোয় তা'র দুই চোখে যন্ত্রণা হয়, রাত্রে অন্ধকারে বাগানে গিয়ে অনেকক্ষণ নিরিবিলি ব'সে থাকলে চোখ আর মাথা দুই ঠাণ্ডা থাকে।

মামা একদিন খুনী মাসিমাকে ডেকে বললেন, ওরে, তোর ছেলেকে দেখে এলুম পগেয়াপটির মোড়ে—গ্যাঁড়াতলা থেকে খানিকটা এগিয়ে—

কেন, সেখানে কেন?

গাঁটকাটার দলে ভিড়েছে যে!

আমার ছেলের নামে এত বড় বদ্‌নাম দিচ্ছ তুমি?—খুনী মাসিমা চীৎকার ক'রে উঠলেন,—তুমি নিজে কি? তুমি ঠকিয়েছ কত লোককে! কত লোককে ধাপ্পা দিয়ে টাকা মেরেছ! তোমার কোন্ গুণে ঘাট আছে?

মামা খানিকটা দাঁড়ালেন। পরে বললেন, হুঁ, আমার বাপের টাকায় খেয়ে-প'রে আমারই ওপর তম্বি! কেমন?

নন্দদার চরিত্রের প্রতি এমন ভয়ানক কটাক্ষ শোনা ইস্তক খুনী মাসিমা মেঝের উপর প'ড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলেন—এক সময় সহসা মুখ তুলে হাউ হাউ ক'রে বললেন, ছেলে যদি আমার মন্দ হয়েই থাকে, তবে মামার মতনই ভাগ্নে হয়েছে।

মামার মতন ভাগ্নে!—মামা ভিতর থেকে একবারটি বেরিয়ে এলেন। পুনরায় বললেন, মামা গাঁট কেটেছে, কিন্তু ধরা পড়েনি কখনো! তোর ছেলে হল কাঁচা চোর। ধরা পড়লেই মরা—এই বলে রাখলুম! বলে কিনা মামার মতন ভাগ্নে! রাম বলো! বলে, রামে আর রামছাগলে!

মামা আবার ঘরে ঢুকে তামাক টানতে বসলেন।

কিছুদিন পরে কোথা থেকে যেন ফিরে এসে নন্দদা হঠাৎ একদিন ঘোষণা করলো, সে বিদেশে যাবে!

বিদেশে!

খুনী মাসিমা সবেমাত্র হবিষ্যি করতে বসেছিলেন। সেদিন দ্বাদশী। তিনি আঁতকে উঠে ভাত ফেলে দৌড়ে এলেন। বললেন, কোথা যাবি বাবা? কোন্ বিদেশে, নন্দ?—তাঁর গলা কান্নায় আটকে গেল।

নন্দদা উত্তর দিল না। জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো। খুনী মাসিমা কাছে এসে তা'র মাথায় হাত রেখে বললেন, নন্দ,

কি হয়েছে বাবা? কোন্ দুঃখে যাবি বিদেশে? হ্যাঁ, বাবা, কথা বলছিসনে যে?

খুনী মাসিমা ফুঁপিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পরে নন্দদা তার কণ্ঠে গভীর বেদনা নিয়ে বলল, সকলের চক্ষুশূল হয়ে থাকার চেয়ে সকলের চোখের আড়ালে চ'লে যাওয়াই ভালো!

সন্তানের এই বেদনায় জননীর প্রাণ আকুল-ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কেঁদে উঠে খুনী মাসিমা বললেন, তুই চক্ষুশূল হয়ে চলে গেলে আমি আর এখানে থাকবো মনে করেছিস? মা-গঙ্গার কোলেও কি আমার ঠাঁই হবে না, নন্দ? কিন্তু তুই কোথায় যাবি, বাবা? নন্দ, আমার সাত রাজার ধন!

নন্দদা গভীর ও উদাস কণ্ঠে বলল, যাবো অনেক দূরে—জাহাজে চ'ড়ে সে দেশে যেতে হয়!

অ্যাঁ! জাহাজে! সমুদ্দুরের পথে!—খুনী মাসিমা ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন। বাড়ীর সমস্ত বাতাসটা যেন সেই ব্যথায় ও কাতরতায় ঘুলিয়ে উঠলো। তিনি অনেকটা যেন ভেঙ্গে পড়লেন বিছানার একপাশে। কাঁদলেন তিনি অনেকক্ষণ। তারপরে একসময় বললেন, কোন্ দুঃখে তুই সমুদ্দুর পেরিয়ে যাবি, বাবা? হ্যাঁরে, নন্দ?

নন্দদাও তার মায়ের সঙ্গে ককিয়ে উঠলো, আমার জীবনের কি দুঃখ, তা তোমরা কি জানবে?

আমি জানবো না, তবে কে জানবে বাবা?

অনেকক্ষণ পরে নন্দদা বলল, যাকগে, আমাকে যেতেই হবে সে-দেশে। এদেশে লেখাপড়া হলো না,—সে-দেশেই যাবো। যদি কোনদিন অন্ধ হয়ে যাই, তবে সে-দেশের লোক কি আর আমাকে দয়া করবে না? আমার দুঃখ নিয়ে আমি চ'লে যেতে চাই!

সমস্ত দিন ধ'রে নন্দদা বিছানায় প'ড়ে রইলো, আর সমস্ত দিন ধ'রে খুনী মাসিমা সেই একভাবে কাঁদতে লাগলেন আর ছেলেকে কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। অবশেষে যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলো তখন নন্দদা বালিশের পাশ থেকে মুখ তুলে বলল, আমি কথা দিয়েছি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে, তিনি আমার জন্যে টিকিট কিনেছেন। যদি তোমরা সবাই মিলে আমাকে যেতে না দাও, তবে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে, তা জানো?

বড় বড় চোখ মেলে নন্দদা মায়ের দিকে তাকালো। সেই চোখে নিশ্চিত আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত দেখতে পেয়ে খুনী মাসিমা শিউরে উঠলেন।

কী কান্না দীর্ঘ রাত পর্যন্ত! খোকা নন্দদার পাশে শুয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। খুনী মাসিমার কাতর কান্না দেখলে বনের পশুপক্ষীও বোধ হয় কেঁদে যায়। মনে হচ্ছিল নন্দদার হয়তো চোখের অসুখ, কিন্তু মাসিমা যে একেবারেই অন্ধ! অজ্ঞান ব'লেই না অন্ধ! মা মাত্রেই বোধ হয় অন্ধ!

ডুকরে-ডুকরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে—খুনী মাসিমার সেই কান্নার আদি অন্ত নেই! ওদিকে জীবনের সমস্ত দুঃখ নিয়ে বালিশের তলায় মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে নন্দদা। নন্দদা চিরকালের মতো নিরুদ্দেশে চ'লে যাবে। চাকরি যদি সেই দেশে কোথাও পায় ভালো, যদি না পায় তবে তা'র সমস্ত ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। পৃথিবীময় খুঁজলেও আর নন্দদাকে পাওয়া যাবে না।

রাত বোধ হয় দুটো বাজে। চারিদিক নীরব। বাড়ীসুদ্ধ সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। খোকার চোখেও ঘুম এসেছিল। এমন সময় খুনী মাসিমা আবার ককিয়ে উঠলেন, তবে কি কোনো উপায় নেই? তবে কি কাল ভোরে উঠে গিয়ে গঙ্গার কোলেই আমাকে ঝাঁপ দিতে হবে, বাবা?

নন্দদা প্রথমটা জবাব দিল না। নিশুতি রাত। ও ঘরে বড়দার বড় ঘড়িটায় টিক-টিক শব্দ হচ্ছে। পাছে কোথাও কেউ শুনতে পায় এজন্য গলা নামিয়ে এক সময় নন্দদা বলল, আছে একটা উপায়, তুমি পারবে?

যেমন ক'রেই হোক পারবো, নন্দ! বাবা আমার!

নন্দদা বলল, হয় জাহাজে যাওয়া, আর নয়ত আত্মহত্যা, দুইয়ের একটা। কিন্তু আর একটা উপায় আছে এখনও!

খুনী মাসিমা অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করলেন, কি বল্? মন খুলে বল্?

পরে কিন্তু আমাকে দোষ দিয়ো না ব'লে রাখছি।

খুনী মাসিমার অশ্রুভরা দুটো চোখ জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। বললেন, না দোষ দেবো না, তুই বল্।

নন্দদা বলল, কেউ যেন না জানে। আমার চারিদিকে এখন গোয়েন্দা। আমি নজরবন্দী। যদি না যাই, পুলিসে ধরে। তবে হ্যাঁ, ক্যাপ্টেনকে যদি শতখানেক টাকা ঘুষ দেওয়া যায়, তবে হয়ত টিকিটখানা বাতিল হ'তে পারে। তুমি কিন্তু একথা কোথাও প্রকাশ ক'রো না ব'লে দিচ্ছি। গোয়েন্দাদের কানে যদি ওঠে, তাহলে আমার তিন বছর জেল্।

খুনী মাসিমা সুদীর্ঘ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, না কোথাও বলবো না। কাল সব আত্মীয় কুটুম্ব মহলের দরজায় দরজায় হত্যে দিয়ে সন্ধ্যের আগে তোকে টাকা দেবো। ভয় কি তোর, নন্দ?

অন্ধকারে নিঃসাড়ে শুয়ে খোকা শুধু হাসল।

কলকাতা ভাঙতে আরম্ভ করেছে। ছাতুবাবুর বাজারের ওদিকে নাকি মস্ত চওড়া রাস্তা হচ্ছে। বার-শিমলে, কাঁসারিপাড়া, চোরবাগান, চাষাধোবা-পাড়া,—সব পাড়া নাকি ভাঙছে। কলকাতায় নাকি গ্যাসের আলো, গলি-ঘুঁজিতে তেলের আলো—এসব থাকবে না। ইলেকট্রিক হয়ে যাবে সবখানে। ময়লা বস্তি সব সাফ হয়ে যাবে। শুঁড়িপাড়া, যুগীপাড়া, মানিকতলা, ওদিকে সব রাস্তা চওড়া হবে। পুরনো খালের ওপর যত সাঁকো আছে, সব ভেঙে নতুন তৈরি হবে।

সেকালের ভট্টচার্যিবাগানের সেই বত্রিশ নম্বর বাড়ীর গায়ে ছিল মস্ত পুকুর। আশপাশে ছিল জাম তেঁতুল আর কাঠচাঁপার জঙ্গল। সবাই জানতো সেই পুকুর-ঘাটে থাকতো যক্ষিবুড়ী, জলের নীচের থেকে উঠে এসে বসতো সে ঘাটের সিঁড়িতে। ধুতরোর মতন তা'র শাদা চুল, ভয়ানক তার চোখের তারা। চৈত্রের দুপুরে যখন জাম গাছের ডালে ব'সে কাকের চোখে তন্দ্রা নামতো, দূরের কোন্ রেলের বাঁশী শোনা যেতো, আর কাঁসারির গলি দিয়ে পেরিয়ে যেত ঠন্ঠনিয়ে—সেই সময় হয়ত কোনো মধ্যাহ্নের ঘুমভাঙা বালক চুপি চুপি যেত পুকুর ঘাটে, কিন্তু যক্ষি বুড়ীর ভয়ে তাকে থমকে দাঁড়াতে হত ওই বাড়ীর খিড়কি দরজায়। জাম তেঁতুলের বনে উদাসী হাওয়া বয়ে যেত ফুরফুরিয়ে, আর ঘুঘু ডেকে যেতো কোনো ভাঙা পাঁচিলের পাশ দিয়ে, পথ দিয়ে যেতো সেই অদ্ভুত মেয়েছেলে,—'বা-ত ভা-লো ক-রি, দাঁতের পোকা ভালো করি,—সেই মেয়েছেলের পিঠে ঝোলানো থাকতো ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি, কানে রূপোর কানবালা, হাতে একগাছা রূপোর চুড়ি, আর খড়ের মতন শুকনো তা'র মাথার চুল। ওরা কোন্ জাত, কোন্ দেশের—কোনো-দিন জানা যেতো না। ওরা কলাপাতায় তেল মাখিয়ে দাঁতের ওপর চেপে ধ'রে মন্তর পড়ে, আর সেই মন্তরের চোটে দাঁতের ভিতর থেকে শাদা শাদা পোকা বেরিয়ে আসে। তখন দেখা যেতো সেই ডাইনীর চোখে যেন পিশাচীর উল্লাস! দাও তখন তাকে চারটি পয়সা।

খিড়কির সেই পুকুরে তারপর কোথা থেকে এসে মাটি পড়তে লাগলো। দেখতে দেখতে পুকুর বুজে মাঠ হয়ে গেল। দেখতে দেখতে যক্ষি বুড়ী জলের তলাকার রাজ্য ছেড়ে তার হিসেবনিকেশ শেষ ক'রে কোথায় গেল চ'লে—তার খবর আর কিন্তু কেউ নিল না। ওরা হাওয়ায় ভেসে চ'লে যায়, ওদের

জানা আছে,—ওরা জ্যোৎস্নারাত্রে শাদা চুল এলিয়ে আকাশ-পথে উড়ে গিয়ে আবার হয়ত কোনো অজানা পুকুরে জায়গা নেয়—সেখানেও চৈত্রের দুপুরে মধুর হাওয়া ওঠে, জল ছল ছল করে ঘাটের শেষ সিঁড়িতে, বটের ঝুরি নেমে আসে জলে, আশেপাশে যজ্ঞিডুমুর আর কাঁটা কুলের ঝাড়। যক্ষি বুড়ীর চোখে তন্দ্রা নামে।—এমনি ক'রে ছেলেটা কত গল্প শুনে যেত!

যেখানে ছিল পুকুর সেখানে জ'মে উঠলো গাড়ীর আড্ডা। আর সেই জঙ্গল কেটে জ্ঞান ভটচার্যির পাকাবাড়ী উঠলো। যেখানকার ছায়ায় গিয়ে পা টিপে টিপে এগোতে গা ছম্‌ছম্‌ করতো, সেখানে এসে পড়তে লাগলো রাজমিস্ত্রিদের মালমসলা, গরুর গাড়ী বোঝাই ইঁট আর চুন সুরকি। দেখতে দেখতে কোথায় গেল সেই জাম-তেঁতুলতলা আর ঝোপঝাড়, সেখানে এলো উগ্র দিনের আলো, লোকজনের আনাগোনা, আর ফড়ে- দালালদের হিসেবনিকেশের কচকচি। চেয়ে-চেয়ে ছেলেটা দেখল, যেন একটা মস্ত কিছু ওখান থেকে বিদায় নিয়েছে। ওখানকার সেই কাঁটা জঙ্গল, সেই ছমছমে বাঁশবনের ছায়া, সেই শালিক পাখীর কণ্ঠে আর কাঠবিড়ালীর ঝিলিকে চমকে ওঠা বোশেখ মাসের দুপুরের তন্দ্রাটা, তারাও যেন ওই সঙ্গে বিদায় নিয়ে গেছে। কাজ সেরে গেছে সবাই—শুধু রেখে গেছে ওকে যেন সমস্ত ওলটপালটটা দেখবার জন্য! ও যেন সকল ভাঙনের সাক্ষী! বাল্যকালটা যেন ওকে পিছনে ফেলে ওদের সঙ্গে চ'লে যাচ্ছে।

সেই বত্রিশ নম্বর বাড়ী চ'লে গেছে অনেক কাল আগে। সেখান থেকে ভেঙ্গে এখন সতেরো নম্বর। এরই সঙ্গে ওদের আশৈশব নিবিড় পরিচয়। কিন্তু আবার ভাঙন ধরেছে এখানেও।

দিদিমা বললেন, ওরে, এ বাড়ী আমাকে বেচতেই হবে, নৈলে সুরেন রায়ের দেনা শুধবো কি ক'রে? পাটা বন্ধক দিয়ে এক-এক মেয়েকে পার করা হল, নাতিদের বে'থা দিলুম—এক এক ধাক্কায় টাকা এনে দিতে হল। আর এ বাড়ী থাকবে না।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দিদিমা পুনরায় বললেন, একে একে পাঁচটি জামাই গেল, দুটো নাতনী গেল, খুনীকে আর নিবারণকে রাখতে পারলুম না। আমি আর কেন থাকি সংসারে!

দিদিমার পিঠের পাশটিতে রাম ব'সে ছিল। আর সবাই ছিল আশেপাশে। সেদিন সামনে দিয়ে খাট সাজিয়ে নিয়ে গেল এ পাড়ার অক্রূর চাটুয্যেকে—যার গলায় থাকত রূপোর চেন্‌ বাঁধানো রুদ্রাক্ষের মালা, চুলের রাশি পড়তো পিছন

দিকে, কপালজোড়া সিঁদুর, কাঁধে ঝোলানো পাটকরা গামছা, হাতে মস্ত লাঠি। বিরাট শরীর ছিল তাঁর। চোখ দুটো দেখে ভয়ে ওরা পালিয়ে আসত সদর দরজা থেকে। সেই অক্রূর চাটুয্যেকে নিয়ে গেল সামনে দিয়ে। আর নিয়ে গেল ললিতবাবুকে আর ভাদুড়ী মশাইকে। তারপরে গেল সাতুবাবু।

দিদিমা আঁচলে আবার চোখ মুছে বললেন, পেটের ছেলে মানুষ হয়নি,—ওরা ছিল আমার সাত ব্যাটা! পাড়া কানা হয়ে গেল। এবার একে একে সব যাবার পালা!

দিদিমা?

কেন, বাপি?

বাড়ী বিক্রি হ'লে আমরা কোথা যাবো?

দিদিমার গলা দিয়ে কান্না উঠে এলো। তিনি বললেন, পথে পথে ভেসে যাবো! ওই কাওরা বস্তির সামনে দিয়ে যাবে বড় রাস্তা—সারি সারি বাড়ী আর বড় বড় দোকান। এমন কি আর থাকবে! কার্তিকরা বাড়ী ছেড়ে চললো, দীপুদের আড্ডা ভাঙলো, লালাদের দোকান উঠলো,—গঙ্গার মা'র ঘর আর আস্তাবল ভেঙ্গে এবারে সাফ হয়ে যাবে!

ছেলেটা তার কথার জবাবটা খুঁজে পাচ্ছে না। পথে পথে ভেসে যাবে—কিন্তু সে কোন্ পথ? এ গলির পরে সেই গলি, তারপরে ওই গলি—গলি পেরোলে ট্রাম রাস্তা, সেটা ছাড়িয়ে গির্জার পাশ দিয়ে সে অনেক দূর! সেখানেও ত ভাঙ্গন ধরেছে! ছাতুবাবুর বাজার ছাড়িয়ে গঙ্গায় যাবার পথে সব ভাঙ্গছে, ভাঙ্গছে মাণিকতলায়, শুঁড়িপাড়ায়, ভাঙছে কাঁসারিপাড়ায়, জেলে-টোলায়—ভাঙ্গছে চারদিকে। ঘর বাড়ী সব ভেঙ্গে দিচ্ছে, আর ভেঙ্গে দিচ্ছে মন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় ভাঙ্গা বাড়ীর ভিতরকার শোবার ঘরের দেওয়াল আর কুলুঙ্গী, অন্দর মহলের সব লুকোনো আব্রুরাখার জায়গা। ওই সব ঘরে কেঁদেছে কত লোক, কত হাসির সঙ্গে চোখের জল গড়িয়েছে,—আর ওখানে ছিল কত নণ্টুর মা, কত রত্নেশ্বরের মরা ছেলে যজ্ঞেশ্বর, কত সরলার মারখাওয়া শিশু। ওরা সবাই হিসেব চুকিয়ে চ'লে গেছে ঘর ভেঙ্গে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে রামখোকার কান্না পেতো!—

গোয়াবাগানে গয়লাপাড়ার ওদিকে খোয়ার রাস্তাটা খুঁড়েছিল—অনেক নিচে দিয়ে নাকি ড্রেন-পাইপ যাবে। খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ আবিষ্কার করল পাথরের একখানা মস্তবড় হাত! হাতে পাঁচটা পাথরের আঙুল।

খবর ছুটল চারদিকে। সরকারী লোকরা খবর পেয়ে ছুটে এল। লোকজন

জমে গেল দেখতে দেখতে। পেয়ারাবাগান, হোগলকুঁড়ে, ডালিমতলা,—যে যেখানে ছিল সব ছুটে এল। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে লোকে-লোকারাণ্য।

মজুররা এবার সাবধানে গাঁইতি বসাতে লাগল। কোদাল দিয়ে মাটি সরানো হচ্ছে। ক্রমশ বেরিয়ে পড়ল বিশালকায় এক অষ্টভুজা কালীমূর্তি, আর তার পায়ের তলায় শুয়ে রয়েছে একই পাথরে তৈরি প্রকাণ্ড শিব-বিগ্রহ।

এপাড়া ওপাড়া—সব পাড়ায় হই হই। চারদিক থেকে পাগলের মতো মেয়েপুরুষ কেবলই ছুটছে গোয়াবাগানে। তখন দুপুরবেলা। পুলিস পাহারা ততক্ষণে এসে গেছে। এ-পাড়া থেকে ছুটল ক্ষিরি নাপতিনিরা, কাওরাবস্তির সবাই, নন্দ চৌধুরীর বাড়ির লোকরা, মেসবাড়ির ছেলেরা, তাঁতিদের বাড়ির ওরা। দীপুর ঘর থেকে সেই লছমী নামক মেয়েছেলেটাও ছুটল। ওই উলকিকাটা কাঁচপোকার টিপপরা স্বাস্থ্যবতী বয়স্কা মেয়েছেলে লছমী এই সেদিন একটা কেলেঙ্কারি করেছিল। দীপুর বদলে আরেকটা লোক ওর ঘরে নাকি চুপি চুপি ঢুকেছিল। ওর পরনে ছিল একখানা বৃন্দাবনী কাপড়। ধস্তাধস্তি করতে করতে লছমী ওই কাপড়খানা ছিনিয়ে নিয়ে ন্যাংটো হয়ে এ বাড়িতে ছুটে এসে ঢোকে। তখন দুপুরবেলা। ওই ছেলেটা সেই প্রথম দেখল বয়স্থা স্ত্রীলোকের উলঙ্গ দেহ।

যাই হোক, নেংটি ইঁদুরের মতন ওই ছেলেটাও গিয়েছিল ওই ভিড়ের মধ্যে। বড় বড় বাঁশ আর ফালিতক্তা ততক্ষণে এসেছে। শালের খুঁটি এসেছে কয়েকখানা। মস্ত বড় লোহার কপিকল এনেছে। সবাই ততক্ষণে জেনেছে এই ধূসরবর্ণের কালীমূর্তি কার! এ সেই রঘু ডাকাতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কালী! কে না জানে বাঙ্গালীর ইষ্টদেবী হলেন শক্তিরূপিণী কালী! শক্তির উপাসনা করি, আমরা তাই শাক্ত। মা, মাগো, মা, করালবদনি, শ্যামা! শ্মশানবাসিনী দিগ্বসনা মা আমার—!

হাউ হাউ করে কাঁদছে কত লোক। ছটফট করছে অনেকে। অনেকে একপাশে গিয়ে জপে বসে গেছে। কারও ভর হয়েছে, কেউ বা মূর্ছা গেছে। ওর মধ্যে একজন তারস্বরে গান ধরেছে—'হরহৃদি পরে দিয়েছ চরণ, মা, নাহিক তোমার লাজের লে-এ-এ-শ! শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী—'

সেই প্রতিমা রাস্তার উপরে অবশেষে কপিকলের সাহায্যে উঠল। একখানা পাথরের হাত চোট খেয়ে ক্ষত হয়েছে। আর সব ঠিক আছে। প্রতিমার বর্ণ ফিকে নীল। আন্দাজ সবসুদ্ধ পাঁচ হাত উঁচু। জিব বার করা। সবটা ছিলেকাটা, মাথার চুলও। গলায় নরমুণ্ডমালা। আটখানা হাতে শঙ্খ, চক্র,

খড়্গ, পদ্ম, নরমুণ্ড—আরও যেন কি কি। বড় বড় চোখ। সমস্ত মূর্তিটা নাকি মাত্র একখানা বড় পাথর থেকে খোদাই করে তোলা। কত বড় শিল্পী ছিল রঘু ডাকাত!

ছেলেটা বাড়ি ফিরেছিল সন্ধ্যার প্রাক্কালে। ততক্ষণে এপাড়া ওপাড়া কালীকীর্তনে মুখর হয়ে উঠেছে।

এবার বাড়ি বদলের পালা। এ বাড়িতে ওদের আর ঠাঁই হচ্ছে না।

অনেক পুরনো এ-বাড়ি, বালি ধসছে চারদিকে। নিচের তলাটা ঝুপসি অন্ধকার, উত্তর দিকের জানলার গায়ে খোলার বস্তি—মাঝখানে বীভৎস নর্দমা। নিচের তলায় দিনেরবেলায় ঘরের ভিতরে পিদিম জ্বালতে হয়। মানুষের বাসযোগ্য নয়। সেখানে কেমন করে থাকবে নতুন বউ? ওরা এখন মোট সাতজন।

ওদের মাসিক আয় এখন বত্রিশ টাকা। এর মধ্যে বাড়ীভাড়া দিতে গেলে সংসার চলবে কি?

এই অর্ধভুক্ত দরিদ্র পরিবার ঘুরে বেড়িয়েছে একখান থেকে অন্যখানে। শুঁড়িপাড়ায়, মানিকতলায় দর্জিপাড়ায়, নারকেলডাঙ্গায়, শ্যামপুকুরে, টালায়, বেলগাছিয়ায়,—কোথায় নয়? তফাৎ শুধু এই খোলার চালার তলায় শুধু আশ্রয় নিতে হয়নি। ওদের সঙ্গে ওই নাবালক ছেলেটা ঘুরেছে সব রকম জীবনের মধ্যে, সকল রকম অভিজ্ঞতার ভিতরে ভিতরে। ওইটুকুর মধ্যেই দেখল ভালবাসা মানুষের মধ্যে নোংরা জীবন, অশিক্ষা আর অন্ধসংস্কার—দেখল নিরপরাধের উৎপীড়ন। দেখতে দেখতে সে চলল। দেখছে ছবির পর ছবি। ছেলেটা গল্পের মতো শুনে এল, ওরা নাকি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক শাখা। ওদের সঙ্গে নাকি জড়িয়ে রয়েছে মুক্তাগাছার জগৎকিশোর আর সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী,বরিশাল বাটাজোড়ের জমিদার রায়সাহেব পূর্ণ লাহিড়ী, ফরিদপুর বালিয়াকান্দির অতি প্রসিদ্ধ জমিদার সাণ্ডেলরা, কাশীর রায়বাহাদুর অভয় সাণ্ডেল, নৈহাটির ডাক্তার পরমেশ আর ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ, হাওড়া-সাঁতরাগাছির গঙ্গারাম আর সীতারাম খাঁ ভাদুড়ী—যাদের বাড়ির মেয়ে হল ওর ঠাকুমা গোলাপসুন্দরী, এবং যাদের নাতি হল শিশির খাঁ ভাদুড়ীরা।

ওই ছেলেটা যখন এক পয়সার কচুরি আলুর দম কিংবা আলু-কাবলি খেতে পায় না, ঘন বর্ষার মধ্যে ছুটতে ছুটতে যখন এক পয়সার পোস্ত কিনে এনে ধার-করা কয়লায় উনুন জ্বেলে পোস্তচচ্চড়ি আর পান্তা খেয়ে ওদেরকে

কাটাতে হয়, শীতের রাত্রে ছেঁড়াকাঁথার একধারটা গায়ে দিয়ে রাত কাটানো ছাড়া ওর উপায় থাকে না, তখন ও শোনে ভাগলপুরের জজ ওর অতি নিকট সম্পর্ক, অমুক ইস্কুলের হেডমাস্টার ওর অমুক, অমুক সিভিল সার্জেন ওদের অমুক, অমুক মস্ত ব্যবসায়ী ওদের অমুক হয়। ওর মনে বিকার দেখা দেয়। ইস্কুল থেকে ফিরে ওর জলখাবারের ভাগে আগের দিন পিঁপড়ে-ধরা একখানা বাসি রুটি যদি বা কোনদিন জোটে, তার সঙ্গে এক ফোঁটা গুড় পেলে ত সোনায় সোহাগা। না পেলে এক চিমটি নুন। কিন্তু তারপর তার সহপাঠী সুবিদের বাড়ি জল-ডিঙোডিঙি খেলতে গিয়ে যখন দেখে সুবি খাচ্ছে একথালা গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি আর আলুর দম, তার সঙ্গে কিসমিস-বাদাম দেওয়া ঘি-গড়ানো মোহনভোগ, তখন ওই দৃশ্য সামনে দাঁড়িয়ে দেখা—ওর যেন সম্মানবোধে আঘাত লাগে। রাম ওরফে শ্রীমান বিভূতি সেখান থেকে সেদিনের মতো পালিয়ে আসে।

ওই চালতাবাগানের ছবি রয়ে গেল সুলতা আর বন্ধুর স্মৃতিতে, বাগমারির সেই বৈরাগীর উচ্ছ্বসোক্তি, "আমার ভবের হাট ভেঙ্গে গেল মা"—মানিকতলার সেই দুটো ভাই বোন গুয়ে আর গিনি, আর সেই সুশ্রী কিশোর ধীরু, যাকে পাগলের মতন সে জড়িয়ে ধরত ভালবাসায়,—এরা যেন ছবির পর ছবি। তখন কী নিবিড় ছিল আকাশের নীলিমা, হেদুয়ার সেই বৃহৎ দেবদারুর ডালে সন্ধ্যাপাখীর কলকাকলী কী কথা কইত কানে কানে, গেরুয়া গঙ্গায় বর্ষার স্রোত তাকে ডাক দিয়ে যেত কতবার। আর সেই দর্জিপাড়ার বাড়ির বোষ্টম নিবারণ দাসের সেই কণ্ঠীপরা সুন্দরী বউটা—বয়সে যে বড় অনেক, যে লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে দিয়ে পেঁয়াজের বড়া আনাতো হরিসাধনের দোকান থেকে—তার কথা মনে পড়লে ভাবান্তর ঘটে। ওর সঙ্গে সেই যমদূতের মতন মারকুট্টে জীবন দাস,—যার ছেলেটার সঙ্গে ছিল ওর বন্ধুত্ব।

বাড়ি বিক্রির আগে আবার এসে নিয়ে গেলেন দিদিমা ওঁর বাড়ীতে। এখন ওঁর বাড়ী সামান্য কিছু মেরামত হয়েছে। ও-মহলে আবার এসেছে পঁয়ত্রিশ টাকার ভাড়াটে। তারা রাজসাহীর লোক। কর্তা নাকি খুবই অসুস্থ। ডাঃ নীলরতন সরকার ওঁর চিকিৎসা করবেন।

মামা তাঁর ঘরে বসে ছোট-কলকেটায় এক টুকরো ময়লা ন্যাকড়া জড়িয়ে বড় করে ধোঁয়া টানছিলেন। ধোঁয়াটা ঘরের বাইরেও আসছিল। ওটা যেন ঠিক পরিচিত তামাক নয়। কড়া গন্ধটা একটু অন্য রকমের। ওধার থেকে ছোড়দি বলল, কই, নাকে কাপড় দিচ্ছিস নে? গন্ধ বুঝি খুব ভালো

লাগছে? মাকে বলে দেবো?

ছেলেটা অবাধ্য। ছোড়দিকে দেখিয়ে-দেখিয়ে সে হাঁ করে ওই ধোঁয়াটা গলার মধ্যে নিতে লাগল।

দাঁড়া ত! ফাজলামি বার করছি—ছোড়দি ছুটল।

মামা এবার হাঁক দিলেন, তাহলে খালি গোয়াল পেয়ে আবার বুঝি গরুবাছুর এসে ঢুকল। বলে, যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই!

মুখ সামলে কথা বলিস—দিদিমাও হাঁক পাড়লেন এদিক থেকে—কার ধন? তোর রোজগারের সম্পত্তি? তোর পাঁচ আঙুলের পয়সা যে, কথায় কথায় হুমকি দিস? এবার তোকে 'গো-টে-হেল' করে তবে ছাড়ব।

মামা ইংরেজি জানতেন না। সেজন্য দিদিমার মতো অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তির মুখে 'গো-টে-হেল' কথাটা শোনামাত্র তিনি আগুন হয়ে উঠতেন। ও ঘর থেকে চিৎকার করে তিনি বললেন, এবার আর দাঙ্গা নয়, এবার সোজা হাইকোর্টে এক নম্বর! স্থটবিহারী এবার এজলাসে বসেছে, সে আমার এক গেলাসের ইয়ার। এবার ঘুঘুর ফাঁদ দেখাব সবাইকে।

মামা জোরে টান মারলেন ছোট কলকেটায়।

এ বাড়ীতে আবার সবাই ঘরকন্না পেতে বসে গেল। বড়দা রইল নিচের তলায় বউকে নিয়ে। দিদিমা গেলেন দীনবন্ধু মিত্তির ছেলে জ্যোতিষ মিত্তিরের কাছে। বললেন, মেজ নাতিটি একটি পাস করেছে। তোমরা পাড়ায় থাকতে গুরুবাড়ীতে হাঁড়ি চড়বে না, এ কেমন কথা জ্যোতিষ?

জ্যোতিষ হলেন হাইকোর্টের রেজিস্টার। তিনি উঠে এসে দিদিমার পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, সামনের মাসের পয়লা তারিখ নাতিকে আমার এখানে পাঠিয়ে দেবেন, সেজখুড়ি।

ছোড়দার চাকরি হয়ে গেল।

সেই বছরে প্রথম-মহাযুদ্ধ থামল। ইংরেজ জিতল, জার্মানি হারল। আবার কায়েম হল কোম্পানির রাজত্ব। গান বাজনা আমোদ-আহ্লাদ, বাজি পোড়ানো, বাড়ী সাজানো,—চারিদিকে কী আনন্দ রাজভক্তদের!

কিশোরদা যুদ্ধ থেকে ফিরে রানীগঞ্জের এক স্কুলে হেডমাস্টারি নিয়েছেন। তিনি কলকাতায় এসেছেন পূজোর ছুটিতে। এখান থেকে যাবেন কাশী। দিদিমাও পরে যাচ্ছেন কাশীতে তাঁর রায়বাহাদুর জামাইকে দেখতে। শ্রীমান রাম কান্নাকাটি ধরল কিশোরদার সঙ্গে সে যাবে রানীগঞ্জ—সেখান থেকে কাশী।

১৯১৮। কিশোর বালকের চোখে কাশী। বড় বড় রাস্তায় যে এত ধুলো

কে জানত ? পথে-পথে তেলের আলো জ্বলে কৃষ্ণপক্ষে, অন্যপক্ষে অন্ধকার। টাকায় বারো সের খাঁটি দুধ, খাঁটি ঘি আট আনা, সরষের তেল দু'আনা। এক সের রাবড়ি চার আনা, এত বড় একটা খোয়াক্ষীরের সন্দেশ এক পয়সা। প্রথম শরতের একটা বড় ফুলকপি এক আনা, ধমক দিলে তিন পয়সা। পাঁচ পয়সা মস্ত ইলিশ একটা। তিন আনা থেকে চার আনা কাটা রুই মাছ। শুধু চালের দাম কলকাতার চেয়ে বেশি—প্রায় চার টাকা মণ।

সোনারপুরা আর বাঙ্গালীটোলা—এই নিয়ে কাশীর ধনীসমাজ এবং মাথাওলা লোক সব বাঙ্গালী। কাশীরাজের মন্ত্রী ললিত সেন রায়, কলেজ বা ইস্কুল অধিকাংশ বাঙ্গালীর। কাশী বিশ্বাস, যোগীন বিশ্বাস, চিন্তামণি ঘোষ, চিন্তামণি মুখুজ্যে, অভয় সাণ্ডেল, সত্যেন সাণ্ডেল—এরা সব বড় বড় নাম। রানী ভবানী এখানে এক বছর ধরে প্রতিদিন এক এক ব্রাহ্মণকে এক একখানা বাড়ী দান করেছিলেন শোনা যায়। বড় বড় 'ছত্র', বড় বড় দেব প্রতিষ্ঠান, বড় বড় অট্টালিকা—সব বাঙ্গালীর। সোনারপুরা, পাঁড়ে হাউলি, দেবনাথপুরা, হাতিফট্‌কা, চৌষট্টি, পাতালেশ্বর, গণেশ মহল্লা, সিমন চৌহাট্টা, খালিসপুরা, এসব ছোট ছোট পল্লী বাঙ্গালীপ্রধান। দক্ষিণে হারারবাগ, হরিশচন্দ্র, শিবালা, পশ্চিমে ভেলুপুরা, রামাপুরা, তিলভাণ্ডেশ্বর—একেবারে সেই লাক্‌সা পর্যন্ত প্রায় সবই বাঙ্গালী। আর গঙ্গাতীর। সেখানেও একই কথা। অসি, চেৎসিং, হরিশচন্দ্র, কেদার, গোড়েন, পাঁড়ে, চৌষট্টি, অহল্যাবাঈ, দশাশ্বমেধ—আরও যে ঘাটেই যাও, সর্বত্র বাঙ্গালীর আধিপত্য। এখানে বাংলা না শিখলে হিন্দুস্থানীদের কাজ-কারবার চলে না। পাণ্ডা, গোয়ালা, দোকানদার, বাজারের ফড়ে, ফেরিওয়ালা—এরা বাংলা বলতে বাধ্য হয়। কালীতলাটা যেন কালীঘাটের পাড়া।

চারদিক দেখেশুনে ছেলেটা অবাক। এ তার জননীর জন্মভূমি, তাই এখানকার অধিদেবতা বিশ্বেশ্বরের নামানুসারে তিনি বিশ্বেশ্বরী।

বাড়ীর কর্তা অভয় সাণ্ডেল তার মেসো। তিনি রায়বাহাদুর। এখানে কুইনস্‌ কলেজে তিনি রসায়ন বিভাগের কর্তা ছিলেন, এখন পেন্‌সন্‌ পান্‌। বাড়ীতে খানদুই গাড়ি—টাঙ্গা আর টমটম। গোটা তিন চার ঘোড়া। উত্তর দিকে আস্তাবল বাড়ী। তার গায়ে চিন্তামণি মুখুজ্যের ইস্কুল। যেমন রেওড়িতলায় খিরিদপুরের প্রসিদ্ধ জয়নারায়ণ মুখুজ্যের মস্ত পুরনো ইস্কুল। এ বাড়ীর ঠিক দক্ষিণে কোচবিহার মহারাজার বিখ্যাত কালীবাড়ী। ওখানে প্রতি প্রত্যূষে সানাই বাজে।

এ এক নতুন জগৎ। এ যেন গঙ্গাকেন্দ্রিক। স্নান-দান, পূজা-অর্চনা, জপ-তপ—এই নিয়ে প্রতিদিনের জীবন। এখানে রান্না-খাওয়ার কথা বড় নয়, পূজো-নৈবেদ্য--ভোগ-ফুলচন্দন—এই নিয়ে কাটে। শাঁখ-ঘণ্টা আরতি-মন্ত্র-স্তোত্র, মন্দিরে-মন্দিরে ঘোরা, গঙ্গাস্নান—এই সব নিয়ে মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত। ছেলেটা হকচকিয়ে রইল দিন পনেরো। চারদিকে তার প্রাচুর্য যেন থই থই করছে। অজস্র খাদ্য তার চতুর্দিকে।

এখানে শুধু মনে রইল গলির পর গলি। এ-গলি ও-গলি সে-গলি। যেন মস্ত এক উর্ণনাভের জাল। সড়কে মহাজনী দামী একা, টাঙ্গা—এসব গাড়ি যায় রাতদিন। কিন্তু গলিপথে চলে কাশীবাসীরা, আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে গরু ষাঁড় আর মহিষ। এ ছাড়া বানরদের রামরাজত্ব। বানরদের প্রবল অনাচার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ঘাটে বাজারে গলিতে বাড়ির ছাদে—সর্বত্র বানর। ওরা ছিনিয়ে নেয়, লুট করে, ডাকাতি করে, পকেট মারে, শাসায় আর ভয় দেখায়। ভোরবেলা থেকে ওরা দল বেঁধে কাশীশহর আক্রমণ করে।

সব মিলিয়ে কী আনন্দে কাটল এবারের পূজো। দশাশ্বমেধে প্রতিমা-বিসর্জনের সেই অপরূপ শোভা—এ রইল অবিস্মরণীয়। অবিস্মরণীয় রইল পুণ্যভূমি, তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশী।

তিন সপ্তাহ পরে তাকে আবার ফিরে আসতে হল কলকাতায়। আবার সেই দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানির মধ্যে কিলবিল করতে থাকা। শোনা যাচ্ছে দিদিমার এই বাড়ী দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে যাবে। পাশের বস্তি উঠে যাবে, মস্ত বড় রাস্তা হবে, দীনু স্যাকরার বাড়ি ভাঙবে, লালার দোকান থাকবে না, শেতলদের বস্তি ভেঙ্গে মাঠ হবে। পুরনো কলকাতা ভেঙ্গে নতুন চেহারা নেবে। মোটর গাড়ি ছুটবে। জায়গা জমির দাম বাড়বে।

যুদ্ধ থেমে গেছে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ আর কুইন মেরী দীর্ঘজীবী হোন। শান্তি-উৎসব হল কলকাতায়। ইস্কুলে-ইস্কুলে মস্ত ঘটা। সেণ্ট পলস্ ইস্কুলের আনন্দ উৎসবে বাঙ্গলার ছোট লাট লর্ড রোনাল্ডসে-র হাত থেকে ওই ছেলেটা পেয়ে গেল একখানা তামার মেডেল। একদিকে রাজারানীর সংযুক্ত ছবি, অন্যদিকে ইংরেজিতে লেখা 'শান্তি উৎসব ১৯১৯'।

মামা শুনে বললেন, 'ইংরেজ জিতবে না ত জিতবে কে? ওরা হল পশুরাজ সিংহের গুষ্টি। স্বদেশী ব্যাটারা ওদের নামে বদনাম রটিয়ে বেড়াচ্ছে। সেবার দিল্লীর দরবারে আমাকে নেমতন্ন করেছিল।

তোমাকে!—ভুরু কুঁচকিয়ে দিদিমা বললেন, তোমাকে কোন্ সুবাদে ওরা নমতম্র করবে?

কেন করবে না—মামা চেঁচালেন।—তুমি মেয়েমানুষ, কতটুকু বিদ্যে তোমার? তুমি কি জানো লর্ড কিচেনার জাহাজডুবির আগে আমার নাম করে ডুবেছে?

বটে!—দিদিমা বাঁকাচোখে চেয়ে বললেন, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে! যা, গাঁজায় দম দিগে যা!

মামা গর্জন করলেন, ইজ্জৎ রেখে কথা বলো বলে দিচ্ছি। কিচেনার সাহেব বেঁচে ছিল, তাই যুদ্ধের সময় তোমার গরুর পালের জাব জুটেছে! নইলে তোমার গুষ্টি ঘুঘুর ফাঁদ দেখত!

বড়দা এতদিন কথা বলেনি, কিন্তু আজ সে সাবালক। বিয়ে হয়েছে তার, বউ এসেছে ঘরে। একটি মেয়ে হয়েছে। সে হঠাৎ ঘর থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এসে মামার সামনে দাঁড়াল কঠিন চক্ষে। বলল, গরুর পাল আপনি কাদেরকে বলছেন?

ইস্ক্রুপের মতন চোখ ঘুরিয়ে মামা বললেন, ও, পিঁপুল এবার পেকেছে দেখছি! ল্যাজ খসেছে ব্যাঙাচির! কুড়ি টাকা মাইনের গরম, কেমন? যারা ফলনা ভট্‌চার্যির খড়ের আঁটিতে টান মেরে জাব খেয়ে মানুষ, সেই তাদেরই কথা হচ্ছে, বুঝেছিস?

এমন সময় মা এসে দাঁড়ালেন মাঝখানে। বড়দার দিকে তাকালেন। শান্ত কঠিন মর্মভেদী দৃষ্টি তাঁর। বললেন, ছি, গুরুজনের কথা আশীর্বাদ বলে নিতে হয়। যাও এখান থেকে—

বড়দা মাথা হেঁট করে পালিয়ে বাঁচল। মা সেখান থেকে চলে গেলেন।

ওই সময়ে নাবালক ছেলেটার কানে বাজছিল কয়েকটা নাম। বেশ মনে পড়ে সেই নামগুলো ভারতবর্ষের সবখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তখন বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড। নামগুলো হল, বালগঙ্গাধর তিলক, আনি বেসান্ত, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সুরেন বাঁড়ুজ্যে, রবি ঠাকুর, গান্ধী. জগদীশ বোস, নবাব আলি চৌধুরী, গজনভি, ফজলুক হক—এমনি আরও অনেক লোক। তখন চৈত্র মাস। দেশে হইচই উঠল। কোথায় পান্‌জাবে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজ সৈন্যরা গুলী করে মেরেছে অনেক মানুষকে। অনেক মেয়েপুরুষ বালক বালিকা মরেছে। তারা পালাবার চেষ্টা করেও পারেনি। চারদিকে পাঁচিল। তারই মধ্যে ওদেরকে মেরেছে।

আগুন জ্বলছে পান্‌জাবে,—সেই আগুন ছড়িয়েছে সবখানে। সবাই বলছে, এবার থেকে গান্ধী হবেন নেতা। নাগপুরে নাকি কংগ্রেস।

রাম এবার একটু একটু সাবালক হচ্ছে। আয়নায় দেখছে নিজেকে। এখন আর তেঁতুল চুরির দিকে মন যায় না। মাথায় একটু লম্বা হয়েছে। মায়ের কাছে আর শুচ্ছে না। নাপিতের কাছে ছাড়া চুল কাটছে না। ইস্কুলের বুড়ো পূর্ণ পণ্ডিতকে আর জ্বালাচ্ছে না। মায়ের সঙ্গে আর গঙ্গায় যাচ্ছে না। ছোটবেলায় সে মেয়ে সাজতো, পায়ে আলতা পরত, ভাঙ্গা প্যাঁটরায় কাপড় আর পুতুল গুছিয়ে নিয়ে 'আলাদা' হয়ে যেত—এখন ভাবলে হাসি পায়। সে ফার্স্ট ডিভিশনের ছেলে। আর দু'বছর পরে সে ম্যাট্রিক দেবে।

দালাল আনাগোনা করছে বাড়ীতে। তার নাম রামলাল। বুড়ো, কিন্তু লম্বাচওড়া। গলার আওয়াজ ভয়ানক মোটা। যমদূতের মতন এসে দাঁড়ায়—এ বাড়ী সে বিক্রি করিয়ে দেবে। বাড়ী বিক্রি হয়ে গেলে কে কোথায় যাবে জানা নেই। কিন্তু শিকড় নড়েছে। কেউ যাবে কাশী, কেউ কেষ্টনগর, কেউ বা যাদবপুর। কিন্তু মামা যাবেন কোথায় ?

মামা চেঁচিয়ে ওঠেন পাশের ঘর থেকে। বাড়ী বিক্রি! জাল-উইলের জোরে কা'র বাপের সম্পত্তি হস্তান্তর করতে চায়? মাগি যেদিন বায়না করবে, সেই দিনই হাইকোর্টে ঠুকবো এক নম্বর। বাপের ব্যাটা যদি হই, তবে ডুবো জাহাজ আবার তুলে আনবো!

দিদিমা হেঁকে ওঠেন—যা যা যা, ভারি সাধ্যি তোর! যা পারিস করগে যা!

মামা বলেন, হ্যাঁ, তাই যাবো। হাইকোর্টের প্যায়দারা আসবে, ঘুঘু চরবে, দারোয়ান ছুটবে—তবেই আমার নাম নোগে ভট্‌চায। তিন পুরুষ ধ'রে মামলা চলবে, আমি গ্যাঁট হয়ে ব'সে থাকবো এই ফল্‌না ভট্‌চার্যির বাড়ীতে।

রামলাল-বুড়ো খদ্দের আনে মাঝে মাঝে—এ বাড়ী দেখে যায়। মামা বলেন, ব্যাটাকে বাগে পাবো যেদিন, মুরগি-জবাই করবো!

কান পেতে ও শোনে দিদিমার গলা। সে গলায় যেন আর পুরনো তেজ নেই। কান পেতে শোনে মামার আওয়াজ, সেই আওয়াজের জোর যেন কবে থেকে ক'মে গেছে। ভাঙ্গন ধরেছে ওঁদের শক্তিতে, যেমন ভাঙ্গন ধরেছে পুরনো কলকাতায়। অবিনাশ কবিরাজের বাড়ী ভাঙ্গছে, ওই যেখান থেকে লাল রঙের বড়ি এনে দিতুম—সেই বাড়িতে থাকতো গঙ্গাজলের গন্ধ। বুড়ো

কবিরাজের চেহারাটা ছিল গঙ্গাজলের বর্ণ, সে গায়ে জড়িয়ে থাকতো তসরের চাদর—মাথায় ছিল তার শাদা চুল, আর শ্বেতচন্দন মাখানো থাকতো বুড়োর কপাল জুড়ে। কবিরাজের সেই মস্ত দোকান একদিন উঠে গেল। সরকারী কুলীরা ভাঙ্গতে লেগেছে তা'র বাড়ীটা। থাকবে না কেউ আর এ পাড়ায়। চৌধুরীরা চলে যাচ্ছে, সর্বাধিকারীরা বাড়ী খুঁজছে। আর গলির মধ্যে সেই নলিতবাবুর খুব সুন্দর বৌ—সেই যে রামকে কাছে বসিয়ে হাসিমুখে তালের বড়া খাওয়াতো—তারা যেন কবে চ'লে গেছে কোন্ পাড়ায়। খোঁজ পেল না কোথায় হঠাৎ একদিন চ'লে গেল সেই অন্ধ গঙ্গার মা তার ঘরটি ছেড়ে। অন্ধকার একটি ঘড়ে থাকতো সেই বুড়ী, তার চৌকির তলায় থাকতো পিতলের কয়েকটি বাসন। অন্ধকার থেকে সেই বাসন চকচক করতো, আর মনে প'ড়ে যেত যক্ষি বুড়ীর করাল চোখ। গঙ্গার মা পা বুলিয়ে-বুলিয়ে উঠতো তা'র ঘরের সিঁড়িতে, কোমর থেকে চাবি নিয়ে খুলতো ঘর, আর তোলা উনুনে গুলের আগুন ধরিয়ে ভাত ফুটিয়ে খেতে ব'সে যেত। ছোট্ট ঢিল ফেলত সে ওর ঘরের মধ্যে, আর বুড়ী আরম্ভ করতো গালাগালি, কান পেতে শোনা যায় না সেই কদর্য ভাষা। কিন্তু গঙ্গার মা চ'লে যাবার পর ব্যথায় ভারী হয়ে উঠেছে মন। যারা দুঃখ পেয়ে গেছে ওর হাতে, তাদেরই জন্যে নিঃশ্বাস পড়েছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

শেতলবাবুদের বস্তি ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে, পাঁচু পালরা চ'লে যাচ্ছে পাড়া ছেড়ে। সেই অন্ধ বুড়ো একদিন ম'রে গেল—সেই যে খড়কে পুড়িয়ে মন্তরপড়া জলে ছ্যাঁকা দিত, আর রামের হাত থেকে নিত পাঁচটি পয়সা। শিশুর তড়কা হলে এক পয়সা, ভূতে পেলে কিন্তু জলের দাম বেশী। সেই বস্তির থেকে হরার মায়ের গলার আওয়াজ আর শোনে না, কাওরানি বুড়ী আর লালার দোকানে পোস্ত কিনতে আসে না। ওরা কেউ মরেছে, কেউ বা স'রে গেছে।

এ বাড়ী বিক্রি করবেন দিদিমা। ওই যে বেলতলার ছাদে ছিল ভাঙ্গা রেলিংটা—শিশুদের প'ড়ে যাবার ভয়ে ওটার ফাঁকে দড়ি বেঁধে রাখতে হতো। কিন্তু এবার থেকে আর দরকার হবে না। ছোট ছাদের দেওয়াল থেকে চুন-বালুর চাপ্‌ড়া খ'সে পড়ছে। ইটেল-চণ্ডী নাকি জানান দিচ্ছে, এ বাড়ীতে আর ওদের জায়গা নেই। এই বেলতলার ছাদে দাঁড়ালে গন্ধ পাওয়া যেত শরৎকালের, যখন আসেন দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী—তিনি আসেন কৈলাস থেকে,—এই শরতের মেঘ যেদিকে ভেসে যায়, রাজহাঁসরা আসে যে-দেশ

থেকে। শোনা যেত আগমনী গান এই বেলতলার ছাদ থেকে। কবেকার কোন্ জননীর বুকফাটা কান্না সোনামাখানো রোদ্দুরে আর হাওয়ায় ভেসে আসতো ওদের কানে—"কবে যাবে গিরিবর আনিতে আমার উমাধনে। যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, মা বিনে উমা কত কেঁদেছে।"

কোন্ মা কেঁদেছে কবে? কাঁদবে না কি মা বসুমতী এই বাড়ীর অনেক নীচের থেকে—যেদিন ওরা একে ছেড়ে চ'লে যাবে? কাঁদবে না কি আজকের এই এলোমেলো হাওয়া অন্ধকার ঘরে ঘরে—যখন একজনও কেউ এখানে থাকবে না? এখান থেকে বড় ছাদের পাঁচিল পেরিয়ে দেখা যায় কার্তিক মাসের ঠাণ্ডা আকাশ,—গোলা পায়রারা পাখার শব্দ ক'রে উড়ে গিয়ে যেদিকে উধাও হয়ে যায়, আর নিম গাছটা হেমন্তের হাওয়ায় থরথরিয়ে ওঠে, আর বেল-গাছ থেকে কাকের বাসা সেই হাওয়ায় শুকিয়ে ঝ'রে পড়ে। এখান থেকে সে দেখত শ্রাবণ মাসের বর্ষা—ওই নারকেল গাছটা যেন কুঁকড়ে যেত ঝড়ে-বৃষ্টিতে, শ্যাওলাধরা ওর পাঁচিল থেকে জল গড়িয়ে আসতো—আর সেই শ্যাওলার ওপর নাক রেখে সে শুঁকত শ্রাবণ মাসের ভিজে গন্ধ। সব ছেড়ে এবার ওদের চলে যেতে হবে। বুড়ো রামলাল খদ্দের আনছে একে একে।

দিদিমা?

দিদিমা চুপ ক'রে শুয়ে ছিলেন বেলতলার ছাদে। জবাব দিলেন, কেন, ভাই?

কান্নায় থতিয়ে গেল বালকের মুখের আওয়াজ। একটু সামলে নিয়ে বলল, বাড়ী বিক্রি হ'লে তুমি যাবে কোথায়?

আমি? আমি যাবো কাশী। যেদিন শেষ হবে সেদিন হাড় ক'খানা যাবে মণিকর্ণিকায়। কাশী, কাশী বিশ্বনাথ!

দিদিমার বুকের ভিতরটা ওই বিশ্বনাথের জন্যে যেন হাহাকার ক'রে উঠতো, হাহাকার করতো এ বাড়ীর মমতায়। সেই হাহাকার সে শুনত কান পেতে। সেই হাহাকারে শুনতে পেত কলকাতার ভাঙনের আওয়াজ,—আসছে যেন নতুন, কিছু একটা নতুন। হয়ত ঘোড়ায় চড়ে আসছে সেই কল্কি অবতার, তার পায়ের ধুলো উড়ছে চারিদিকে। ওরা সবাই কোথায় ঠিকরে যাবে কেউ জানে না। সামনের ভবিষ্যৎটা ভয়ের মতন এসে দাঁড়াচ্ছে।

বোনেদের একে একে বিয়ে হয়ে চলে গেছে। যারা কাছে ছিল, পাশে ছিল, তারাও দেনাপাওনা বুঝে নিয়েছে। মামার সেই ডালিম গাছ শুকিয়ে গেছে, পুষি বিড়ালটা মরে গেছে কোথায় কোন্ আঁস্তাকুড়ের পাশে শুয়ে।

দেখতে দেখতে ক্ষিরি নাপতিনি চোখ বুজলো; মরে গেল মানুর মা। তারপর মরে গেল নয়নদাদা। নয়ন দাদার বয়স হয়েছিল চার বছর কম একশো। শনদড়ির মতো তার মাথার চুল, কোঁচকানো চামড়ার মধ্যে তার শরীরে ছিল চওড়া হাড়, কথা বলতো কম,—স্যাকরা বাড়ীর টাকা আদায় ক'রে বেড়াতো এখানে ওখানে। সে নাকি মরবার আগে পর্যন্ত এক সের ক'রে খাঁটি দুধ খেতো। একদিন সে দেখল বেহারী বুড়োর গঙ্গাযাত্রা। বুড়ো খাবি খাচ্ছে,—তাকে খাটে ক'রে ঝুলিয়ে নিয়ে গেল নিমতলায়।

বাড়ীর ভিতর ঘরকন্না ভাঙ্গছে। মামী বলছেন, বাড়ী বেচে আমায় কিছু দিয়ো। চিরকাল তোমাদের বাড়ীতে ঝিগিরি করলুম,—এবারে বেরিয়ে পড়বো। আমি গিয়ে থাকবো কেষ্টনগরে। সেখানে আজও আমার বাপ-খুড়োর গুষ্টিরা বেঁচে আছে।

দিদিমা বললেন, তোমাকে টাকা দেবো কোন্ স্ববাদে ?

আমার পাওনা আমি নিয়ে চলে যাবো এখান থেকে।

ওই দস্যুকে বুঝি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে যেতে চাও ?

সে তোমরা মায়ে-ব্যাটায় বোঝাপড়া ক'রো, আমি জানতেও আসবো না! —মামী মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন।

দিদিমা হেঁকে বললেন, তোমার সোয়ামী আমার নামে হাইকোর্ট করবে, আর আমি দুধকলা দিয়ে সাপ পুষবো, কেমন ?

মামীর দিক থেকে আর কোনো সাড়া এলো না।

ওদিকের শূন্য মহলটায় আর ভাড়াটে আসছে না। ভাড়ার নোটিশ ঝুলছে দোতলার জানলায়, কিন্তু খোঁজ নিতে আসছে না কেউ। সুরেন রায়ের কাছে বাড়ী বাঁধা—তাদের ওখান থেকে টাকার তাগাদা আসছে। সুদ আর আসলে টাকা জমেছে অনেক। এদিকে ভাড়াটের অভাবে দিদিমার খরচপত্র চলছে না। বুড়ো দালাল রামলাল প্রায় রোজই আনাগোনা করছে। বাড়ী কেনবার লোক প্রস্তুত।

কালো বিড়ালটা কেঁদে যায় ভাঙ্গা পাঁচিলের ধার দিয়ে, আঁস্তাকুড়ের পাশ দিয়ে। ও বিড়ালটা নাকি অলক্ষণে—দিদিমা বলেন। বিড়ালটা আসে রাত্রে, যখন ওদিকের শূন্য মহলে সাঁ সাঁ ক'রে যায় হাওয়া,—যখন এদিকের মহলে একেবারে নিশুতি,—নিচের তলায় যখন জনমানব থাকে না। কালো বিড়ালের

ডাক শোনা যায় বেলগাছের নীচে, আনাচে কানাচে,—ওর সঙ্গে যেন একাকিনী পেত্নীর কান্নাটাও মিলে যায়। সিঁড়ির তলাটা অন্ধকার, কলতলার পাড়াটাও ঝুপসি। বুঝতে পারা যায় আর কিছুদিন পরে ও বাড়ীতে একটি মানুষও থাকবে না। এ কথা মনে রয়ে গেল এই বাড়ীতে কেউ কা'রো জন্যে কখনো কাঁদলো না, কেউ কাউকে বুক ভ'রে ভালোবাসলো না, কেউ বড় রকমের কিছু লেখাপড়া শিখলো না, এবং কোনোদিন কারো মুখ থেকে ভালো কথা শোনা গেল না। শুধু মরবার জন্য ওরা বেঁচেছিল, বাঁচবার জন্য ঘরে ঘরে ভাত ফুটিয়ে খেয়েছিল।

ভাঙ্গন ধরেছে কলকাতায়। নতুন নতুন রাস্তা হচ্ছে, নিত্য নতুন নক্সায় একটির পর একটি প্রাসাদ গ'ড়ে উঠছে। যারা পুরনো ছিল, যারা পুকুরঘাট আঁকড়ে ছিল, যারা জামার বদলে উড়ুনি আর কোর্তা গায়ে দিয়ে মাথায় গামছা চাপিয়ে ঘুরে বেড়াতো,—তা'রা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। পাড়ায়-পাড়ায় আর ভিস্তি দেখা যাচ্ছে না কাবলীওলার সংখ্যা যাচ্ছে কমে,পাল্‌কির আড্ডায় পাল্‌কি আর বেহারাদের যখন তখন দেখা যাচ্ছে না, খোলার খাপরা তা'র নোংরা হাওয়া নিয়ে স'রে যাচ্ছে, পাড়ায়-পাড়ায় মিশনারিরা আগের মতন আর ঘুরছে না। মিত্তিরদের জুড়ি গাড়ী বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, হরমোহনবাবুরা নাকি মোটর গাড়ী কিনবে, কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় নাকি পিচ্‌ পড়বে, হাওড়ার পন্‌টুন্‌ পুল নাকি থাকবে না।

ভাঙ্গন ধরছে পাড়ায় পাড়ায়। যা কিছু পুরনো, এবার থেকে সে সব লোপ পেয়ে যাবে। তারা যে-যার কোথায় স'রে যাবে কেউ জানে না। তারা নাকি থাকবে কেবল ইতিহাসে। পুরনোটা পালাচ্ছে, নতুনটাকে ভালো ক'রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা। যদি জিজ্ঞেস করো, এত যে ভাঙছে, এত যে গ'ড়ে উঠছে —এখানে আসবে কারা, কা'রা থাকবে- কেমন তাদের চেহারা, তাদের সঙ্গে এদের মিলবে কিনা,—এ সব কথার জবাব কারো মুখেই নেই। ওরা কেবল ভেঙ্গেই যাচ্ছে, ওদের কাজ হোল ভাঙ্গনের,—ওরা প্রশস্ত জায়গা রেখে দিচ্ছে তাদের জন্যে, যাদের সঙ্গে ওদের কোনো জানাশোনা নেই।

মাঝরাত্রে দিদিমার সাড়া পাওয়া যায়। তাঁর ঘুম নেই, ঘুম তাঁর আসে না। তিনি ডাকেন, জেগে আছো মা, বিশু?

এদিক থেকে উত্তর আসে, কেন মা?

তোমার মনে আছে, ও-মহলের কোণের ঘরে সেই বোষ্টমদের? কী গানই

গাইতো তারা! এখনো যেন কানে শুনছি।

মা বলেন, সব মনে আছে।

দিদিমা বলেন, সেই মেয়েটাকে কোত্থেকে যেন ধরে এনেছিল। কী মারধরই করতো ছুঁড়িকে! মেয়েটার আচার-ব্যাভার কিন্তু ভালোই ছিল।

মা বলেন, পোড়ারমুখির জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না কিছু।

ওই পর্যন্তই। দিদিমাও চুপ, মায়েরও আর কোনো সাড়া নেই। পোড়ারমুখির কথাটা রাম কিন্তু ভোলেনি। মেয়েটার নাকে তিলক, হাতে উল্‌কির লেখা—'হরে কৃষ্ণ', মাথার খোঁপায় বেলফুলের মালা, চোখ দুটোয় যেন ঘুমের ভাব, পরনে থানকাপড়,—মেয়েটার সোঁদা সোঁদা গা, সেই গা থেকে সে চন্দনের গন্ধ পেত। কীর্তনের কলি থাকতো তা'র মুখে দিনরাত, আর সে গান গাইলে ওদের এদিকে সকলের হাত থেকে কাজ প'ড়ে যেত। একদিন বাড়ী ছেড়ে তা'রা চ'লে গেল কিন্তু তা'র মাথুরের গান সেই থেকে এই বাড়ীর বুকের তলাটাকে টনটনিয়ে তুলতো। কীর্তনের সেই কান্না রেখে গেছে সে ওই কোণের ঘরের হাওয়ায়।

ওরই পাশের ঘরের সেই বেথুন কলেজে পড়া ফর্সা মেয়েদুটোকে মনে পড়ে। তা'রা বয়সে অনেক বড়। তাদের বাপের নাম রমাকান্ত কাকাটিয়া। তারা আসামের লোক,—এখানে এসেছিল লেখাপড়ার সুবিধের জন্য। মনে পড়ছে কোনোদিন কথা বলেনি তারা। তা'রা সম্ভ্রান্ত, তা'রা শিক্ষিত, তাদের পোশাকে আভিজাত্য। কাছাকাছি গিয়ে ছেলেটা দাঁড়িয়েছে, দয়ার চোখে দেখে তা'রা স'রে গেছে। নিজেদের মধ্যে বিদ্রূপের হাসি হেসেছে নিজেদের ভাষায়, কিন্তু রাম সম্ভ্রমের চক্ষে ওদের দেখেছে। বুঝতে পারত, ওদের কী ঘৃণা, কী কৃপা এদের ওপর। কী কঠিন হাসি মাখানো থাকতো ওদের মুখে। গোলাপ ফুলের মতন চেহারা,—কিন্তু যেন শুক্‌নো রঙ্গীন কাগজের ফুল। ওদের চোখ দিয়ে ছেলেটা নিজেদেরকেই দেখত, ওরা কী কাঙ্গাল, কী অকিঞ্চন, কী নির্বোধ। যতদিন তা'রা ছিল ওই বড় ঘরে, ততদিন ওদের ঘৃণা বয়ে সে বেড়িয়েছে।

দরজার মাথার উপরে যে ঘর, সেই ঘরে ছিল অরুণ চৌধুরী। জমিদারের ছেলে সে, শান্তিপুরের ধুতি পরতো, সারাদিনে পাঁচ-ছয়বার চান্ করতো সাবান দিয়ে—আর গায়ে একটি গেঞ্জি দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতো। তা'র ছিল একটু মাথার দোষ, নিজের মনে কী বকতো, আর চাকরকে সরিয়ে নিজের হাতে পান সাজতে বসতো। কী সৌখীন তা'র নজর, কী সুন্দর তা'র চেহারা।

হঠাৎ একদিন রাত্রে সে খুন করতে উঠলো তা'র চাকরটাকে। চীৎকারে ঘুম ভাঙলো এ মহলের। মামা এদিক থেকে লাঠি ঠকঠক করলেন, কিন্তু খুনে পাগলের সামনে গিয়ে তাঁর দাঁড়াবার সাহস ছিল না। চাকরের চীৎকারে অত রাত্রেও রাস্তায় লোক জড়ো হলো। শেষকালে তাকে তালাবন্ধ ক'রে চাকরটা বেরিয়ে এসে এক কোণে রাত কাটালো। পরদিন থানা পুলিস। সেই জমিদারের ছেলেকে নিয়ে গেল নাকি বহরমপুরে।

সব ঘরের গল্প ছেলেটার মুখস্থ। শূন্য মহলের অতীত কাহিনীরা ওর কানে আর মনে যেন রাত হলেই ভিড় ক'রে আসে। সেই ছিন্নভিন্নরা প'ড়ে থাকবে শূন্য ঘরে ঘরে, ঘুরে বেড়াবে এ বাড়ীর হাওয়ায়, দেওয়ালে, পাঁচিলে, আনাচে কানাচে। কিন্তু ওরা আর এখানে থাকবে না।

মামা যেন একটু বদলে গেছেন, একটু ঠাণ্ডা হয়েছেন। একদিন বললেন, বাড়ী বিক্রি হয়ে গেলে বাড়ী আমি ফেরত পাবো—কিন্তু কত টাকায় বিক্রি হচ্ছে শুনি ?

দিদিমা বললেন, বটে, টাকার গন্ধ পেয়েছিস বুঝি ? তোর এত মাথাব্যথা কিসের ?

মামা তেড়ে উঠে বললেন, টাকার ভাগ আমি চাই, নৈলে হাইকোর্টে গিয়ে ওই জাল উইল আর বিষ খাওয়ানো প্রমাণ করবো।

তবে হাইকোর্টেই যা, মেনিমুখ নিয়ে ঘরে ব'সে থাকিস কেন ? টাকা চাস কোন্ লজ্জায় ?

মামা বললেন, যাবো, হাইকোর্টে'ই যাবো,—তার আগে সব নিকেশ ক'রে যাবো। ছুরিখানা আমার আজও ভোঁতা হয়নি।

মামা ঘরে গিয়ে ঢোকেন। মাঝে মাঝে তাঁর ছুরিতে মরচে ধরে যায়, মাঝে মাঝে সেই ছুরি তিনি শানিয়ে তোলেন। সেই ছুরিটি একদিন ছেলেটা লুকিয়ে দেখে এসেছে। সেখানা ছোরা নয়,—ছোট্ট পেন্‌সিল কাটা ছুরি। কিন্তু তারই ভয় ক'রে এসেছে ওরা এতকাল। ওর চেয়ে খুন্তি ভালো, চিমটে ভালো, এমন কি সোন্না-নরুণও ভালো। ছয় পয়সা দামের ছোট্ট একখানা ছুরি। যা ছোট ছেলের পকেটে পকেটে ঘোরে।

তবু সকলেরই একটা হৃৎকম্প ছিল—যেদিন বাড়ী বিক্রি হবে, সেদিন মামার কি উত্তাল চেহারা। দানবের হুঙ্কারে সেদিন কেঁপে উঠবে বাসুকীর ফণাটা, কেঁপে উঠবে পৃথিবীর তলাটা। সেদিনকার ভূমিকম্পের দোলনটা কে সইবে ? কা'র এমন সাহস ? ঠাকুর ঘরে গিয়ে দিদিমা চুপি চুপি আলোচনা

করেন। যেদিন বাড়ী বিক্রি হবে, সেদিন দিদিমাকে বাঁচানোর জন্য থানা থেকে পাহারাওয়ালাকে আনা দরকার,—বটতলার থানায় ডায়েরী ক'রে আসা চাই সকলের আগে। মামা ভয়ানক হিংস্র, তাঁর হাত থেকে সাবধান থাকা দরকার।

সাতপুরুষ ধ'রে শিকড় নেমে গেছে এই পাড়ার মাটির তলায়, তা'কে উপ্‌ড়ে ফেলবার সন্ধিক্ষণ এসেছে এবার। আর সময় নেই, নতুনের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, ভাঙনের আওয়াজ আসছে কানে। গুছিয়ে যদি নিতে হয় তবে এই বেলা। এই বেলা ঘট ভ'রে নাও, কাজ সেরে রাখো, ফসল ঘরে তোলো। এবার ঝড় উঠবে, ঈশানের কোণে কালো মেঘ জমেছে, তুফান আসবে সমুদ্রে। এই বেলা তীরে ওঠো।

দিদিমা বলেন, ওরে, ন্যায়বাগীশের বংশ, গলগণ্ড মেলাবার গুষ্টি। বন কেটে বসতি বসেছিল ওই বত্রিশ নম্বর বাড়ীতে। সে অনেককালের কথা ভাই।

ছেলেটা মুখ তুলে তাকাত দিদিমার দিকে।

দিদিমা গল্প ব'লে যেতেন। যশোর খুলনা জেলার এক বামুনের ছেলে ঘুরতে ঘুরতে এসেছিল সুতোনুটিতে, ছেলেটার নাম ছিল অনন্তরাম। দেখতে রাজপুত্তুর, কিন্তু গলায় ছিল তা'র গলগণ্ড। সে আজ দুশো বছর আগের কথা রে, তখন এদেশে নবাবী আমল, কোম্পানীর রাজত্ব তখনও হয়নি। রেলগাড়ী নেই, পায়ে হাঁটা পথ। ছেলেটা এসে উঠলো শোভাবাজারের মস্ত রাজ-বাড়ীতে। সেখানে হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। রাজার ঠাকুর-বাড়ীতে গিয়ে ছেলেটা পুরুতের কাজ নিল। খায় দায়, আর থাকে একটা ঘরে। রাজবাড়ীর পূজো, পাওনা-গণ্ডা বেশ ভালোই। অনন্তরাম রোজ গঙ্গাস্নান সেরে এসে গলায় উড়ুনীখানা জড়িয়ে পূজো করতে বসে। পূজো করে এক মনে, পূজোর মন্তর শুনে সকলের গায়ে কাঁটা দেয়। একদিন কিন্তু রাজার নজরে প'ড়ে গেল। রাজা বললেন, ঠাকুর মশাই, তোমার গলায় ওই উড়ুনীখানা কেন জড়ানো থাকে? অনন্তরাম মিছে কথা বলতে পারতেন না। বললেন, রাজা মশাই, গলায় আছে আমার গলগণ্ড। ওটা নিয়েই আমি জন্মেছি। রাজার মুখ গম্ভীর হলো। বললেন, শরীরে একটা খুঁৎ নিয়ে রাজ-বাড়ীতে তোমার পুরুতগিরি করতে আসা উচিত হয়নি। তুমি এমন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, এত ভক্তি তোমার, ঠাকুরের দয়ায় ও রোগটা কেন তোমার সারেনি? এই কথা শুনে অনন্তরাম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ব্রাহ্মণের মুখের ওপর এত বড়

কথা ? আমি চললুম। এ রোগ যদি সারাতে পারি তবেই দেবতার ভজনা করবো, নৈলে না খেয়ে মরবো পথের ধারে শুয়ে। এই ব'লে ন্যায়বাগীশ গঙ্গায় চললেন। ঘাটে গিয়ে গলাজলে নেমে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনদিন চোখ বুজে। তিনদিন পরে সেই গলগণ্ড মিলিয়ে গেল।

মিলিয়ে গেল !—ছেলেটা উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল দিদিমাকে।

হ্যাঁ, মিলিয়ে গেল। অনন্তরাম ফিরে এলো হাসিমুখে আবার রাজবাড়ীতে। সেই দেখে রাজা কেঁদে পড়লেন সেই ব্রাহ্মণের পায়ে। বললেন, অপরাধ নিয়ো না, ঠাকুর—কি বলতে কি বলেছি। তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি নারায়ণ। তোমার পায়ের ধুলোয় রাজবাড়ী পবিত্র হোক। যা তুমি চাও তাই দেবো। ন্যায়বাগীশ বললেন, আমি দেবসেবা চাই, আর কিছু চাইনে। রাজা সে কথা শুনলেন না। তিনি ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করলেন। তখন কাঁসারিপাড়া, ঠনঠনে, বারশিমলে, পুঁটিবাগান—সমস্তই জঙ্গল, বাদুড়বাগানের ওদিকে বাঘ ডাকে, কালীঘাট যেতে গেলে ডাকাতে অঞ্চল পেরিয়ে যেতে হয়,—মাঝখানে ধানক্ষেত আর বনবাদাড়। সেই সময় ন্যায়বাগীশ জায়গা পেলেন এই বারশিমলেয়। সেই থেকে এ পাড়ার নাম হলো ভটচার্যি বাগান। তোর মামাতো ভাইকে নিয়ে এই হলো সাত পুরুষ। ন্যায়বাগীশের বংশ যে ! ওদের কত বোল বোলা, বারো মাসে তেরো পার্বণ,—ওদের কথায় রাজা ওঠে বসে।

টিপটিপ ক'রে রেড়ির তেলের পিদিমটা জ্বলে। বালিধসা ফাটলধরা দেওয়ালে দুশো বছর আগেকার ছায়ারা যেন ন'ড়ে বেড়ায়। সেকালের সেই নবাব, সেই শোভাবাজারের রাজা, সেই সেপাই সান্ত্রী পাহারা,—তাদের সঙ্গে এসে দাঁড়ায় তরুণ ব্রাহ্মণ—আপন অহঙ্কার আর মহিমায় ওই পিদিমের আলোয় জ্বলজ্বল ক'রে।

দিদিমা বলেন, শুনবি তবে আর এক গল্প ? শোন্ তবে—

তিনি যেন আরেক যুগে এসে থমকে দাঁড়ান,—আরেক গল্প তুলে ধরেন বালক-বালিকাদের চোখের সামনে।

ফরিদপুরের বেলেকাঁদি গাঁয়ে এক বর গিয়েছিল বিয়ে করতে। হাওড়া জেলার বর, বরযাত্রীরাও তাই। বিয়ের দুদিন পরে কনেকে সঙ্গে নিয়ে বরের দল শেষ রাত্রে উঠেছে নৌকোয়,—মস্ত বজরা নৌকো। ভোরের আলো ফুটতে দেখা গেল, বছর তেরো বয়সের একটি বামুনের ছেলে সেই নৌকোয়

সবাইকে লুকিয়ে উঠে বসেছে আগের রাত্তিরে। রাত কাটিয়েছে পাটাতনের নীচে। ছেলেটার পৈতে হয়েছে সবে, মাথাটা ন্যাড়া, গায়ে শাদা চাদর— দেখতে একেবারে চাঁদের টুকরো। বিষয় আশয় সম্পত্তি আত্মীয় স্বজন ছেড়ে ছেলেটা বিবাগী হয়ে চললো ওদের সঙ্গে, কিছুতেই নৌকো থেকে নামলো না। ওদের সঙ্গেই এলো পালিয়ে। হাওড়া রামকেষ্টপুরের ঘাটে নেমে সেই ছেলে এসে উঠলো ঘরেদের বাড়ীতে—সাঁতরাগাছিতে। লেখাপড়া নিয়ে ছেলেটা বসে গেল, ওদের ঘরেই মানুষ হতে লাগলো। কোথায় রইলো তা'র মা-বাপ, কোথায় রইলো তা'র দেশ-গাঁ। সেই বাড়ীতে ছিল গোলাপসুন্দরী ব'লে খাঁয়েদের মেয়ে। খাঁগুষ্টির ছেলেমেয়ের রূপের বড় দেমাক। সেই মেয়ের সঙ্গে বে'থা দিয়ে খাঁয়েরা ওই ছেলেটাকে করলো ঘর-জামাই। ঘর দিলে, জমি দিলে, ভাগের ভাগ দিলে। সেই গোলাপসুন্দরীর রূপ ছিল ডাকসাইটে। এত রূপ সেই মেয়ের যে, নিজের দিকে চাইতে পারতো না। একদিন কি হলো জানিস ভাই? নিজের রূপ দেখে নিজেই সে পাগল হয়ে গেল। নীচের তলাকার একখানা এঁদোপড়া অন্ধকার ঘরে তাকে বন্ধ রাখতে হলো। আহা, একুশ বছর বয়সে সেই গোলাপসুন্দরী পাগল অবস্থায় একদিন ম'রে গেল! রেখে গেল একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে।

এপাশ থেকে মা বললেন, পুরনো কথা আর কেন তোলো, মা? ওসব কাহিনী ডুবে যেতে দাও!

দিদিমা বললেন, তা হোক মা। কবে বলতে কবে ম'রে যাবো, সব কথা ব'লেই যাই। ওরা বংশপরিচয় জেনে রাখুক। গোলাপসুন্দরী কে জানিস, ভাই?

ভাইবোনেরা সবাই মুখ তুলে তাকাল দিদিমার মুখের দিকে। দিদিমা বললেন, সেই হলো তোদের ঠাকুমা! তখন মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমল। আর ওই ছেলেটাই তোদের ঠাকুরদাদা!

পিদিমের আলোটা তখন প্রায় নিবে এসেছে। সেই অন্ধকারে ওরা কি দেখত? কী দেখত জানলার বাইরে নিমগাছটার সেই ঝাপড়াগুলোর ভিতরে! অতীতকাল কোথাও কথা কইছে না! বোবা রাত্রি বুকের ওপর চেপে বসে। এই অবরোধের ভিতর থেকে পালিয়ে যাবার জন্য ছেলেটা ব্যাকুল হয়ে উঠত। ওই যেমন পালিয়ে এসেছিল অনন্তরাম ন্যায়বাগীশ, যেমন পালিয়ে এসেছিল সেকালের সেই এক তরুণ কিশোর চন্দ্রনাথ! গলায় তা'র পৈতের গোছা, শাদা উড়ুনী গায়ে জড়ানো, মাথাটা ন্যাড়া—সুন্দর সুকুমার কিশোর। রামও

যেন চলেছে তা'র সঙ্গে সেই শেষ রাত্রে। নৌকোয় চলেছে নদীপথে নিরুদ্দেশে। টলমল করছে নৌকো, অকূলের দিকে পাড়ি দিয়েছে রামও তার সঙ্গে। ভবিষ্যৎ জানা নেই, জানা নেই এ জীবনের কোনো পরিণাম। সমস্ত কাঁদন বাঁধনকে ডিঙিয়ে, স্বজন পরিজন আত্মীয় বন্ধুকে ছেড়ে—ওর সঙ্গে একই নৌকোয় পাড়ি দিয়ে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে ছেলেটা মিলিয়ে যেতে লাগল। সেই ঠাকুরদাদা আজ যেন নাতি হয়ে উঠেছে।

ভাঙন ধরেছে কলকাতায়, ভাঙন ধরেছে পাড়ায় পাড়ায়। কে যেন তাড়না করছে। দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে। কত জঞ্জাল জমেছে এই বাড়ীতে, কত কালের কত নোংরা স্তূপাকার হয়ে উঠেছে এখানে ওখানে, একোণে ওকোণে। কত ফাটলে বাসা বেঁধেছে চামচিকে, কত গর্তে ঢুকে রয়েছে কেঁচো আর কাঁকড়া বিছে, কত কীটপতঙ্গ সাপখোপ। এর উপরে পড়বে ভাঙনের আঘাত। ঝাঁটা দিয়ে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবে সবাইকে।

কালো বিড়ালটা কাঁদলেই ছাঁৎ ক'রে ওঠে বুকের ভিতরটা। ওর কান্নাটা কানে এলেই রাম বুঝতে পারে, এ বাড়ীর থেকে ওদের বাস উঠবে। দিদিমা বাড়ী বিক্রি করবেন। রামলাল দালাল খদ্দের আনছে।

ভাঙন ধরেছে ওদের মনে, বাঁধন ভেঙেছে ওদের জীবনে। জঞ্জাল সরিয়ে ওদেরকে এখান থেকে চ'লে যেতে হবে। ওরা সবাই ঘরভাঙার কাজে লেগে যায়। কী আছে ওদের? আছে আবর্জনা, আছে অদরকারী অনেক সামগ্রী। ওরা কোনো কাজে আসবে না, ওরা কেবল দিনে দিনে জমে উঠেছে আশেপাশে। টিনের কৌটো, খালি শিশি, ছেঁড়া মাদুর, পায়াভাঙা জলচৌকি, পুরনো জুতো, কানাভাঙা কাঁচের বাটি, পারাওঠা ময়লা আরশি, দাঁড়াভাঙা চিরুনি। ময়লা বালিশ থেকে তুলো বেরিয়ে পড়েছে, তোশকের ভিতর থেকে বেরিয়েছে নাড়িভুঁড়ি। ফুটো বালতি, মাটির হাঁড়িকুঁড়ি, ছেঁড়া ছাতা,—ভাঙনের মুখে ওরা একটি একটি ক'রে বেরিয়ে পড়েছে আজ লোকসমাজের সামনে। ওরা ওদের যাবার পথ আগলে রেখেছিল এতকাল, এবার যাবার তাড়ায় ওদেরকে পা দিয়ে সরিয়ে চ'লে যাবে।

হঠাৎ ওই আবর্জনার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে অদ্ভুত সামগ্রী। গোয়ালীয়রের রাজামার্কা একটি তামার পয়সা! পুরনো কাঠের সিন্দুকের ভিতর থেকে একপাল আরশোলার সঙ্গে বেরিয়ে আসে সমুদ্রের শুকনো একখণ্ড ফেনা! ওরা অবাক হয়ে পরীক্ষা করতে থাকে। ঝুপসি কুলুঙ্গির ভিতর থেকে কেউ হাত বাড়িয়ে খুঁজে পায় কোন্ দেশের পাহাড়ের একটি রামখড়ি।

একরাশি সমুদ্রের ঝিনুক খুঁজে পেয়ে যায়। পেয়ে যায় গয়া-র পাথরবাটি, এক টুকরো কষ্টিপাথর, একটি চুম্বক লোহা, এক শিশি চুয়া, পঞ্চবটির একখানা পুরনো ছবি, পিতলের পিনাটে বসানো একটি ছোট শিবলিঙ্গ, তীর্থযাত্রার একখানা পুস্তিকা, ধূমপানের একটা পাইপ। ছোট একটি পুঁটলি খুঁজে পায় তা'র মধ্যে রুদ্রাক্ষ, লাল সুতো, টিনের আয়না, শুকনো ফুলের গুঁড়ো, সিঁদুর মাখানো চাউলের দানা। ওরা কী যেন আবিষ্কার করে সমস্ত সামগ্রীর মধ্যে। ওর মধ্যে কত দেশের কাহিনী, কত ভ্রমণের ইতিহাস, কতকালের পুরনো গন্ধ।

কী কৌতূহল ওদের চোখে মুখে। মা লক্ষ্য করতেন, কিন্তু কথা বলতেন না। অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করলে ধমক খেত,—ফেলে দে, ফেলে দে—ওসব জঞ্জাল আর সঙ্গে নিয়ে যাসনে।

জঞ্জাল, সবাই জানে। কোনো কাজে আসবে না, এও জানা। তবু ওই জঞ্জালেই মস্ত পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। ওরা খবর আনে অতীতের প্রাচীনের, পিতৃ-পুরুষের। ওরা খবর আনে সুদূরের। সমগ্র বাল্যকালটা যেন অস্থির কৌতূহলে সমস্ত সামগ্রীর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

বাড়ী ছেড়ে যাবার আগে দিদিমার মন শোকাচ্ছন্ন। তবু ছেলেটাকে ওই জঞ্জালের কাহিনী জানতে হবে বৈ কি, না জানলে স্থির থাকবে কেমন ক'রে বাকি জীবনটা? ভূগোলে সে প'ড়ে এসেছে যে সব দেশের নাম, তা'রা কেমন ক'রে এলো ওদের ঘরের কুলুঙ্গিতে,—ওদের ওই ভাঙ্গা কাঠের সিন্দুকে?

দিদিমা? তুমি জানো?—ছেলেটার জিজ্ঞাসা অস্থির হয়ে ওঠে।

চোখের জল মুছে দিদিমা বলেন, আহা অজ্ঞান—কোত্থেকে জানবে বলো মা? তিন মাসের ছেলেটি রেখে বাপ গেল, বাপের পরিচয় জানতে সাধ হয় বৈ কি। আহা, চোখে যেন আজো দেখতে পাচ্ছি। এই এতখানি বুকের ছাতি, মটর ডালের মতন রং, ঝাঁপা ঝাঁপা কোঁকড়া চুল, কী লম্বা চওড়া। পাশ দিয়ে গেলে পথের লোক চেয়ে থাকতো। রূপ দেখেই ত ঘরে জামাই ক'রে এনেছিলুম! দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াতো বাউণ্ডুলে হয়ে, বাপ ছিল ঘরজামাই, তাই অহঙ্কার ক'রে বাপের সম্পত্তি ছুঁলো না,—শেষকালে ওর মামা গিয়ে ওকে ধরলো কাশীতে। সেখানেই তোর মায়ের সঙ্গে বিয়ে দিলুম, ভাই। জামাইটি আমার বড্ড বদরাগী ছিল, কারো তোয়াক্কা রাখতো না। চাল নেই চুলো নেই—কিন্তু রাজার মতন মেজাজ ছিল। চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতো,—শ্বশুর শাশুড়ী শালা শালীকে গেরাহ্যি করতো না। বিয়ের রাত্তিরে

বাসরে ব'সে বললে, বউ আমার শ্যামবর্ণ হলো, আমি খুশী। সুন্দরী হ'লে কথায় কথায় আমার সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেত।—নতুন জামাইয়ের কথা শুনে আমরা সবাই অবাক!

পিতৃ-পরিচয় শুনে স্তব্ধ হয়ে দিদিমার দিকে চেয়ে রইল সবাই। দিদিমা বললেন, পড়াশুনোয় বড্ড মনোযোগ ছিল। যত রাজ্যের বই এনে রাত জেগে জেগে পড়তো। রাশি রাশি বই। বই নিয়ে একবার বসলে ঘরকন্নায় তা'র মন থাকতো না।

নিঃসাড়ে বসে ছেলেটা সমস্ত গল্পটা শুনে যেত। রেড়ির তেলের পিদিমটা জ্বলে পুড়ে একসময় যেন থাক হয়ে যেতো।

দিদিমার বাড়ী বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। গোপাল মল্লিকরা কিনবে। তাই নিয়ে মাঝে মাঝে কান্নাকাটি চলছে। তবু বাড়ী বেচলে দিদিমার দেনা শোধ হবে। সবাই কিছু কিছু পাবে। মামা তাঁর পাওনা নিয়ে সেই টাকায় হাইকোর্টে নালিশ ঠুকবেন। আবার তিনি ফিরে পাবেন ফলনা ভটচার্যির এই সম্পত্তি। গোপাল মল্লিককে তিনি ঘুঘুর ফাঁদ দেখাবেন। দিদিমা অতঃপর তাঁর শেষ বয়সে কাশীবাস করবেন। মামী ওই দস্যুকে ছেড়ে চলে যাবেন তাঁর ব্যাপের বাড়ী কেষ্টনগরে।

এ বাড়ী ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে চিরকালের মতন। ওদের কাছে এবার ডাক এসেছে অন্যান্য জীবনের। শুধু যে বাড়ী ছাড়া হচ্ছে তা নয়, সবটা ভেঙ্গে যাচ্ছে। চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে একের সঙ্গে আরেকের সম্পর্ক। বাঁধন কেটে গেছে সকলের। ভাঙ্গন ধরেছে পুরনো কলকাতায়।

যাবার আগে ও-ছেলেটা ভাবল, আজকে শেষদিনের মতো পুঁটিবাগানে মান্টুর সঙ্গে ক্যারম খেলে আসি। মান্টু ওর ক্যারম খেলার গুরু। দুজনে প্রায় সমবয়সী। মান্টু ভীষণ খেলে। তিন বোর্ডে গেম্ দেয়। এও কম যায় না। মান্টু যখন রামের সঙ্গে ক্যারম নিয়ে বসে তখন প্রায় ক্যালকাটা ভার্সাস মোহনবাগান। কে হারে কে জেতে!

মান্টুরা চৌধুরী। মস্ত বাড়ী ওদের। বৈঠকখানায় ফরাসের ওপর খেলা হয়। বাইরের বেঞ্চে বসে রাম ওকে ডেকে পাঠাল। ও-বাড়ীর সবাইয়ের সঙ্গে রাম ঘনিষ্ঠ। কিন্তু মান্টুর প্রতি ওর ছোটবেলা থেকে অনুরাগ। সেই অনুরাগ কৈশোরের বাহিরপ্রান্তে এসে আরও যেন নিবিড় হয়েছে। মান্টুকে ভিন্ন সে কিছু ভাবে না।

বামুনদিদি ঘরে গেল, ঝি-চাকর সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত,—কিন্তু মান্টু

আর আসে না। বছরের পর বছর দিনের পর দিন খবর পাবামাত্র যে মানু ছুটে এসে খেলায় বসে যায়—সেই মানু কেন আসে না? এ যে প্রায় আধঘণ্টা হতে চলল।

অবশেষে মানু এক সময় এল। কিন্তু এ মানু সে মানু নয়। সে-মানু এতকাল ফ্রক পরেছে, এ-মানু এল শাড়ি পরে। গতকাল মানু ছিল বালিকা, আজকের মানু তরুণী। হাতে দুগাছা বালা, কানে ছোট্ট সোনার ফুল। সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, চলে যেতে বললুম তখন যে? তবু বসে আছিস কেন?

রাম বলল, খেলতে বসবিনে?

খেলতে? তোর সঙ্গে?—মুখখানা গম্ভীর করে মানু বলল, তোর বুঝি লজ্জা করে না আমাকে ডাকতে? আমি না এখন বড় হয়েছি?

রাম একেবারে অবাক। বিশ্বসংসার তার সামনে দুলছিল। সে বলল, আমি খেলতে এসেছিলুম। এ পাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তাই যাবার আগে—

মানু চলে যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়াল। বলল, না, আর খেলব না। তুই যা, আর আসিসনে কোনদিন।

মানু অদৃশ্য হয়ে গেল। কালীবর্ণ অন্ধকারে যেন সব ডুবে গেল।

এ যেন একটা মৃত্যু। এ যেন ভালোবাসার বিষম অপমান। কেঁদে উঠল রামের ভিতরটা। তার বাল্য আর কৈশোরের চরম সর্বনাশ যেন আজ ঘটে গেল। সামনের দোতলার পাঁচিলের উপর একদল ক্লান্ত পায়রার বুকফাটা বকবকম শোনা যাচ্ছিল। রাম সেই দিকে তাকিয়ে এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। আজ প্রথম আবিষ্কার করল, মানু তাকে কোনও দিন ভালবাসেনি, এবং সে নিজে আজ প্রথম জানল, তার মতো নির্বোধ এবং অজ্ঞান আর কেউ নেই।

চৌধুরীদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোন্‌দিকে যেন সে চলতে লাগল।

ওদের যাবার দিন স্থির হলো।

গোলা পায়রারা থাক ওদের কোটরের মধ্যে, চামচিকেরা থাক্ ফাটলে-ফাটলে, ইঁদুরেরা থাক্ গর্তগুলোয়, আনাচে কানাচে থাক্ মাঝরাত্রির সেই ভূত পেত্নী দৈত্য পিশাচের দল,—ওদের সকলের হাতে রাজ্যপাট রইলো,—এরা এবার বিদায় নিয়ে চ'লে যাচ্ছে।

অল্প জায়গার মধ্যে ছেলেটা ঘুরছিল এতদিন। আশেপাশে আঁকা-

বাঁকা গলিঘুঁজি, বস্তির ভিতরকার বিচিত্র গোলকধাঁধার পথ,—কিন্তু সমস্তটা যেন ওর চিরকালের চেনা। গঙ্গার মার মতন সেও যদি অন্ধ হত, তবে তারও অসুবিধে হোত না। পা বুলিয়ে বুলিয়ে গন্ধে গন্ধে—সমস্ত পাড়াপল্লীর প্রত্যেকটি পরিচিত ঘরে, প্রতি গলিতে অনায়াসে ঘুরে আসতে পারত। চোখ বুজে সে চ'লে যেতে পারত মিত্তিরদের বাড়ী বাঁদিকে রেখে অর্জুনের দোকান ছাড়িয়ে মহাকালী পাঠশালাটা পেরিয়ে পুঁটিবাগানের পথটা ধরে কচিদের বাড়ীর ধার দিয়ে। তারপর সোজা ফিরে আসতে পারত নিজেদের গলিতে। কিন্তু এর বাইরে যে কলকাতা, সেটা ওর কাছে গল্প, ওর কল্পনা। আজ সেই অজানা কলকাতার মস্ত বড় বিস্তারের মধ্যে কোথাও চ'লে গিয়ে ওদের আশ্রয় নিতে হবে। সেই জগৎটা একেবারে অপরিচিত। পুরনোটা পিছনে ফেলে যেতে কান্না আসছে, ন[illegible]টা মনে মনে দুর্ভাবনা আনছে। ওদের যাবার দিন স্থির হয়ে গেল।

মামা বললেন, আমি যাবো না, এ আমার বাপ-পিতামোর ভিটে। যদি বিক্রি হয়, তবে হাইকোর্ট থেকে ফিরিয়ে আনবো। আবার ভাড়া বসাবো এ বাড়ীতে। আবার ডালিমের গাছ এনে বসাবো বেলতলার পাঁচিলে, আবার আমি নতুন বেড়াল পুষবো। এ আমার হকের ধন, একে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আর যদি দেখি তেমন বেগতিক, তবে রইলো আমার কাছে ওই ছুরি। নিজের বুকে বসাবার আগে আর পাঁচটাকে নিকেশ ক'রে তবে যাব।

বেশ, তাই করিস্,—দিদিমা চুপ ক'রে যান্। যাবার জন্য তিনি গোছগাছ করতে ব্যস্ত ছিলেন। বিবাদ আর তিনি বাড়াতে চান না। ছেলের বুদ্ধি, বিদ্যা ও শক্তির সীমা তাঁর জানা ছিল।

কিন্তু বালক-বালিকারা এখান থেকে এর আগে গিয়েছে অনেকবার, আবার ফিরে-ফিরে এসেছে। বাঘমারিতে গিয়েছে, গিয়েছে সেই বল্‌দে পাড়ায়। তারপরে গিয়েছে লতাদের বাড়ীতে, সেখান থেকে সেই কেষ্ট-দাসীদের বাড়ী। গিয়েছে বটে, কিন্তু থাকতে পারেনি,—আবার দিদিমা এখানে এনেছেন ফিরিয়ে। এবার যাচ্ছে মাণিকতলায়। কিন্তু এই ওদের শেষ যাওয়া, শেষ ক'রে চ'লে যাওয়া।

এ বাড়ী মস্ত বড় ছিল, মামী তাই ভয় পেলেন। মামী বললেন, তিনমহল বাড়ী—এ বাড়ীতে থাকবে কে একলা? সন্ধ্যের আলো দেবে কে? ঝাঁটা পড়বে কা'র হাতে? গাঁজা-আফিংখোরের সঙ্গে আমি একলা এখানে বাস

করবো না। গলা টিপে যদি আমাকে মারে একদিন, তবে জানবে কেউ? দস্যুকে কে সামলাবে?

দিদিমা বললেন, দস্যু তোমার স্বামী নয়? সাত পাক ঘোরোনি একদিন? শুভদৃষ্টি করোনি? অগ্নিসাক্ষী ক'রে এক পিঁড়িতে বসোনি? এক বিছানায় শোওনি?

রাম বলো! গেল জন্মের কথা!—মামী বাঁকা মুখে ঠোঁট উল্টে বললেন, গাঁজাগুলি খেয়ে ভূতনেত্য করবে জানলে মাথার সিঁদুর কবেই মুছে ফেলতুম। আমি থাকবো না, ছেলের সঙ্গে আমি কালই কেষ্টনগরে চ'লে যাব।

মামী সত্যই চ'লে গেলেন তা'র পরের দিন। কিন্তু যাবার ঠিক আগে মামা চেঁচিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আছে! তোর কেউ সেখানে ঠিকই আছে! তুই নষ্ট মেয়েমানুষ,—চল্লিশ বচ্ছর ধ'রে তুই সেই ব্যাটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিস। সে আজ তোকে ডাকছে সেখান থেকে।

মুখে আগুন কথার!—মামী ঠিকরে উঠলেন।

তামাকের গড়গড়ার সেই বড় চিম্‌টেটা নিয়ে মামা তাড়া ক'রে গেলেন মামীকে, আর প্রবীণ বয়স্কা মামী তাঁর পুঁটলিটি হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। সদর দরজায় ছুটে এসে দাঁড়িয়ে মামা শাসালেন, ফের যেদিন ধরতে পারবো, সেদিন এই চিম্‌টে দিয়ে তোর মাংস তুলে তুলে নেড়িকুকুরকে দিয়ে খাওয়াবো!

মামী ততক্ষণে হন হন ক'রে লালার দোকান ছাড়িয়ে শীলেদের বাড়ীর ধার দিয়ে নির্মল সরকারের বাড়ীর পাশ দিয়ে ছুটে চললেন পুবদিকে। মামীর পক্ষে বিয়ের পরে এই প্রথম বাপের বাড়ী যাওয়া! যাবার ঘটা দেখে পাড়ার লোক ভেঙ্গে পড়েছিল।

অতঃপর মামা রইলেন একা সেই শূন্যপুরীতে। তিনি ঘড়ি সারানোর কাজ তখনও করেন বটে, কিন্তু ঠিক বোঝা যায়নি, তাঁর আহারাদির পর্বটা চলে কেমন ক'রে! বাড়ীটায় দিনের বেলাতেই একা থাকতে কেমন গা ছমছম করে, রাত্রির কথা ত আলাদা। খাঁ খাঁ করছে তিনমহল, ভিতরের ঘরে ঘরে হাওয়ার হাহাকার, নীচের তলাটা প্রেতলোক, আশেপাশে কোথাও জনমানবের সাড়াশব্দ নেই, বস্তি-পল্লীতে সরকারি ভাঙ্গনের ফলে সমস্ত লোকজন পাড়া ছেড়ে কে কোথায় চ'লে গেছে, অন্ধকার সাঁ সাঁ করছে বাড়ীর ভিতরে ও বাহিরে। হয়ত পিদিমের তেল ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু সে অন্ধকারে কোনো এক ঘরে ব'সে রয়েছেন মামা। চোখে তাঁর ঘুম নেই, কিন্তু ঘুমেল

চোখ। গড়গড়ার নলটা হাতে, আফিঙের আমেজ আছে মাথায়, উবু হয়ে ব'সে আছেন তিনি ছেঁড়া কাঁথার ওপর,—আর ভাবছেন শুধু হাইকোর্টের কথা; এই প্রেতপুরী তাঁর পৈতৃক, এ হলো ফল্‌না ভট্টচার্যির সম্পত্তি,—তিনিই একমাত্র ওয়ারিস, সুতরাং মহামান্য হাইকোর্টের সাহায্যে এ সম্পত্তি জননীর হাত থেকে ছিনিয়ে আনা দরকার। মামলা একবার ঠুকলে আর তাঁকে রোখে কে?

কিন্তু মামলার খরচের টাকা?

মামা এলেন একদিন সকালে রামেদের মাণিকতলার ভাড়া বাড়ীতে। বাড়ী বিক্রির রেজেষ্টারী তা'র এক সপ্তাহ আগে হয়ে গেছে। দিদিমা সমস্ত টাকা পেয়ে গেছেন ক্রেতার হাত থেকে। এখন তিনি অতিশয় শোকার্ত হয়ে কাশী যাবার জন্য মন প্রস্তুত করছিলেন। বাড়ী ছেড়ে দেবার জন্য মামাকে একমাসের সময় দেওয়া হয়েছিল।

মামা এসে দিদিমার সামনে অদূরে বসলেন। পুরনো ছাতাটি দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে বললেন, হয়ে গেছে বিক্রি? টাকা পেয়ে গেছ?

দিদিমা বললেন, হ্যাঁ।

মামা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একসময় বললেন, হুঁ, গজকচ্ছপ! পাছে মামলা বাধে আমার সঙ্গে, তাই ব্যাটা এখনো দখল নিতে আসেনি বুঝতে পারছি।

দিদিমা বললেন, সে আসেনি, পেয়াদা আসবে। বাঁশের চাড়া দিয়ে তুলবে। একমাস পেরিয়ে গেলেই গলাধাক্কা!

তুমি বোঝো না, বিষয়-সম্পত্তির কিচ্ছু বোঝো না তুমি!—মামা বললেন, আমি না বলেছিলুম, স্ত্রীধনের প্রমাণ নেই? ছেলে ওয়ারিশন্ থাকতে মায়ে বেচতে পারে না? ওসব বিক্রি আর রেজেষ্টারী রাখো! টাকা হলো কপালের ফল, হাতে পেয়েছ রেখে দাও। আর টাকা পেলেই কি সম্পত্তি হাতছাড়া হয়! আদালত-মকোদ্দমা নেই? হাইকোর্ট নেই? বাড়ীর কওলা রেজেষ্টারী দলিলে বেচে টাকা পেয়েছ, বহুৎ আচ্ছা, টাকাটা তুলে রেখে দাও। ল্যাঠা চুকে গেল। আমি বাড়ী ছাড়িনি, কারণ বাড়ী আমার। তুমি বাড়ী ছেড়েছ, টাকা তোমার। সোজা কথা। টাকাটা তোমার, আর বাড়ীখানা আমার!

দিদিমা বললেন, সকালবেলা বুঝি গাঁজায় দম দিয়ে এসেছিস?

ওই ছাখো, উল্‌টো বুঝলি রাম!—মামা যেন একটু ক্লান্তকণ্ঠে বললেন,

কথাটা বোঝো, সাক্ষীর জোরে কি না হয়! অত বড় হাইকোর্ট দাঁড়িয়ে আছে শুধু সাক্ষীর জোরে! তোমার সাক্ষী না হয় হীরেন দত্ত, আর আমার সাক্ষী খাঁদা শুঁড়ি নেই? ওই তোমার গোবর্ধন ময়রা নেই? কার্তিক স্যাকরা নেই? সব আছে, সব উঠবে মাটি ফুঁড়ে! মামলার টাকা পেলেই বাড়ীখানা ফিরিয়ে আনবো।

মামলা চালাবি, হাইকোর্ট করবি, সাক্ষী ডাকবি,—টাকা দিচ্ছে কে তোকে?

তুমি!—মামা এবার গুছিয়ে বসলেন।

আমি! আমার নামে মামলা করবি, আর আমি তোকে টাকা দেবো? নেশাভাঙ ক'রে বুঝি তোর আর মাথার ঠিক নেই?

ওই ছ্যাখো, আবার উল্টো বুঝলি রাম! তোমার নামে মামলা হবে কেন? যে ব্যাটা বাড়ী কিনেছে, তা'র নামে! জাল-উইলের সম্পত্তি সে যে বেনামীতে কিনেছে! তুমি টাকা নিয়ে ব'সে থাকো গ্যাঁট হয়ে, ও বেটাকে আমি ঘুঘুর ফাঁদ দেখাবো! দেখছো না, ওই জন্তেই আজো দখল নিতে আসেনি! ব্যাটা ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি হাত করতে গিয়েছিল কিনা, তাই পুলিসের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। এ যে ফৌজদারি মামলা, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর!

দিদিমার কাছাকাছি ছেলেটা এক পাশে বসেছিল। মামা হঠাৎ তার দিকে তাকালেন। বললেন, কথাগুলো গিলছে ছ্যাখো! ব্যাটা নির্ঘাত গোয়েন্দা, মনে-মনে সব টুকছে!

মামার সেই ছোট ছোট ভীমরুলের মতন চোখ দেখলেই আতঙ্কে গলা শুকিয়ে আসতো। আস্তে আস্তে উঠে ছেলেটা আড়ালে স'রে গেল। মামা পিছন থেকে বললেন, জন-জামাই-ভাগ্না, তিন নয় আপনা! লুটেপুটে সব নিলে চিরকাল।

দিদিমা এবার আসল কথাটা পাড়লেন। বললেন, তাহলে তুই মামলাই করগে যা, আমার কাছে আর কেন?

তাই ত যাবো,—শুধু টাকাটার অপেক্ষা।—মামা বললেন, আগে বাড়ীখানা ভাড়া দেবো, রসিদ কাটবো নিজের নামে। নতুন দলিল তৈরী করবো—উকীল এটর্নীরা আমার হাত-ধরা। সাক্ষীরা সব মজুত। বেটাকে এবার তুর্কি নাচন নাচাবো।

দুর্গা দুর্গা,—তোকে পেটে ধরেছি, সাত জন্মের পাপ! কিন্তু তোকে

আমি পথের 'বেগার' করবো না। কুপুত্তুর যত্তপি হয়, কুমাতা কখনো নয়! তিন হাজার টাকা তোকে আমি দেবো—লোকে জলেও ত ফেলে দেয়,—তাই দেবো। এই টাকা নিয়ে মানে-মানে যদি জীবন কাটাতে পারিস ত ভালো, নৈলে ভিক্ষে করিস, আমি আর খোঁজ নেবো না।

ঘাড় দুলিয়ে মামা বললেন, উল্টো বুঝলি রাম! তিন হাজার টাকা খরচ ক'রে তিরিশ হাজার টাকার সম্পত্তি ফিরিয়ে পাবো, এটা দেখলে না! তুমি দেখাবে গোপাল মল্লিক, আমি দেখাবো হাইকোর্ট। তিন হাজারই সই! মাসে পাঁচশো টাকা মামলায় খরচ হ'লে ছ'মাসে সম্পত্তি ফিরবে ওই টাকায়! কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলবো, হুজুর, খরচা সুদ্ধ আমার বাড়ী ফেরৎ চাই। জজের পেশকার হোলো আমার এক কল্কের ইয়ার!—হ্যাঁ, টাকাটা কখন দেবে বলো দিকি?

কাল এসে নিয়ে যাস।—দিদিমা ওঠবার চেষ্টা করছিলেন।

ওর ওপর আর গোটা পঞ্চাশেক টাকা আমাকে দিয়ো। আমারো এই শেষ পাওনা। বাজারে কিছু ধার আছে, জামা কাপড় বিছানা কিছু নেই, দুধের দরুণ তিন টাকা বাকি, আফিঙও ফুরিয়ে এলো। হাত একেবারে খালি।

মামার ক্লান্তকণ্ঠে কোথায় যেন উদ্দীপনার অভাব মনে হচ্ছিল। যে ব্যক্তি পরিবারের সবাইকে চিরদিন হত্যার ভয় দেখিয়ে ছুরিতে শান দিয়ে এসেছে, সে যেন হঠাৎ আজ জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়েছে।

পরদিন এসে মামা টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কোনদিন তিনি মামলা ঠোকেননি। তা ছাড়া হাইকোর্ট অনেক দূর, অনেক কাঠখড় না পোড়ালে হাইকোর্টে পৌছানো যায় না। তা'র চেয়ে বরং ওই টাকায় খাঁদাশুঁড়িদের পাড়ায় গিয়ে তিনটাকায় একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে দিব্যি দিন কেটে যাবে। তা'র আগে চুলের ঝুঁটি ধ'রে মামীকে বাপের বাড়ী থেকে টেনে আনা দরকার।

কিন্তু মামী আর এ জীবনে স্বামীর ঘরে ফিরবেন না। কথা উঠলো, তবে কি মামা যাবেন শ্বশুরবাড়ী? কেউ বললে, তা যেতে পারেন। কেউ বললে, গেলেও মামীকে আর ফেরানো যাবে না। কেউ বা বললে, রাম বলো! শ্বশুরবাড়ী যাবেন উনি কোন্ মুখে? বছর তিরিশ আগে এক জামাইষষ্ঠীর দিনে খাদ্‌রি বাঁশ নিয়ে শাশুড়ীকে ঠ্যাঙ্গাতে গিয়েছিলেন! খড়ে নদী সাঁতরে শ্বশুর পালান্, আর শাশুড়ী সেই জামাইষষ্ঠীর রান্নাবান্না ফেলে এক বাগ্দীর বাড়ীতে ঢুকে প্রাণ বাঁচান্!

তারপর ?

তারপর যা হয় ! পাড়ার ছেলেরা লাঠি সোঁটা নিয়ে পাঁদাড় পেরিয়ে জামাইকে তাড়া করে ! কিন্তু জামাই তা'র আগেই শ্বশুরের বাক্স ভেঙ্গে লুঠপাট ক'রে খিড়কির বাগান পেরিয়ে সট্‌কান্ দেয় ! ধরতে পারেনি কেউ !

সুতরাং জানতে পারা গেল, মামীকে ফিরিয়ে আনবার জন্য মামার পক্ষে আপাতত শ্বশুরবাড়ীর দেশে যাওয়া সম্ভব নয়। কিছুকাল পরে দিদিমার কানে খবর এসেছিল, হাইকোর্টের কোন্ উকীলের ফাঁদে মামা নাকি পা দিয়েছেন। সে-ব্যক্তি নাকি এই কথা জানিয়েছে, বাপের সম্পত্তি ছেলেই পায়। মামলা একবার ঠুকলেই বাজীমাৎ।

কাশীতে ব'সে দিদিমা এই খবর পেয়েছিলেন। কিন্তু আর কিছু জানবার ঔৎসুক্য তাঁর ছিল না। নিশ্বাস ফেলে কেবল বলেছিলেন, অনন্তরাম ন্যায়বাগীশও একদিন ভিক্ষেয় বেরিয়েছিল পথে পথে, দুশো বছর পরে তা'র বংশ আবার ভিখিরি হল ! মরুক গে, আমি আর ভাববো না !

হিতবাদী বা বঙ্গবাসী—ঠিক কোন্ কাগজখানা মনে পড়ছে না, তবে কাগজখানার পাট খুললে দেখা যেত, ঘরজোড়া মস্ত শতরঞ্চির আকার। একখানা কাগজ ছড়ালে জন আষ্টেক লোক তার ওপর বসতে পারত। ওদের মধ্যে নানা কারণে নতুন দৈনিক কাগজ 'বসুমতী' জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশেষ করে যুদ্ধের খবর দিত বসুমতী। তখনকার দিনে জল আর স্থলযুদ্ধ ছিল আসল। কোন্ দেশ বেশি মারছে অপর পক্ষকে, কে কার কত জাহাজ ডোবাচ্ছে, কে কোন্ কৌশলে জব্দ হচ্ছে—এই সব খবর। মনে হচ্ছে তখন বসুমতী ছিল এক পয়সা।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরের বছরে তিলক মারা গেলেন। উনি ছিলেন রাজনীতিতে গান্ধীর গুরুস্থানীয়। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বেরোল। গোলদীঘিতে শোকসভা। রাম গিয়েছিল স্বদেশীদলের মিছিলে। এবারে আর ওর রক্ষে নেই—ইস্কুলে সব জানাজানি হয়েছে। ও ছেলে এবার জেল খাটবে।

তখনও মেয়েছেলে তেমন দেখা যায় না পথেঘাটে। বাড়ির ঝি, ঘুঁটেওয়ালি, হিন্দুস্থানী মেয়েছেলে, বাজারে-বাজারে দু চারজন মেছুনি, ছাদ পেটাবার রেজানি, ভিখারিনী বুড়ি, খৃষ্টানদের দু' একজন মাষ্টারনি—এদের বাইরে মেয়েছেলে নেই। পালপার্বণে, মহাষ্টমীতে, গ্রহণস্নানে—শত শত ভাড়াটে

গাড়ি যেত নিমতলা আর আহিরীটোলা আর শ্মশানেশ্বরীর ঘাটের দিকে। বছরে দু'চারটে দিন মেয়েদের পায়ের শেকল আলগা করা হত। মেয়েরা ছিল পুরুষের সম্পত্তি। রাজনীতি ছিল কেবলমাত্র পুরুষের। মেয়েরা খবরের কাগজে হাত দিলে অপযশ রটে যেত। মেয়েদের বিদ্যে চিঠি লিখতে শেখা পর্যন্ত।

বাড়ি বিক্রির পর দিদিমা গেছেন কাশী, ওরা আরেকবার এসেছে মানিক-তলার শুঁড়ি-পাড়ায় একেবারে বড় রাস্তার ওপর। ভাদুড়ীরা বাদুড়বাগান ছেড়ে এসেছে এই কাছেই হরতকি বাগানের মোড় পেরিয়ে ভানহাতি। শিশিরবাবু হচ্ছেন বিদ্যাসাগরের প্রফেসার। তিনি প্রায়ই থিয়েটার করেন, এবং কিছুদিন আগে বুঝি 'কমলে-কামিনী' ছবি করেছেন। মুরারী আর ভবানী ইস্কুলে যাচ্ছে। হৃষিকেশ পাস করল কিনা খবর পাওয়া যায়নি। তারাকুমার আর বিশ্বনাথও থিয়েটার করার দিকে ঝুঁকেছেন। ওঁদের পোশাক-আশাক আর চাল-চলনে একেবারে সব ফিটবাবু। দূরের থেকে ওঁদের কারোকে আসতে দেখলে রাম ফুড়ুক করে ভিতরে পালায়।

না, রাম মানুষ হল না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ভাল, কিন্তু মানুষ হওয়া অন্য কথা। এর মধ্যে নোংরা কথা শিখেছে, বড় ভাইবোনদের তক্কা রাখে না, কোত্থেকে যেন দাবা খেলা শিখে এসেছে, আর সেই হেদোর কথা মনে নেই মা? সেই যে সেই দোপাটি ফুলগাছটার তলায় লুকিয়ে ও আর শচীন সিগ্রেট টেনেছিল?

মা শুধু হুঁ বলে চলে গেলেন।

ওর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। ওইটুকু ছেলে, গোলদীঘির স্বদেশী সভায় গিয়ে বিপিন পালের বক্তৃতা শোনে, খেলার মাঠে সেদিন হকিস্টিক দিয়ে কাকে যেন পিটে এসেছে। শুধু তাই, ওদের হেডমাস্টার আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে 'বুলি' করতে গিয়ে হকির লাঠি দিয়ে তাঁর পায়ের হাড় জখম করেছে। সাইকেল চড়ছে আজকাল। একলা গড়ের মাঠে যায় খেলা দেখতে। এবার পূর্ণ পণ্ডিতকে ছেড়ে ঝণ্টু মাস্টারকে ধরেছে। সেদিন বেতের বাড়ি খেয়েছে আগাগোড়া। ইস্কুল থেকে ওকে তাড়িয়ে দেবে বলেছে। সেবার ঝণ্টু-মাস্টারের ঝুঁটি ধরে টানার ফলে ওকে রাসটিকেট করেছিল, মনে নেই? শেষকালে বড়মাসির ছেলে ওকে নিয়ে গেল স্যার আশুতোষের কাছে, তাই না মিটমাট হল। কিন্তু ইস্কুলে ফ্রি-শিপ হারাল। দাও, এখন মাস-মাস চার টাকা করে মাইনে?

আজকাল খবর পাওয়া যাচ্ছে ও নাকি কুসঙ্গে মিশছে! লেখাপড়া শিখে একটি আস্ত জানোয়ার তৈরী হচ্ছে। যেমন মামা তেমনি ভাগ্নে!

বড়দা তার আপিসে পনেরো টাকা উপরি পেয়েছিল। হঠাৎ তার বড়-মানুষি বেড়ে গেল। বউদিদির জন্যে নতুন শাড়ি, সেমিজ, একশিশি অগুরু, বাড়ির জন্য এক সের মাংস, কমলালেবু, নতুন গুড়ের সন্দেশ—অন্তত ছয় সাত টাকা খরচ করেছে। তারপর রটিয়ে দিল তার হাতে আর কিছুই নেই। বটে! রাম গিয়ে বড়দাকে চেপে ধরল। বড়দা, তুমি যে বলেছিলে এবার আমি এ-সেক্‌সনে প্রমোশন পেলে চটিজুতো কিনে দেবে?

সেকি? বলেছিলুম নাকি? কিন্তু আমার কাছে আর এক-আধলাও নেই! আবার সেই মাসকাবার হলে তবে মাইনে!—বড়দা জবাব দিয়েছিল।

রাম ওর দিকে তাকিয়েছিল। এবার বলল, তাহলে শোন বড়দা, ভাল হবে না কিন্তু। বউদিদির ক্যাশবাক্সে এখনও আট টাকা সাড়ে পাঁচ আনা রয়েছে। ওটা যদি হারায় তখন আমাকে দোষ দিও না! আমার চটিজুতো, রুমাল আর ফীস্টের চাঁদার দরুণ মোট দেড় টাকা ঠিকই চাই। কাল ভোরে উঠেই আমাকে যেতে হবে।

বড়দা হাসিমুখে বলল, তাহলে ক্যাশবাক্সে কিছু আছে তুই বলছিস? কি জানি, দেখি—আমি কি আর অত খোঁজখবর রাখি? কিন্তু একটা কথা, তুমি কেমন করে ক্যাশবাক্সের ভেতরমহলের খবর পেলে? চাবি চুরি করেছিলে ওঁর আঁচল থেকে?

রাম পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করল। বলল, এই ত তোমারই হাতের লেখা হিসেব, আজকের তারিখ।

বড়দা সুড়সুড় করে দেড়টি টাকা বার করে দিল। তারপর কাগজটা রামের হাত থেকে নিয়ে বলল, কিন্তু খবরদার, মা যেন জানতে না পারে আমি সিগ্রেট খাই।

রাম বলল, বেশ, আমি চেপে রাখব। কিন্তু তার জন্য আমাকে মাসে মাসে আট আনা করে দেবে, কথা দাও?

বড়দা রাজি হয়ে গেল।

ভবানীপুর আর কালীঘাট ছাড়ালে যেন কলকাতা ফুরিয়ে যায়। মনোহর-পুকুরের দিকে সরু কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। ওদিকে বনবাঁদাড়, জলাজঙ্গল আর ধানক্ষেত। ও অঞ্চলে কোথায় যেন আছে ঘোধপুর ক্লাব, সেখানে

সাহেব-মেমদের রঙ্গরসের আড্ডা, ভাড়াটে ফীটন গাড়ি নিয়ে বনজঙ্গলের পাশ কাটিয়ে তারা ওখানে যায়। বাবুর্চি আরদালিরা যায় মদ-বীয়ারের পেটি নিয়ে। তাদের সঙ্গে থাকে জ্যান্ত মুর্গির ঝুড়ি। তাছাড়া ফলপাকড়, জাম-জেলি-মাখন এবং স্কেটিং খেলার সরঞ্জাম। বলা হত, 'উইকএণ্ড'। কেউ কেউ নিয়ে যেত নতুন আমলের বিলাতী মোটর। সঙ্গে বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার। ওরা বনবাঁদাড়ে ঢুকে ঘুঘু, তিতির বা রঙ্গীন হড়িয়াল মেরে খেত। থাকত ওখানে দুই রাত্রি।

নতুন বালীগঞ্জ, লেক বা রাসবিহারী এভেনু তখন স্বপ্নবৎ। শুধু মনোহর-পুকুরের জলা, বন-জঙ্গলের একপাশে ছিল জ্ঞানানন্দের মহানির্বাণ মঠ। দুই এক খানা টিনের বা হোগলার চালাঘর—এই নিয়ে মঠ। ওর চারদিকে বনবাঁদাড়।

শ্রীমান্ রামের সেই সেদিনকার দক্ষিণ পথের অভিযান স্মরণীয়। হাজরার মোড় পর্যন্ত এসেছিল ট্রামে। বার আষ্টেক নেমেছে-উঠেছে টিকিট ফাঁকি দেবার জন্য। পকেট ভরে নিয়েছে মুড়ি আর ঝাল ছোলা ভাজা। শীতের দিনে হাঁটা সুবিধে। নির্জন নিরিবিলি গ্রামের পথ, বন-বাগান ক্ষেতখামার ছাড়িয়ে চলেছে সে। মাঝে মাঝে খড়ের গাড়ি, তার পিছু পিছু যাচ্ছে গাড়ি-গাড়ি ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন আর মুলো। টমেটোর নাম ছিল বিলেতী বেগুন, তার সঙ্গে বীট, গাজর, সয়াবিন, লেটুস,—এসব কোনটাই কেউ তখন খেত না! বাজারেও তাই ওসব আসত না। ওসব গাড়ি যেত হগ-সাহেবের বাজারে।

বাংলার আকাশ, প্রকৃতি, সরোবরে পদ্ম আর শালুক, বিলের ওপর মাছরাঙা আর বকের দল, কলাবাগান আর নারকেল বন,—এ যেন চারদিকে অবারিত মুক্তি। আকাশ থেকে সুমধুর রৌদ্র যেন সোনার ঝর্না মনে হচ্ছে। বেলা দশটার মধ্যে সে রাজপুর, চৌহাটি ও হরিনাভি পার হয়ে বহুদূর চলে গেল। সে যাচ্ছে লাঙ্গলবেড়ে চক্কোত্তি বাড়ি মামা-ভাগ্নে সুবাদে। আর বেশি দূর নেই। হাজরার মোড় থেকে ধরলে সে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ পেরিয়েছে। রাম চলল পা চালিয়ে একে-ওকে পথের নিশানা জিজ্ঞেস করে।

কী সুন্দর জীবন তার! স্বচ্ছ, অবাধ, আনন্দময়। পাখির মতন সে স্বাধীন। যত জোর আছে তার ডানায়, ততদূর তার আকাশ অবারিত। সে শুধু চলবে, দেখতে দেখতে যাবে। সে থামবে না কোথাও, সে জানতে জানতে যাবে। সে অশান্ত গতিমান। যার গতি নেই, সে ত মরা! সে থেমে গেছে চিরকালের জন্য। না, রামের পথ কোনও দিন শেষ হবে না!

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লাঙ্গলবেড়ে পৌঁছবার জন্য ডানহাতি একটা পথ পাওয়া গেল। একজন বলল, এই সোজা…এক পোয়া পথ গেলেই চক্কোত্তি বাড়ি, ওদের সবাই চেনে—ওরা মস্ত জমিদার।

রাম প্রশ্ন করল, বারুইপুর কতটা হবে এখান থেকে ?

এই ত, কোশখানেকের মধ্যেই। তার পরেই ইষ্টিশান।

রাম গিয়ে পৌঁছল চক্কোত্তিদের মস্ত উঠোনে। বহুকালের পুরনো ভিটে। সামনে দুটো ধানের মরাই। একধারে খানচারেক গরুর গাড়ি। পাশে কয়েকটা লোক কাজ করছে। রামের খবর পেয়ে শিবানী, গৌরী, হরিচরণ সবাই ছুটে এল। হরিচরণ হল রামের কুটুম্ব মামা। শিবানী হাসি মুখে রামের হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। গৌরী চলল পিছু পিছু।

এরা দিদিমার বাপের বাড়ির গোষ্ঠী সেই জন্য এককালে ঘনিষ্ঠ যাতায়াত ছিল। ওরা বহুদিন থেকে এখানে দিদিমার পায়ের ধুলো চেয়ে এসেছে। কিন্তু দিদিমা কাশী যাবার পর রাম সেটি ভোলে নি। সেই জন্য রামের অভ্যর্থনা এখানে অকুণ্ঠ !

গৌরী বয়সে একটু ছোট। সুশ্রী মেয়ে। চোখ দুটো একটু কটা। আহারাদির পর গৌরী ওকে নিয়ে সমস্ত দুপুর এখানে ওখানে ঘুরল। শিবানী বললেন, যাবার সময় আর হেঁটে যেতে হবে না। ওরাই গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবে। নতুন গুড়, মোয়া, ক্ষীরের প্যাঁড়া আর হাঁসের ডিম সঙ্গে দেবো। শিয়ালদা থেকে গাড়ি করে বাড়ি যাবে।

রামের আর কোনও ভাবনা রইল না। এ যাত্রায় ওর অভিযান সার্থক হল।

॥ ৬ ॥

দিদিমার মুখে বাল্যকালে বহু শ্লোক ছেলেটা শুনত। একটি মনে পড়ে, "এক বৃক্ষে নানা পক্ষী নিশীথে বিরহে সুখে, প্রভাত হইলে তা'রা কেবা কোথা যায়।"

দিদিমা ছিলেন বনস্পতি। সেই বনস্পতির শিকড় সুদ্ধ পতন ঘটেছিল। বাড়ী বিক্রির পর থেকে সবাই হয়ে গেল ছন্নছাড়া। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সবাই নানাদিকে ছিটকে পড়েছিল।

ওদিকে ভাঙ্গন ধরেছে কলকাতায়। সেই ভাঙ্গনের আঘাতে প্রাচীনের

কাঁদন মিলিয়ে গেছে। বাঁধন শিথিল হয়ে খসে পড়েছে, কোথাও কিছু দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। যা কিছু ওদের আশৈশবের চেনাশোনা, চারিদিকের যে পরিচয়টার মাঝখানে ওরা দাঁড়াবার জায়গা পেয়েছিল—সেটা ভাঙনের টানে ভেসে যাচ্ছিল। এবার থেকে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। খিড়কির আনাচে-কানাচে ঘোরা হয়েছে, অলি-গলিতে পাক্ খাওয়া হয়েছে, এবার থেকে সদর দরজায়, এবার থেকে বড় রাস্তায়। পৃথিবীর মুখোমুখি।

তবু মন প'ড়ে রইলো ওইখানে, ওই ক্ষিরি. নাপতিনির দাওয়ায়, ওই গঙ্গার মার চৌকীর তলায়, নলিতবাবুর বৌয়ের রান্নাঘরে, অন্ধ বুড়োর মন্তর পড়া ঘটির জলে! ওই মহাকালী পাঠশালার পাশ দিয়ে অর্জুনের দোকান ছাড়িয়ে পুঁটি বাগানের গা দিয়ে—ওই রহস্য রন্ধ্রপথের কোথাও যেন শেষ নেই। খৃষ্টানদের গির্জাটার ওই বাগানে—যেখানে কৃষ্ণচূড়া আর দেবদারু গাছের ডালে-ডালে মধ্যাহ্ন পাখীর তন্দ্রা জড়ানো ক্লান্ত কাকলী চিরকালের জন্য ছেলেটার মর্মে ছুঁয়ে রইলো। কত লোক মরেছে, কতজন কেঁদেছে, কত চেনা মানুষ কোথায় তলিয়ে গেছে, কত জীবনের ধারা কোথায় গিয়ে শুকিয়ে গেছে,—সেই যাদের সে নাম জানত না, খোঁজ পেত না, পরিণাম ভাবত না,—তারা তাদের পায়ের চিহ্ন রেখে গেছে সেদিনের সেই অর্বাচীন বালকের বুকে। প্রাচীন আর নবীনের যুগ-সন্ধিক্ষণে সেই তরুণ বালক তখন দাঁড়িয়ে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ। প্রথম মহাযুদ্ধের তখন অবসান ঘটেছে। ভাঙন ধরেছে কলকাতায়, বাঁধন কেটেছে জীবনের। তরঙ্গ উঠেছে সাগরে। ডাক এসেছে সুদূরের।

দৈনিক বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা উপেন মুখুজ্যে মশায় কাগজ বের করার আগে আহিরীটোলার শ্যামাচরণ ভাদুড়ীর কাছ থেকে হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। উভয়ে ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ভাদুড়ীমশায়ের পরিবারবর্গ ছিলেন বৈবাহিক সূত্রে বিভূতি ওরফে রামেদের নিকট কুটুম্ব। সেই বসুমতীতে যুদ্ধের সময় থেকে অতিশয় উত্তেজনাকর শিরোনামা দিয়ে খবর বেরোত। একখানা কাগজকে ঘিরে দশ পনেরোজন লোক আশেপাশে দাঁড়িয়ে আকুল আগ্রহে খবর শুনত, পড়ত শুধু একজন ব্যক্তি। সংবাদপত্র পড়ার অভ্যাস না থাকার জন্য পদে পদে ওই পাঠকটিকে ভাষা, বাক্য, শব্দ, বানান—প্রভৃতির উপর হোঁচট খেতে হত। শ্রোতারা অনেক সময় বিরক্ত হলেও দাঁড়িয়ে থাকত এবং ভিড় বেড়েই যেত। ইংরেজী কাগজ সাধারণ লোকে পড়ত না। উচ্চবর্ণ এবং উচ্চ শিক্ষিত যারা—শুধু তাদের এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ঘুরত স্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান, ডেলি নিউজ ও বেঙ্গলী কাগজ। প্রথম দুখানা ছিল ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের এবং তারা আড়ালে থেকে গভর্নমেণ্টের শোষণ ও শাসননীতি নির্ধারণ করত। পুলিস, হাইকোর্ট, আদালত, জেলাপ্রশাসন, প্রত্যেক বড় বড় সদাগরি প্রতিষ্ঠান, পোর্ট কমিশনারস্, প্রেসিডেন্সি বিভাগ, ম্যাজিস্ট্রেট মহল, হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরী সর্বত্র ইংরেজ হল কর্তা। সমস্ত শিক্ষা বিভাগ ওদের হাতে। তখন দু তিনটি বিদেশী ব্যাঙ্ক ছাড়া একটিও এদেশী ব্যাঙ্ক ছিল না। শুধু ছিল ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল—সে ওদেরই হাতে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, ধনী-নির্ধন—সবাই ছিল ওদের বশম্বদ। যারা বড় বড় পদস্থ বাঙালী, তারা ধন্য হত ওদের সাহচর্যে। কোনও ইংরেজ সাহেব কোনও অপিসের বড়বাবুকে বেল বাজিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন, কিংবা ধমক দিয়েছেন, কিংবা তাঁর কাজের ঈষৎ সুখ্যাতি করেছেন—তা হলে ব্যস, সে রাত্রে তাঁর গৃহিণীর কাছে কী খাতির বেড়ে যেত! সেই গৃহিণী পাড়াপড়শীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অথবা আত্মীয়কুটুম্ব, জামাই, বেহাই—সবাইকে নেমন্তন্নে ডেকে সালঙ্কারে রসিয়ে রসিয়ে স্বামীর গৌরবগরিমার কাহিনী প্রচার করতেন।

তবে? এরা কারা? বসুমতীতে বেরিয়েছে, দেশের ভাল ভাল অনেক লোককে 'ভারত প্রতিরক্ষা' আইনে আটক করেছে? কেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

দেশত্যাগ করেছেন, আর তাঁর ভাই বারীন ঘোষ আন্দামানে বন্দী? তবে কেন সেই বাঘের সঙ্গে লড়াই-করা বাঘা যতীন মুখুজ্যে এই সেদিন বালাসোরে বুড়ি-বালমের ধারে লড়াই করল কলকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্টের দলের সঙ্গে?

অজ্ঞান বিভূতির বয়স তখন বছর দশেক।

আবার সেই বারো বছর বয়সে শুনেছে ওই বসুমতীতে—"প্রতিহিংসা, রক্তপ্লাবন, রুশিয়ার জারের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে উন্মত্ত জনতা। বলশেভিকদের রণতাণ্ডব। লেনিনের সৃষ্টি পৃথিবীর নতুন ইতিহাস। সর্বহারা, ক্ষুধার্ত উৎপীড়িত নূতন জাতির আশা-ভরসা!"

তারপর চলে গেছে অনেক দিন। এখন তার পনেরো বছর বয়স। ওই বসুমতী আর নায়ক—এ দুখানা কাগজে সে দেখল, ভারতের রাজনীতিতে অহিংসাবাদ এবং সর্বত্যাগী গান্ধীজীর অভ্যুত্থান। চিত্তরঞ্জন দাস, লালা লাজপত রায়, মোতিলাল নেহরু—আরও অনেক নাম শুনছে!

সেদিনের ওই অবাধ্য স্বেচ্ছাচারী ছেলেটার বাইরের চেহারা ছিল কৃশকায়। এমন কোনও বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই, যেটা অন্যের চোখে পড়বে। বন্ধুমহলে ও থাকত পিছিয়ে, ওর স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তা নেই, কেউ ওকে গ্রাহ্য করে না, মানুষ বলে ভাবে না। জ্ঞান, বুদ্ধি, চাতুরী, বিচক্ষণতা, চিন্তাশীলতা, কূটনীতি—কিচ্ছু ওর মধ্যে নেই! ও যেন হাঁদা, উটমুখো, ওকে ঠিক সম্পূর্ণ মানুষ বলতে বাধে! ও থাকে সকলের শেষে, সবার পিছনে, চক্ষের আড়ালে। ও সব সময় চুপ করে থাকে, শুধু চেয়ে চেয়ে মনে মনে ভাবে।

কেউ কি জানে, ওর মনের গঠন কোথায় কি ভাবে তৈরি হচ্ছে? কেউ কি খোঁজ রাখছে কেমন ওর মনের প্রতিক্রিয়া? প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে অলক্ষ্যে চারিদিকের জীবন থেকে ওর মন কি কি পদার্থ তুলে নিচ্ছে? ওর লেখা-পড়ার খবর, খেলাধুলো বা দুরন্তপনার খবর, ওর অন্ন বস্ত্র ইত্যাদির খবর সবাই নিচ্ছে—নিচ্ছে না শুধু ওর মনের খবর। কেউ একবারও জানতে চাইছে না, ও-ছেলেটা কী একা, কী নিঃসঙ্গ, কী নিস্পৃহ! অগণিত সংখ্যক বন্ধু আছে ওর, কিন্তু ওর মন যে কথায় কথায় পথ হারায়—কেউ কি তার খোঁজ রাখে?

পরের বছরে ওরা শুঁড়িপাড়া ছেড়ে উঠে গেল নারকেলডাঙ্গায় সেই মতি সেনের গলিতে! এ যেন আরও অবনতি। চারদিকে কাঁচা বীভৎস নর্দমা, সমস্ত দিন দুর্গন্ধেভরা! সরু গলির পূর্ব দিকটায় কয়েকখানা কোঠা বাড়ি,

পশ্চিমটা সমস্তই হোগলা বস্তি। ওখানে থাকে নাপতে, ধোবা, মুদিমশলার দোকানী, ফিরিওলা, মোটরের ড্রাইভার, ছাপাখানার কম্পোজিটার—এমনি নানা লোক। কিন্তু এবার এই গলিতেই ওদেকে থাকতে হবে চিরস্থায়ী। সর্বাপেক্ষা অসুবিধা, কলকাতার এই পূর্বপ্রান্ত ওদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। পরিচিত সমাজ, বন্ধু মহল, আত্মীয়পরিজন, চেনা পথঘাট—এখান থেকে অনেক দূরে, তার চেয়ে দূর হল গঙ্গা! কেউ আর নেই যেন ওদের। ওরা এখন একক পরিবার। আত্মীয়স্বজন পরিজন থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন, ওরা সম্পূর্ণ সমাজচ্যুত। ওরা যেন নোঙর-ছেঁড়া নৌকা!

নিচের তলায় ছোট বড় তিনখানা ঘর, দক্ষিণে উঠোন, পূর্বদিকে রান্না ভাঁড়ারের দুখানা ঘর। দোতলায় পশ্চিমমুখো দুখানা মোটামুটি ভাল ঘর। সম্পূর্ণ বাড়ি। ভাড়া মোট পঁয়তাল্লিশ টাকা। দাদাদের মাইনে বেড়েছে বছরে বছরে অল্পে অল্পে,—কিন্তু পুষ্যি বেড়েছে তার চেয়েও বেশি। বাড়িতে দুটি বউ এসেছে। মোট দশ জন পুষ্যি। সব মিলিয়ে একশ টাকার মতো আয়। না, দারিদ্র্য ঘোচে নি! সেই অভাব অনটন, সেই অসন্তোষ ভিতরে ভিতরে। সেই কোনও মতে প্রাণধারণ করা!

ওই ছেলেটা—যার সম্বন্ধে আশা ভরসা করার কিছু ছিল না, সে ম্যাট্রিক টেস্ট দেবার আগে পালাবার চেষ্টা করছিল। ডি-ভ্যালেরা পালিয়েছে ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে জাহাজের তলার দিকে লুকিয়ে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায়। নরেন ভটচার্যি ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায় পালিয়েছে রাশিয়ায়, রাসবিহারী বোস পালিয়েছে জাপানে, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এশিয়ায়। এই ছেলেটার সহপাঠী হরিদাস মাস্টারের ছেলে গত বছর পালিয়েছে নিউইয়র্কে। সে খৃষ্টানের ছেলে, কিন্তু এখন কপালে সিঁদুর মেখে পেতলের ছোট ছোট দেবমূর্তি সামনে বসিয়ে সে নাকি নিউইয়র্কের কোন্ রাস্তায় গণৎকারের ছক নিয়ে বসে। বেশ মোটা তা'র রোজগার। সাহেব-মেমদের হাতের রেখা বিচার করে তাদের ভবিষ্যৎ এমন ব'লে দেয় যে, একটির পর একটি মিলতে থাকে। এখানে ওর বাড়িতে খবর এসেছে, পিণ্টু আছে রাজার হালে।. পাতু পালাবার কথা ভাবছে, সেও খৃষ্টান। তার মাসি বেথুন কলেজের মেট্রন। এ ছেলেটা তার ওখানে যায় পাতুর সঙ্গে। বেথুন কলেজের ভিতরে ভীষণ কড়াকড়ি, কোনও পুরুষ মানুষের পক্ষে হস্টেলের মেয়ে-মহলে যাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু ওরা এখনও পুরুষ হয়ে ওঠে নি! ওরা মেয়েদের মধ্যে গিয়ে এখনও চুলবুল করতে শেখে নি, এখনও যৌনচেতনা

ওদের দেহের মধ্যে বিষবাষ্প ঘুলিয়ে তোলে নি।

এ ছেলেটাও পালাবার চেষ্টা করছিল। জাহাজে পালানোই সবচেয়ে সুবিধা। সেও খালাসী হয়ে যাবে। যাবে সমুদ্রে, ভাসবে তরঙ্গে তরঙ্গে। সে ভূগোলের ভাল ছাত্র, এবারেও ফার্স্ট হয়েছে। সে জানে পৃথিবীর আগাগোড়া মানচিত্র। সে যাবে ছয়টি মহাদেশে। সে রবিনসন ক্রুশোর মতন নেমে পড়বে নির্জন এক দ্বীপে। সে খুঁজবে নতুন জীবন, উজ্জ্বলন্ত প্রাণ, অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পথ। লেখাপড়া? উচ্চশিক্ষা? ভাবী চাকরিতে উন্নতি?— না, ওসব থাক। সুন্দর সুশৃঙ্খল জীবন চাইছে না সে। ললিত লাবণ্যের মদিরতা তার কাম্য নয়। তাকে ডাকছে সমুদ্র, মরুভূমি; তাকে ডাকছে অজানা দেশ, ডাকছে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, গহন অরণ্যানী, ডাকছে এমাজন্, ডাক দিয়ে যাচ্ছে কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, ডাকছে ভিকটোরিয়া ওয়াটার ফলস্!

ম্যাকিনন ম্যাকেনজি আপিসে জাহাজের খালাসী রিক্রুট করা হচ্ছিল। সেখানে প্রায়ই ভিড় ক'রে থাকে নোয়াখালি আর চট্টগ্রামের মুসলমান বাঙালীরা। ওরা জলাদেশের মানুষ, সাঁতারে বিশেষ পটু। ওদের পোশাক হল ছিটের লুঙ্গি, গায়ে বেনিয়ান, কাঁধে গামছা। ওরা জাহাজের দড়িদড়া টানে, মেসিন ঘরে কাজ করে, বর্ষা-বাদলে ঝড়ের সমুদ্রে ওরা ডেকের তেরপল ঝোলায়, বিপদের কালে নৌকা ও লাইফ-বেল্ট নামিয়ে দেয়, ওরা জাহাজের নিরাপত্তার খোঁজ রাখে।

লুঙ্গি কোথায় পাওয়া যায়, ছেলেটা জানে না। গামছা একখানা জুটল। কিন্তু বেনিয়ানের বদলে গেঞ্জি। খালি পা। তাই সই। কিন্তু ও কি ওর দুঃখিনী বিধবা জননীকে দুঃখ দিয়ে যাচ্ছে? যিনি চিরকল্যাণময়ী, ভক্তিমতী, ধর্মপরায়ণা,—তাঁকে কি সে আঘাত দিয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে প্রতারণা করে? কই না, সে ত ঠকাচ্ছে না, সে ত নিষ্ঠুরতার কোনও ইতিহাস রেখে যাচ্ছে না, সে ত জননীর কোল ছাড়া থাকছে না! যেখানে যে-দেশে যে-সমুদ্রেই সে যাক না কেন, জননীর আশীর্বাদ যে চলল তার পিছু পিছু! সে যাচ্ছে না, তাকে নিয়ে যাচ্ছে যেন আরেকজন কেউ, তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না তার ভিতরকার আত্মতাড়না! যে তা'র সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে, যে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, সেও যেন অশরীরী এক বিশ্বজননী বিশ্বেশ্বরী!

ছেলেটা চোখের জল মুছল লালদীঘির পাড়া দিয়ে যাবার সময়। কেন তার অন্তরাত্মা এই দিনমানের রৌদ্রের আলোয় এমন ক'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে? সে পিছন ফিরে তাকাল। কই না, কেউ তাকে অনুসরণ করছে

না ত? সে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড়ে দাঁড়াল। আজ সোমবার, ওরা আজ লোক নিচ্ছে।

লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা। সোরগোল করছে ওরা নিজেদের ভাষায়। কিন্তু সে ভাষা কি বাংলা? রাম আগে এ ভাষা শোনে নি ত? ওর সহপাঠী গৌরীশঙ্কর, সে নাকি বাঙ্গাল দেশের ছেলে। বাঙ্গালদের ভাষায় সে কথা বলে। কিন্তু সে দুর্বোধ্য নয়। এ যেন অন্যপ্রকার। এর বাক্য, শব্দ, উচ্চারণ, হাসি, পরিহাস—কোনটাই সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। ওদের সবাই বয়স্ক, বহুলোকেরই কালো-কালো দাড়ি, কালো-কালো চেহারা, ষণ্ডা-ষণ্ডা দেখতে,—কিন্তু ওদেরই সঙ্গে ওকে এখন থেকে থাকতে হবে। অথচ ওদের সঙ্গে ওর মিলছে না কোথাও। ভাষায়, চেহারায়, স্বাস্থ্যে, ভঙ্গীতে,—কোথাও মিল ঘটছে না!

হঠাৎ এল এক যমদূত। খাকি পোশাক পরা, গোঁফ চোমরানো এক হিন্দুস্থানী আপিসের দারোয়ান। পিছন থেকে এসে ওর ঘাড়ের কাছে গেঞ্জিটা মুচড়িয়ে ওকে টেনে আনল লাইনের ভিতর থেকে।—আরে লওণ্ডে, হিঁয়া ক্যা কাম? জবাব দো!

ভয়ত্রস্ত মুখে রাম কি যেন বলতে গিয়ে থতিয়ে গেল। অতগুলো লুঙ্গির মধ্যে তার কেবল ধুতি! অতগুলো কালো লোকের মধ্যে সে নাকি ধওলা! অতগুলো চুলদাড়ির মধ্যে তা'র শুধু গোঁফের রেখা! সে ধরা পড়ে গেল তা'র হিন্দু-বৈশিষ্ট্যের জন্য। হিড়হিড় করে লোকটা তাকে টেনে নিয়ে এল বাইরে। তারপর কপালে কি ঘটল, সেটা আর আলোচ্য নয়। রাস্তার এক পাহারাওলা তা'কে ধরে বেশ ঝাঁকুনি দিয়েছিল!

মতি সেনের গলির দক্ষিণ প্রান্তে ষষ্টিতলা রোড। পুবদিকে কিছুদূর এগিয়ে গেলে স্যার গুরুদাস বাঁড়ুয্যের চারখানা বাড়ি। এদিকে পাড়ার এক লাইব্রেরীতে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতায় আগুন ছুটছিল। লোকে লোকারণ্য। তখন লাউড-স্পীকারের যুগ আসে নি।

সর্বত্যাগী দেশবন্ধুর কণ্ঠে ঝলসিয়ে উঠছিল তাঁর প্রাণোত্তাপ: "এ মিথ্যে, এ ফাঁকি, এ প্রতারণা! ইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি—এ সব ত গোলামখানা! ওই গোলামখানায় তৈরি হয় ইংরেজ শাসকশ্রেণীর ক্রীতদাস! আমার দেশ, আমার জাতি, আমার সমাজ—এর ওপর শুধু আমার প্রভুত্ব চলবে! স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার! আজ তাই গোলামখানা ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হবে দেশের যুব সমাজকে। দেশের আশা ভরসা যারা,—যারা দেশের ভবিষ্যৎ।

সমস্ত দেশ ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। কোটি কোটি ভারতবাসী এই অহিংস সংগ্রামে এগিয়ে এলে সাধ্য কি ওদের—এই শক্তিকে রোখে? এই স্বরাজলাভ আর স্বাধীনতালাভ যদি না ঘটে, তবে আমার মৃত্যুর পর তোমরা লিখে রেখো, বাংলাদেশে এক বাতুল জন্মেছিল!"

সভাস্থল ফেটে পড়েছিল উন্মত্ত করতালিধ্বনিতে।

শীতকাল। পরদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। হু হু ক'রে শীতার্ত বাতাস বয়ে যাচ্ছে। হেদুয়ার পূবদিকে স্কটিশ চার্চ কলেজের বড় গেটের সামনে সত্যাগ্রহী যারা পথ আগলিয়ে শুয়েছিল তাদেরকে দেখার জন্য শত শত লোক ছাতা মাথায় দিয়ে আশেপাশে ভিড় করেছে। এ 'গোলামখানা' বন্ধ করতে হবে। কোনও ফাঁকে কেউ যেন ভিতরে ঢুকতে না পারে। আগে স্বরাজ পাওয়া চাই, তারপর নতুন শিক্ষাপদ্ধতি চালু হ'লে তবেই লেখাপড়া! ইংরেজিতে বলা হয়েছিল, "Education can wait but Swaraj can not."

এ সব অহিংস আন্দোলন। যদি কেউ ভিতরে ঢুকতে চাও, তবে সত্যাগ্রহী-দেরকে মাড়িয়ে ভিতরে ঢোকো! অনেকেই ঢুকছে মানুষকে মাড়িয়ে-মাড়িয়ে। স্কচ প্রফেসর, খৃষ্টান ও হিন্দু প্রফেসর, রাজভক্ত সমাজের দু'চারজন ছাত্র, কলেজ স্টাফের দু'চারজন চাকুরে।

ওদের মধ্যে পাশ ফিরে শুয়েছিল শ্রীমান রাম। শীতে আর বৃষ্টিতে সে কুঁকড়িয়ে গেছে। ভিজেছে আগাগোড়া। রাস্তার মেঝের ঠাণ্ডা অসহ্য মনে হচ্ছে। মুখখানা কেবলই সে বাঁচাচ্ছে পাছে কেউ জুতো দিয়ে তা'র মুখ থেঁৎলিয়ে যায়! চোখ পিটপিট করছিল সে। মোটাসোটারা যেন তাকে না মাড়ায়! তা'র ঠ্যাং দুখানা জুতো দিয়ে রগড়িয়ে দিয়ে গেল এক অধ্যাপক। ওর বাপ বোধ হয় তা'র মেসোর মতই বুড়ো রায়বাহাদুর! এবার দম বন্ধ করে মুখ টিপে রাম পড়ে রইল গাদাগাদির মধ্যে। বৃষ্টি পড়ছিল টিপটিপ করে।

স্বরাজ পাবার পর দেশের চেহারা কেমন হবে, স্বরাজ কেমন বস্তু, প্রকৃত অর্থ তা'র কি প্রকার—এসব ব্যাপার রামের কাছে খুবই অস্পষ্ট। দেশবন্ধুর বক্তৃতায় তার শরীরের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠেছিল সত্য, কিন্তু এখন এই শীতের দিনের ঝড়ো বৃষ্টিতে তার সেই রক্ত হিম হয়ে এসেছে। সন্ধ্যার পরেই তা'র নিশ্চয় জ্বর আসবে, সেই সেবার ১৯১৭ সালের ডেঙ্গুজ্বরের মহামারীতে যেমন তাদের খুব জ্বর হয়েছিল। জ্বর হয় হোক, কিন্তু নিমোনিয়ায় মারা গেলে স্বরাজ দেখছে কে? রাম এবার কোঁচার খুঁট খুলে মুড়ি দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে বুকের তলায় দু'হাত চেপে রইল। ওতে একটু গরম হয়। বেলা দশটা থেকে

চারটে,—ছ'ঘণ্টা। সুদীর্ঘকাল! সত্যাগ্রহীরা মড়ার মতো প'ড়ে রইল সেই টিপিটিপি বৃষ্টির মধ্যে।

সে যেন অনন্তকাল। মাঝে মাঝে চিৎকার উঠছে, 'বন্দে-এ মাতরম্।' আজ শ্রীমান রামও ওদের সকলের মতো দেশের 'বীরসন্তান', ও নাকি আজ পরাধীন ভারতের মুখোজ্জ্বল করছে! ওরা নাকি দেশ ও জাতির গৌরব। 'বন্দে-এ-এ মাতরম্।'

শত শত লোক ছাতা মাথায় দিয়ে কিংবা বর্ষাতি চড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। কিন্তু দূরের থেকে দু'চারজন লাঠিওলা লাল-পাগড়ি দেখা মাত্র ছাতাসুদ্ধ দৌড় মারছে! ওরা আগে পালাবার পথ ঠিক করে রাখে! আগে পৈতৃক প্রাণটা, তারপর স্বরাজ! যঃ পলায়তি স জীবতি!

কী বোকা ঐ রাম! ওখানে ওই বৃষ্টির মধ্যে মুখ থুবড়িয়ে থেকে আর কতক্ষণ ধ'রে সে ভারতের মুখোজ্জ্বল করবে? শীতে কাঁপছে সে, কিন্তু হাসি পাচ্ছে! সেই সকাল আটটায় সে খানচারেক বাসি রুটি খেয়ে নারকেলডাঙা থেকে হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসে সটান শুয়ে পড়েছে। এখন বেলা প'ড়ে এসেছে।

হঠাৎ রামের কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। আর কোথাও টুঁ শব্দ নেই, কোনও দিক থেকে আর বন্দে মাতরম্ শোনা যাচ্ছে না! সে মুখের থেকে কাপড় সরিয়ে মাথা তুলল। আরে, এ যে কোথাও কেউ নেই! সামনে কলেজের গেট বন্ধ। সবাই ভোজবাজির মতো কখন যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে! ত্রিসীমানার মধ্যে জনমানব নেই। শুধু অদূরে দু'জন লাল-পাগড়ি তা'র দিকে চেয়ে হি হি ক'রে হাসছিল।

অত চওড়া রাস্তার ওপর বোকারাম কতক্ষণ একা ওইভাবে পড়েছিল, কে জানে। এবার সে তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়াল। জবজব করছে ভিজে সর্বাঙ্গ। জামা কাপড়ে আগাগোড়া জুতোর কাদার ছোপ-ছোপ দাগ। হেদুয়ার জলে জামা কাপড় না কাচলে বাড়ি যাবার উপায় নেই। শুধু ফিতে বাঁধা জুতো-জোড়াটা জলে ডুবিয়ে নিলেই চলবে। রাম সবসুদ্ধ নিয়ে হেদুয়ায় ঢুকল।

শ্রীমান সে বছর টেস্ট পরীক্ষা দিল এবং ফার্স্ট চান্সেই বেরিয়ে গেল।

জানুয়ারী মাস থেকে আবার প্রবল রাজনীতিক আন্দোলন। পরিচালনা করছেন গান্ধীজী। এই আন্দোলনে এই প্রথম নামলেন বাঙালী মহিলা। দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবী, দেশবন্ধুর ভগ্নী ঊর্মিলা দেবী। ওঁদের সঙ্গে বেরোলেন হেমপ্রভা মজুমদার আর জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী। সম্রাটের পুত্র প্রিন্স অফ্

ওয়েলস আসছেন ভারত ভ্রমণে, তাঁকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি যেখানেই যাবেন—সেখানেই হরতাল হবে! অহিংস ভারতের অন্ত অঙ্ক নেই। ভারতব্যাপী ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে গেল। মহিলারা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলেন এবং তাঁদের গ্রেপ্তার করা হ'ল। কর্তৃপক্ষ সেইকালে গান্ধীজীকে ছয় বছরের জন্য জেলে পাঠালেন। উত্তাল হয়ে উঠল ভারত।

সেই বছরেই অর্থাৎ ১৯২২ সালের দোল পূর্ণিমার দিন বেরোল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। ওই ছেলেটা গিয়ে পটলডাঙ্গার মোড় থেকে দু' পয়সা দিয়ে একখানা লাল শিরোনামার কাগজ কিনে নিয়ে এল।

সেই বছরেই রাম পাস করল, কিন্তু স্কটিশ চার্চ কলেজের বুড়ো প্রিন্সিপ্যাল জে জে ওয়াট ওকে কলেজে ঢুকতে দিল না। ওর বিরুদ্ধে অনেক নালিশ। ও নাকি বালগঙ্গাধর তিলকের শোকমিছিলে অংশ নিয়েছিল, মিশনারি ইস্কুলের মধ্যে দোল খেলেছিল, কয়েকজন মাস্টারকে নানাভাবে হায়রান করেছিল, ক্লাসের ভিতরে ব'সে 'দেশের শত্রু' গান্ধীর গল্প ফেঁদেছিল, এবং কলেজ-গেটে সত্যাগ্রহ ক'রে শুয়ে পড়েছিল। ইস্কুলে ওর রেকর্ড খুব খারাপ।

কান্নাকাটি, হাত জোড় করা, ক্ষমা চাওয়া, নাকখৎ দেওয়া—কোনও কিছুতেই ওয়াট সাহেবের মন ভিজল না। ওর সামনে দিয়ে একে একে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা স্কটিশ কলেজে ভর্তি হল। রাম একা পথে নেমে এল।

বাইবেল পরীক্ষায় ওর নম্বর বেশ ভাল উঠত। ও গেল ডাফ চার্চে। সেখানকার খাতায় ওর নাম ছিল কাশীনাথ। বছর দুই আগে ওর বন্ধু নবকুমারের সঙ্গে ওর মাথাতেও পুণ্যসলিল জর্ডন নদীর জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। মন্ত্র পাঠ করেন রেভারেণ্ড। ওর নামের আগে বসানো হয়, ভিক্টর। তখন থেকে ও নাকি খৃষ্টান! যেমন পাতু, পিণ্টু, মিমি, আঙ্গুলকাটা যতীনদা এবং আরও অনেক বন্ধু। কিন্তু হোক না খৃষ্টান, এদিকে সে যে নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান, ঋগ্‌বেদে তা'র অধিকার। সুতরাং যথাসময়ে সেই বছরেই ওর হয় 'উপনয়না'! দিদিমার বাড়িতে যাগযজ্ঞ, হোম—মহা ধুমধাম। সেই হোমের আগুনের সামনে ওকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে হল। ওর কান ফুঁড়ে হলুদ সুতো আর সোনার কাঠি ঢুকিয়ে দিল। ওর মাথা ন্যাড়া ক'রে দেয় নাপিত। ওর আঙ্গুলে ওঠে ছিলেকাটা আংটি, গায়ে গরদের জোড়, হাতে তালপাতা বাঁধা যষ্টি। চারদিনের দিন ভোরে গিয়ে গঙ্গায় 'দণ্ডী' ভাসানো। ফিরে এসে 'নিয়মভঙ্গ'। তখন রাজবেশ ধারণ করো! ও যে হিন্দুকুলতিলক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।

২

কিন্তু জর্ডন নদীর জল মাথায় ছিটোবার পর ওই ছেলেটা পেয়েছিল প্যাকেট মোড়া ভাল-ভাল খাবার। চপ, কেক, সন্দেশ, খাস্তাকচুরি—অনেক। এক-খানা সিল্কের রুমাল, এক শিশি এসেন্স, এক বাক্স পিয়ার্স সোপ, ঘুড়ি ও লাটাই। সানডে-সকালের সার্ভিসে লজেন্স, চকোলেট আর কেক। পাঁচ বছর আগে সেই দর্জিপাড়ার নিবারণ দাসের সুন্দরী বৌটা শ্রীমান বিভূতির চোখে জল দেখে বলেছিল, এ শুধু জল নয় ভাই, এ হল প্রেমাশ্রু। তোমার বয়স আমার চেয়ে অনেক কম। কিন্তু তুমি ওঁদের মতন পরম বৈষ্ণব।

বোষ্টমদের মুখে এমন স্তুতিবাদ শুনে ছেলেটার ল্যাজ মোটা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে আসলে ছিল নির্বোধ। সে ওই মেয়েছেলেটার কথা শুনে ওদেরই কীর্তনীয়ার দলে ভিড়ল। ওর গলাটা মন্দ ছিল না। মাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে বিভূতি বেরিয়ে পড়ত ওপাড়া থেকে সে-পাড়ায় কীর্তনেদের সঙ্গে বারোয়ারি মিছিলে গান গেয়ে—'প্রেমে ঢল ঢল গল গল গল ছল ছল ছল করুণ নয়নে দুটি ভাই। ও তার একটির নাম গৌরহরি আরেকটির নাম হয় নিতাই—'।

ওদিকে মিশনারি ইস্কুলে ওর সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ছিল আলতাফ, জলালুদ্দিন ও কামাল। ওরা ওকে নিয়ে যেত ওদের সেই নিকিরিপাড়ায়। সেখানে ছিল মসজিদ,—তা'র উঠোনে গুলী খেলা হত। সেখানে আজান্ দিত ঠিক সন্ধ্যার আগে। সেখানে কল্‌মা পড়ায়। কিন্তু তা'র ভাষা আর উচ্চারণ কারও রপ্ত হত না। আল্‌তাফ হাসত। ওখানে চারদিক নোংরা, আর সেই কাওরাদের মতন বস্তি, নালা-নর্দমা। মুর্গি চরত চারদিকে। ওখানে যাতায়াত করতে ভাল লাগত না। না, ওটায় আর দরকার নেই।

ওকে স্কটিশ চার্চ কলেজে যখন কোনমতেই নিতে চাইল না ও তখন রবিবার সকালে ডাফ চার্চের সার্ভিসে গিয়ে ঢুকল। বাইরে থেকে এসেছেন একজন নামকরা বিশপ। তাঁর পিছনে জ্যোতির্মণ্ডলময় খ্রীস্টের সৌম্যমধুর ছবি। মাতা মেরী তার পাশে। যীশু পাপীকে ক্ষমা করেন, অপরাধীকে আশ্রয় দেন। অন্যায় ও দুষ্কৃতকারীকে তিনি কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেন, দুঃখীর দুঃখ দূর করেন। ওই দিকে তাকিয়ে বিভূতি বার দুই চোখের জল মুছল।

কিন্তু, এত কাণ্ড করেও বিভূতির পিতামহপ্রতিম ওই খৃষ্টান ধর্মযাজক ওয়াট সাহেবের মন কিছুতেই পাওয়া গেল না। বারম্বার অনুরোধ-উপরোধ, কিন্তু তিনি আপন সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

অবশেষে নিঃসঙ্গ বিভূতি গিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীটের সিটি কলেজে ভর্তি হল।

তার মনে রুদ্ধ আক্রোশ জমা হতে লাগল। প্রতিশোধস্পৃহা, হিংস্রতা, বিদ্রোহ-বাদ, বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি আকর্ষণ, চলতি জীবন ব্যবস্থার প্রতি অহেতুক বিরাগ—এগুলি তাকে পেয়ে বসল।

অত্যন্ত বিরক্তি, বিদ্বেষ ও ঔদাসীন্যের সঙ্গে সে মাসের পর মাস কলেজ করতে লাগল। খৃষ্টান সমাজের সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক সে ছিঁড়ে ফেলে দিল। মেয়েদের ডাণ্ডাস হস্টেল্, ওয়ান্ হস্টেল, ডাফ চার্চ, অগিল্ভি, ডাফ হস্টেল,—এদের ত্রিসীমানার থেকে সে দূরে চলে গেল।

এবার সে যেন আসছিল ধীরে ধীরে একটা অজানা বাইরের জীবনে। সে ঘুরছিল আপন গণ্ডীর মধ্যে, পরিচিত সমাজের আশেপাশে। সে যেন এবার সেখান থেকে সরে যাচ্ছিল, ছিটকিয়ে পড়ছিল এখান থেকে ওখানে। কী সে চাইছে সে জানে না, চোখের সামনে যা আসছে, তা সে চায় না। তার গতি ও বিধি কারও জানা নেই। ওর মনের খবর কেউ রাখছে না। ও যাচ্ছে মাসের পর মাস ভরা দুপুরের রৌদ্রে সেই হোগল-কুঁড়ের মোড়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, কিংবা সেই মেট্‌কাফ হলের ইম্পিরিয়ল লাইব্রেরীতে, কিংবা কলেজের মাইনে থেকে কিনছে কতকগুলো সাময়িক পত্র আর ওয়েলিংটনের মোড় বা প্রেসিডেন্সির রেলিং থেকে মাঝে মাঝে পুরনো বই।

ছেলেটা নিজের মধ্যে রচনা করেছিল একটা বিচিত্র লক্ষ্মীছাড়ার জগৎ। সেই জগতে তার কোনও দোসর খুঁজে পাওয়া যেত না। শৈশব থেকে সে শুধু নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে ঘুরেছে। অন্ধ কুসংস্কার, কুরুচি, কুশিক্ষা, তার সঙ্গে অন্ধ আচার, যুক্তিহীন অনুষ্ঠান, অর্থহীন লোকাচার—সব মিলিয়ে চারিদিকে যেন বেড়াজাল, রুদ্ধশ্বাস অবরোধ। সেই কালে এক সময় সে গিয়ে দাঁড়াল সরকার বাগানে নতুন বন্ধুদের মাঝখানে।

এটা ছিল ব্রাহ্মদের পাড়া। ওদের মধ্যে ঢুকল সে। তাকে 'আনন্দমেলার' সভ্য করে নেওয়া হল। প্রতি দোল পূর্ণিমায় বার্ষিক উৎসব। মাঝে মাঝে ছোটখাটো সম্মেলন। এই সম্মেলনের যিনি হোতা তাঁকে সবাই বলে, 'রাঙ্গাদা'। তাঁর পোশাকী নাম হরিহর চন্দ্র। যেমন মধুরভাষী, তেমনি অমায়িক। চেহারা যেমন সুশ্রী, তেমনি মিষ্ট আচরণ। রাঙ্গাদার স্ত্রী হলেন তরুণ ছেলেদের বৌদি। তিনি শিক্ষকতা করতেন রামমোহন লাইব্রেরী হলে ছোট একটি ইস্কুলে।

একে একে এ-বাড়ি আর ও-বাড়ি আর সে-বাড়িতে পাওয়া গেল দিদি তার বৌদিদি আর মাসিমা! অমুক দাদা আর অমুক মামা আর এক আধটি

ছোট্‌কা। ওর মধ্যে মাঝে মাঝে পাইকপাড়ার মাঠে বালকবালিকা আর তরুণ তরুণীর উৎসব। ওই প্রথম স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল 'মেয়ে' দেখা গেল! যারা স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে, যারা গান গায় রবিঠাকুরের, যারা চড়িভাতি করতে যায় বন্ধুদের সঙ্গে।

ওখান থেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গলিঘুঁজিতে আনাগোনা, ছেলেমেয়ে মহলে জনপ্রিয়তা, এখানে ওখানে নেমন্তন্ন, টুকিটাকি চিঠি লেখালেখি, এমন কি মান-অভিমানের পালা পর্যন্ত। কার সঙ্গে কার বেশি ভাব তাই নিয়ে চুপি চুপি জল্পনা। ওই কানাকানির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তরুণ তরুণীরা। ইভা, ললিতা, নোটন, সত্যেন, দীপেন। কে লুকিয়ে সিনেমা দেখেছে, কে গোপনে প্রতিমা দর্শন ক'রে এসেছে, কোন্‌ ছেলে অশ্লীল একটা উক্তি করেছে, কা'র বিরুদ্ধে কে লাগিয়েছে, এবং কার গোপনীয় চিঠি কে ধরে ফেলেছে,—এ নিয়ে অজস্র কলকাকলী। ওই পাড়াতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের কোণে ছিল 'প্রবাসী' আপিস এবং ওই সরু গলিতেই থাকতেন কোন কোনও আচার্য—তাঁরা অতিশয় রক্ষণশীল।

শ্রীমান্‌ বিভূতি ওরফে কাশীনাথ ওরফে রাম,—যে-ছেলেটা আত্মীয়মহলে খোকা নামে পরিচিত,—সে ধীরে ধীরে এক অর্বাচীন সাবালক তৈরি হচ্ছিল। সে এখন নিজের শ্বাসরোধী ঘর ছেড়ে বাইরের জীবনে ঘর খুঁজছিল। সে ঢুকছে ব্রাহ্মসমাজে আর তার কাছে সঙ্গীত সমাজে, সে যাচ্ছে রামমোহন লাইব্রেরী আর গড়পার, সরকার বাগান আর সিংহীবাগান। সে স্কুল ছেড়ে কলেজে পড়ে, সে আনন্দমেলার সভ্য, নানা ব্রাহ্মপাড়ায় সে দিদি আর বৌদিদিদের অন্তরঙ্গ। তাকে দেখে মেয়েমহলে কেউ আড়ষ্ট হয় না, ছেলেমহলে কেউ হেনস্তা করে না, প্রবীণমহলে কেউ অনাদর করে না। সে নিরীহ, সে নীতিমান, সে সঙ্গীত, কাব্য ও সাহিত্যপ্রিয়। কেউ কেউ বলছে সে নাকি লেখক। সে হাতের-লেখা ম্যাগাজিনে অনেক লিখেছে। তার লেখা বেরিয়েছে নাকি 'মজলিশ' আর 'শঙ্খে'। একদা তার একটি গল্প চেয়ে নিল রাঙ্গাদা। সেই লেখাটা ছাপা হল 'কল্লোল' নামক এক মাসিক পত্রে। সেটি ১৯২৩। সেই বছরেই 'কল্লোলের' জন্ম।

ছেলেটা বোধ হয় এবার লেখক হতে চাইছে। এবার থেকে বোধ হয় একরাশি চুল রাখবে।

এই সময় একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটে, সেটি ওই ছেলেটি ভুলতে পারে নি। মনোমোহনবাবু নামক জনৈক অচেনা ব্যক্তি একদা গায়ে পড়ে পথের উপরেই

ওই ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করে। অতঃপর ঠিকানা নিয়ে বাড়িতে আনাগোনা করতে থাকে। মাঝে মাঝে চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে টোস্ট-আমলেট্ ইত্যাদি খাওয়ায়।

একদিন লোকটা নানা কথায় ছেলেটাকে নিয়ে গেল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। চোরবাগান ছাড়িয়ে চাষাধোবাপাড়ার ভিতর দিয়ে গেলে যে-দরজাটা পাওয়া যেত, সেই গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকেছিল। যাঁর সঙ্গে আলাপ হল, তিনি প্রবীণ ও সৌম্যদর্শন, পাকা দাড়ি গোঁফ। নাম ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতি অমায়িক ও মিষ্টভাষী। তিনি কয়েকখানি বই বার করে ছেলেটাকে উপহার দিলেন। সেগুলি ব্রাহ্মসমাজ দর্শন সম্বন্ধে লেখা। ঠাকুর মশায় বিশেষ সমাদর জানিয়ে ওই ছেলেটাকে বললেন, তোমাকে আমি ব্রাহ্মোফাই করে নিতে চাই।

মন্দ কি ? ছেলেটা হাসিমুখে রাজি হয়ে গেল। সে হিন্দু, সে খৃষ্টান, সে মুসলমান, পার্শী, বৌদ্ধ,—কোন্‌টা সে নয় ? ওই ক'খানা বই পড়ে আজ থেকে সে ব্রাহ্ম হবে, এবং বোধ হয় খাতায় নাম উঠবে, এবং ওঁদের সংখ্যা বাড়বে,—এই ত।

ঠাকুর মশায়ের ওখানে চমৎকার জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেদিন বইগুলো সঙ্গে নিয়ে ফিরবার পথে কল-মুখরিতকণ্ঠে ছেলেটা বলেছিল, প্রত্যেক সপ্তাহে আপনার সঙ্গে আসব, মনে রাখবেন মনোমোহনবাবু।

কিন্তু মনোমোহনবাবু আর কোনদিনই আসেন নি এবং ছেলেটাও আর কোনওদিন যায় নি।

সেই রামখোকা একদা ডুবে গেল, কাশীনাথ হারিয়ে গেল, বিভূতি তলিয়ে গেল! ওই সংজ্ঞাগুলোর ভিতর থেকে যে ছোকরা নানা ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে ঘুরে ফিরে বেরিয়ে এসে কলকাতার রুক্ষ কর্কশ পথে দাঁড়াল, সে আরেকজন! সে দরিদ্র, অর্ধউপবাসী, হতভাগ্য। সে শুনে এসেছে এতকাল, তার স্বর্গত পিতার এক মস্ত গ্রন্থসংগ্রহশালা ছিল, সেই সমস্ত বই মাত্র চার পয়সা সের দরে সময়-সময় বিক্রি করে তবে তাদের অন্ন জুটত। তারও স্বপ্নের মতো মনে পড়ে, বস্তার পর বস্তাবন্দী বই পড়ে থাকত অন্ধকার সিঁড়ির তলায়—সেগুলোর মধ্যে আরশোলা, উই আর নেংটি ইঁদুরের রাজত্ব ছিল। তেতলার দোছত্রীতে থাকত অনেকগুলো বস্তা—যেগুলো বর্ষায় ছাদের ফাটলের জলে সপসপ করত। ওদেরই ভিতর থেকে বই টেনে তাদের

কাগজে ছোট বাচ্চাদের দুধ গরম করা হত এবং বাড়িতে ঘুঁটে না থাকলে ওইসব বই জেলেই উনুন ধরানো চলত।

ওই ছেলেটা কেবল হাঁটছিল নারকেলডাঙ্গা থেকে মাণিকতলায় জগন্নাথ দে-র নতুন বাড়িতে। পাঁচ মাস ধরে সে-বাড়িতে চলছিল ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা, কৃষ্ণকীর্তন, প্রভাসখণ্ড ও শ্রীচৈতন্যলীলা। কথকতা করছিলেন নিত্যানন্দ গোস্বামী। সুদীর্ঘ পাঁচ মাস—পৌষের আরম্ভ থেকে বৈশাখের শেষ। এই পাঁচ মাসের প্রতিদিনটি ছিল ওই ছেলেটার একাগ্রতার ও নিষ্ঠার ইতিহাস। এই পাঁচ মাস অবধি বেদনায়, কান্নায়, আনন্দে, রসের কল্পনায়, মর্মের যন্ত্রণায় ও অন্তরের নিবিড় প্রেরণায়,—সে ছিল আলোড়িত। প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত দশটা—সে যেন উঠে আসত অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যুর থেকে জীবনে! মৃত্যুর বেড়াজাল যেন চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে রাখত, কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় মুক্তি দিত ওই নিত্যানন্দ গোস্বামী। ওই লোকটা কীর্তনকথা ও আঁখরের মায়াজাল বিস্তার করে ওর একাগ্র চিত্তকে নিয়ে যেত আর্যাবর্তের সকল পুণ্যতীর্থে। ও গিয়েছে দ্বৈপায়ন হ্রদে আর দ্বারকায়, গিয়েছে প্রভাসে আর কৈলাসে, গিয়েছে বৃন্দাবনের ধীরসমীর আর কালীয়দমনের ঘাটে। ওর মন সর্বত্র কেঁদে বেড়িয়েছে।

বৈশাখের সংক্রান্তি তিথিতে সেবার ভরা শুক্লপক্ষ। সেদিনের শেষ অনুষ্ঠানের পর ছেলেটা সেই ঘন জ্যোৎস্নায় আপনমনে ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় ভিড়ের ভিতর থেকে তার ঠিক পাশেই নারীকণ্ঠে শুনল, শোনো—

সচকিত হয়ে সে ফিরে তাকাল। চওড়া কালাপাড় শাড়ি পরা সুশ্রী এক মহিলা। তার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা। মহিলা বললেন, আমাকে একটু এগিয়ে দেবে? রাত অনেক হয়েছে ত—

গলা পরিষ্কার করে ছেলেটা সসম্ভ্রমে বলল, চলুন—

দু'জনে বেরিয়ে হেদোর মোড়ের দিকে চলল। কথা কিছুই নেই—কেনই বা থাকবে? দু'জন সম্পূর্ণ পরস্পর-অপরিচিত। তবু সেই রাত্রির জ্যোৎস্নার তলায়-তলায় ওই ছেলেটার পা কাঁপছিল! মহিলা এক সময় বললেন, আমি কাছেই থাকি, এই হেদোটুকু পেরিয়ে গেলে সামনেই রায়বাগানের গলিতে—

যেন রূপমতীর দেহচ্ছটা! বেথুন কলেজের নিরিবিলি ফুটপাথ ধরে যাচ্ছিল দু'জনে। হঠাৎ মহিলা বললেন, বলো ত, এত লোক থাকতে তোমাকে কেন বললুম এগিয়ে দিতে?

ছেলেটা নির্বোধের মতো তাকাল ওঁর ধবধবে মুখশ্রীর দিকে। ওর মুখে কোন কথাই যোগালো না।

মহিলা বললেন, তা হলে শোন। এই পাঁচ মাস ধরে কের্তনের আসরে কতবার তুমি আমার দিকে চেয়ে দেখেছ, মনে পড়ে? তুমি চেনা হয়ে গিয়েছ!

ছেলেটার কপালে ঘাম দেখা দিয়েছিল।

রায়বাগানের গলিতে ওরা ঢুকল। সরু গলিতে জনমানব কেউ নেই। শুধু কোন্ বাড়ি থেকে যেন শোনা যাচ্ছিল কালোয়াতি গান। ওরা সোজা এসে সিংহ-মূর্তিমার্কা ফটকটির ডানদিকে ঘুরল। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর বাড়ির ঠিক পাশেই আস্তাবলটার উঠোনে মহিলা ঢুকলেন। এ পাড়ার সব বাড়ি ও ছেলেটার চেনা।

বিদায় নেবার আগে মহিলা স্মিতমুখে বললেন, তোমাকে খুব ভালো লেগেছিল, তাই বলে যাচ্ছি। কী যে ছিল তোমার চোখে, আমি খুব আড়ষ্ট হতুম। এই যে, এ বাড়ির নিচের তলায় আমি থাকি। বিধবা মানুষ, একলাই থাকতে হয়। একটা শুধু ঝি আছে, ঘর আগলায়।

ছেলেটা বলল, এবার আমি যাই—

মহিলা ও কথাটা কানে নিলেন না। কী যেন ভাবছিলেন। পরে বললেন, ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে বলি, মাঝে মাঝে এসো, গল্প করব, তোমাকে খাওয়াবো। কিন্তু সে সব থাক্, আমার সাহস হয় না। আচ্ছা, এসো—। মহিলা যেন সরীসৃপের মতো ভিতরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ছেলেটা হাঁটতে হাঁটতে এসে হেদোয় ঢুকল। ঘাসের উপর এসে বসল।

হাওয়া দিয়েছে দক্ষিণের। হেদোর জল সেই হাওয়ায় আন্দোলিত হয়ে জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে। সে ভাবছিল, এ তার নতুন অভিজ্ঞতা। মহিলা কেন নিজের পরিচয় দিলেন, এবং কেনই বা গল্প করার ইচ্ছা প্রকাশ করেও তাকে আসতে একপ্রকার মানা করলেন,—এসব দুর্বোধ্য। যেটা রয়ে গেল ছেলেটার মনে, সেটি হল, এই চন্দ্রহসিত জনবিরল রাত্রে একটি ছোট্ট ঘটনার ব্যঞ্জনা। ওই চন্দ্রবরণা নারী যেন মহাকাব্যের সেই আদি মহাসিন্ধুর ভিতর থেকে চিরযৌবনা উর্বশীর মতো তার সামনে প্রতিভাত হয়েছিল। ওই ছেলেটার মনে যেন বিগলিত রৌপ্যপ্রবাহের মতো একপ্রকার কাব্য সেই রাত্রে উচ্ছলিত হচ্ছিল।

ছি, এসব ভাবতে নেই। ললিত লাবণ্যের মোহ-মদিরতা তার জন্য নয়।

সে মনে মনে বিবেকানন্দর একান্ত অনুরাগী। স্বামীজীর প্রত্যেকটি বই ও বাণী তার কণ্ঠস্থ। এ ধরনের ছোট ছোট ঘটনা তাকে ভুলে থাকতে হবে। তার সামনে এখন সুদীর্ঘ জীবনের পথ। তার এই ভাবান্তর তার পক্ষে অপমানজনক।

তুমুল রাজনীতিক আন্দোলন চলছে তখন দেশে। অসহযোগ আন্দোলনে বিশেষ কিছু হয় নি। ৩১ ডিসেম্বর পেরিয়ে গেলেও 'স্বরাজ' আসে নি। গান্ধীজী জেলে। বেরিয়ে এলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মোতিলাল নেহরু। প্রথম জনের পিছনে এসে দাঁড়াল পরিণত যুবা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—দেশবন্ধুর সকল কর্মের দোসর। এ ছাড়া আরও তিনটি তরুণ যুবক—সুভাষচন্দ্র, হেমন্ত সরকার ও কিরণশঙ্কর রায়। ওঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র আই-সি-এস চাকরি নিলেন না, হেমন্তকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুজ্জ্বল রত্ন, এবং কিরণশঙ্কর ব্যারিস্টার ও তেওতার জমিদার। মোতিলাল নেহরুর পাশে পাশে সসঙ্কোচে আসছিলেন জওয়াহরলাল—মোতিলালের একমাত্র পুত্র। দেশবন্ধু ও মোতিলাল—উভয় দেশবরেণ্য নেতা স্বরাজ্য পার্টি সৃষ্টি করলেন। এবার কাউন্সিলে ঢুকতে হবে। বাইরে থেকে অসহযোগ আন্দোলন আর নয়, এবার ওই বৃটিশ শাসনচক্রে ঢুকে ভিতর থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। একে একে এলেন শরৎ বোস, রাজা কিশোরীলালের ছেলে তুলসী গোস্বামী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং আরও অনেকে। ভারতবর্ষ আবার চেতিয়ে উঠল। ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলামখানায় ছেলেরা আবার ঢুকল। এই রকম একটা সময়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে বোধহয় প্রথম সহশিক্ষার প্রচলন হল। ছেলের সঙ্গে মেয়ে বসবে একই ক্লাসে— ? বজ্রাঘাত হল রক্ষণশীলদের পাড়ায় পাড়ায়! কাগজে-কাগজে ব্যঙ্গচিত্র। কটূক্তি আর ব্যঙ্গোক্তি। দেশের সর্বনাশ হ'তে চলল, সমাজ ভেঙ্গে পড়ল, ছেলেরা উচ্ছন্নে যেতে বসল, মেয়েরা কলঙ্কবতী হয়ে উঠল!

সেই বছর প্রাক্তন অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ী ইডেন গার্ডেনের একজিবিশনে 'সীতা' ও 'আলমগীর' মঞ্চস্থ করেন। এর আগে উনি ম্যাডান থিয়েটার্স এবং আর দু'চারটি প্রতিষ্ঠানে আবর্তিত হয়ে বন্ধুমহলের সহযোগে এবং আত্মবিশ্বাসের জোরে নিজের রঙ্গমঞ্চ সৃষ্টি করেন। উনি থিয়েটার-জগতে আবির্ভূত হয়ে পুরনো কালকে ভাঙছেন এবং নতুন কালের উদ্বোধন করছেন, নতুন ধরনের অভিনয়কলা ও রীতির প্রবর্তন করছেন, এইটি লক্ষ্য করে 'অবতার' সাপ্তাহিকে কটূক্তি ছাপা হতে লাগল। উনি নাকি মদ খেয়ে

স্টেজের ভিতরে ও বাইরে 'হাম আলমগীর হ্যায়' বলে মাতলামি করে থাকেন। শিশিরকুমারের বয়স তখন বোধ হয় চৌত্রিশ। বয়স হিসাবে এটি নাকি মদ্যপানের উপযুক্ত কাল।—কিন্তু বড় আর্টিস্টের প্রতিভা নিরঙ্কুশ। সে কথায় কথায় কেন মানবে সমাজনীতি, কেনই বা প্রতি পদক্ষেপে তার পায়ের তলায় কাঁটার মতো ফুটবে সামাজিক বিধিনিষেধ? কবি, শিল্পী, গায়ক, অভিনেতা, সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক প্রভৃতি চিন্তাজীবীরা যদি কিছু কিছু নেশাভাঙ না করে তবে তাদের স্বভাবশূন্যতা ভরবে কী দিয়ে? বড় বড় ব্যারিস্টার, দেশনেতা, সমাজপতি, কাগজের সম্পাদক, সমরনায়ক—এঁরা নেশা না করলে চলবে কেন? মাতালদের জন্য ত মদ নয়!

শিশিরকুমারের চারিদিকে বন্ধুরা ঘিরে দাঁড়ালেন। অবনীন্দ্রনাথের জামাতা ও সুলেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, চারুচন্দ্র রায়, অধ্যাপক অরুণ সেন, নরেন্দ্র দেব, যোগেশ চৌধুরী এবং আরও অনেকেই এলেন।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের কাছে হ্যারিসন রোডের ওপর 'আলফ্রেড থিয়েটার' ভাড়া নেওয়া হল। তখন ওই ছেলেটা নিজের পারিবারিক অধিকারে ওই থিয়েটারে আনাগোনা করতে লাগল। ব্রাহ্মদের পাড়া ছেড়ে দিল।

গঙ্গার সঙ্গে যোগ ছিল প্রায় আশৈশব। চুঁচড়ো-নৈহাটির গঙ্গা, শান্তিপুরের গঙ্গা, শিবপুর-রামকৃষ্ণপুর-বদরতলার গঙ্গা, স্বরূপগঞ্জ আর নবদ্বীপের গঙ্গা, খড়দা, বারাকপুরের গঙ্গা,—এসব অতি পরিচিত। ওই দুরন্ত ছেলেটার নড়া ধরে নিয়ে যাওয়া হ'ত আনন্দময়ী আর নিমতলার স্নানের ঘাটে। নৌকায়-সে ভেসে বেড়িয়েছে বহুবার।

তখন বড়বাজারের ঘাট থেকে স্টীমার ছেড়ে উত্তর গঙ্গার দিকে সেই শিবতলার ঘাট পর্যন্ত যাওয়া যেত ছয় পয়সায়। এপার ওপার করত স্টীমার। প্রথম বড়বাজারের ঘাট ছেড়ে আহিরিটোলার ঘাট, ওপারে শালকিয়া বাঁধাঘাট, আবার এপারে কাশীপুর, ওপারে বেলুড়, বালী আর উত্তরপড়া, তারপর কুটীঘাট আবার এপারে এঁড়েদা, আর শিবতলা। কিন্তু জেটিতে একবার নামলেই সেই ছ'পয়সার টিকিট বাতিল। যদি স্টীমারের নিচের তলায় থাকো, কেউ কিছু বলবে না। ওই ছ'পসায় গা-ঢাকা দিয়ে সারাদিন গঙ্গায়-গঙ্গায় ঘোরো। বন্ধু সঙ্গে থাকলে কথাই নেই। লুডো খেলো, ওয়ার্ডমেকিং খেলো, ফুট-কড়াই ভাজা বা নকলদানা খেতে থাকো, দাবার ছক নিয়ে বসে যাও,—কেটে যাবে সারাদিন।

কুটীঘাট-পরামানিকের ঘাট থেকে উঠে পুবদিকে এসে বরানগরের বাজার ছাড়ালে সোজা পথ গেছে সিঁথির দিকে। সিঁথি থেকে পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে ঘুঘুডাঙ্গা স্টেশনে। জনবিরল বন-বাদাড়ের দিকে। দিনের বেলা পেরোতেও ভয়-ভয় করে। ছুরি দেখিয়ে ছিনিয়ে নিত পয়সা-কড়ি। সেই কারণে এই পথে দল বেঁধে যেত জেলেরা। ওই পথেই জেলেদের সঙ্গে ছেলেটার ভাব হয়েছিল। সবাই মিলে ওখান দিয়েই ঘুরতে ঘুরতে এল বেলগাছিয়া-পাতিপুকুর হয়ে উল্টোডিঙ্গির দিকে।

সেদিন কে আড়াল থেকে সাজিয়ে তুলছিল ওই ছেলেটার জীবনের একেকটি উপচার? সে কি ভাগ্যের নিত্যনূতন কৌতুক, না বিদ্রূপ? সেই নিয়তি কি কোনও পরম পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চাইছিল? সে কি তার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে একটির পর একটি উপকরণ যুগিয়ে দিচ্ছিল? কে আছে ছেলেটার পিছনে? অদৃশ্য কি কেউ তার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে এক-অজানা থেকে অন্য-অচেনায়?

দিন তিনেক পরে সে এসে উঠল উল্টোডিঙ্গির খালধারে স্টীমবোটে। খর রৌদ্র মাথার উপর। অগণ্য ঝুড়ি-পলো আর চেঙ্গারি উঠেছে সেই বোটে। ভিতরে ঠাসাঠাসি ময়লা মানুষের দল। ঘর্মাক্ত সেই জেলেদের গায়ের গন্ধের সঙ্গে মিলেছে ওই ঝুড়ি-চেঙ্গারিগুলোর আঁসটে গন্ধ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের গরম। লক্ষ লক্ষ মাছি আক্রমণ করেছে ওই স্টীমবোট। এই বোট নতুন খালের ভিতর দিয়ে যাবে ভাঙ্গড়ের দিকে। কলকাতা আর শহরতলীর মাছ সাপ্লাই হয় এই জলপথে।

ওই কলেজ-পালানো ছেলেটা সেই নারকেলডাঙ্গা থেকে খালি পায়ে আর গেঞ্জি গায়ে হাঁটতে হাঁটতে এসেছে মানিকতলার খালধার দিয়ে। কী আনন্দ আর উদ্দীপনা তার। সে মাছের কারবারে নামছে, জেলেদের দলে ভিড়ছে। ওদের মধ্যে মিলে যেতে গেলে ওদের মতন হওয়া চাই। জুতো আর জামা চিরদিনের মতন বোধ হয় তাকে ত্যাগ করতে হ'ল। রৌদ্রে, বর্ষায়, শীতে— ওই ময়লা গেঞ্জি। বর্ষায় ভেজো, শীতে কোঁচার খুঁট দিয়ে গা ঢাকো। আর পি-সি-রায় প্রচার করছেন, বাঙ্গালী ব্যবসায় নামুক, নইলে দেশের উন্নতি নেই।

দেশের উন্নতি? কই না, দেশের উন্নতির জন্য ত সে বেরোয় নি? সে বেরিয়েছে তা'র ভিতরের থেকে একটা অপ্রতিরোধ্য তাড়নায়। সে ভাসতে চাইছে নিত্যনূতনের তরঙ্গে-তরঙ্গে। তার ঔৎসুক্য, তার কৌতূহল, তার শিকলছেঁড়া মন, তার বেপরোয়া প্রকৃতি,—এরা তা'কে কোনওদিন স্থির থাকতে দিচ্ছে না। দেশের উন্নতির কথা ভাববে, এমন বিদ্যে তা'র নেই।

নতুন খালের দিকে সারেঙ বড় চাকাটা ঘোরালো। ঝকঝক শব্দ তুলে বোটখানা জল কাটতে কাটতে চলল। কলকাতা খুব কাছে, কিন্তু সেই কলকাতা কোথা দিয়ে কখন্ যেন হারিয়ে গেল। খালের একধারে বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর, অন্যধারে ঝোপঝাড়, নারকেল-বাগান আর আম-কাঁঠালের গাছ। মাঝে মাঝে বাঁশবন। কোথাও কোথাও গোলপাতার চালাঘর, নয়ত করোগেটের। আশেপাশে ছোট ছোট গ্রাম, জেলেদের বাস। ঘাটের ধারে তালের ডোঙ্গা ভাসছে কোথাও কোথাও, আর নয়ত বাচ্চারা স্নানে নেমে জল ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। পাখিরা কলকাকলী করছে অশ্রান্ত।

এ দৃশ্য দেখে নি সে আগে। সে জানে না গ্রাম কেমন, সে দেখে নি কেমন করে জল-মাটি-গাছ আর ধানক্ষেতের সঙ্গে মানুষ জড়িয়ে থাকে। সে যেন ছিটকিয়ে এলো বিচিত্র এক অজানা জগতে, যার কোনও সংবাদ কলকাতায়

কেউ রাখে না। একেকটি জনবসতি যেন অনাদিকালের ছোট ছোট ছবি। ফুলে ফলে রঙে রসে, মৌমাছি আর প্রজাপতি-পতঙ্গে নতুন খালের দুই পার ছেলেটাকে যেন নিয়ে চলল কোন্ বৈকুণ্ঠলোকে। তন্ময় হয়ে সে চেয়ে ছিল।

স্টীমবোট এসে পৌছল কেষ্টপুরে। তখন খর মধ্যাহ্ন কাল।

কে জানত এমন একটা বড়সড়ো জনপদ রয়েছে কলকাতার এত কাছে? এটা কেষ্টপুর টোল্। এখানে গভর্নমেণ্ট খাজনা আদায় করে জেলে আর বেপারীদের কাছ থেকে। এখানে কাঁচা পাকা বহু ঘর বাড়ি। বহুলোকের বাস। কোথাও কোথাও ধানের গোলা আর খড়ের গাদা। ঢেঁকির পাট শোনা যাচ্ছে এখান থেকে। চোখ-বাঁধা এক বলদ অদূরে সরষের তেলের ঘানি ঘোরাচ্ছে। মুর্গি চরছে ডাঙ্গায়, খালের জলে পাতিহাঁস ভাসছে।

না, এখানে নয়। এর পরে যেখানে স্টীমবোট থামবে সেইখানে নামা। ওই যে, এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে সেই সরু কাঁচা পথ, যে-পথ গেছে শূলী-মোহান্তর সেই আখড়ায়। ওখান থেকেই আসে গাজনের একদল সন্ন্যাসী। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—চড়কতলা আরেকটু এগিয়ে। কাঁটাঝাঁপ, বঁটিঝাঁপ, আগুন ঝাঁপ—সে সব কি আর আছে এখন? এই ত এবারের চড়কে সেই ছোকরাটা মারা গেল! লোহা দিয়ে পিঠ ফুঁড়ে উঠল চড়ক গাছে। তারপর নামল যখন মরা ছেলে। আজকাল থানা-পুলিসে বড়ই কড়াক্কড়ি।

স্টীমবোট এসে থামল আরেক ঘাটে। সামনে কালীর এক মন্দির-স্থাপনা। শোভারামের সঙ্গে ছেলেটা একখানা তক্তার ওপর দিয়ে ঘাটে এসে নামল। ঘাট থেকে পথ গিয়েছে এঁকে বেঁকে। চারদিকে ঝোপঝাড়, কলাবাগানে কলার কাঁদি ঝুলছে। নারকেল বনে হাওয়া উঠেছে। বাঁশবনে ছমছম করছে ছায়াপথ।

কয়েকখানা চালাঘরের ফাঁকে একখানা ছোট পাকা দালান। সেখানে শোভারাম ছেলেটাকে এনে তুলল। এখানেই ব্রাহ্মণ-সেবা হবে। এক ঘটি জল আর গামছা আনো। আসন দাও ব্রাহ্মণকে। অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করো।

দেখতে এলো সবাই। ময়লা গেঞ্জির তলায় ব্রাহ্মণের উপবীত দেখা যাচ্ছে। মেয়ে-পুরুষ ভিড় ক'রে দাঁড়াল চারদিকে। একে একে এলো মর্তমান কলা, বাতাসা, দই আর চিঁড়ে।

মোড়ল বলল, বামুন ছিল না এ গাঁয়ে। তুমি আমাদের বাপের ঠাকুর। এখানে বাম্ভন-পিত্তিষ্ঠে হবে। সরো বাছা তোমরা, বাম্ভনের গেরাস দেখতে নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এই ত কোশ দেড়েক পুবদিকে বিদ্যেধরী

পেরোলেই শূলী-মোহান্তর আখড়া। ওখানে সব আছে, বা'ঠাকুর। শৈব-শক্তি-বোষ্টম— সব আলাদা-আলাদা ঠাঁই।

ক্ষুধার্ত ছেলেটা টাউ-টাউ ক'রে চিঁড়ের ফলার গিলছিল। তখন শোভারাম চান্ করতে গেছে কলাবাগানের কূয়াতলায়। কিচ্ছু ভেবো না বা'ঠাকুর—বৃদ্ধ মোড়ল ব'লে যাচ্ছিল,—ওই আখড়ায় তোমার ঘর আমরাই বেঁধে দেবো। বেড়া দিয়ে তোমার উঠোন ঘেরা থাকবে। থাকবে তুমি নিজের মনে জপতপ নিয়ে। আখড়ায় বোষ্টমীরা আছে। তোমার জল তুলবে, রান্না করবে, বাসন মাজবে, কাপড় কাচবে—সব।

ছেলেটা প্রশ্ন করল, কেন, ওরা কেন করবে?

মোড়ল তা'র ফোকলা দাঁতে হেসে উঠল,—শোনো কথা! বাস্তন কিনা, —তাই কথা উঠছে! তুমি যে হবে আমাদের গুরু-পুরুতের বংশ, ওরা তাই হবে সেবাদাসী! ও যে ওদের ধম্ম, বা'ঠাকুর!

আমি তবে কি করব সারাদিন?—ছেলেটা জানতে চাইল।

তুমি?—আবার হাসল মোড়ল,—স্রেফ পাঁজিপুঁথি, যাগযজ্ঞি! সে সব কথা হবে একে একে। কত সৌভাগ্য আমাদের, তোমার পায়ের ধুলো পড়ল গাঁয়ে। তুমি বাস্তন, তুমি শুধু কুষ্টিবিচার করবে, হাত দেখবে। বামুন মানেই জ্যোতিষী আর গণৎকার। তবে হ্যাঁ, একটা কথা। এটা কালীর থান। তোমার হাতেই থাকবে সব। মারণ-উচাটন-বশীকরণ বলো, কবচ-মাদুলি-ঘুন্‌সি বলো, জলপড়া-বাটিপড়া-বেড়িধরা যাই বলো,—সব তুমি।

আমি ত এসব জানিনে?

হাসিতে আবার ফেটে পড়ল মোড়ল। তারপর অধীর উল্লাসে বলল, তুমি জান না ত জানে কে ঠাকুর? তোমাকে যে এবার চিনেছি। তুমি দরিদ্র্য বাস্তনের বেশ ধ'রে এসেছ নারায়ণ—তুমি যে ছলনাময় ঠাকুর!

জলযোগ শেষ করে ছদ্মবেশী নারায়ণ পাতে প্রসাদ রেখে এবার উঠলেন। পিছনের ঠাণ্ডা ঘরটায় তাঁর জন্য বিছানা ও তাকিয়া। তিনি যখন এসে বসলেন, তখন একটি মেয়েছেলে বড় একখানা হাতপাখা নিয়ে আগে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল, তারপর পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণরূপী নারায়ণকে হাওয়া করতে লাগল। কিন্তু তখন বাইরের দিকে কল-কোলাহল আরম্ভ হয়ে গেছে নারায়ণের প্রসাদ কাড়াকাড়ি নিয়ে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব কিছু বিলম্বিত হয়ে। তার আগে আরেকবার মোড়ল এসে ঢুকল। বলল, ওরে ক্ষেন্তি, তুই এখন পালা, পাখাখানা দিয়ে যা।

ক্ষেন্তি যাবার পর বুড়ো দরজাটা একটু ভেজিয়ে দিল। তারপর বাতাস করতে করতে বলল, যা বলছিলাম, ঠাকুর। তুমি শুধু টিকি রেখে মাথার চুল ফেলে দেবে। তারপর নামাবলী আর ছোপানো কাপড়। কেষ্টপুর থেকে ভাঙড়—তোমার হাতের মুঠোয় থাকবে। খবর একবারটি রটলে দশ হাজার শিষ্যি-সেবক। বছরে মাথাপিছু একটাকা গুরুপ্রণামী। তোমার ভাবনা থাকবে কিছু? শূলী-মোহান্ত হ'ল গোড়ায় জেলে-কৈবর্ত। তুমি হ'লে জাতকেউটে, বর্ণশ্রেষ্ঠ বাম্ভন। তোমার পিতিষ্ঠে আমরা সবাই করব। তোমার ত শাক্তমত, শৈব আচার। হ্যাঁ, সব জানি। শূলী-মোহান্ত বাবাজী আফিং সেবা করে, তুমি কেন যাবে সস্তার কারবারে?

ছেলেটা একান্ত আগ্রহে মোড়লের সদুপদেশ ও পরামর্শ শুনছিল। এবার বলল, দামী কারবারটা কেমন?

শোনো কথা ঠাকুরের!—মোড়ল বলল, বুঝলে না? আমরা হলুম সহজিয়া দলের লোক, আমাদের সব সহজ! আসলে ত বোষ্টম গো। বাউলরা ত আমাদেরই ঘরের লোক! তোমার কিছু ভাবনা নেই, ঠাকুর। মেয়েরা আছে আখড়ায়, বাদামী ভাঙ বেটে দেবে তোমার। ওই যে বোটে এল ওরা সবাই, ওদের কোঁচড়ে-কোঁচড়ে গাঁজা আর চরস। যত চাও তুমি, যখন-তখন পাবে!

ওসব খায় কেন?—ছেলেটা প্রশ্ন তুলল।

আহা, এঁকেই বলে অজাতশত্তুর বাম্ভনকুমার!—মোড়ল বলল, বলি, ছোট-কল্‌কের ছ্যাদা ছোট কেন বল ত নারায়ণ? তিনি যে ছোট্টটি হয়ে আসেন! তিনি যে চিরশিশু! শৈব-শক্তি-সহজিয়া—সব তিনি! তার আগে শুধু ধোঁয়া, ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকেই ত তাঁর আবিব্‌ভাব, ঠাকুর। যাই দেখি এবার ভোগ রান্না কতদূর হ'ল।

মোড়ল বাইরে গেল।

ভয়-ভয় করছে ছেলেটার। সে এসেছে এক উদ্দেশ্য নিয়ে, কিন্তু এটা অন্যপ্রকার। এ যেন অক্টোপাসের ফাঁদ, চারদিক থেকে বেষ্টন করছে তাকে। কিন্তু এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় প্রস্তাব,—দশ হাজার শিষ্য! বছরে দশ হাজার টাকা! ২৪ পরগণায় এক লাখ শিষ্য ধরে নিতে কতক্ষণ? অর্থাৎ বছরে এক লাখ টাকা! মঠ, মন্দির আখড়া, আশ্রম,—এরাই ত সৌভাগ্য সৃষ্টির পথ! লোকটা বলছে ভাল। নেড়ামাথায় টিকি থাকবে—থাক্ না কেন? নামাবলী, গেরুয়া, পায়ে খড়ম, হাতে অঙ্গুরীয়, গলায় শোধন করা কণ্ঠী!

ছেলেটার বিশ্বাস, ওকে মানাবে ভাল! তবে ওই গোটা চার-পাঁচ নেশা—আফিং গাঁজা ভাঙ চরস তামাক, এগুলো তা'র মামার কল্যাণে তা'র কাছে নিতান্ত অপরিচিত নয়! তা ছাড়া মামা এখন কাশীবাসী। বাবা বিশ্বনাথ ওইগুলো দিয়েই তাঁকে ভুলিয়ে রেখেছেন। নইলে তিনি এতদিন এলাহাবাদ হাইকোর্টে এক নম্বর মামলা ঠুকতেন। আসল কথা, ছেলেটা সেদিন ভয় পেলেও যেন ভরসা হারাল না। আর যাই হোক সে বেরিয়েছে ভাগ্য অন্বেষণে। ইংল্যাণ্ডের অবাধ্য ছেলেরা ভাগ্য অন্বেষণে যায় অস্ট্রেলিয়ায়,—দশ হাজার মাইল দূর। পিণ্টু গিয়েছে নিউ ইয়র্কে। পাতুরা যাচ্ছে লণ্ডন। মিমিরা বোধ হয় চলল ডেট্রইট, মিসিগানে। সে ত রয়ে গেল কলকাতার কাছাকাছি। অতই বা ভয় কিসের!

মধ্যাহ্ন ভোজের বর্ণনায় আর কাজ নেই। প্রথম পাতে ছিল খাঁটি গাওয়া ঘি, শেষ পাতে ঘন খাঁটি দুধের সঙ্গে হিমসাগর আম আর চাটিম কলা।

অতঃপর অপরাহ্ণের দিকে শোভারাম ওকে নিতে এল। এবার যেতে হবে।

শোভারাম ঘাটের দিকে যেতে যেতে বলল, ঠাকুরমশাই, আপনি আমাদের মান্য। শুনলেন ত জ্যাঠার কথা? উনি আপনাকে পিতিষ্ঠে করবেন!

ছেলেটা বলল, তা কি করে হয় শোভারাম? আমি এসেছি অন্য কাজে। তোমাদের সঙ্গে থেকে মাছের কারবার করব। তুমি বলেছিলে পঁচিশটি টাকা সঙ্গে আনতে। তাও এনেছি। না ভাই, ওসব কথা এখন থাক, গুরুপুরুতগিরি আমার দ্বারা হবে না।

শোভারাম হাসছিল, হাসতে হাসতেই ঘাটে এসে নামল। সামনে একখানা সরু ছিপ নৌকায় ওদেরই তিনজন লোক পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বসেছিল। শোভারাম আগে নৌকায় উঠে ছেলেটার হাত ধ'রে তুলে নিল। ওরা নিজেরাই লগি টেনে নৌকা ছাড়াল।

জানা যাচ্ছে না কোথায় যাচ্ছে নৌকা। তখন গোধূলিকাল, সূর্য সম্পূর্ণ ডোবে নি। চারিদিকে প্রাণীচিহ্নহীন একটা বিশ্বলোক যেন প্রতিভাত। ধূ ধূ করছে একধারে দিগন্তপ্রসার প্রান্তর, অন্যদিকে বনময় ছায়াচ্ছন্ন একটা ভূখণ্ড। এই নৌকার মোট পাঁচটি আরোহীকে বাদ দিলে অস্তিত্বলোকে আর কিছু নেই। পাখিরা বাসায় ফিরেছে।

কালো কালো ময়লা চেহারার লোক। প্রত্যেকেই ষণ্ডামার্কা। ওদের মাংসপেশী দেখলে দুর্ভাবনা আসে। এরা পরোয়া করে না পরিশ্রমের। বড়

বড় ভারী ওজনের বাঁক নেয় কাঁধে, বোঝা নেয় মাথায়, মাছ ভাত খায় প্রচুর, ঘুমোয় সাংঘাতিক।

অন্ধকার ছেয়ে আসছে চারদিকে। এদিকের খাল আবার একস্থলে দু ভাগ হয়েছে। ওরা বাঁক নিল বাঁ দিকে। ডানদিকে সেই শাখা স্রোত ছমছমে অন্ধকারে দূরে গিয়ে কোথায় যেন বিবাগী হ'য়ে গেল। বাঁদিকের খাল আবার এক সময় দু'ভাগ হয়ে এক সঙ্কীর্ণ নালা পথে ঢুকল। নৌকা যেন ডুবে গেল দুধারের ঝোপ-ঝাপড়ার মধ্যে। ওরা এবার হাত দিয়ে বাইতে লাগল।

ভীত কণ্ঠে ওই অন্ধকারেই ছেলেটা বলল, এ কোথায় আনলে শোভারাম?

এই যে ঠাকুর মশাই এই আমাদের 'আলা'।

আলা!

হ্যাঁ, এ হ'ল মুক্তোরামের ভেড়ি। ওর নামডাক খুব। এখানেই উঠি আমরা।

নৌকা রাখল পাড়ের গা ঘেঁষে। পাড়ে উঠে ওরা ছেলেটার হাত ধ'রে তুলে নিল। উঠেই সে দেখল দিগন্তের দরজা যেন সকল দিক থেকে ওর চোখের সামনে হঠাৎ খুলে গেছে। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না কিন্তু ঠাহর ক'রে সে দেখল, সে দাঁড়িয়ে রয়েছে দিক্‌চিহ্নহীন বিশাল এক সমুদ্রের তীরে,—ক্ষণে ক্ষণে যে-সমুদ্র ঝড়ো বাতাসে উর্মিমুখর হয়ে উঠছে।

এবার সেই 'আলা'। আলা মানে আলয়, এই প্রথম সে জানল। একটি মাত্র গোলপাতার ঘর, সেই ঘরটি দুলছে ঝড়ের হাওয়ায়। এ ঘর মুখ থুবড়িয়ে পড়বে যে কোনও মুহূর্তে! ওরই মধ্যে ঢুকে ওরা কেরোসিনের কুপি জ্বালল। ছেলেটা ভিতরে এসে দাঁড়াল।

ঘরে একখানা ন্যাড়া তক্তা, তার ওপর প্রেতমুণ্ডের মতো ময়লা একটি বালিশ। মেঝের এক কোণে কালিঝুলি মাখা একটা মাটির হাঁড়ি, একখানা কালো তৈলাক্ত কড়াই। তারই কাছে খান দুই চটা ওঠা কলাইয়ের থালা। একটা বড় পোঁটলা রয়েছে একপাশে। কেরোসিনের কুপির শিখা ছাড়িয়ে শিস উঠছে গলগলিয়ে।

সেদিনের সেই তরুণ যুবক আজকের আমি নই, এবং আমার মধ্যেও সেই ছেলেটার অস্তিত্ব যেন আর খুঁজেও পাচ্ছিনে। সে যেন কবে কোথায় হারিয়ে গেছে খোঁজ করি নি। তবু তাকে দেখছি আজ খুঁটিয়ে। সে অজ্ঞান, সে মূঢ়, সে বেহিসেবী, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। কিন্তু বিচার করলে দেখা যেত, সে এনেছিল একটা উদ্দাম প্রাণশক্তি, কেমন যেন একটা অজেয় অধ্যবসায়, একটা

অফুরন্ত অনুপ্রেরণা। যে প্রতিভা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সৌভাগ্যকে জয় ক'রে আনে, লক্ষ্মীর বরপুত্রে পরিণত করে—সেই প্রতিভা তা'র কিছু ছিল না। তাই আবার বলি, সে নিজে কিছু করছে না, তাকে অন্তরাল থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার নিয়তি,—একটা অন্ধ অদৃশ্য শক্তি!

ও বাইরে এসে দাঁড়াল। ওর সমগ্র ভবিষ্যৎ, ওর কর্মজীবন, ওর ইহলৌকিক সমস্ত উচ্চাভিলাষ, এ আলার মধ্যে বাঁধা রইল। ও ছেড়ে দিল সংসার, বন্ধু-সমাজ, আত্মীয় পরিজন। ওই সমুদ্রের সীমানায় দাঁড়িয়ে ও বোধ হয় কাঁদছিল। কিন্তু বাইরে ওর কান্নার চিহ্ন নেই। না চোখের জল, না ডুকরানো, না এতটুকু শব্দ। ও শান্ত, অবিচল, দৃঢ়চিত্ত। কিন্তু আমি জানি, ও কাঁদছিল ভিতরে ভিতরে। ওর সেই ভিতরে আমি আজও বাসা বেঁধে আছি। ওর প্রকৃতির তলায় তলিয়ে থাকত একটা নিষ্ফলতার নৈরাশ্যবাদ। মাঝে মাঝে ভ্রম হয়, ও যেন উঠে এসেছে বেদান্তবাদের স্ফুলিঙ্গ সঙ্গে নিয়ে। হাত বাড়িয়ে সর্বাগ্রে যেটা ধরতে যায়, সেটাতেই ওর প্রথম নিস্পৃহা। আমি ঠিক জানি উপরের ওই অন্ধকার তারকাখচিত গগনলোক দিগন্তের যে সমুদ্ররেখার তলায় ডুবেছে, সেইদিকে নিশ্চল ও নিঃশব্দে তাকিয়ে ও কাঁদছিল বুকফাটা কান্না!

দুর্যোগ বা বর্ষার ঝড় নয়,—এক প্রকার প্রমত্ত বিপ্লবী বাতাসের অস্থিরতা। বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ওই ঘরে ঢুকেছে মোট ছয়জন—তা'কে নিয়ে। শোভারাম, মদন, শশধর,—আরও যেন কে কে। একজন কে যেন কি একটা হাতে নিয়ে এবার বেরিয়ে এল। বলল, ঠাকুরমশাই, মাছ ভাজা, মাছের ঝোল আর ভাত। এবার জবাব দিলুম, এ ত খুব ভাল।

আপনার অসুবিধে হবে বইকি। তবে নুন-মসলাপাতি সঙ্গেই এনেছি। মিষ্টিজলও আছে দু'কলসী।

মিষ্টি জল মানে?

লোকটা বলল, এখানে যে সব নোনা! এর নাম বাদা। এখানে জল কেউ মুখে দেয় না।—এই ব'লে সে এগিয়ে গেল, কতটা দূরে গিয়ে জলের ধারে দাঁড়িয়ে পুনরায় বলল, তবে এই যে বাঁধটা দেখছেন, এটা আমাদের নিজের। এটার জল্ একটু খরা, তবে আমরা খাই মধ্যে মাঝে।

লক্ষ্য করি নি অন্ধকারে। লোকটা তিন চার মিনিটের মধ্যেই পর পর গোটা চারেক মাছ টপাটপ ছিপ দিয়ে গেঁথে হেঁচকা দিয়ে তুলল। এ যেন পোষা মাছ, যখন তখন কথা শোনে। ওর মধ্যে একটা মাছ বঁড়শির থেকে খুলে লোকটা আবার জলে ফেলে দিল। বলল, না, ওটা নেব না। বড্ড কাঁটা—

কী মাছ ওটা ?

ওর নাম আমলেট, ঠাকুরমশাই—এ কথা কয়টা বলতে বলতেই সে আর একটা মাছ গেঁথে তুলল। হাঁ, এ মাছটা বড় বাটা, এতেই হবে।

ওর সঙ্গে সঙ্গে অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে আমিও ঘরে এসে দাঁড়ালুম। কাঠের ধোঁয়ায় ঘরখানা ভরে গেছে। উহুনে ভাত চড়েছে। আমি বললুম,শশধর, আমাকে ওই ছোট বঁটিখানা দাও, আমি মাছ কুটে হলুদ মেখে দিই। দাও—

কী যে বলেন ঠাকুরমশাই ?—ওরা সবাই হেসে উঠল,—আপনি বাম্ভন, মাথার মণি,—আমরা সেবাদাস। এ কি আপনার যুগ্যি ?

কথাগুলি শুনতে ভাল, আত্মাভিমানে সুড়সুড়ি লাগে। কিন্তু এর জন্য আমি আসি নি। ওদের মধ্যে মিলিয়ে যাব, ওদের সঙ্গে একাকার হব, সেই আমার একমাত্র পরিচয়। আমি লেখাপড়া জানি, আমার উচ্চ বর্ণ, আমি নিচের তলায় নামতে শিখি নি, অপরিচ্ছন্ন জীবনের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারিনে, —এসব আমার গৌরব নয়। আমি গরীব, আমি ভাতকাপড়ের সংগ্রামে নেমেছি, আমার সমস্ত জীবন ঘামে রক্তে আর চোখের জলে কর্দমাক্ত হয়ে উঠুক সেই আমি চাই! না, আমি এখানে খাতির নিতে আসি নি, বামনাই আমার পেশা নয়,—সভ্যনীতি, শিক্ষাভিমান, শহুরে চাকচিক্য, পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য—ওসব আমার জন্য নয়। আমি নেমেছি জীবন সংগ্রামে। আমি চাই রোজগার। সেই রোজগার আমি মায়ের হাতে তুলে দেবো।

একে একে ভাত, মাছ ভাজা আর মাছের ঝোল রান্না হ'ল। এবার আমার আড়ষ্টতা ঘুচেছে। গায়ের গেঞ্জিটা খুলে ফেললুম। পরে এগিয়ে এসে বললুম, সরো তোমরা। আমি ঠুঁটো জগন্নাথ নই, শোভারাম। আমি তোমাদের ভাত বেড়ে দেবো।

ঠাকুরমশাই, আমরা যে পাপে ডুববো।—ওরা হকচকিয়ে গিয়েছিল।

ডুবে গেলে আবার তোমরা উঠবে, ভয় কি ? কিন্তু আমি বিনা মেহন্নতে তোমাদের ঘাড়ে চ'ড়ে থাকব, এ আমার অপমান।

আমি ওই হাঁড়ি কড়াই আর থালা বাটির মাঝখানে মেঝের উপরে চেপে বসলুম। খান চারেক কলাইয়ের থালা আর কলার পাতা সাজালুম ওদের সামনে। শোভারাম চেঁচিয়ে উঠল, ঠাকুরমশাই, মোড়ল কাকার কানে যদি একথা ওঠে, তাহলে আমাদের আর রক্ষে থাকবে না।

হই চই ক'রে আমরা সবাই হেসে উঠলুম।

লাল রংয়ের বুকড়ি চা'লের গরম-গরম ভাত, মাছ ভাজার পরে মাছের

ঝোল,—উপাদেয় আহার। ছয়জন মিলে অন্তত দেড় সের মাছ উঠল। আমি হিসেব জানি। মাছ অন্তত আট আনা। তা ছাড়া সবাই মিলে কমসে কম সের তিনেক চা'লের ভাত খেল। তিনসের চা'লের দাম আজকাল কমপক্ষে চার আনা।

আহারদির পর থালা-বাসন ধোওয়া, এঁটো পাড়া, ঘর নিকানো ইত্যাদির পর আমি বললুম, মনে রেখো মদন, আমি বামুন হলেও রাঁধুনি বামুন! তোমরা যোগাড় দিয়ো, আমি দু'বেলা রাঁধব। ওসব আমি জানি। আর শোনো শোভারাম, তুমি আমার মূলধন চেয়েছিলে পঁচিশ টাকা। এই নাও, এ টাকা তুমিই রাখো।

টাঁ্যাক থেকে পঁচিশটে টাকা বার করে শোভার হাতে দিলুম। সিকে পাঁচেক শুধু আমার হাতে রইল।

এতক্ষণে সম্পর্কটা যেন অনেকটা সহজ হ'ল। ওরা চেয়েছিল ব্রাহ্মণ সন্তানের জাত মান বাঁচাতে, চেয়েছিল আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে! ওরা এখনও শোনে নি আমি মিশনরি ইস্কুলে মানুষ। খৃষ্টান, মুসলমান, পার্শি, বৌদ্ধ, হিন্দু—সব সমাজের ছেলেদের সঙ্গে পড়েছি, খেলেছি, এক পাতে খেয়েছি,—কিন্তু জাত মান খোওয়া যাচ্ছে কিনা কেউ বলে নি। আজও যখন গুলু ওস্তাগর লেনের তরুণ উকীল সোফিয়ার রহমনের স্ত্রী লুৎফন্নেসা বউদিদির কাছে মাঝে মাঝে খাবার খেতে যাই, তখন তিনিও একবারও বলেন না, খোকা এবার তোর জাতধর্ম সব গেল। না, কেউ বলে না। ডাফ চার্চের চৌধুরীরা বলে না, পার্শিদের গজদার আহমেদ বলে না, বৌদ্ধ বীর-বাহাদুর বলে না,—কিছুই কেউ বলে না। আমি ওদেরই একজন। ওদের বাইরে আমি নই।

ঘরে কোথাও জানলা বা দরজার কপাট নেই। ভিতর-বাহির এক হয়ে সব হু হু করছে। চোর আসে না, ডাকাত পড়ে না। রৌদ্র, বৃষ্টি ও শীত—এই তিনের থেকে শুধু মাথা বাঁচানো। এ গৃহস্থ ঘর নয়।

দুজন বাইরের মাঠে কি ভাবে শুয়ে পড়ল আমি দেখি নি। ওরা ঘুমোবার আগে গাঁজা টেনে নিচ্ছিল। ওদের মধ্যে একজন দমভোর ধোঁয়া টেনে উচ্চ-কণ্ঠে গান ধরেছিল, "মানুষ-রতন চিনল না রে, গেলো পুতুল পুজে জনম গো ভাই—"

ঘরের মধ্যে নিকানো মেঝের উপর শুয়ে পড়েছে শোভারাম ও আরেক জন। আমি শুয়েছি তক্তার ওপর। কিন্তু ময়লা বালিশটা মাথায় দিতে পারি নি, এত দুর্গন্ধ। নিজের গামছাখানা পুঁটলি পাকিয়ে নিয়েছিলুম।

বেশিক্ষণ নয়, হয়ত বা মিনিট দশেক। তারপরেই একে একে ওদের নাক ডেকে উঠল। সেজো মাসিমার নাকডাকা শুনেছি, আস্তাবলের ছকুমিঞার নাক ডাকা জানি। এ কিন্তু অন্য প্রকার গর্জন। বাইরে গোঁ গোঁ করছে ঝড়ো হাওয়া, মাঝে মাঝে মড় মড় শব্দে দুলছে এই খড়ের চালা। কিন্তু ওরা নিশ্চিন্ত, এ ঘর ভূমিসাৎ হবে না!

ঘরখানা কখন্ মড়মড়িয়ে আমার নাকের উপরেই ভেঙে পড়বে, এই কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় আমারও চোখে ঘুম এসেছিল। সেই ঘুম কতক্ষণের কিছু মনে নেই।

এক সময় হই-হল্লা উঠল বাইরে। ওদের চেঁচামেচি শুনে আমরাও জেগে উঠলুম। এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে, তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার।

যেখানে যা ছিল, পিছনে প'ড়ে রইল। ওদের নেশা কেটেছে, প্রয়োজন মতো ঘুমিয়েও নিয়েছে। ওদের পিছনে পিছনে আমিও ঘাটে নেমে এলুম।

এবার দেখি দুখানা ছিপ নৌকা দড়ির খোঁটায় বাঁধা। একখানায় অনেক-গুলো মাছের ঝোড়া জালে আটকানো। শোভারাম অন্ধকারে আমার হাত ধরে ছিপে তুলে নিল। পর পর দুখানা ছিপ চক্ষের পলকে ছেড়ে দিল সরু খাল থেকে বেরিয়ে চওড়া খালের দিকে।

রাত সাঁ সাঁ করছে। কত রাত আমি জানিনে। হয়ত দেড়টা কি দুটো। কিন্তু ওরা ঠিক জানে রাত কত। কৃষ্ণপক্ষের শেষ প্রান্তে যে ক্ষতচন্দ্র দেখা দিয়েছে পূর্বাকাশে,—যার আলো নেই, অথচ আছে এক ভৌতিক আভা,—ওরা তার থেকে রাত্রির হিসাব জানে! কিন্তু আমার চোখে তখনও ঘুম কাটে নি। কোমরে গামছাখানা বেঁধে খালি গায়ে সরু পাটাতনে বসে আছি কোনও মতে,—শুধু ঝুড়িগুলোর দুর্গন্ধে একটু অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল।

সেই সেদিনকার খালের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল পৃথিবী, সভ্যতা ও কলকাতা শহর। ছিপ দুখানা বেশ ছুটে চলেছে এ-খাল থেকে ও-খালে। আমি দুঃখিত, লগি আমার হাতে দিচ্ছে না। আমি লজ্জিত, ওদের মতো কঠিন দানবীয় স্বাস্থ্য নিয়ে ছোট ছোট দাঁড় বাইতে পারছিনে। তীরবেগে এবার দুখানা ছিপ পর পর ছুটে যাচ্ছে। উপরে শুধু এক-আকাশ তারা। আমাদের দুপাশে শুধু অন্ধকার বনজঙ্গল।

ঘণ্টা দেড়েকের বেশি নয়। আমাদের ছিপ দু'খানা অতি দ্রুতগতিতে বড় জলার দিকে এসে পৌঁছল। তখন আমরা দেখতে পেলুম বড় বড় আলো এবং ক্রমে অনেক মানুষের আওয়াজ। এ যেন নতুন এক জগতের দ্বার খুলছে

চোখের সামনে। ওরা এবার দেখিয়ে দিচ্ছিল সেই রাত্রের বিস্তীর্ণ বিশ্বের নিচে এক একটা জলরাশির পরিচয়,—এই যে দেখছেন এটা শিরিশ সাঁপুইয়ের ভেড়ি, ওটা সরকারদের। এগিয়ে আসছে ওই যে বেলেঘাটার নস্করদের ভেড়ি। এবার আসছে কার্তিক দাসের ভেড়ি।

অত আলো জ্বলছে কেন ওদিকে?

হা হা হা হা,—ঠাকুরমশাই এখনও দেখতে পায় নি! ওই ত সব মাছ মারছে! দেখছেন না জাল তুলছে, ঝুড়ি ভরছে সব?

চোখে তখনও আমার ঘুম জড়ানো। ছিপ দুখানা আরও অনেকটা এগিয়ে এসে থামল একখানে। বোধ হয় শত শত ছিপ জড়াজড়ি করে রয়েছে খাল-বিলের ধারে ধারে। ওরা দুড়দাড় করে নামল ঝুড়ি নিয়ে। একজন শুধু রইল ছিপ আগলিয়ে। আমি ছিপ ছেড়ে ঘাটে উঠে এলুম।

চারিদিকে বড় বড় কারবাইডের আলো বাঁশের ডগায় বাঁধা। ইতর ভদ্র মানুষের প্রবল ভিড় সর্বত্র। সেই কোলাহল আর হট্টগোলের মধ্যে চিৎকার করে নিলামের ডাক পড়ছে। শেষ রাত্রির এই সময়টুকু ওদের পক্ষে কম। নোনা জল থেকে তোলা তাজা মাছ—এ মাছ এখনই পাচার করা দরকার। নইলে এই প্রচণ্ড গরমের দিন, দু'চার ঘণ্টা এদিক ওদিক হ'লে মাছে পচ ধরবে। এই তাড়াহুড়োয় সবাই দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য। মাছের ঝুড়ি ভরছে শত শত—তার মধ্যে পার্সে, ট্যাংরা, কাঁকড়া, বাগদা, ভাঙুই, বাটা, কাৎলার পোনা, সরলপুঁটি, ভেট্‌কির ছানা, বাণমাছ, আমলেট্—এগুলি লাফাচ্ছে সেই উজ্জ্বল আলোয়। সব মাছ মিলিয়ে ঝুড়ি। প্রত্যেকটা ঝুড়ির স্ট্যাণ্ডার্ড মাপ আছে। দশ, পনেরো, বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ—ইত্যাদি সেরের মাপে ঝুড়ি। নিলামের ডাকে যে ঝুড়ির দর যেমন ওঠে। সেইজন্য চিৎকার উঠছে চারদিক থেকে। সমস্ত ব্যাপারটা নগদ কারবার।

ঠাকুরমশাই, ও ঠাকুরমশাই,—এদিকে—এদিকে এগিয়ে আসুন। এখানে মাল কিনছি—

শোভারাম চিৎকার করছিল দূর থেকে।

ভাল ক'রে কিছু ত'লিয়ে বুঝবার চেষ্টায় আমি এগিয়ে দেখি, একসঙ্গে শোভারামের দল অনেকগুলো ঝুড়ি নিলামে আটকিয়ে ফেলেছে। ওরা গার্ড দিচ্ছে ছোট বড় প্রায় ত্রিশটা ঝুড়ি আগলিয়ে। শুনলুম প্রায় ষোল সতেরো মণ মাছ। এদিকে ওরা মোট বারো জন। আমাকে নিয়ে তেরো।

পঞ্চু বলল, ঠাকুরমশাই, হিসেব হবে পরে। আপনার আছে তিন ঝুড়ি।

মদন, তোল্—দেরি করিসনে। এই শশধর—ঝুড়ি তোল্। তুমি এখানে দাঁড়াও ঠাকুরমশাই, নইলে ঝুড়িকে ঝুঁড়ি সাফ—

সময় নেই কারও। সবাই ছুটছে, সবাই চেঁচাচ্ছে। ওই এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টার মধ্যে যে অদ্ভুত ধরণের অশ্লীল কটূক্তি ও ইতর ভাষার প্রয়োগ চলছিল পরস্পরের প্রতি,—সেগুলি নিয়ে একখানা অভিধান তৈরি করা চলে।

একটি দুটি চারটি—এইভাবে সব ঝুড়িগুলো গিয়ে উঠল ছিপ-নৌকায়। কিন্তু আমার চোখ এড়াল না সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে চুরি, তঞ্চকতা, কারচুপি, জালিয়াতি, ধাপ্পা এবং অসাধুতা—সমস্তই মিলে মিশে রইল। ভেড়িগুলোর মালিকপক্ষে রয়েছে ফড়ে, দালাল, ঘুষখোর, বশম্বদ, চাটুকার—সব শ্রেণীর লোক। মাঝে মাঝে ওদের আলাপচারী আমাকে হতবুদ্ধি করে দিচ্ছিল।

পরপর চারখানা ছিপ ছাড়ল শোভারামের দলের। সেগুলো শুধু দ্রুতগতি নয়, তীরগতিতে ছুটে চলল উত্তর খালের পথে। তখন পূবদিকের আকাশের প্রান্তে প্রথম উষা চিকচিক করছে। সমস্ত বিশ্ব চরাচর তখনও অন্ধকার। ভরা গ্রীষ্মকালের সেই অস্পষ্ট উষার মধুর স্নিগ্ধ বাতাস যেন মানুষের সমস্ত দুর্গন্ধ ও মালিন্যকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ছিপ ছুটেছে নক্ষত্রবেগে। কলকাতার লক্ষ লক্ষ লোক যখন নিদ্রায় অচেতন, তখন আমরা যাচ্ছি তাদের জন্য মাছের ঝোল-ঝালের ব্যবস্থা নিয়ে। আমাদের পক্ষের চারখানা ছিপে অতগুলো ঝুড়ি-ঝোড়ার সঙ্গে চলেছে চোদ্দ-পনেরো জন। এটি ওদের জাত-ব্যবসা। ওরা চিরকাল ধরে বংশ-পরম্পরায় এই কাজ করে চলেছে। ওরা জেলের দল।

আমরা যাচ্ছি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। প্রত্যূষের কিরণচ্ছটায় এখনও রং ধরে নি। যে গতিতে আলো ছুটে আসছে পৃথিবীর আকাশের দিকে, আমাদের ছিপগুলো তারও চেয়ে দ্রুততর। এ যেন প্রচণ্ড প্রাণশক্তির খেলা, যৌবনশক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

কেষ্টপুর ছাড়িয়ে চলে যাবার পর দু' একটা পাখির কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। নারকেলতলার পাশে সেই গ্রামখানার ঘুম এখনও ভাঙ্গে নি। দূর থেকে কলকাতার কয়েকটা আলো চিকচিক করছে। আমাদের নৌকাদলের সামনে ও পিছনে আরও বহু নৌকা ছুটে যাচ্ছিল।

এক সময়ে বললুম, পঞ্চু, শোভারাম আর মদনকে দেখতে পাচ্ছিনে যে? ওরা কি পেছনে আসছে?

পঞ্চু বলল, ঠাকুরমশাই, আপনি এখনও জানতি পারো নি। ওরা সব

ছড়িয়ে গেছে। রাসমনিবাজার বেলেঘাটা দিয়ে ওরা গেছে সেই ভবানীপুর আর কালীঘাটে। শিয়ালদা গেছে অন্যদল। আমরা যাচ্ছি পাতিপুকুর ঘুঘুডাঙ্গা হয়ে বরানগর। শিয়ালদা থেকে মাছের টুকরি ছড়িয়ে যাবে পটলডাঙ্গা, বউবাজার, ছাতুবাবুরবাজার কাশীপুর—সবখানে। হাজার মণ মাছ ঘুরবে, ঠাকুরমশাই। এছাড়া জাওয়ালি আছে, গোয়ালন্দ আর অন্নপূর্ণা ঘাটের ইলিশ আছে। তবে কি জানেন ঠাকুরমশাই, ইলিশে লাভ নেই। দু' আনা ছ' পয়সা দরের ইলিশ, ওতে লাভ কম। তবে হ্যাঁ—

উষার কনক কিরণ চিকচিক ক'রে উঠেছে। খাল এখানে আবার দু' ভাগ হয়ে গেল। আমাদের দলের খানচারেক নৌকো এসে লাগল পুলের তলাদিয়ে উল্টোডিঙ্গির এক ঘাটে। এরই মধ্যে ভিড় জমেছে মেছুনি আর পাজারিদের। বড় বড় দাঁড়িপাল্লা এসেছে। দশ সের মাছ কিনলে পাঁচ পোয়া ফাউ দিতে হবে—এটাই রীতি। শশধর এক সময় আমাকে ধরিয়ে দিল, ঠাকুরমশাই, তিন টুকরিতে আপনার মাছ আছে মোট একমণ দশ সের। হিসেব ঠিক রাখবেন। আজকে টান আছে বাগদার, পাঁচ আনার কম বড় বাগদা ছাড়ব না!

বললুম, সব মাছ ত ঝুড়িতে মিশে আছে একসঙ্গে। কোনটা কত, তুমি জানবে কি করে?

ঘাটে মাল নামাতে নামাতে শশধর বলল, ঠাকুরমশাই, ঝুড়ি দেখলেই ওরা চিনবে। দশ সের বাগদা জল খাবে প্রায় তিন সের। ওদের লাভ ওইখেনে।

হট্টগোল আর কোলাহলে ঘাটের ধার মুখর। সেখানে বড় পাল্লায় ওজন নিয়ে চেঁচামেচি আর ফাউয়ের পরিমাণ নিয়ে কলহ-কচকচি। মেয়েছেলের মুখে অশ্লীল ভাষা শুনে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। তিন টাকার টুকরি পাঁচ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সাত টাকার টুকরি বেচলো বারো টাকায়। ওর মধ্যে যে ফাঁকি সে জেলেরা জানে। পাজারিরা ঠিক জানে লাভ কোথায়। আমি একটু সরে গিয়ে দূরে দাঁড়ালুম। তখন প্রভাতকাল। বোধ হয় যেন পাঁচটা বাজে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শূন্য ঝুড়িগুলো আবার উঠল নৌকায়। পরে ওগুলো যাবে স্টীমবোটে। ঘণ্টায় একখানা স্টীমবোট ছাড়ে। এবার জেলেদের কাজ প্রায় শেষ হল। এখন থেকে শুধু ফড়ে, পাজারি আর মেছুনি। ওরা মাছ খাওয়াবে কলকাতা আর শহরতলীকে।

এক সময় পঞ্চু আমার হাতে সাতটা টাকা দিয়ে বলল, আপনার এগারো টাকার মাছ আঠারো টাকায় ছেড়ে দিলুম, ঠাকুরমশাই। কিন্তু আপনার মূলধনের পঁচিশ টাকা ঠিকই রইল! এটা আপনার লাভের কড়ি!

না বাড়ী আর ফিরব না। বাড়ী ফিরলেই ত—সেই দারিদ্র্য, অভাব আর অনটন। সেই আশাহীন উদ্দেশ্যহীন দিনযাপনের দৈনন্দিন গ্লানি। যেন সবটাই নিরানন্দ দিয়ে ঘেরা।

তবু গৃহত্যাগের পর সপ্তাহ তিনেক বাদে একবার একবেলার জন্য মাকে দেখতে গিয়েছিলুম। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে হাতে জমেছিল প্রায় একশ' টাকা। ওটা লুকিয়ে মায়ের হাতে দিয়ে খপ্ করে একবার তাঁর পায়ের ধুলোও নিয়েছিলুম। কিন্তু ওই সঙ্গে প্রায় টাকা তিনেক খরচ করে মায়ের জন্য একজোড়া কোরা থানধুতি এবং একখানা নামাবলী কিনে দিয়ে এসেছিলুম। জননীর চোখে সেদিন জল এসেছিল। আমার গায়ে শুধু ছিল ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি, পরনে নোংরা ধুতি, আর খালি পা।

পালিয়ে এসেছিলুম অপরাহ্নের দিকে। স্টীমবোট ধরে সোজা চলে এসেছি 'আলায়'। পথঘাট এখন আমার সব চেনা।

না, এই ভাল। এখানে নোঙর বাঁধা আছে জীবনের। এখানে দুবেলা মাছ ভাত, অবারিত স্বাধীনতা, শাসন-বাঁধন নেই কোনওদিকে। আমি ওদের চাল তেল নুন মসলা ইত্যাদি প্রায়ই কিনে দিই, ওদের রান্না করি, ওদের ভাষায় কথা বলি এবং ওদের মধ্যে মিলিয়ে থাকি। হ্যাঁ, এই ভাল। এখানে টাকার গন্ধে আমার নেশা লেগেছে। আমার লগ্নির পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে একশ' টাকা। আজকাল আমার অ্যাকাউন্টে মাছ কেনা হয় পাঁচ থেকে ছয় মণ। এই তিন মাসে আমি হাত-জাল কিনেছি একখানা, গোটা চারেক পলো কিনেছি। ঘন বর্ষার মধ্যে ছুটোছুটি করতে হয়, সেজন্য একটি ছাতা, পরনের ধুতি গেঞ্জি, কলকাতায় যাবার জন্য একজোড়া নটবর দাসের মজবুত চটি। আমি টাকায় ভাসছি!

নিজেই আমি ছিপ নৌকো চালিয়ে যেতে পারি আজকাল। ডোঙা নিয়ে এপার ওপার হতে শিখেছি। এর মধ্যে একদিন গিয়েছিলুম কালীতলায়। মোড়ল আমাকে দেখে পাদ্যঅর্ঘ দিল। আমি যে বামুন, একথা এখানে এলে মনে পড়ে। আমার পায়ের ধুলো নেবার হিড়িক প'ড়ে যায়।

মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হচ্ছিল, ওরা আজকাল আমাকে মাঝরাত্রে ভেড়িতে নিয়ে যেতে চায় না কেন? আমি ব্রাহ্মণ, আমি লেখাপড়া জানা

লোক, আমি ওদের মধ্যে বেমানান—এসব কথা আমার কানে এসেছে। কিন্তু ওদের মনের কথা ছিল অন্যপ্রকার। শোভারাম সেইটিই একদিন আমাকে বলল।

—ঠাকুরমশাই, জেলে হয়ে জন্মাতে হয়, নৈলে জেলেকে চেনা যাবে না। মাছ ধরার কারবার আপনি পারবেন না, ঠাকুরমশাই—

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। দিন কয়েক থেকে ওদের কারবারে মন্দা দেখা যাচ্ছিল। বৃষ্টিতে মাছ তেমন ওঠে না। শোভারাম আলায় বসে আছে আজ তিনদিন।

আমি একটু উদ্বিগ্নভাবেই বললুম, কিন্তু তিন মাসে এসব কাজকর্ম আমি কি কিছুই শিখি নি, শোভারাম?

শিখেছেন ঠিকই। তবে দেখুন না কেন ঠাকুরমশাই, আপনার কাজ আমাদেরই চালিয়ে নিতে হচ্ছে। আমাদের লাইসেন্সে আপনি মাছ কিনতে পাচ্ছেন। চৌকিদার আপত্তি তুলছে।

বিশেষ সঙ্কোচের সঙ্গেই শোভারাম তার মনের কথা খুলে বলছিল। আমি চুপ করেই রইলুম। শুধু এক সময় বললুম, শোভারাম, আমি ভুলি নি। তুমিই আমাকে পথ দেখিয়ে একাজে নামিয়েছিলে।

তা অবিশ্যি বলতে পারেন, ঠাকুরমশাই।—শোভারাম জবাব দিল, তবে কিনা তখন ভেবেছিলুম, দু'চারদিনেই আপনার শখ মিটে যাবে।—বলতে বলতে সে নিজেই উঠে দাঁড়াল। বলল, আজ বাড়ি যাচ্ছি, আবার একদিন কথা হবে'খন।

বৃষ্টি ধরেছিল। শোভারাম ঘাটে গিয়ে ছিপ নিয়ে কালীতলার দিকে পাড়ি দিল। ও হ'লো মোড়লের এক সম্পর্কে ভাইপো। আমার মনে নানা সন্দেহ ছোঁক ছোঁক করতে লাগল।

ওরা হিসেব করে দেখেছে গত তিন মাসে আমার খাতে শ'পাঁচেক টাকারও বেশি আদায় হয়েছিল। আমি হলুম উট্‌কো একটা বাইরের লোক। এ যেন অনেকটা ওদের ভাগ থেকে কেড়ে নেওয়া! দেখতেই পাচ্ছি কেনাবেচার ব্যাপারে ওরাই সর্বময় কর্তা। আমার নিজের লাইসেন্স নেই, সুতরাং আমার কারবারটা ওরাই পরিচালনা করে। আমার নিজস্ব একখানা ছিপও নেই। অথচ ওদের ছিপ ওরাই তৈরি করে। আমি নৌকা নির্মাণ জানিনে। আমার পক্ষে লোকজন রাখা সম্ভব নয়, এটি সুস্পষ্ট। লোক রাখা মানে ভাগীদারকে ডেকে আনা। ভাগীদার মানে ওদেরই চেনা লোক। ওদেরই সঙ্গে তার

যোগসাজস থাকবে। এছাড়া আরও কথা আছে। গত কয়েক দিন থেকে লক্ষ্য করছিলুম,আমারই লগ্নির টাকায় মাছ কিনে ওরা লভ্যাংশ নিয়ে যাচ্ছে শতকরা ষাট টাকারও বেশি। আমি ক্রমশ যেন ওদের দয়ার পাত্র হয়ে যাচ্ছি।

এসব আমি জানি এবং কালক্রমিক অভিজ্ঞতায় ওদেরও প্রকৃত চেহারা অনেকটা জেনেছি। আমি বরং পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে ভেড়ি জমা নিতে পারি, কিন্তু জেলেদের অন্নে ভাগ বসাবার অধিকার আমার কোথায় ?

পর পর চারদিন শোভারাম এল না। কিন্তু তিন দিনের দিন অপরাহ্নের দিকে পঞ্চু এসে হাজির। পায়ের ধুলো নিয়ে সে বলল, পেটের রোগে ভুগছে শোভারাম,—আমাকে তাই পাঠিয়ে দিল।

বললুম, তোমরা মাছ মারতে যাচ্ছ না কেন ?

ওমা, যাচ্ছি ত—পঞ্চু বলল, আপনার কষ্ট হয় তাই সঙ্গে নিইনে আপনাকে! মোড়লের যে কড়া হুকুম, আপনার গায়ে না আঁচ লাগে।

পঞ্চু তার ট্যাঁক থেকে মোট পঁয়ষট্টি টাকা বার ক'রে আমার হাতে দিল। বলল, এ টাকা আপনার। শোভারাম পাঠিয়ে দিল।

এবার আমি বললুম, পঞ্চু, মোড়ল যাই বলুক, তোমরা আমাকে সঙ্গে নিচ্ছ না, এটা দুঃখের কথা। আমি তোমাদেরই লোক, একথা ভুলো না। আমিও জেলে, কেননা আমি জাল ফেলি। আমি রোজ রাত্তিরে তোমাদের সঙ্গে যাব এ আমার আনন্দ।

আচ্ছা, আমি শোভাকে গিয়ে বলি আপনার কথা।

পঞ্চু চ'লে গেল। বুঝতে পারা যাচ্ছে সে বেশিক্ষণ অন্তরঙ্গ আলাপ চায় না। আকাশ ধরেছে এখন। আলার বাইরে এক পা বাড়ালেই অবারিত সেই দিগ্‌দিগন্ত। সামনে থইথই করছে সীমানা চিহ্নহীন 'সমুদ্র'। তার ক্রোড়ভূমি রয়েছে এখানে এক আধ টুকরো। এই ক্রোড়ভূমিরই পূর্বাস্তে বিদ্যাধরী বুজে এসেছে নোনামাটি আর বালুতে। সেখানে একপাশে একখানা ড্রেজার মাঝে মাঝে বুঝি মাটি কাটে। পঞ্চাশ বর্গমাইলের মধ্যে মাত্র দু'খানা 'আলা'। একখানা আমার এই ঘর, অন্যখানা মাইল তিনেক দূরে। এই সমুদ্রেরই ভিন্ন নাম হ'ল পুরাকালের 'লবণহ্রদ'। এর সমস্ত জলই নাকি বঙ্গোপসাগরের! ইতিহাসের কোন্ পর্বে এক মহাঝঞ্ঝা ছুটে আসে দক্ষিণের সেই সাগর থেকে, এবং তারই তাড়নায় এক বৃহৎ জলোচ্ছ্বাস সুন্দরবন ভেদ ক'রে এতদূর পর্যন্ত এসে আছড়িয়ে পড়ে। এরই এক অংশের নাম 'বাদা', অন্য একটা অংশ 'মহিষবাথান'।

আমি একা, নিঃসঙ্গ। এ নিঃসঙ্গতা আমার পক্ষে নতুন। এখান থেকে শুধু আমি নয়, লক্ষ কণ্ঠের চিৎকারও দূরের কোনও জনপদে গিয়ে পৌঁছবে না। আমি নিতান্তই একা। আমিই আমার সঙ্গী।

নিজের মধ্যেই কথা ওঠে, একা ভয় করে না তোর? করে বইকি। আমি বরাবরই ভীরুপ্রকৃতি। চোর-ডাকাতের ভয়, ভূত-পেত্নীর ভয়, মামার দরুন সেই ছোটবেলাকার পিশাচের ভয়। ভয় আমার মৃত্যুর। ভয়—আমার সামনে যে জীবনটা প'ড়ে রয়েছে তাকে। আমাকে পথ দেখাবার কেউ নেই, তুলে ধরার মানুষ নেই, যদি কোথাও মুখ থুবড়িয়ে পড়ি, তবে নিজের শক্তিকে ভর ক'রেই উঠে দাঁড়াতে হবে।

ইতিমধ্যে খরচ করেছি কম নয়। তবুও এবার আমার টাকা জমেছে অনেক। বোধ হয় এখন সাড়ে চারশ' টাকার কাছাকাছি। গুনতে ভয় করে, কেন না এত টাকা এক সঙ্গে আমি দেখি নি! সব টাকাই আমার, ভাবতে গেলে গা ছমছম করে।

সেদিন সারারাত্রির প্রবল বৃষ্টির পর সকালে একটু রোদ দেখা দিয়েছিল। পলো দিয়ে আমি মাছ ধরছিলুম বাঁধের নালীর ধারে ব'সে। কিন্তু ওটার মধ্যে একটা খেলার আনন্দ ছিল। কাঁকড়া, বাগদা, ট্যাংরা ও বাটার ছানার সঙ্গে প্রায়ই উঠে আসছিল এক-একটা ঢোঁড়া সাপ। এগুলো জলঢোঁড়া, দেড় হাত থেকে দুহাত লম্বা। চক্ষের পলকে আমি পলোটা জল থেকে তুলে নিচ্ছিলুম। তারপর একগাছা বাঁকারির সাহায্যে সেই সাপটাকে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিচ্ছিলুম, সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছিল শঙ্খচিল। এই খেলা নিয়ে সারাদিন কাটানো চলে।

কাঁকড়ায় আমার দরকার নেই। বাগদাগুলো ছেড়ে দিচ্ছিলুম। ছোট ছোট দু'চারটে বাটা, একজনের পক্ষে যথেষ্ট।

মাছগুলো নিয়ে যখন উঠব, তখন দূরের থেকে আওয়াজ কানে এল, ঠাকুরমশাই?

মুখ তুলে দেখি দূর থেকে খালের পার দিয়ে আসছে আমাদের সেই ভাঙোড়ের 'বট-বাবাজি'। আমি হাত তুলে বুড়োর দিকে চেয়ে হাসলুম। পরনে তাঁর সেই গেরুয়া, কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ, পিছন দিকে ঝুঁটি বাঁধা চুল। দুটি জিনিস তার সঙ্গেই থাকে। একটি হল ভিক্ষার ঝুলি, অন্যটি তার একতারা। আমাকে সে মনে করে একজন পাকা সমঝদার। সেইজন্য অনেকদূর থেকেই সে তার বাউল গান ধরেছিল—"মনের মানুষ মনের মাঝে কর অন্বেষণ রে—" বুগ-বুগ বুগুং বুগুং—বুগ-বুগ—

আবার ধরল, "মনের মানুষ যথায় বিহারে/আট বন্ধ করে দেখ নিগম দ্বারে/তারে আগে চিনবে মন/দুদ্দু কয় শুনেই সারা হই আমি রে—" বুগ-বুগ-বুগুং বুগুং—

গাইতে গাইতে বট-বাবাজি কাছে এল।

এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে, বাবাজি?

আর যাব কোথায় বাবা? মেগে-পেতেই খাই পাঁচ জায়গায়, তাই আসি-যাই। কই, শশধর, পঞ্চু—ওদের দেখছিনে?

বললুম, ওরা ক'দিন আসছে না, আমিও অপেক্ষায় আছি। বাবাজি, এখানে আজ তুমি খাবে। আমি রান্না করছি—

বট-বাবাজি বলল, সে কি ঠাকুরমশাই, আমি যাচ্ছিলুম শূলী-মোহান্তর আখড়ায়, সেখানে রাধাষ্টমীর বরাত আছে। নাচ গান আছে আজ। কাল আবার এই পথ দিয়েই ফিরব।

বললুম, বেশ যাবে বইকি। তবে আমার এখানে চারটি খেয়ে যাও। আর ধরো দু'একখানা গান,—বেশ গলা তোমার বাবাজি। তুমি গান ধরো, আমি রান্না সেরে নিই।

ঘরে এসে বসল বট-বাবাজি। ঝুলি-ঝোলা রাখল, একতারাটা নামিয়ে রাখল এক পাশে। বললুম, বড্ড মাছি। মশারিটা খাটিয়ে দিই, বাবাজি?

বাবাজি বলল, তা দাও, মাছিতে টিঁকতে দেয় না!

নতুন একটা জোলার মশারি কেষ্টপুরের বাজার থেকে সাতসিকে দিয়ে এনেছিলুম। মশারিটা বড়। ভিতরে চারজনে ব'সে বেশ তাস খেলা চলে।

মশারি খাটাচ্ছিলুম, তখন বট-বাবাজি বলল, ঘরে তামাক-টামাক আছে কিছু, ঠাকুরমশাই?

আছে বইকি!—সোৎসাহে বললুম, তুমি সুস্থ হয়ে বসো, আমিই সেজে দিচ্ছি।

মশারিটা খাটিয়ে আমি ওর জন্য ছোট কলকেটা বা'র করলুম। গাঁজার জটি ছোট হাঁড়ির মধ্যেই ছিল। ছোট কলকেটার মধ্যে 'ঠিকরে' বসিয়ে এক একটা শিকড় ছিঁড়ে-ছিঁড়ে কলকেটা বেশ নিরেট ক'রে ভ'রে দিলুম। তারপর সাঁপির ময়লা ন্যাকড়াখানা একটু ভিজিয়ে বাবাজির হাতে দিয়ে বললুম, কলকেটা তুমি মুখে ধরো, আমি দেশলাই জ্বেলে দিই।

বাউল বাবাজি তাঁর কলকে টেনে দম নিতে লাগল। আমি ততক্ষণে মাছ কুটে বা না বেটে আলু-পটল কেটে রান্নায় ব'সে গেলুম। আমি কৃতার্থ।

শিল্পী ও গায়কের সামান্য সেবা করার সুযোগ পেয়েছি, এ আমার সৌভাগ্য। ওর গান আমাকে যেন পথ চিনিয়ে নিয়ে যায় চলমান সংসারযাত্রার বাইরে অনেক দূরে। সেখান থেকে আমার ফিরতে দেরি হয়। আমার জীবন-সংগ্রাম বা অন্ন-সংস্থানের সকল প্রচেষ্টা কেমন য়েন মিথ্যা মনে হয়।

বাবাজি প্রাণভ'রে ধূমপান করল।

আমি ততক্ষণে আলু-পটল ভেজে নিয়ে বাটনা গুলে ঝোল চড়িয়েছি। অতঃপর ভাজা মাছ তার মধ্যে ছেড়ে নুন দিয়ে মশারির মধ্যে এসে ঢুকলুম। চেয়ে দেখি বাবাজির রক্তজবার মতো দুই চোখ রসের নিবিড়তায় নিমীলিত—যেন রবি বর্মার সেই পটে আঁকা দেবাদিদেবের ধ্যানস্তিমিত দৃষ্টি। একতারাটি নিয়ে আমি ওর হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম।

যে সুর ধরল বাবাজি, সে নাকি যোগিয়া বাউল। ধীরে ধীরে কণ্ঠে তার সুরের লহরী সঞ্চারিত হল :

> "ওরে মন শোন রে—
> আপন জনমের কথা যে জানে রে
> ভাই/সকল ভেদ সেই ত জানে,
> তার তুলনা নাই। রজঃ-বীর্য রসের
> কারণ, এ দেহ হইল সৃজন, যারে
> ধ'রে সৃজন পালন/তারে কোথা
> পাই—" বুগ বুগ বুগুং বুগুং—
> "ওরে মন শোন রে আমার—" বুগুং
> বুগুং—

বট-বাবাজি একবার থামল। প্রশ্ন করলুম, এ গান কাদের বাবাজি?

বাবাজি বলল, দুদ্দু শাহ্‌র গান, ঠাকুরমশাই। লালন ফকিরের শিষ্য দুদ্দু, আমার গুরু। এ গান পুবে-পশ্চিমে হেঁটে বেড়ায় বাবা—

আমার অনুরোধে বোয়েগীবাবা আবার সেই পুরনো গানটা ধরল, "এ মায়া প্রপঞ্চময়/ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে রঙ্গের নট নটবর হরি/যারে যা সাজায় সে তাই সাজে/কর্মক্ষেত্রে জীবমাত্রে মাতৃসূত্রে সবি গাঁথা/কেহ পুত্র কেহ মিত্র কেহ ভগ্নি কেহ ভ্রাতা/কেহ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা/সে যে কত রঙ্গের অভিনেতা নাচে কত সাজে সেজে।"

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলুম। বাইরে মধ্যাহ্নকাল যেন তৃষ্ণায় টা-টা করছিল।

নোনা জলের হাওয়ায় ঝলকে ঝলকে আসছিল মাছের গন্ধ। তার সঙ্গে শঙ্খচিল আর মাছরাঙ্গাদের অবিশ্রান্ত মুখরতা। এদেরই মধ্যে একাকার হয়ে মিলে যাচ্ছিল বট-বাবাজির দেহতত্ত্বের গান। আমি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলুম।

আহারাদির পর বাসনপত্র ধুয়ে ঘর নিকিয়ে আমিও মাছির উৎপাত এড়াবার জন্য বাবাজির মশারির মধ্যে জায়গা নিয়েছিলুম। আমি বামুন, এজন্য বুড়ো একটু প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু বামুনের জাত কোনও অবস্থাতেই যে যায় না, এটা ওকে বোঝাতে হয়েছিল।

দুজনেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।—

ওর কাছেই খবর পেয়েছিলুম, শূলী-মোহান্তর আখড়া এখান থেকে ক্রোশ দুই। তবে জলাবিলের ধার দিয়ে তয়ে-তয়ে গেলে পোয়াটাক রাস্তা কম পড়তে পারে। আজ রাধাষ্টমীর দিনে সেখানে মস্ত ধুমধাম। কালীতলা, ধানকুনি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সব লোকজন ভেঙ্গে পড়বে। খাওয়া দাওয়ার খুব ঘটা।

ঘুম থেকে উঠে আমি বললুম, বাবাজি, আমিও যাই চলো তোমার সঙ্গে। মোড়লরা থাকবে ওখানে?

বলো কি ঠাকুরমশাই, ওদেরই ত কাজ। দশ-বিশটে ভেড়ির জেলে-মালোরা ভেঙ্গে পড়বে ওখানে—বট-বাবাজি বলল, আর তুমি হলে বাম্ভন, মাথার মণি। তুমি সঙ্গে গেলে আমি ডবল ভেট পাব। বাচ্চাকাচ্চারা দু-দিন ভালমন্দ খেয়ে বাঁচবে।

আমি তৈরি হয়ে নিলুম। খাটো ধুতিখানা পরলুম—একটু আধটু ছেঁড়া বা হলুদের দাগ-লাগা—অত ভ্রূক্ষেপ করলুম না। ময়লা ধুতিখানা আরও ছেঁড়া। ওখানা থাক এখানে। পুরনো গেঞ্জিটা ঘর নিকোবার কাজে লেগেছে। হাতকাটা কোরা টুইল শার্টটা পরলুম বটে, কিন্তু ময়লা ধুতির সঙ্গে মিলল না। সমস্ত টাকা নিয়ে পেট-কাপড়ে বাঁধলুম। পাঁচশ' টাকারও বেশি। চটিজুতো জোড়াটা কাগজে মুড়ে ফালি দিয়ে বাঁধলুম। ওটা হাতে নেবো। ছাতাটা সঙ্গে নিলুম। বৃষ্টি ধরলেও শ্রাবণ এখনও শেষ হয় নি। গামছাখানা বেঁধে নিলুম কোমরে।

বেরিয়ে পড়লুম বট-বাবাজির সঙ্গে। ঘর ত খোলাই, ওর কবাট নেই। জানলাও তাই। কিন্তু চোর ডাকাত—কোন দিনই আসে নি। শুনেছি মধ্যে মাঝে অচেনা বিভূঁইয়ের লোক এই সব 'আলায়' দু-এক রাত কাটিয়েও যায়। সঙ্গে চারটি চাল ডাল তেল-নুন থাকলেই হল—যত খুশি মাছ খেয়ে যাও!

আমি রেখে গেলুম আমার কয়েকটা পলো, একখানা হাত-জাল, ওই বড় মশারি আর গোটা দুই বালিশ। কিছু তেল-নুন-মসলা, কিছু সব্জি, সের দুই ডাল—ওগুলোও রেখে গেলুম। চাল রইল হাঁড়িভরা। ওদের সবাইকে একদিন খিচুড়ি খাওয়াব ভেবে রেখেছিলুম।

এ রাস্তা আমার জানা নেই। মাঝে মাঝে নরম কাদায় পা ডুবে যাচ্ছে। চোরকাঁটা আর ঝোপড়া জঙ্গলে ভরে গেছে এখান ওখান। বাবাজির সঙ্গে যাচ্ছিলুম খানা খোন্দল পেরিয়ে। অবেলার আকাশে তখন মেঘ জমছিল। আমরা পা চালিয়ে চললুম।

বোরেগী বলল, ঠাকুরমশাই, আরেকটু জোরে পা চালাতে হবে। মেঘে অন্ধকার হচ্ছে ও-দিকে।

হোক না—আমি বললুম, এমন সুন্দর দেশ, একটু দেখতে দেখতে যাই না কেন? ওটা বুঝি মিষ্টি জলের বাঁধ? লাল পদ্ম ফুটেছে! নারকেলের বন ছেয়ে রয়েছে সব দিকে। না, আর মাছরাঙ্গাদের দেখা যাচ্ছে না—

তবু হনহনিয়েই যাচ্ছিলুম। এক সময় টিপ টিপ করে বৃষ্টি নামল। কিন্তু এ বৃষ্টি কতটুকু সেই সে-রাত্রির তুলনায়? দুখানা ছিপ-নৌকো নিয়ে সেই সেদিন সরু খালের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলুম সবাই মিলে। যাচ্ছিলুম তাড়দার ভেড়িতে মাছ মারতে। রাত তখন দুটো। বৃষ্টি এল ঝমঝমিয়ে। খোলা মাঠের নিচে সেই বৃষ্টির ঝাপটা আর শাসানি জীবনে কবে দেখেছি? সেই বৃষ্টি যেন উন্মত্ত, সে যেন সেই রাত্রে অন্ধ বিশ্ব চরাচরকে চাবুক মেরে তাড়না করছে! কোথায় পাব আশ্রয়? কী দিয়েই বা ঢাকব নিজেদেরকে? আমরা ছিলুম সাতজন। শোভারামরা আমার জন্য ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু সত্যিই বলব, আমি সেই অন্ধকারে উল্লাসে যেন আত্মহারা হচ্ছিলুম। দেখতে দেখতে দুখানা ছিপ ভরে গেল জলে। নালাপথের পাড় নেই, সে যেন নর্দমার মতো। এক সময় আমরা সাতজনেই জলে নামলুম। সে যেন প্রাণপণ সংগ্রাম। ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে সে যেন জয়-পরাজয়ের কঠোর দ্বন্দ্বযুদ্ধ। অবশেষে সেই দুখানা নৌকাই উপুড় করতে হল। তাদেরই পিঠের ওপর আমরা সাতজন বসলুম। সেদিন রাত চারটের পর বৃষ্টি থামল। তাড়দার ভেড়ি থেকে মাছ নিয়ে যখন কলকাতায় গিয়ে পৌছলুম, বেলা তখন দশটা বাজে। খুব সম্ভব কলকাতার বাবুরা সেদিন ডিমসিদ্ধ-খিচুড়ি খেয়ে আপিস গেছে। ঘন বর্ষায় মাছের কারবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় বলেই মাছ হয়ে যায় দো-রসা কিংবা পচা! বর্ষার সন্ধ্যায় ইলিশ আর তপসের বাজার ভাল—ভেড়ির মাছের আদর কম।

পুজো পর্যন্ত এইভাবে চলে। তারপর থেকে বাগদা ছেড়ে গলদা চিংড়িতে আসে। ইলিশের বদলে ভেটকি-ভাঙড়।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি বেড়ে উঠল। বট-বাবাজি বলল, আর ত কিছু উপায় দেখিনে, ঠাকুরমশাই।

দাঁড়াও।—আমি বললুম, ঝমঝমে বর্ষা, এ এখন ধরবে না। তুমি তোমার একতারাটি পুরে নাও ঝুলির মধ্যে, আর এই ছাতাটা নাও হাতে।

বট-বাবাজি বলল, সে কি কথা, তোমার উপায় ? এ যে প্রবল বৃষ্টি, সাপের মাথা ছিঁড়ে পড়ে !

ছাতাটা খুলে বাবাজির হাতে দিয়ে বললুম, তোমার ওই একতারাটা ভিজলে আজ গান করবে কী দিয়ে ?

তা যা বলেছ ঠাকুরবাবা, ওটিই খাঁটি কথা।—বট-বাবাজি বলল, ঝুলির মধ্যে ভিক্ষের চাল আর গোটা দুই ঝিঙে-পটলও আছে। তা বাবা, আমাকে সবাই ভালই বাসে।

পথ তখনও বাকি আধ ক্রোশের মতো। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছিল। মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে। আমার জামাকাপড় সপ-সপ করছে জলে। শার্টের নিচে গেঞ্জি নেই। তাই ভয় হচ্ছে পাছে টাকাগুলো সব ভিজে যায়। মাথার চুল কাটা হয় নি অনেক দিন, সেজন্ত চোখ পর্যন্ত চুলের ঝালর নেমে এসেছে। চার মাসের মধ্যে আরসিতে মুখ দেখি নি ! সাবান, চিরুনি ইত্যাদি চোখেই পড়ে নি। নুন-সরষের তেল, কাঠের ছাই আর নিমের ডাল—এরা হচ্ছে দাঁতন। ধোবা-নাপিত কোন দিন চোখেও পড়ে নি। আমি আগাগোড়া অপরিচ্ছন্ন। নিজের আগেকার চেহারা আমার মনেও পড়ে না।

বট-বাবাজি এক সময় বলল, ঠাকুরমশাই, এবার এসে গেছি আমরা। ওই যে টিনের চালা দেখা যাচ্ছে। মাঝখানে শুধু ঘরামিদের বস্তিটা। হ্যাঁ, কুমোরপাড়া কাছেই—বাঁধ পেরোলেই পাব। তোমার ছাতাটা আমার ঝুলিটাকে বাঁচিয়ে দিল। এসো বাবা—

বৃষ্টি তেমনিই চলছে। পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বাবাজি। বাঁধের পর কুমোরপাড়া, তারপর বাঁশবাগান পেরিয়ে ঘরামিদের বস্তি। তারপর এল মস্ত 'নারকেলতলা' আর কলাবাগান। সেটা ছাড়িয়েও আবার অনেকটা। যখন আমরা এসে আখড়ার বাগানে ঢুকলুম, তখনও সন্ধ্যার দেরি রয়েছে। বৃষ্টি ও বর্ষা এতক্ষণ পরে যেন এবার একটু থমকিয়ে গেল !

জলটুলি-জেলেপাড়ায় আজ রাধাষ্টমী তিথির উৎসবে অযাচিতভাবে সাক্ষাৎ 'নারায়ণে'র আবির্ভাব ঘটেছে, এই খবর যখন রটল—তখন কী প্রকার পরিস্থিতি দাঁড়াল সেটা অনুমান করে নিতে হয়। আমি দৈবাৎ ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমি যে নারায়ণ—এটা ওরা বিশ্বাস করে!

শুধু মেয়ে-পুরুষ নয়, গ্রামবাসী যেখানে যে কেউ ছিল, ভেঙে পড়ল আমার চারদিকে। এ যেন পরম পুণ্যদর্শন। জেলে, জোলা, মালো, পোদ, বারুই, নমোশূদ্র—সব মিলিয়ে সেই বৃহৎ জনতা। জালি-হালি দুই আছে। আমি না হয় ভিনদেশী বামুন, কিন্তু এরা সবাই ত আমার দেশেরই মানুষ! চারদিকে দেখছি জীবন্ত কঙ্কাল, ঘন কালো তাদের বর্ণ, ছিন্নভিন্ন ময়লা পরিচ্ছদ, উলঙ্গ ছেলেমেয়ে, অর্ধনগ্ন নারী ও পুরুষ। ছোটবেলায় চাটুজ্যেগিন্নির শ্রাদ্ধে দেখেছিলুম শত শত সর্বহারা কাঙ্গালীদের ভোজন, দেখেছিলুম রাজেন মল্লিকের বৃহৎ প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে শতসহস্র অন্নভিক্ষুর দল—এরা সেই তাদেরই সগোত্র। আমার গলা শুকিয়ে উঠেছিল।

প্রথম চেনা লোক পেলুম মোড়লকে। তার লাফালাফি আর চেঁচামেচি দেখবার মতো। আমার দুই পা ভরা কাদা, ময়লা ধুতি ও সাদা হাফশার্ট ভিজে থপথপ করছে, মাথার চুল দিয়ে তখনও জল নামছে। কিন্তু তা বললে কি হয়? 'ধুলো-পা' ব্রাহ্মণের পাদ্য-অর্ঘ্য কই? সেটা যে সবার আগে! আসন কই? বরণমালা কই? চারদিকে হই-চই পড়ে গেল।

মোড়ল কপাল চাপড়িয়ে খানিক ছুটোছুটি করল। কিন্তু দেখতে দেখতে এসে পৌছল সিঁদুর মাখানো ছোট্ট পিতলের ঘড়া। ভিতরে একটি আম্রপল্লব। ঘড়ার উপরে বসানো পিতলের সরা। তার মধ্যে চাল, সুপুরি, পান, পৈতা ও দক্ষিণার দরুন কয়েকটা তামার পয়সা। একখানা নতুন গামছা ওর সঙ্গে।

আমি টিনের চালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। সেই ঘড়া রাখা হল আমার পায়ের কাছে। কে যেন আনল ধূপ, ধুনো আর প্রদীপ। অতঃপর গ্রামের এবং এই আখড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা দূরের থেকে একে একে প্রণাম করতে লাগল। আধ ঘণ্টা ধরে সেই প্রণামের পাট চলল।

এক সময় চিৎকার করে উঠল মোড়ল—তোদের মনে পড়ে সেই সে-বছর এক মোড়ি-পোড়া বামুন ছটকিয়ে এসেছিল এ গাঁয়ে? এ আর তোমার সেই ঢোঁড়াসাপ নয়! এ হল খাঁটি সোনা, জাত-কুলীনের বংশ। ঢোঁড়া দেখে এলি এতকাল, এবার গোখরো দেখে যা। কিন্তু আর নয়, এবার পালা সব—যা, যা পালা!—ঠাকুর, নারায়ণ—তুমি এবার প্রসন্ন হও। আসন 'গোরহোন্' করো।

কাগজ মোড়া ভিজে চটি জোড়াটা ঠিক জায়গায় রেখেছিলুম। পাদ্য-অর্ঘ্য যা পেলুম তার মধ্যে কয়েকটা পয়সা ছাড়া গামছাখানারই যা দাম। আমি তখন ডাকলুম বট-বাবাজিকে। বললুম, তোমার ঝুলির মধ্যে এগুলো সব তুলে রাখো। কাল যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা হয় যেন।

বট-বাবাজি কৃতার্থ হয়ে ঘড়া, সরা, বাতাসা, সুপুরি ও গামছাখানা ঝুলিতে ভরে নিল। দক্ষিণার পাঁচটা পয়সাও সে ঝুলিতে ফেলে রাখল।

শূলী-মোহান্তর সঙ্গে পরে আমার দেখা হবে। তার আগে মোড়ল আমার জন্য চমৎকার টিনের একটি চালাঘর ও বারান্দার বন্দোবস্ত করে দিল। ভিতর দিকে তার উঠোন, ফুলবাগান, স্নানাদির জায়গা এবং এপাশে রান্নাঘর।

এই উঁচু বারান্দায় দাঁড়ালে সমগ্র আখড়াটাই দেখা যায়। মোড়ল বলল, তা প্রায় বিঘে পঁচিশেক জায়গা হবে। আম-কাঁঠাল লেবু-লিচু পেয়ারা-পেঁপে সবই হয়। শাকসব্জি কিনতে হয় না। গোয়াল আছে মস্ত বড়। ঘানি একটা আছে। চিঁড়ে-মুড়ি-মুড়কি খই-বাতাসা এরাই করে। এ আর নতুন কি, ঠাকুর? সব আখড়াতেই এই একই ব্যবস্থা। লোক ত আর কম নয়! ষাট-সত্তর জনের দু-বেলা খোরাকি। মেয়েছেলেরা এখানে সেবাদাসী হয়ে আসে, এখানেই থেকে যায়। তোমাকে ত বলেছিলুম ঠাকুর সেই চার মাস আগে, এখানে একবার বসলে আর কোন ভাবনাই নেই! পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে জপতপ পুজো আহ্নিক নিয়ে থাকবে, হাজারে হাজারে শিষ্যসেবক আসবে।

এতক্ষণ পরে আমিই বললুম, শূলী-মোহান্ত কোথায়?

এখানেই আছে—মোড়ল বলল, তবে আজ রাধাষ্টমী কিনা, ভর নিয়ে আছে গোপাল মন্দিরে। রাত্তিরে তোমাকে নিয়ে যাব।

আরেকবার গলা নামিয়ে মোড়ল বলল, তা যদি বললে ঠাকুর, তা হলে শোন, শূলী-মোহান্তকে আমিই এখানে বসিয়েছি। ও আগে ছিল কীর্তনে, শোভারামের বাপের সাকরেদ। বোরেগী বাউলদের সঙ্গে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরত। হাতে থাকত একগাছা ত্রিশূল, গলায় কণ্ঠী, আর অঘোরীদের দলে ভিড়ে শ্মশানে রাত কাটাত। আমিই ওকে তুলে এনেছিলুম, ঠাকুর।

কথাবার্তা চলছে এমন সময় একটি অল্পবয়স্কা আঁটসাঁট মেয়েছেলে বারান্দায় এসে উঠল। মুখখানা হাসি-হাসি। সটান এসে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে বলল, বড়জ্যাঠা, আমিই ঠাকুরের সব ভার নিচ্ছি, তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না—

এ আবার কে রে? এমন সহজ কণ্ঠস্বর মেয়েমানুষের? একটু অবাক হয়ে ওর দিকে যখন তাকিয়েছি, মোড়ল তখন বলল, তোর সাতজন্মের তপিস্তে রে মানদা, এজন্মে ঠাকুরের সেবার দখল পেলি!

মানদা বলল, তোমাদের সকলের পুণ্যে পেয়েছি, বড়জ্যাঠা।

মোড়ল বলল, এবার তবে আমি যাই ঠাকুর! আবার আসব এক সময়। মানদা রইল তোমার সব কাজে। ওই যে, বলতে বলতেই যুমনি এসে পড়েছে! এত দেরি হল? ভাঁড়ারে পেলি সব?

হ্যাঁ, বাবা—বলতে বলতে একটি ঘন-শ্যামবর্ণা মেয়ে একটি ধামা, তার উপর একটা চেঙারি এবং ডান হাতে হারিকেন ল্যাম্প নিয়ে বারান্দায় উঠে এল।

দুইজন স্ত্রীলোক দেখে আমি আড়ষ্ট। দুজনের মধ্যে মানদা সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের কোনও মেয়েছেলে সেমিজ বা জামা পরে না। পরার রেওয়াজ এখনও বোধ হয় হয় নি। মাঝে মাঝে আমাকে মাথা নিচু করতে হচ্ছিল।

ওরা দুজনেই ভিতরে গেল। দুটো ধামা-চেঙারিতে কি কি সামগ্রী এনেছে আমি লক্ষ্য করি নি। ভিতর থেকে ওদের গলার আওয়াজ, বালতির ঝনঝনানি এবং অন্যান্য সাড়াশব্দ পাচ্ছিলুম। মেয়ে দুটো কাজকর্ম জানে, এটা বুঝতে পারছিলুম।

সেই ভিজে জামা-কাপড় আর দু-পা ভর্তি কাদামাটি মেখে হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছি—সময় চলে গেছে ঘণ্টা দেড়েক। এমন সময় ভিতর থেকে মানদা এসে আমার একটা হাতের নড়া ধরে তুলল। বলল, এসো ঠাকুর, আমি সব করে দিচ্ছি। যুম্নি, দেখ, জল একটু গরম হল কিনা।

হয়েছে, এবার নিয়ে এসো।—যুম্নি ভিতর থেকে জবাব দিল।

ভিতরের উঠোনে ফুলবাগানের কোলের কাছেই স্নানের জায়গা। সেখানে এনে মানদা আমাকে একখানা টুলের ওপর বসাল। তার পর নিজেই আমার জামার বোতাম খুলে শার্টটা মাথা গলিয়ে তুলে নিল। যখন সে আমার স্নানের সুবিধার জন্য কোমরের কসি আলগা করে ধুতিখানা এলোমেলো করতে চাইল, আমি বললুম, দাঁড়াও, আমার টাকা আছে পেট-কাপড়ে—

মানদা বলল, আচ্ছা আচ্ছা—যুম্নি, নৈবিদ্যির গামছাখানা দে ত? আলোটা কাছে এনে দে।

যুম্নি আলো আর একখানা ছোট্ট গামছা নিয়ে এসে রাখল। সেই গামছায় আমার টাকাগুলো বাঁধলুম। মানদা সেটি নিয়ে পাশের বাতাবি গাছের ডালে

ঝুলিয়ে রাখল। তারপর গরম জলের বালতিতে ঠাণ্ডা জল মিলিয়ে ঘটি দিয়ে সে আমার মাথায় ঢালতে লাগল। কিন্তু সে তার নিজের কাজের সুবিধার জন্য আমার সব লজ্জাশরম ঘুচিয়ে দিল। মাঝে মাঝে বাধা দিচ্ছিলুম, কিন্তু মানদা আমার গায়ে মাথায় মুখে সাবান ঘষতে ঘষতে বলল, ঠাকুর, তুমি এখনও পুরুষ হও নি, তোমাকে দর্শন করেই বুঝেছি, তুমি এখনও কাঁচা।

নিতান্ত এক কচি শিশুকে উলটিয়ে-পালটিয়ে আপাদমস্তক সাবান মাখিয়ে যেমন স্নান করায় বাড়ির গৃহিণী—এও প্রায় তাই। আড়ষ্টতা, প্রতিবাদ, বিরক্তি প্রকাশ—কোনটার অবকাশ নেই, এবং সে ভ্রূক্ষেপও করছে না! মাঝে মাঝে তার স্তনের মূল আমার চোখে ও নাকে ঠেকছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নেওয়াটাই তার পক্ষে আগে দরকার।—'এই যুমুনি, ব্রাহ্মণ দিগম্বরকে দর্শন করবি ত আয়! কাদা মাটি ময়লা মাখা ছিল হীরে—দেখে যা একবার, ঝলমল করে উঠেছে! ক্ষীরের পুতুল দেখে যা—'

ওধার থেকে যুমুনি বলল, দুধ ওৎলাচ্ছে মানদাদি, উঠতে পারছিনে।

স্নানের পর আমাকে একখানা গেরুয়া কাপড়ে জড়িয়ে টাকার পুঁটুলিটা সঙ্গে দিয়ে মানদা আমাকে এনে বসাল শোবার ঘরের একখানা চৌকিতে। আমি কিছু না, আমার কোনও স্বকীয়তা নেই, আমার সব লজ্জার বাঁধন শেষ করে দিয়েছে এই সহজিয়া দলের মেয়ে, আমি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

মানদা গিয়ে শিশি বার করে আনল। তার থেকে সুগন্ধ তেল কয়েক ফোঁটা হাতে নিয়ে আমার মাথার চুলে মাখাতে মাখাতে বলল, ঠাকুর, তোমার এই কৃষ্ণ কেশরাশি যে রেশমের গোছা!

এবার বললুম, কাল আমার মাথাটা ন্যাড়া করে দিয়ো। মাথায় টিকি রেখে আমি এই আশ্রমেই থাকব।

ঠাকুর, সব তোমার ইচ্ছে, সব তোমার আশীর্বাদ।—মানদা বলল, কেন ন্যাড়া হবে? আচার অনুষ্ঠান কি তোমার জন্যে? তোমার এই চুলের রাশির মধ্যে আমি রক্ত-গোলাপের গন্ধ জমিয়ে রেখে দেবো, ঠাকুর।

মানদা চিরুনি এনে আমার মাথা আঁচড়িয়ে দিল। এমন সময় যুমুনি এসে আসন পেতে ঠাঁই করল। তারপরে এল ফল-মিষ্টির থালা। আরেক থালায় বসানো জাম-বাটিতে ঘন দুধ। সঙ্গে বড় বড় মর্তমান কলা, চিঁড়ে, বাতাসা ইত্যাদি। মানদা আমাকে আসনে বসিয়ে দিয়ে বলল, ঠাকুর, এবার সেবা হোক?

আমি খুবই ক্ষুধার্ত ছিলুম। আসনে বসে ব্রাহ্মণের কৃত্য আচরণ করে নিলুম গেলাসের জলে। 'পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ।'

যুমুনি পিছন থেকে বাতাস করতে লাগল।

এমন ঘন দুধের ফলার আর কবে এমন করে খেয়েছি, মনে পড়ে না। ওর সঙ্গে চটকিয়ে নিয়েছিলুম নেয়ো কাঁঠালের কোয়া। একতাল ছানার সঙ্গে লাল জাভার চিনি—অতি উপাদেয়। ফলের থালায় ফল আর মিষ্টি অনেকই রয়ে গেল। আমি এবার উঠলুম। যুমুনি হাত ধুইয়ে দিল।

শোবার ঘরখানা বেশ বড়। দক্ষিণের দুটো বড় বড় জানলা ঘেঁষে বড় তক্তার উপর নধর বিছানা পড়েছে। ঘরে ধুনোর গন্ধের সঙ্গে ধূপ জ্বালানো হয়েছে। দক্ষিণের হাওয়ায় কেয়ার সৌরভ ভেসে আসছে। আমি বিছানার ওপর বসলুম।

হাতে একটা ছোট বাটি নিয়ে মানদা ঘরে এসে ঢুকল। আমার সঙ্গে তিলমাত্র পরামর্শ না করেই সে আমার কপালে সাদা চন্দন মাখাতে লাগল। কপালের পর গলা, বুক, হাত, পিঠ—একে একে মাখিয়ে দিল। পরে বলল, এবার একটু বিশ্রাম করে নাও ঠাকুর—পরে তোমাকে নিয়ে যাব।

বললুম, কোথায় নিয়ে যাবে ?

ও মা, তোমার পায়ের ধুলো না পড়লে কীর্তনের আসর পবিত্র হবে কেন ? এখন আরতি হচ্ছে মন্দিরে। সখীসঙ্গে শ্রীরাধা আসবেন শ্যামকুঞ্জে। আজ তোমার ইচ্ছায় সারারাত কীর্তনগান চলবে।—মানদা বলল, তাই ত তোমাকে চন্দনবিলাস নিবেদন করলুম, ঠাকুর ?

মানদা, তুমি লেখাপড়া শিখেছ কোন্ ইস্কুলে ?

মানদা বলল, আমি ? আমি একবর্ণও লেখাপড়া জানিনে, ঠাকুর !

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। পরে প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা মানদা, সহজিয়া কাকে বলে ?

মানদা আমার দুই পা ধরে একবার মাথায় ঠেকালো। সবেমাত্র সে স্নান করে এসেছে। হেঁট হতেই তার ভিজে চুলের আলগা খোঁপা ভেঙে পড়ল বিছানায়। মেয়েটা আমারই সমবয়সী, বরং দু'এক বছরের বড়ও হতে পারে। গায়ের রংটা গঙ্গাজলের মতো। মাথা তুলল মানদা এবার। চোখে যেন তার একটা ধ্যানাবেশ। বলল, কিছু জানিনে ঠাকুর, কিছু জানিনে। যা সহজ তাই শুধু জানি। আমি নয়, তিনি। সকলের মধ্যে তিনি। তিনিই যা কিছু করছেন আমার হাত-পা দিয়ে। আমি শুধু দাসী। দাসী আমি সকলের। সকলের পায়ের তলায় জায়গা পাই তাতেই আমি ধন্য।

দিদিমার মুখে কামাক্ষ্যার গল্প শুনেছিলুম। পুরুষ মানুষ সেখানে গেলে নাকি আর ফিরতে পারে না। সেখানকার মেয়েরা নাকি ডাকিনী আর যোগিনী। তারা জানে মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি। পুরুষরা তাদের কাছে 'ভেড়া' বনে যায়।

অনেক রাত্রে মানদা আমাকে আখড়ার এখানে ওখানে নিয়ে গেল। সেখানে মস্ত এক মণ্ডপ। সেই মণ্ডপে কীর্তনের আসর বসেছে এবং যিনি কীর্তনীয়া তিনি কোমর দুলিয়ে-দুলিয়ে আঁখর ধরছেন একটির পর একটি। এসব আমার কাছে খুবই পুরনো। কিন্তু ওই আসরেই দেখলুম, দল বেঁধে বসে আছে মোড়ল, শোভারাম, পঞ্চু, বদন, চিন্তামণি, শশধর—সবাই। কীর্তন বেশ জমেছে।

ওখান থেকে সরে গিয়ে মানদা আমাকে দাঁড় করালো শিবমন্দিরের সামনে। আজ রাধাষ্টমী, শিবের সমাদর কম। এসে দাঁড়ালুম কালীর থানে। সমগ্র আখড়ায় তিনটি মাত্র পাকা ঘর, এবং তিনটিই মন্দির। এবারে এলুম গোপালের ঘরে, অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে। এখানে পূজা পাঠ ও শয়নারতির আয়োজন চলছে। আমি থমকিয়ে দাঁড়ালুম। যিনি আয়োজন করছেন, তিনি ত হিজড়ে! হিজড়েই ত!

উকি কে?

মানদা বলল, উনিই শূলী-মোহান্ত! আজ উনি আছেন রাধাভাবে। ওঁর মাথার জটা আজ বেণী হয়ে উঠেছে। আজ ওঁর শ্রীরাধার বেশ। ওঁর পায়ে আলতা, সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে শাড়ি, গলায় আর হাতে অলঙ্কার।

আমাদের চাপা কথাবার্তা শুনে রাইবেশী শূলী-মোহান্ত আমাদের দিকে চেয়ে মৃদু মধুর হাসলেন। মানদা আমার কানে কানে বলল, ঠাকুর, হাসিটুকু দেখলে ত? ও-হাসি বৃন্দাবনের ধীর-সমীরের বংশীবটের! দেখছ না, কৃষ্ণকে উনি জড়িয়ে ধরে আছেন? ভাবে বিভোর দুই চক্ষু?

হঠাৎ চোখ পড়ল বট-বাবাজি বসে রয়েছে দরজার একটু আড়ালে। এক সময় ছোট কল্‌কেটায় একটা বড় রকমের টান দিয়ে সে 'শ্রীরাধিকার' হাতে ওটা এগিয়ে দিল। শ্রীরাধিকা সেই ময়লা ন্যাকড়াটা কল্‌কেয় জড়িয়ে মুখের কাছে ধরলেন।

এর পর মানদা আমাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চালাঘরগুলি দেখাল। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সহজিয়া ও বাউল,—সব মিলে আছে গায়ে-গায়ে—যার একটিও তলিয়ে বুঝবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি সেদিন আমার আয়ত্তে আসে নি।

মানদা যখন আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে বিছানায় শোয়ালো, রাত তখন সাঁ সাঁ করছে। যুম্‌নি ঘুমোচ্ছে ভিতর দিকের বারান্দায়। মানদা গিয়ে আহারাদি সেরে একখানা হাতপাখা নিয়ে ঘুমের আগে আমার বিছানার ধারে বসে বাতাস করতে লাগল।

॥ ১০ ॥

পালা-পার্বণ মিটতে দিন দুই লাগল।—আখড়ায় এখন আর বাইরের লোক কেউ নেই। জলটুলি-জেলেপাড়া এখন শান্ত। শুনলুম চার-পাঁচ দিনে আখড়ার যা উপার্জন হয়েছে, পুজো পর্যন্ত তাতেই বেশ চলে যাবে।

সকালবেলা সেদিন স্নান ও জলযোগ সেরে বসেছি, এমন সময় এল মোড়ল আর শূলী-মোহান্ত। মোহান্তর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চোখ দুটো গুলি-গুলি, দাড়ি-গোঁফ কামানো, গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষের মালা ও তাগা। পরনে ফিকেবর্ণ গেরুয়া। মোড়লের সঙ্গে সেও দূরের থেকে আমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। বলল, ঠাকুর, আমিও তোমার দাসানুদাস।

মোড়ল বলল, ধরে এনেছি মোহান্তকে। বলি, তুমিও চলো সঙ্গে, ঠাকুরের পায়ে দুজনেই কেঁদে পড়ব,—তাতে যদি মন পাই।

মোহান্ত বলল, ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা যদি এ গাঁয়ে হয়, তবে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকবে, কিন্তু আমাদের মোক্ষলাভের পুণ্য!

আমি চুপ করে হাসছিলুম। মানদা এগিয়ে এসে বলল, বড় জ্যাঠা, আমি বলি আরও দু'চারদিন যাক্ না কেন, ঠাকুরের মন একটু বসুক, আমাদের সেবায় ওঁর মন একটু তুষ্ট হোক, তখন কথাটা তুললেই চলবে। এতই বা তাড়া কিসের বাবাজি?

আচ্ছা, আচ্ছা,—সেই ভাল, মানদা ঠিকই বলেছে। ঠাকুরমশাই, তোমার ধুতি-চাদর আজ ভোরে এসে পৌঁছেছে, আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এস হে মোহান্ত, মানদাই রইল ঠাকুরমশায়ের কাছে, মনের কথা মানদাই বুঝবে ভাল। বুঝলে মোহান্ত, আসল কথাই হল মনের সন্তোষ!

বারান্দা থেকে কয়েক পা এগিয়ে শূলী-মোহান্ত বলল, মোড়ল, কোথা থেকে এমন চাঁদের টুকরো ঘরে আনলে বলো দেখি?

চাপা গলায় মোড়ল শুধু জবাব দিল, যদি পাঁচজনে মিলে ওকে ধরে রাখতে পার মোহান্ত, আমাদের সাতজন্ম উদ্ধার পাবে। এখন সব রইল মানদার হাতে।

বট-বাবাজি সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে জলা-জঙ্গল আর মাঠ-ময়দানের ভিতর দিয়ে এই আখড়ায় এনেছিল। কিন্তু কোনও পথই আমার চেনা নেই। এ গ্রামের পিছন দিকটা নারকেলের বন আর ঘন বাঁশবাগান। পশ্চিম দিকে মস্ত এক দীঘি, তার পরে আবার বনবাগান। মানদার কাছে শুনেছি, ওদেরই ভিতর দিয়ে প্রায় আড়াই ক্রোশ পেরিয়ে গেলে তবে সেই কেষ্টপুরের খাল। রোজ বেলা দশটার পর একখানা স্টীমবোট ওই খাল দিয়ে কলকাতার দিকে যায়। ওই খাল দিয়েই আমরা চার মাস ধরে গেছি মাছের ছিপ নিয়ে। খাল পর্যন্ত যেতে পারলে বাকি সব রাস্তা আমার চেনা। আমার মন চঞ্চল হচ্ছিল।

যুমনি রান্না চড়িয়েছিল ভিতর দিকে। মানদা বোধ করি রান্নারই আয়োজন করে দিচ্ছিল। এমন সময় বাইরে সাড়াশব্দ পাওয়া গেল এবং দেখতে দেখতেই ভিতরে এসে দাঁড়াল শোভারাম, পঞ্চু আর শশধর।

আমি উঠে হাসিমুখে ওদের অভ্যর্থনা জানালুম। বলা বাহুল্য, ওরাই এদেশে আমার সব চেয়ে বেশি পরিচিত এবং সব চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ।

শোভারাম পায়ের ধুলো নিয়ে মেঝের উপরেই বসল। ওরাও পাশাপাশি বসে পড়ল। শোভারাম বলল, কাজকর্মের ঝামেলা যাচ্ছে ঠাকুরমশাই, দু'দণ্ড এসে বসব আপনার কাছে, তা আর হয়ে উঠছে না।

বললুম, এ বছরের সমস্ত বর্ষার দুর্যোগ তোমাদের সঙ্গে কাটিয়েছি। তোমরা আমার একান্তই আপন, শোভারাম। একসঙ্গে থেকেছি, খেয়েছি, রোজ রাত্তিরে মাছ মারতে বেরিয়েছি। সব কষ্টের মধ্যেও আনন্দ ছিল। কিন্তু আজ আমাকে সরিয়ে দিতে চাইছ কেন, বলো ত?

আমার কথায় কিছু হৃদয়ের সুর, কিছুবা অনুযোগও ছিল,—সেটার আবেদন ওদের কাছে ঠিক কতটুকু আমার জানা নেই।

পঞ্চু বলল, যাই বলুন, এসব কাজ আপনাকে মানায় না, ঠাকুরমশাই। গাঁ সুদ্ধ লোক আমাদেরই নিন্দে করছে। তা ছাড়া আমাদেরও অসুবিধে—

শোভারাম বলল, মাছ কেনাবেচায় অনেক হুজ্জুতি, ঠাকুরমশাই। দেখেছেন ত সব? আপনাকে সামলিয়ে আপনার জন্যে নিলেম ডাকবো, আবার এদিকে আমাদের দিক সামলাব,—এত হয়ে উঠছে না।

আর কি কি অসুবিধে বল?

শশধর বলল, প্রথম হল ছিপ নৌকোয় আপনার মাল ধরানো। আপনার নৌকোও নেই, নিজের লোকজনও নেই। ভেড়িতে আপনার লাইসেন্সও নেই। কেউ আপনাকে চেনে না।

কি জানেন ঠাকুরমশাই, এ হল মুখখিস্তি আর জাল-জালিয়াতির কারবার—পঞ্চু আমাকে বোঝাতে লাগল, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি কেন এই নরকে নামবেন? আমাদের এটা হল জাত-ব্যবসা, আমরা চোদ্দ পুরুষের জেলে।

শোভারাম বলল, আখড়ায় আপনার কেমন লাগছে, ঠাকুরমশাই?

হাসিমুখে বললুম, দিনরাত্তির খাচ্ছি, সেবা নিচ্ছি, আর বেকার হয়ে বসে আছি। এ যেন সুখের ফাঁদে পড়ে গেছি। চারদিক থেকে জাল ফেলেছে, মাছের মতন ধরা পড়ে খাবি খাচ্ছি।

ওরা সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

এবারেই হল ওদের আসল কথা। শোভারাম তার পেটকাপড় থেকে এক গোছা টাকা বার করে বলল, আমরা কোনমতেই আপনার কাজে আসতে পারলুম না ঠাকুরমশাই—আমাদের মাপ করবেন। এ আপনার সেই একশ টাকা, যেটা লগ্নি করেছিলেন। আর এই হল পঞ্চান্ন টাকা—চার পাঁচ দিন আপনার নামে মাছ কেনাবেচা করেছি।

পঞ্চু টাকাগুলো এক করে আমার কাছে গছিয়ে দিল।

ওরা যেন মুক্তি পেয়ে বাঁচল, এমন ওদের মুখ চোখ। আমার আর বলবার কিছু রইল না। ওদের অন্নে ভাগ বসাচ্ছিলুম, এবং ওদের ব্যবসা কেড়ে নিচ্ছিলুম—এইরূপ একটা মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। সুতরাং আমিও বোধ হয় এবার থেকে নিষ্কৃতি পেলুম।

শোভারাম বলল, আপনি আমাদের আলা ভরে রেখে এসেছেন দেখলুম। পাঁচ-পাঁচটা পলো, একখানা হাতজাল, তারপর আলার মধ্যে অত বড় মশারি, দুটো বালিশ, খাবার জিনিসপত্তর—ও সবই যেন আপনার আশীর্বাদ। আপনাকে মনে থাকবে চিরকাল।

শশধর বলল, এবার আপনি ঠিক জায়গায় এসেছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, এই আপনার উপযুক্ত ঠাঁই। শিষ্য-সেবক দলে দলে জুটবে, কোনও কিছুর ভাবনা থাকবে না। মোড়লকাকা আপনার সব গুছিয়ে দেবে।

ওরা এক সময় বিদায় নিল। কিন্তু একথা জেনে গেল, আমার মাছের কারবারে গণেশ ওল্টালো বটে তবে আমি এই গ্রামের কুলগুরু হিসাবে এখানেই প্রতিষ্ঠিত হবো! ওরা এখানে আমাকে গোদান-ভূমিদান সবই করবে, আমার জন্য পুকুর কাটাবে, বাস্তুভিটার মধ্যেই নারায়ণের মন্দির গড়বে। আমার গোলায় নিজস্ব ধান উঠবে, এবং খামারে আমার জন্য শাক-সব্জি ফলানো হবে। কোনও ভাবনাই আমার আর থাকবে না।

সবই আমার কাছে আজগুবী মনে হচ্ছিল। যা কিছু শুনেছি গত চার মাস ধরে—সব আমার কাছে মিথ্যে এবং হাস্য-কৌতুকের বিষয়। আমি আধুনিক কালের ছেলে, ঘর থেকে বেরিয়েছি ভাগ্য অন্বেষণে, নেমেছি জীবন সংগ্রামে, মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি কঠোর বাস্তবের। আমি করব গুরুগিরি? আমার জন্য গোলাভরা ধান আর পুকুরভরা মাছ? আমি জোটাবো শিষ্য-সেবক? আমি হাসলুম। এরা সবাই মিলে আমাকে যেন একটা মধ্যযুগীয় আচার-সংস্কারের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে অবাস্তব লাগছিল।

দেখতে দেখতে অনেক টাকা জমল আমার। একদা বহু চেষ্টায় বহুজনের কাছে হাত পেতে তিরিশটি টাকা যোগাড় করেছিলুম। এবার গিয়ে সেই টাকা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করব। খরচ-খরচা করেও এখন আমার হাতে জমেছে সাতশ' টাকারও বেশি। নগদ করকরে সাতশ'।

গামছার পুঁটলিটি বার ক'রে আমি আজকের টাকার গোছাটা একসঙ্গে করে আবার গেরো দিলুম।

ওরা আমাকে সরিয়ে দিয়ে বোধ হয় ভালই করল। ওই দুর্যোগ আর দুর্গতির মধ্যে আমার উপার্জনের নেশা অপেক্ষা নতুন একটা জীবন আবিষ্কারের উদ্দীপনা ছিল প্রবলতর। আমি তরঙ্গের চূড়ায়-চূড়ায় লাফিয়ে বেড়াতে চাই। আমি চাই নিত্য নতুনের ডাক শুনতে। আমি এক, কিন্তু আমি বহু হ'তে চাই। আমারও মন বলছিল, না, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনওখানে!

খাওয়ার আগে মানদাকে বলেছিলুম, আমি একবারটি বাড়ি যাব। মাকে দেখি নি অনেকদিন।

মানদা আমাকে আদর করে বলল, বেশ ত, দু'চারদিন ঘুরেই এসো। তবে আর এক কাজ কর না কেন, ঠাকুর? আসবার সময় মাকে সঙ্গে এনো। তিনি এখানে হবেন দেবী প্রতিমা। তাঁরও সেবা করে আমরা ধন্য হব। বলো আনবে তাঁকে?

তিনি রাজি হলে নিশ্চয় আনব। কাল ভোরেই আমি যাব।

মানদা বলল, না, তোমাকে একলা যেতে দেবো না। আমি আর বড় জ্যাঠা গিয়ে তোমাকে স্টীমবোটে তুলে দিয়ে আসব।

বেশ।

কিন্তু সেইদিন রাত্রের দিকে মানদার আচরণ ও ব্যবহারে আমি খুশী হতে পারি নি। সে যেন আমার মনের অতল তলের একটা নিশ্চেতন স্পৃহাকে

বাইরে টেনে বার করতে চাইছিল—সাপের ল্যাজ ধরে বেদেনীরা যেমন সাপকে গর্তের ভিতর থেকে টেনে আনে। আমি বিরক্ত হচ্ছিলুম, কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। যুমনিকে সে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল হয়ত বা এই কারণেই। তার এই অতিশয় দৈহিক সমাদর সইতে না পেরে যখন বিছানায় উঠে বসলুম মানদা তখন শান্ত হাস্যে বলল, ঠাকুর, তুমি নারায়ণ, আমি সামান্য সহজিয়া মেয়ে। আমার দেহই আমার নৈবেদ্য, তোমার চরণের সেবায় তুমি গ্রহণ করো, ঠাকুর।

আমি ঠিক কি বলব বুঝতে পারছিলুম না। রাত তখন সাঁ সাঁ করছে, কেউ কোথাও জেগে নেই। তাছাড়া এই ছোট আশ্রমটি আখড়ার একদম দক্ষিণ প্রান্তে। মাঝখানে মস্ত উঠোন, তারপর ফুলের ছোট বাগান, এবং তারপরে কীর্তনের সেই মণ্ডপ।

মেয়েটার চোখ দুটো কেমন যেন আবেশ-মদির, একটু যেন নিমীলিত। লোকে বলবে ওর মুখশ্রী ভাল, স্বাস্থ্যশ্রী আরও ভাল,—ওর খোলা গা আমি বহুবারই দেখেছি এবং সেদিকে মানদা ভ্রূক্ষেপও করে নি।

কিন্তু ওকে দেখে আমি ভয় পাচ্ছিলুম।—

মানদা হাসিমুখে প্রশ্ন করল, বসে রইলে ঠাকুর, ঘুম আসছে না?

ওর মুখের দিকে আবার তাকালুম। আমি দেখছি ওর দুই চোখে অতি মধুর তন্দ্রাবেশ, কিন্তু আমার দিব্যচক্ষু দেখছে সেটি সত্য নয়! সহজিয়া মেয়ে কাকে বলে আমি জানিনে, কিন্তু শিকারকে সামনে রেখে যে-বাঘিনীর চোখ ধ্যানতন্দ্রায় জড়িয়ে থাকে তাকে বিশ্বাস করতে বাধে!

বললুম, তুমি গিয়ে শুয়ে পড় না কেন?

আচ্ছা, তাহলে এবার তুমি ঘুমোও ঠাকুর। আমি একটু বাতাস দিয়ে যাই। বড্ড গুমোট।

আবার আমি জানলার দিকে পাশ ফিরে কঠিন প্রতিজ্ঞা মনে নিয়ে শুয়ে পড়লুম। হ্যারিকেনের আলোটা জ্বলছে ঘরের ওদিকে। মানদা আর আমার গায়ে হাত দিল না। শুধু পিঠের দিকে বাতাস করতে লাগল।

আমি তিন মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

মানদা কিন্তু সত্যিই বলেছিল। শ্রাবণের শেষ এবং ভাদ্রের প্রারম্ভে গুমোট দেখা দেয়। জানলা দিয়ে কতক্ষণ ধরে ফুরফুরিয়ে বাতাস আসছিল, এবং সে-বাতাস কতক্ষণ আগে থেমেছে আমি টের পাই নি। মানদা কখন্ হাতপাখা রেখে তক্তা থেকে নেমে মেঝের উপর গড়িয়ে পড়েছে তাও জা নি

জানিনে। কিন্তু গরমের চোটে এক সময় ছাঁৎ করে আমারই ঘুম ভেঙে গেল। দেখি গলা দিয়ে আমার ঘাম নেমেছে এবং মশাও বেশ কামড়াচ্ছে দু'চারটে। আলোটা তেমনিই জলছিল।

কোঁচার খুঁট দিয়ে ঘাম মুছলুম। মশাগুলো তখনও গায়ের আশেপাশে ঘুরছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরে দেখি, কলাবাগানের মাথার উপর বোধ করি মেঘ জমেছে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

হাতপাখাখানা মানদা কোথায় রাখল দেখতে গিয়ে চোখ পড়ল মেঝের দিকে। মানদা অকাতরে হাত-পা ছড়িয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। পাখাখানা রয়েছে তার ডান হাতের মুঠোয়।

আমি শিশু নয়, বালক নয়, আঠারো বছরের তরুণ পুরুষ! আমি জ্ঞাতাস্বাদও নই। তবু অবাক বিস্ময়ে মানদার আনগ্ন আপাদ-মস্তক চেয়ে রইলুম। সে সহজিয়া মেয়ে, যিনি দেহতত্ত্বরসের দেবতা তাঁরই উদ্দেশে মানদা আত্মনিবেদিতপ্রাণা! দেবতার প্রতি অঙ্গের জন্য তারও প্রতি অঙ্গ কাঁদে! সেই দেবতা যেন তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সকল লজ্জাবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে আমার সামনে ওকে মেলে ধরেছেন!

দেখতে দেখতে বজ্র বিদ্যুতের সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। স্নিগ্ধ বাতাসের ঝাপট এল ঘরের মধ্যে। আবার আমি শুয়ে পড়লুম।

পরদিন যথাসময়ে ওরা আমাকে স্টীমবোটে তুলে দিয়েছিল। মানদার সঙ্গে ছিল মোড়ল আর শোভারাম। আমাকে বিদায় জানাবার কী ঘটা! সঙ্গে দিতে চেয়েছিল এক হাঁড়ি ক্ষীর, কয়েকটা ঝুনো নারকেল আর এক ছড়া মর্তমান কলা। আমি কিছু নিই নি। ওরা দিয়েছিল ধুতি চাদর, একটি সোনার অঙ্গুরী, গেরুয়ার দোপাট্টা—আমি তাও রেখে এসেছি। আমার নিজের হাত-কাটা টুইল শার্ট, খাটো ধুতি এবং আমার কেনা এই চটি জুতো—ব্যাস, এই যথেষ্ট। তবে নৈবিদ্যির গামছায় বাঁধা টাকার পুঁটুলিটা পেট-কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিলুম! আমি এখন অনেক টাকার মানুষ। অগাধ টাকা এখন আমার। সেদিন এত লোক যাচ্ছিল স্টীমবোটে, কিন্তু ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে বিশ্বাস করলুম, আমার মতো ধনী কেউ নেই ওদের মধ্যে! ওরা কি জানে কত টাকা আছে আমার সঙ্গে! সকলের লোভের চক্ষুর উপর দিয়ে সৌভাগ্যের পুঁটলি নিয়ে যাওয়া কী আনন্দ সে কাকে বোঝাব? আজকাল একটা এম-এ পাস করা ছেলে কুড়ি টাকার চাকরির

জন্য ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছে, সে কি জানে তার তিন বছরের মাইনে আমার ট্যাকে গোঁজা রয়েছে ?

যাই বলো, ওই মেয়েটার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচলুম ! আর দুদিন থাকলে আমার মাথায় খুন চাপত ! মেয়েটার মতলব একেবারেই ভাল ছিল না। আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যেন যৌন দুর্নীতির পিচ্ছিল পথে নিয়ে যাচ্ছিল। কথায়-কথায় আমার ধর্ম, আমার ব্রহ্মচর্য, আমার ইজ্জত পর্যন্ত নষ্ট করছিল। আমি যে কৌমার্য ব্রতধারী এবং স্বামীজীর মন্ত্রসিদ্ধ,—মানদাকে এটা কোনমতেই বোঝানো যাচ্ছিল না। সে বোধ হয় আমাকে দু'বছরের কচি শিশু ছাড়া আর কিছু মনে করে নি।

বট-বাবাজিকে ছাতাটা দিয়ে দিয়েছি, ওতে আমার দুঃখ নেই। সে বড় মধুর বাউল গান গায়। রৌদ্রে আর বর্ষায় তাকে ভিক্ষায় বেরোতে হয়, ছাতাটা তার দরকার।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আনন্দের কথা এই, আমি এযাত্রা পালিয়ে বাঁচলুম !

এরপর টাকা নিয়ে বেশ কিছুদিন ছিনিমিনি চলল। যাদের কাছ থেকে তিরিশ টাকা ধার নিয়েছিলুম, তাদের নাকের ডগায় প্রত্যেকটি টাকা ধরে দিলুম। তারপর আনলুম আট আনায় একসের রাবড়ি, পাঁচ আনায় এক সের চিনিপাতা দই। পয়সা-পয়সা শ্রেষ্ঠ আম-সন্দেশ, কে কত খাবে খাও ! ছ'আনা সের কাটা রুই, ছ'আনা মাটন,—রান্নাঘরে মোচ্ছব লেগে গেল। ডিম খাওয়া বাড়িতে নিষিদ্ধ, স্থতরাং গা ঢাকা দিয়ে এক সময়ে হোটেলে গিয়ে ডবল-ডিমের অমলেট খেয়ে এলুম তিন পয়সায়। বউদিদির জন্য জংলা গরদের শাড়ি আট টাকার, মায়ের জন্য পুজোর বাসন, বিছানা-বালিশ-ওয়াড়-মশারি, রাত্রের দিকে সবাই খাবে গাওয়া ঘিয়ের লুচি,—টাকা উড়তে লাগল কিছুদিন ধরে। ওদিকে তেরো বছর বয়সের ভাগ্নেটা আসে যখন-তখন। সে পাকা চোর। সে যদি পয়সাকড়ির গন্ধ পায় তবে আর রক্ষা নেই। তার ধারণা, ভাগ্নেদের জন্ম হয় মামাদের তপিল মারবার জন্য। খবর পেয়েছিলুম, প্রত্যেক বাক্স-প্যাটরার দ্বিতীয় চাবিটা সে আগেভাগে সংগ্রহ করে রাখে। সাধু সাবধান !

মায়ের ইচ্ছা, পুজোর পর তিনি কাশী-বৃন্দাবন-হরিদ্বার-জয়পুর-পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ করতে যান। আমি উল্লাসে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলুম। আমার তখন চোখ ফুটেছে, পথঘাট চিনেছি, বাইরের ডাক মাঝে মাঝেই কানে আসে। আমি এখন সাবালক, সাবালকের সব লক্ষণ এখন আমার মধ্যে পরিস্ফুট। মেয়েদের

ম্নানের সামনে এখন আর আমি দাঁড়াইনে। বরং আমার মাসতুতো-পিসতুতো-মামাতো ভাইদের মিলিয়ে বারো চৌদ্দটি যাঁরা আমার বউদিদি, তাঁরা আমাকে সামনে দেখলে তাঁদের দেহের পুঁজিপাটার উপর ভিজে কাপড় টেনে-টুনে দেন। এখন আমি সাবালক, আর আমি কারো পরোয়া করিনে!

প্রথমেই কাশী এলুম। কিন্তু গত বছর শীতকালে যখন আসি তখন এখানে হয়েছিল প্রথম 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'। কী ঘটা তিনদিন ধরে! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়েছিলেন সভাপতি। অনেক নামজাদা সব লেখক এসেছিলেন। একজন বুঝি লেখিকা কে যেন। আমি আবদার ধরেছিলুম ভলান্টিয়ার হবো। ওই একটা লাল রংয়ের ব্যাজ আমার জামায় লাগানো থাকলে আমার পক্ষে ওই সম্মেলন হবে অবারিতদ্বার। সুতরাং কিশোর দাদা তাঁর বন্ধু ভূপেন বিশ্বাসকে বলে আমার ব্যবস্থা করলেন। কাশীরাজের দেওয়ান ললিতবিহারী সেনরায়, বিশু ও বেণী গুপ্ত, দু'চারজন মহামহোপাধ্যায়, আরও কত লোক। ওদের সকলের মধ্যে উজ্জল হলেন রবিঠাকুর। কাঁচাপাকা দাড়ি, ধবধবে রং, গায়ে শাল, নাকে টেপা-চশমা, তার ডাঁটি নেই। বিরাট পুরুষ। উনি নাকি প্রায় সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন।

আর আমার কিছু মনে নেই। গত বছর আমি নাবালক ছিলুম। কিন্তু এ বছর? এ বছর আমি মাছের ব্যবসা করে দু'হাতে টাকা রোজগার করেছি। দুর্যোগে, দুস্তরে, অন্ধকারে,—কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি হয়ে বার বার আমার ছিপনৌকা ডুবে যেতে চেয়েছিল, আর আমি সমস্ত বর্ষাকালটার ঝড়ের আঘাতে বৃষ্টির তাড়নায় ছিন্নভিন্ন চেহারায় বিপরীতের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছি। ওরই মধ্যে দেখে নিয়েছি মানুষের ভালবাসা আর মমত্ববোধ, মানুষের স্বার্থপরতা আর ইতর চক্রান্ত, ওরই মধ্যে দেখেছি আনন্দে বেদনায় দুঃখে নৈরাশ্যে দুঃসহ দহনে আমি বিপর্যস্ত এবং দ্বন্দ্বদোলায়িত। আমার অন্ততঃ পঁচিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে। এখন আমি সাবালক।

কাশীতে এখনও তেলের আলো জ্বলে, শুক্লপক্ষে তাও থাকে না। খোয়ার রাস্তায় শুধু এক্কা আর টাঙ্গা। চারদিকে জপতপ পূজাপার্বণ। গভীর রাত্রে নাকি কালভৈরব পাপীদের অস্থি নিয়ে ছুঁড়ে দেন ব্যাসকাশীর দিকে, পুণ্য বারাণসীতে তাদের ঠাঁই নেই। প্রতিদিন প্রত্যুষে কুচবিহারের কালীবাড়ীর উচ্চচূড় নহবতখানায় অতি মধুর শানাইয়ের সুর ওঠে। সেই সুর ভেসে যায় উত্তরবাহিনী গঙ্গার প্রবাহে। সেই মধুর সুরধ্বনিতে আমাদের ঘুম ভাঙ্গে।

তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বেড়ে উঠল কাশীতে। কাশী থেকে যাচ্ছিলুম বৃন্দাবনের

দিকে। এটি অযোধ্যা ও রোহিল্লাখণ্ডের রেলপথ, এবং এটি যুক্তপ্রদেশকে ছেয়ে রয়েছে।

এই যুক্তপ্রদেশ থেকে মাঝে মাঝে বজ্র-কণ্ঠের ডাক দিচ্ছেন মোতিলাল নেহরু। পাঞ্জাবে যেমন পাঞ্জাব কেশরী লালা লজপত রায়। বাঙলায় যেমন দেশবন্ধু। দেশবন্ধুর প্রতি অসীম অনুরাগ নিয়ে উঠেছেন চারটি প্রতিভা। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, সঙ্গীতাচার্য কিন্নরকণ্ঠ দিলীপকুমার রায়, এবং রাজনীতিতে যিনি প্রথম আবির্ভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠলেন, সেই সৌম্য সুদর্শন তরুণ কুমার সুভাষচন্দ্র বসু। বিলাত-ফেরত উচ্চাভিলাষী যুবকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় যে চাকুরি, যার নাম আই সি এস, সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই চাকুরি পরম অবহেলায় অনেকটা যেন ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করলেন, এবং ঝাঁপ দিলেন দেশকর্মে। এই যুক্তপ্রদেশে স্বরাজ্য পার্টি একটি পরিণত রূপ নেয় এবং সম্ভবত এই বছরেই জওহরলাল নেহরু ব্যারিস্টারী ছেড়ে দেন। স্বরাজ্য পার্টির প্রবল শক্তিলাভের ফলে ইংরেজ শাসকবর্গ এবার সচকিত হন।

মথুরায় এসে বিশ্রামঘাটে থমকিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। আশা ছিল কংসের কারাগার দেখব, দেখব শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থল, দেখতে পাব যমুনার ঠিক কোন্ ঘাট থেকে জন্মাষ্টমীর বর্ষামুখর ও বজ্রবিদ্যুদ্দাম-শিহরিত গভীর রাত্রে বসুদেব তাঁর শিশুকৃষ্ণকে বুকে করে নদী পার হয়েছিলেন। দেখব সেই স্থলটি, যেখানে বাসুকী তাঁর সহস্র ফণায় বসুদেবের মাথায় ছত্র ধারণ করেছিলেন এবং ধর্মরূপী শৃগাল তাঁকে নদী উত্তরণের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

না নেই, সে-যুগ কবে শেষ হয়ে গেছে। আমরা এলুম বৃন্দাবনে। ঘুরে বেড়ালুম নিধুবন আর মধুবনে, বেত বন আর মাঠ বনে, দেখে বেড়ালুম লালাবাবুর কীর্তি আর গোবিন্দের মন্দির। কখনও অন্ধকারে, কখনও তেলে-জ্বালা গলি-ঘুঁজিতে, কখনও শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায়, আবার কখনও বা ধীর-সমীরে বংশীবটে কালীয় দমনের ঘাটে ঘাটে—কী যেন খুঁজলুম! প্রাচীন পাথরের গন্ধে-গন্ধে, ভগ্নজীর্ণ অট্টালিকার আনাচে-কানাচে, মন্দিরের পূজারীর দুর্বোধ্য পূজামন্ত্রে—কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম আকুল আগ্রহে। যা জানিনে, বুঝিনে, অনুমান বা উপলব্ধি করিনে, যার আস্বাদ পাই নি কখনও, যার ইশারা কোথাও দেখিনে, আমি যেন খুঁজছিলুম সেই অনাস্বাদিতকে!

এসে দাঁড়ালুম জয়পুরে। চারিদিকে রক্তবরণ জাফরিকাটা বিচিত্র

অট্টালিকা। সে অপরূপ ছবি। এখানেও গোবিন্দজী আর যশোরেশ্বরী কালী। সে সব যেন অনেক ইতিহাস অনেক কালের। আম্বের দুর্গ আর সেই গল্‌তার প্রপাত,—সর্বত্র যেন কোন্ প্রাচীনের কাঁদন ফুঁপিয়ে ওঠে! না, এরা এখন তোলা থাক্ আমার মনের মনিকোঠায়। ভিড়ের ভিতরে দাঁড়িয়ে এদের দেখব না। একা দেখব এদের একান্ত করে। এখন এরা থাক্। আমি শুধু পথ চিনে রাখি।

আজমীর নয়, আজমের। যেমন বিকানের, যশলমের। উচ্চারণে ভুল হলে চলবে না। অম্বর দুর্গ নয়, ওটা আমবের। আমার সহপাঠী বন্ধু গিরিজা সেন—জয়পুর মহারাজার প্রাক্তন মন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেনের নাতি—তাকে প্রশ্ন করো, সে নির্ভুল উচ্চারণ করবে। আজমের থেকে পুষ্কর। পুষ্কর দুষ্কর—পাণ্ডারা বলে। কূর্মপৃষ্ঠ আরাবল্লির একটুখানি অংশ পেরিয়ে গেলে পুষ্কর হ্রদ। সেখান থেকে মরুভূমি। বালুর মধ্যে পা ডুবে যায়। প্রতি পদক্ষেপে বড় বড় কাঁটা পায়ে ফোটে। ওরই ভিতর দিয়ে ওঠো সাবিত্রী পাহাড়ে। ব্রহ্মার দুই স্ত্রী—সাবিত্রী আর গায়ত্রী। সাবিত্রীর মন্দিরটি ছোট, যেন নিরভিমান, তার অঙ্গসজ্জা নেই, অলঙ্করণ নেই। ভিতরে একটি জয়পুরী শ্বেত-বর্ণ বালিকা বধূর মূর্তি। সে যেন নিত্যকাল ধরে বড় বড় চোখে চেয়ে রয়েছে চারিদিকের রুক্ষ ধূসর মরুভূমির দিকে। সাবিত্রী, তুমি থাকো তোমার শাঁখা, সিঁদুর আর নোয়া নিয়ে। আজ আমি দেখে যাচ্ছি তোমাকে আমার জননীর চোখ দিয়ে। আবার আমি আসব, একান্ত করে তোমাকে দেখে যাব।

সমস্ত ভ্রমণটা যেন স্বপ্নাবেশ এনেছিল আমার দুই চোখে। আমি যেন যন্ত্রচালিত, অদৃশ্য যন্ত্রী আমাকে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি যেন চিরকালের সেই নিত্য তীর্থপথিক, যার প্রারম্ভ ও পরিণতি নেই। আমি যেন অনাদিকালের পরম নিয়মের সঙ্গে আমার গতিকে মিলিয়ে রেখেছি।

শেষ রাত্রির শীতের হাওয়ায় একদা লাক্‌সার পেরিয়ে হরিদ্বারে এসে পৌছলুম। ১৯২৩, নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। যারা গাড়ি থেকে নামল তারা আমার চোখে নতুন। উলি-ঝুলি ময়লা পরিচ্ছদ, আধা-উলঙ্গ, বৈরাগী, বাউণ্ডুলে, মাথায় ঝাঁকড়া-জটা, কাঁধে কম্বল, হাতে লোটা—তারা নামল দলে দলে। না, পরিচিত বাঙ্গালীর মুখ দেখছিনে। কোথাও দেখছিনে শিক্ষিত-ভদ্রের ছাপ, দেখছিনে পালিশ করা আধুনিককে। ঘরকুনো বাঙ্গালী দু'চারজন হয়ত পথ ভুলে আসে, কিন্তু সে যেন খবরের কাগজের খবর! বিচিত্র বলেই প্রকাশিত হয়।

ছোট স্টেশনটি পেরিয়ে বাইরে এসে দেখছি একটি জনপদ। একদিকে দু'চারখানা বাড়ী, মাঝে মাঝে বস্তি, ফাঁকে ফাঁকে এক-আধখানা পুরি-কচুরির দোকানে উনুন জ্বালিয়ে কড়াই চাপানো হয়েছে। অন্য দিকে ঘন ঝোপ আর অফুরন্ত জঙ্গল, তারই মধ্যে কোথায় যেন বিল্বকেশ্বর মন্দির। সামনে মস্ত মনসা পাহাড়—তার নিচে আগাগোড়া সমগ্র জনপদটাকে মনে হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র, মানুষদেরকে মনে হচ্ছে পিপীলিকা শ্রেণী!

যে-গঙ্গাকে জেনেছি আশৈশব, এ গঙ্গা সে গঙ্গা নয়। সেই গঙ্গার নাম হুগলী নদী, সেখানে প্রচলিত ভাগীরথী। এখানে হরিদ্বারের নীলধারা, ওধারে মায়াপুরের মূলগঙ্গা, চণ্ডী পাহাড়ের নীচে। আমি রুদ্ধবাক, তন্ময়, তদ্‌গত, তদ্ভাবে ভাবিতম্‌। নুড়ি পাথরে ভরা নীল নদী দেখি নি আগে, প্রবলা খরস্রোতার উল্লাস-গর্জন কেমন আগে জানতুম না। চারিদিকে পাহাড়, ওপারে বাবলার ঘন জঙ্গল, দূরে হিমালয়, আরও দূরে অস্পষ্ট শুভ্র তুষারচূড়া।

আমাদের প্রবীণ পাণ্ডা কুম্ভকরণের ধর্মশালার ঠিক নিচে অশ্বত্থ গাছের তলায় রক্তবর্ণ সিঁড়ির ধার দিয়ে চলেছে বেগবতী গঙ্গা, সেই সিঁড়ির ধারে বসে দেখতে দেখতে কান্না এলো আমার চোখে। সেই কান্নার উৎস ছিল আমার মূল সত্তায়, সেখান থেকে উঠছে যেন একটা আনন্দধারা আমার সর্বদেহে একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। আমি বাস করছি এক রোমাঞ্চ আনন্দে। আমার নিবিড় উপলব্ধির মধ্যে যেন সমগ্র শৈব হিমালয় জপের আসনে বসে তার বীজমন্ত্র পাঠ করছে। সেই ধ্যানাবেশ আমার দুই চোখে আনছিল ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুর প্রবাহ।

কলকাতার সরকার বাগানে ব্রাহ্ম ছেলেমেয়েদের মুখে যে কবিতাটা প্রায়ই শুনতুম, সেটি যেন আজ পরমার্থ বহন করে আনল, "এতদিনে জানলেম যে-কাঁদন কাঁদলেম সে কাহার জন্য/ধন্য এ জাগরণ ধন্য এ ক্রন্দন/ধন্য রে ধন্য।"

মা বোধ করি লক্ষ্য করছিলেন আমার ভাবান্তর। তাঁর চোখে আমার কিছুই এড়ায় না। তিনি দেখছিলেন আমি দল ছাড়া, আমার গোত্রের সঙ্গে ওদের কারও মিল নেই। আমি হঠাৎ এমন একদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলুম, যেখানে আমি খেইহারা, দিশেহারা—কে যেন অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে আমার সকল শৃঙ্খল মোচন করে দিচ্ছিল। মা সব দেখছিলেন। কিন্তু তাঁর চিরকালের অবাধ্য সন্তানটির প্রতি তাঁর কিছু পক্ষপাতিত্ব ছিল।

সত্যনারায়ণের মন্দির ছাড়িয়ে সোজা গিয়ে পৌছলুম হৃষিকেশে। এক অনুন্নত ক্ষুদ্রতর জনপদ। সাধুসন্ত, বোরেগী আর তীর্থযাত্রী ছাড়া অন্য কেউ

আসে না। অধিকাংশ হাঁটাপথের মানুষ। পথের উপর দিয়ে চন্দ্রভাগার ক্ষীণধারা গিয়ে মিশেছে নীলধারা গঙ্গায়। উত্তরে পর্বতশীর্ষে নরেন্দ্রনগরের প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম দিকে দেরাদুনের গহন অরণ্য। ওদিকটা হিমালয়ের তরাই অঞ্চল। আমরা হিমালয়ের তোরণদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে মাত্র একটি দিনের মধ্যেই। আমি যেন চারি দিকের আশ্চর্য হিমালয়ের প্রতি স্তরে স্তরে শুনতে পাচ্ছিলুম সেই অনাদিকালের মন্ত্র, 'জয় শিবশম্ভো!' আধুনিককাল, মানব সভ্যতা, ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন, আমার অন্নসংগ্রাম ও নব্য সাহিত্য চিন্তার এলোমেলো জটিলতা সব আমার পিছনে পড়ে রইল। আমি লছমন-ঝুলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম—যেন আমি এক অজানা অচেনা নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করেছি।

লছমনঝুলায় দাঁড়িয়ে অগাধ নিচে দেখি, নীলকণ্ঠ পর্বতের পায়ের তলা দিয়ে চলেছে ভাগীরথীর নীলধারা। জল যে হয় এত নীল, এত স্বচ্ছ—আগে জানতুম না। নীলকণ্ঠের নীলাভা আর সূর্যদীপ্ত আকাশের নির্মল নীলিমা জাহ্নবী যেন আপন বক্ষে ধারণ করেছে। উত্তরে দূরে চেয়ে দেখি এই নীলধারা যেন কোন্ এক রহস্যলোক থেকে বেরিয়ে এসেছে।

আপাতত এই আমার সীমা, আর এক পাও নয়। ঝুলাপুল পেরিয়ে মুনি-কি-রেতির তপোবনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে এসে গীতাভবনের ঘাটে নেমে নৌকাযোগে আবার এপারে এলুম। দেখে গেলুম হিমালয়ের প্রবেশ পথ। এই পথে আমার ইষ্টমন্ত্র তুলে নিয়েছিলুম।

কে যেন সেদিন আমার সামনে ভারত এবং মহাভারতের সকল দরজা খুলে দিয়েছিল। কেউ আমাকে টানছিল, কেউ যেন আমার ঝুঁটি ধরে নাড়া দিচ্ছিল।

কেন সেবার ফিরতি পথে প্রথম গিয়ে দাঁড়ালুম দিল্লীতে? সেই সেদিনকার পাথরের পাঁচিলে ঘেরা দিল্লী কী ব্যঞ্জনা এনেছিল আমার মনে? চারিদিকে বিধ্বস্ত তার প্রাচীন ইতিহাস। সেই ইতিহাসের শ্মশানভূমির আশেপাশে ঘুরেছিলাম। পাঁচিলের ওপারে নতুন দিল্লী তখন তৈরি হচ্ছে। এদিকে যমুনার ধারে বিরাট দিল্লী দুর্গ, যার নাম লালকেল্লা। তার সামনে বিস্তীর্ণ ময়দান। ময়দানের ওপারে জুম্মা মসজিদ। যানবাহন একমাত্র হল টাঙ্গা।

পুরনো দিল্লীর ধর্মশালায় দু'দিন কাটিয়ে আমরা ফিরলুম। তখন সুবিধা ছিল এই, রেলগাড়িতে যাত্রীসংখ্যা থাকত একেবারেই কম।

ইংরেজের ওপর রাগ ক'রে আমরা মাটির ওপর ভাত রেখে খাচ্ছিলুম। 'গোলামখানা' ত্যাগ করতে গিয়ে লেখাপড়া নষ্ট হতে বসেছে। বহু ভাল ছেলে মার খাচ্ছে। 'জাতীয়' ইস্কুল বা কলেজ ব'লে যেগুলো রাতারাতি গজিয়ে উঠেছিল, সেগুলো অপদার্থ। সেখান থেকে আদর্শবাদী শিক্ষকরা একে একে গা-ঢাকা দিচ্ছিল। তেল না থাকলে পিদিম জ্বলে না।

মাঝ থেকে আমি কেন ঠকে যাই? আমারও ভবিষ্যৎ আছে, উচ্চাভিলাষ আছে, মানুষের মতন মানুষ হবার চেষ্টা আছে—সুতরাং নিজের দিকটাও দেখা দরকার! ডিগ্রি না থাকলে চাকরি-বাকরির কোনও আশা নেই।

পূজোর আগে কলেজে গিয়ে বাকি-বকেয়া সমস্ত মাইনে চুকিয়ে দিয়ে এলুম। অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্র মহাশয়ের কাছে কেঁদে-কেটে একখানা চিঠিও লিখলুম।

জানুয়ারীর গোড়ায় আবার ঢুকলুম কলেজে। আমার লেখাপড়ার রেকর্ড খুব খারাপ ছিল না। প্রথম সারিতেই বসতুম। রোল-কল করতেই কুড়ি মিনিট চ'লে যেত। অনেকদিন ধ'রে আমার কয়েকটি বন্ধু আমার হয়ে 'প্রক্সি' দিত—সেটা এবার বন্ধ হ'ল। এ কলেজে তখনও সহশিক্ষার চলন হয় নি, সুতরাং সহপাঠিনীর প্রতি ইশারা-ইঙ্গিত, কাগজের কুটি ছুঁড়ে মারা, বেঞ্চের তলা দিয়ে পায়ে পা ঠেকানো, পরোক্ষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ,—এসব বদ্-অভ্যাস ছিল স্বপ্নবৎ। আমি মনোযোগী ছাত্র ছিলুম।

হঠাৎ একদিন মনে প্রশ্ন দেখা দিল। কী বকর-বকর করছে ওই লোকটা —ওই লজিকের অধ্যাপক মিঃ গুপ্ত? মাথা নেই, মুণ্ড নেই, শুধু 'দিনগত পাপক্ষয়' ক'রে যায়? ওঁর ত বইপড়া বিদ্যে! নিজে চার-পাঁচটা পাস করেছেন কতগুলো বই পড়ে। সেই একই বস্তু আর কথার কচকচি আবার আমাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন—বইয়ের বাইরে জীবনের সঙ্গে যার কোনও যোগ নেই! ইতিহাসও তাই। গ্রীস, রোম আর ইংরেজের ইতিহাস! চুলোয় গেল ভারতবর্ষ। কেন পড়ব ওসব—যার সঙ্গে আমাদের তিলমাত্র যোগ নেই? এর সঙ্গে আবার কেমিস্ট্রি! দু'রকমের রস মিললে তৃতীয় রসটা হয় অন্যপ্রকার! তা হয় হোক, আমি ত হ'তে চাইছি রেল-আপিসের কেরাণী!

সব শেষে আবার 'বটানি।' ওই বটানির পাঠ নিতে আবার ছোটো সেই বহুবাজারের মোড়ে, যে-বাড়িটায় গাছপালা সাজানো। সামান্য সাধারণ লতাপাতা, শেকড়-মাকড়, গাছপালা—কিন্তু কিম্ভূত-কিমাকার তাদের একেকটা বিদেশী নাম, যা কোনও দিন কোনও অর্থ বহন করে না! আমি খুঁজছিলুম নিজের জন্য জীবনের পাঠ—এই বিভ্রান্তিকর গ্রন্থপাঠ নিয়ে কী হবে আমার? কলেজে শুধু সৃষ্টি হয় বেকার আর নৈরাশ্যবাদী।

মাস দুই কাল আমি এই 'মূর্খের স্বর্গে' বাস করেছিলুম। তারপর নেমে এলুম পথে। আমি চাইনে এই কলেজ-মেসিনে তৈরি আমার কোনও নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ। বাঁধাধরা জীবন স্বীকার করিনে। প্রচলনের সমস্ত শৃঙ্খল আমি চূর্ণ ক'রে দেবো। আমি কলেজী আদর্শের কল্যাণ চাইনে, তথাকথিত সামাজিক জীবন চাইনে, মনীষীদের উপদেশ আমার কোনও কাজে লাগবে না! আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, চরিত্রের আদর্শ, ন্যায়নীতি, সস্তা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, অধ্যাপকদের অপরিণামদর্শী শিক্ষাদান—সব মিথ্যে, ভণ্ডামি, সব অর্থশূন্য। কোনও বিধি-নিয়মের দাসত্বে আমার মন খাপ খাচ্ছে না। আমি চাইছি সবব্যাপী একটা ভাঙ্গন—কিন্তু সেই ভাঙ্গন কি প্রকার হবে, সেটি আমি ভেবে পাচ্ছিনে।

ইতিমধ্যে 'শঙ্খ' এবং 'মসলিশ' নামক সাপ্তাহিকে আমার দু'তিনটে লেখা বেরিয়েছে। 'কল্লোল' কাগজেও বেরিয়েছে আরেকটা। হাতে-লেখা ম্যাগাজিনেও বোধ হয় চার-পাঁচটা। তার মধ্যে ছিল প্রভাত কিরণ বসুর কাগজ। উনি আমাদেরই স্কটিশের ছাত্র। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বাঙ্গলায় তিনি ফার্স্ট হয়ে স্বর্ণপদক পান। আমাদের ইস্কুলেই পড়ত স্টিফেনস্ নির্মলেন্দু ঘোষ। তার অকালমৃত্যুতে রজনী সেনের একটি গান গাওয়া হয়েছিল, "ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে,/সে যে মরমে ম'রে গেল, মুকুলে ঝরে গেল,/প্রাণভরা আশা তার সমাধি পাশে—" ইত্যাদি।

আমার সমস্ত লেখাগুলোই ছিল রাবিশ। ছাপার আগে পর্যন্ত মন্দ লাগত না,—কিন্তু বেরোবার পর নাক সিঁটকিয়ে উঠতুম। আগাগোড়া তাঁদের মানে খুঁজে পেতুম না। হরিহর চন্দ্র ওরফে 'রাঙ্গাদা' কিন্তু অন্য কথা বলতেন।

তখনও আমার খেলাধূলা করা এবং খেলা দেখার যুগ চলছে। এখানে-ওখানে ম্যাচ খেলতে নিয়ে যায়। ফুটবল আর হকিতে আমি মন্দ নয়। বলাইদাস চাটুয্যে আমাদের স্কুলের ছাত্র ছিলেন, এবং খেলা-ধুলোয় তাঁর সর্বাঙ্গীণ পারদর্শিতার জন্য তাঁকে স্কুলের উঁচু ক্লাসে বছরের পর বছর ধরে রাখা

হয়েছিল। আমরা কয়েকজন তাঁরই ছায়ায় খেলা করতুম। তখন মোহনবাগানের গৌরবের যুগ। ক্যালকাটা-মোহনবাগান, ডালহৌসী মোহনবাগান, সমারসেট-মোহনবাগান,—এসব খেলা ছিল ঐতিহাসিক। গোষ্ঠ পালকে সমগ্র বাঙ্গলা তখন ভারত-গৌরবের আসনে বসিয়েছিল। গোষ্ঠপাল ব্যাক-এ খেলেন, তাঁর কাছাকাছি এসে বিরুদ্ধপক্ষের সাহেব খেলোয়াড়দের নাকাল হতে দেখলে আমরা বড়ই পুলকিত হই। ক্যালকাটার লেফট-আউট নাইট আর গোষ্ঠ পালের সংঘর্ষণ যেন প্রবাদের মতন ছিল! এন্‌সটিস্‌ গ্যালব্রেথ বেনেট, কলভিন, কালী অর্থাৎ কাহালী, কুমার, পল্টু, রবি গাঙ্গুলী, সন্মথ, রাজেন সেন,—এঁরা গড়ের মাঠে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। সামাদ, রসিদ,—এঁদেরকেও কেউ ভোলে নি। আমি মোহনবাগান ক্লাবের নিষ্ক্রিয় সভ্য ছিলুম কিছু কাল। সেই কালে ওয়াই-এম-সি-এর সভ্য হয়ে রোজ সন্ধ্যায় হ্যারিসন রোডে একসারসাইজ করতে যেতুম।

এই সময় কাজী নজরুল ইসলাম ঝড় তুলেছে বাঙ্গলার সাহিত্যে। রুশ নর্তকী আনা পাবলোভা নাচতে এসেছেন কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিসর্জন নাটকে জয়সিংহের ভূমিকায় কালো জাল দিয়ে তাঁর শ্মশ্রু গোপন করে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর সেই তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠ,—"দক্ষিণ বাতাস যদি বন্ধ হয়ে যায়/ফুলের সৌরভ যদি নাহি আসে/যদি দশদিক ভরে ওঠে দশটি সন্দেহম/তবে কোথা সুখ—?" অন্যত্র—"করুণায় কাঁদে প্রাণ মানবের/দয়া নাই বিশ্বজননীর?" শিল্পের জগতে রয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ আর গগনেন্দ্রনাথ,—তাঁদের ভূরি সম্ভার নিয়ে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন গল্প-সাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্ন,—তাঁর সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব বিভিন্ন ও বিচিত্র কাহিনী শোনা যাচ্ছে। তিনি বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত, গৃহী না সন্ন্যাসী, চরিত্রবান বা চরিত্রহীন, তিনি গেরুয়া পরে একটি চেন বাঁধা নেড়ি-কুকুর নিয়ে শিবপুরের পাড়ায়-পাড়ায় ঘোরেন কিনা,—এই সব নিয়ে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা! এ ছাড়া আছেন বঙ্গসাহিত্যের বীরবল প্রমথ চৌধুরী, সঙ্গীত জগতে দিলীপ রায়, সম্পাদক সমাজে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও জলধর সেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ, চিকিৎসা জগতে স্যার নীলরতন সরকার, সুন্দরীমোহন দাস ও বিধানচন্দ্র রায়। বিজ্ঞান জগতে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। অভিনয় ও নাট্যকলায় মনোমোহন নাট্যমন্দিরের স্রষ্টা শিশির ভাদুড়ী। প্রসঙ্গত বলা চলে, থিয়েটারের প্রথম বাঙ্গলা নামকরণ করেন শিশিরকুমার এবং তিনিই প্রথম নাটকের বিজ্ঞাপনে ছবি দেওয়া প্রবর্তন করেন। তাঁর এই

উদাহরণে অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতার বহু দোকানপাট ও প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে বাঙ্গলা নাম প্রবর্তিত হয়। যেমন মডার্ন শু স্টোর্স হয়ে ওঠে পাদুকা শিল্পসদন। ভারতী পত্রিকাকে ধরে এককালে একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। সেই গোষ্ঠীর কেন্দ্র ছিল আমাদের বাড়ির সামনে নন্দ চৌধুরীর গলির মোড়ে ট্রাম রাস্তার ওপরেই গজেন ঘোষের বাড়ি। তিনি সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান এবং বাতব্যাধিগ্রস্ত। ওঁর বাড়ির নাম আমরা রেখেছিলুম হলদে বাড়ি। ওখানে পানাহারের মজলিশ বসত প্রায়ই। কে কে ওখানে আড্ডা দিতে আসতেন, তখনও আমার জানবার বয়স হয় নি। আরেকটি সাহিত্যের মজলিশ ছিল মানসী ও মর্মবাণী নামক মাসিকপত্রকে কেন্দ্র করে। তার মধ্যমণি ছিলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। শুনেছি সেখানে যেতেন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রায় বাহাদুর খগেন মিত্র, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শিল্পী যতীন সেন ও আর্যকুমার চৌধুরী—যাঁর স্ত্রী ছিলেন অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী কবি শ্রীমতী লীলা দেবী,—যাঁর পিতা ছিলেন রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়। আর্য চৌধুরী মহাশয়কে আমি দেখি নি, কিন্তু শিল্পীর হাতে তৈরি লীলা দেবীর ছবি দেখেছি মানসী ও মর্মবাণীতে। পরবর্তীকালে একদা ঘটনাচক্রে ঠাকুর মহাশয়ের নিউ আলিপুরের সুবৃহৎ অট্টালিকায় লীলা দেবীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থাদি আমাকে উপহার দেন। তাঁর মধুর সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম।

কিন্তু ওসব আলোচনা এখন থাক।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে আমি ছোড়দার কল্যাণে আরেকটি নতুন বউদিদি পাই। ইনি কৃষ্ণনগর অঞ্চলের মেয়ে, এবং আমার চোখ দিয়েই অনূঢ়া কন্যাকে পছন্দ করে আসি।

কিন্তু এই সময় আমার ভিতর ও বাহির থেকে কেমন একটা ডাক আসছিল, সেটি আমার মনকে কিছুতেই স্থির থাকতে দিল না। আমার পড়াশুনো গেছে, হিজি-বিজি সাহিত্য রচনায় অরুচি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা গ্লানিতে ভরে উঠছে,—প্রেতচ্ছায়ার মতো ভবিষ্যৎ চিন্তা আমাকে অনুক্ষণ অনুসরণ করে। আমার চুল ছাঁটার মতো পয়সা নেই, নতুন জামা-জুতো-ধুতি বহুদিন থেকে ভুলে গেছি। আমি নিঃস্ব, সর্বহারা, আমার মধ্যে জমছে আগ্নেয় লাভা, আমি জন্মবিপ্লবী, আমি আত্মদ্রোহী, আমি এখন লেনিনের মন্ত্রে দীক্ষিত! এই বছরেই লেনিনের মৃত্যু ঘটে জানুয়ারি মাসে। এই বছরেই মৃত্যু ঘটে স্যার আশুতোষের —যখন তিনি ডুমরাঁও রাজ মামলা পরিচালনায় ব্যস্ত ছিলেন। এই বছরেই

মৃত্যু ঘটে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের,—তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট কাউন্সিল নির্বাচনে পরাজিত হন এবং রাজনীতিক কলঙ্ক মাথায় নিয়ে অনেকটা ভগ্নহৃদয়ে মারা যান। তাঁর পরাজয়টি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জয়গৌরব হিসাবে ঘোষিত হয়। কলকাতার মেয়র হন দেশবন্ধু।

একদিন অতি প্রত্যুষে হাতে একটি ছোট পুঁটলি নিয়ে যখন সদর দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ মা উঠলেন জেগে! চোরের মতো আমি পালাচ্ছিলুম, ধরা পড়ে গেলুম।

এত ভোরে কোথায় যাচ্ছিস রে?

মায়ের মুখের দিকে তাকাবার সাহস ছিল না। আমার মিথ্যা বলার অভ্যাস কিছু কম, কিন্তু আজ বললুম,—মেদিনীপুরে ম্যাচ খেলতে যাচ্ছি, মা।

মা জানতেন আমি ফুটবল খেলতে যাই এখানে ওখানে। তিনি বললেন, ফিরবি কখন?

ফিরব?—থমকিয়ে থতিয়ে গেলুম—ফিরব হয়ত রাত্তিরে নয়ত কাল ফিরব মা। আর নয়ত দু-একদিন,—মানে—

মা আমাকে বিশ্বাস করতেন। তাঁর কণ্ঠে শুধু স্ফুরিত হল, দুর্গা দুর্গা, সাবধানে খেলিস, পায়ে যেন চোট লাগে না! দুর্গা, দুর্গা—

আমার কান্না পাচ্ছিল। পাছে ভেঙ্গে পড়ি, পাছে সত্য কথা বলে ফেলি, এজন্য মার পায়ের ধুলো নেওয়া অসম্ভব মনে হল! আমি বেরিয়ে চলে গেলুম। তখন প্রভাতকাল, কেউ জাগে নি পথেঘাটে। আমি প্রায় ছুটছিলুম নারকেলডাঙ্গার পথ ধরে মানিকতলায়। পুরনো পুল পেরিয়ে ডানহাতি ক্যানাল রোড ধরে উত্তরে। ছুট ছুট। কে যেন তাড়া করেছে পিছন থেকে ধরবার জন্য। আমি বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছি দেশ ছেড়ে পালাবার জন্য। আমার পকেটে আছে মোট দু টাকা পাঁচ আনা মাত্র। দেশত্যাগের পক্ষে এই যথেষ্ট! সন্ন্যাসীদের কী থাকে যখন তারা গৃহত্যাগ করে? কী ছিল পিণ্টুর, যখন সে নিউইয়র্ক পৌছয়? কত টাকা সঙ্গে ছিল, যখন ডি-ভ্যালেরা জাহাজের খোলে ছদ্মবেশে ঢুকে আমেরিকায় পালায়? রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে কত টাকা সঙ্গে নিয়ে? আমি এখন যাচ্ছি বর্মায়, সেখান থেকে হংকং, তারপর টোকিও, তারপর জাপান থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে কালিফর্নিয়া! আমার পথ অনেক দূর।

এই আমার কর্মসূচী। অতি স্বচ্ছ, অতি সরল। কোথাও অস্পষ্টতা নেই।

শ্যামবাজার থেকে আমার নিত্য সহচর রবি সরকারকে সঙ্গে নিয়ে সোজা ট্রামে চড়ে এসপ্লানেড, সেখান থেকে আউটরাম ঘাট। সময় কম, শিগগির চল্। এগিয়ে চল্, থামিসনে কোথাও। গতি চাই, বেগ চাই, ইচ্ছার জোর চাই, চরম লক্ষ্যে পৌছনো চাই! চল শিগগির চল। পিছনে ওরা কাঁদুক, ওরা চিরকাল কাঁদে! আমরা চিরকাল পালিয়ে যাই! "আমরা চলি সমুখপানে, কে আমাদের বাঁধবে?/রইল যারা পিছুর টানে, কাঁদবে তারা কাঁদবে।"

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টীম নেভিগেশনের সমুদ্রগামী জাহাজ 'এলিফ্যাণ্টা' যেন আমাদের জন্যই দাঁড়িয়ে ছিল। দু'জনের হাতে দুটো পুঁটলি। আমরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিলুম, কিন্তু ছদ্মগাম্ভীর্যের স্টাইল বজায় রেখে রবি সগর্বে এগিয়ে চলল। তার বাবা নতুন এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, অহঙ্কার তাকে মানায়।

সকাল সাড়ে আটটায় জাহাজ ছাড়ল। স্টীমারে চড়েছি, স্টীমবোটেও চড়েছি, কিন্তু এই বৃহৎ অতিকায় সমুদ্রগামী জাহাজে এই প্রথম। এ যেন ছয়তলা প্রাসাদ। আমরা উপরের ডেক-এর যাত্রী, কিন্তু আমরা যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। একটির পর একটি সাহেবী কেবিন, তাদের স্নানাগার, ডাইনিং হল, তাদের জন্য রিজার্ভ করা বারান্দা ও লাউঞ্জ। ডেক-এর উপর-তলায় ক্যাপ্টেন, ইনজিনিয়ার, ডাক্তার—এদের একেকটি কেবিন। নিচের তলায় মস্ত দোকান, বাজার, বেচাকেনা চলছে সেখানে। খাঁটি ঘিয়ে ভাজছে গরম-গরম পুরি আর কচুরি, সিঙ্গাড়া আর জিলাপি। সন্দেশ আর পানতুয়া। না থাক্, লোভ করলে আমাদের মানাবে না, আমরা বেরিয়েছি ভাগ্য অন্বেষণে! তবে হ্যাঁ, খাঁটি ঘিয়ের সুগন্ধ অনন্যপ্রকার। রবি যেন পাক খেয়ে গেল। বলল, দশটা বেজে গেছে দেখছি। তা হলে দয়া করে পেট ভরে খেয়ে নাও!

রবির খরচে পেট ভরে খেলুম।

ডেক-এর যেদিকটায় আমরা জায়গা নিয়েছিলুম, সেখানে ছিল ইঞ্জিনঘরের একটা অতি কটু ও বীভৎস গন্ধ। সেই গন্ধটা কেমন করে এড়ানো যায়, এই ভেবে রবি কিনলো হাতীমার্কা এক প্যাকেট সিগারেট, দাম দু'আনা। জীবনে সেই প্রথম আমাদের ধূমপান! 'পান' নয়, পাফিং। গলার মধ্যে ধোঁয়া গেলেই বিষম কাসি। সেদিন সেই জলন্ত সিগারেট মুখে দিয়ে মনে হল কী যেন একটা চিরকালের জন্য হারালুম! নীতি, আদর্শ, চরিত্র, সংযম,—সব মিলিয়ে কোথায় যেন কি একটা সর্বনাশ ঘটে গেল! ওই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে অস্পষ্ট চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছেন আমার আদর্শ পুরুষ স্বামীজী, আমার সর্বংসহা জননী—!

সূর্যাস্ত ঘটেছে পশ্চিম সমুদ্রে, তারই রক্তের আলিম্পন এখনও দেখতে পাচ্ছি দিগন্তে সমুদ্রের প্রান্তরেখায়। অন্যদিকে ধূসর অন্ধকার ছেয়ে আসছে। ডায়মণ্ড হারবারের সর্বশেষ লাইট-পোস্ট আর দেখা যাচ্ছে না। জাহাজ অদৃশ্য হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের বৃহত্তর ব্যাপ্তির মধ্যে। ধীরে ধীরে বিশ্বচরাচরের অবলুপ্তি ঘটছে অন্ধকারে। আমি ডেক-এর শেষ প্রান্তে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলুম। রবি ইতিমধ্যে বন্ধুত্ব পাকিয়েছে জাহাজের ইনজিনিয়ার সৌম্যদর্শন মিঃ ভাদুড়ির সঙ্গে।

বাহির-সমুদ্র সহজেই জানিয়ে দেয়, যত বড় জাহাজই হোক,—তরঙ্গভঙ্গের উত্থান-পতনের কাছে সে একটি দেশালাইয়ের বাক্স ছাড়া অন্য কিছু নয়! অন্ধকারে বোধ হয় মৌসুমী বায়ুর তাড়না ছিল তাই জাহাজ একবার যেন উঠে যাচ্ছে শূন্যলোকে, আবার তখনই তলিয়ে যাচ্ছে যেন সমুদ্রগর্ভে! দেখতে দেখতে আমার অন্ত্রেতন্ত্রে যে-বিপ্লব দেখা দিল এবং ঘূর্ণি লাগল, সেটাতেই আমি 'সমুদ্রপীড়ায়' আক্রান্ত হলুম। শরীরের ভিতরে যে বিকার দেখা দেয় এবং নাভিমূল থেকে উপর দিকে যে কাঠ-বমি উঠতে থাকে, সে বোধ হয় মৃত্যুরই যন্ত্রণা! আমি টলতে টলতে একস্থলে গিয়ে অচৈতন্যের মতো হয়ে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতে লাগলুম। রবির বোধ হয় অতটা হয় নি, কিন্তু সেও ক্ষণে ক্ষণে কাতরাচ্ছে।

একালের বিমানে যেমন 'বাম্পিং' হয় এয়ার-পকেটে। বিমানে যাত্রীদের বমির জন্য ঠোঙার বন্দোবস্ত থাকে। রেক্লাইনিং সীটে কোন-কোনও যাত্রী অনড় হয়ে গোঙাতে আরম্ভ করে।

চতুর্থ দিনে রেঙ্গুন বন্দরে পৌঁছেছিলুম।

অতঃপর আমাদের দুঃখের, দুর্গতির ও অনাহারের জীবন আরম্ভ হতে লাগল। আমরা সারাদিন টো টো করে ঘুরে বৃষ্টি-বাদলে ভিজে পথেঘাটে যা তা খেয়ে সন্ধ্যার পরে আশ্রয় নিতুম স্থানীয় দুর্গাবাড়িতে। মন্দিরের যিনি 'কেয়ার টেকার', সেই লোকটার নাম কবিরাজ, বাড়ী তার চট্টগ্রামে। লোকটা যখন-তখন আমাদের তাড়িয়ে দিত। কিন্তু আমরা অবাধ্য নেড়িকুকুরের মতো আবার এসে একপাশে জায়গা নিতুম। রাত্রের দিকে বর্ষায় ফুটো ছাদ দিয়ে নাটমন্দিরে জল নামত, আমরা সেই জলে চাটাইখানা বিছিয়ে রাত কাটাতুম। এক শ্রেণীর উন্নাসিক বাঙালী জানতে পেরেছিল, আমরা ভাগ্য অন্বেষণের জন্য বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি!

বর্মায় চিরদিন পূর্ববঙ্গের লোকসংখ্যা বেশি। বিশেষ করে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও নোয়াখালি থেকেই অধিকাংশ বাঙালী ওখানে নানা কাজ নিয়ে থাকে। রেল বিভাগে, ডাকঘরে, একাউণ্ট আপিসে এবং অন্যান্য সরকারী আপিসে প্রচুর বাঙ্গালী। এরা শিক্ষিত মধ্য ও স্বল্পবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। তখনও বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায়ের থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ দাঁড়িয়ে ওঠে নি। মনে রাখা দরকার, তৎকালে বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর ও সিংহল—এরা কেউ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন রাষ্ট্র নয়। এরা সবাই তখন ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত।

সেদিন অপরিণতবুদ্ধি দুটি তরুণের যে পরিমাণ রোমাণ্টিক অভিযানের পরিকল্পনা ছিল, ঠিক সেই পরিমাণেই তাদের সাধারণ জ্ঞান ছিল কম। দরজায় দরজায় তারা ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে ঘুরছিল, এবং আপিসে আপিসে তারা পায়ে ধরে বেড়াচ্ছিল। তারা একথা সেদিন বোঝে নি যে, দৈন্য ও ভিক্ষায় ভাগ্যের চাকা ঘোরে না। ওই চাকা ঘোরাতে গেলে হাতের কব্জির জোরের সঙ্গে বুদ্ধির জোর থাকা দরকার। আমরা শ্রমিক হতে না চেয়ে আপিসের কেরাণী হতে চেয়েছিলুম—সেইখানেই আমাদের ভুল ঘটেছে। কেরাণী হবার দৈন্য অপেক্ষা শ্রমিকের মর্যাদা অনেক বড়।

এই ভ্রান্তির ফলে আমাদের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল। ক্রমশ আমরা মানহারা, আশ্রয়হারা ও সর্বহারা হয়ে যাচ্ছিলুম। আমাদের ময়লা ও ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদ যথেষ্ট সম্ভ্রমসূচক না হওয়ায় জন্য বাঙ্গালী সমাজে গিয়ে দাঁড়াবার উপায় রইল না। আমার চটিজোড়াটা এমনভাবেই ছিঁড়ে গেল যে, ওটা মেরামত করার চেষ্টা বাতুলতা। সারা দিন-রাত্রের মধ্যে আমরা দু'জন চার পয়সার ভাত কিনে খাচ্ছিলুম। বহু দোকানে ব্যাঙ, নানাবিধ সরীসৃপ, বহুবিধ ছোট ছোট চতুষ্পদ, শূকরের নাড়ি, নানা পাখির দেহ,—এগুলি সুসিদ্ধ অবস্থায় ঝুলছে। সাদা ইঁদুর, সাদা আরশোলা, বড় বড় পতঙ্গ, সামুদ্রিক কাঁকড়া,—এগুলি নাকি খুবই সুস্বাদু। আমরা দু'জনে সেদিকে ক্ষুধার্ত ও লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে নিরাশ হয়ে চলে যেতুম। আমাদের উচ্চাভিলাষ এবং পৃথিবী পর্যটনের বাসনা—এ দুটোর ধার ক্ষয়ে যেতে লাগল।

স্থানীয় 'পন শপে' আমার শার্টটা বাঁধা দিয়ে চার আনা পেয়েছিলুম। ওতে আমাদের দিন তিনেক চলেছিল। তারপর বাঁধা দিতে হল হাতঘড়িটা। ওটার দরুন পাওয়া গেল একটি টাকা। তৎক্ষণাৎ আমরা সেই নিদারুণ বর্ষার মধ্যে পথে নেমে একটি খাবার দোকানে ঢুকলুম। পোকা-মাকড় দিয়ে

প্রস্তুত 'নাপ্পি' আর পেটভরা ফুরফুরে গরম ভাত,—যেমন উপাদেয় তেমনি রুচিকর। পেটে ক্ষুধা থাকলে নাকে দুর্গন্ধ লাগে না—সেদিন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম। যাই হোক, সেদিন আমাদের ছয় আনা খরচ হয়ে গেল।

আমরা ধীরে ধীরে নিচের স্তরে তলিয়ে যাচ্ছিলুম। আমাদের একমাত্র বাঁচবার পথ তখন রইল চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, পকেটমার এবং দোকানে ঢুকে হাত-সাফাই! মুশকিল এই, কোনটাতেই আমাদের হাত রপ্ত নয়। স্বামীজী বলেছেন, বরং চুরি করা ভাল, কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকা অপরাধ। আমরা নিষ্ক্রিয় নই, দৈনিক ষোল ঘণ্টা পথে পথে ঘুরি। ওরই মধ্যে একদিন গেলুম 'বড় ফয়া' দর্শন করতে। বুদ্ধের এত বড় মন্দির ভারত বা বর্মা কোথাও নেই। মন্দির প্রবেশ-কালে সম্মুখের বৃহৎ সোপানশ্রেণীর দুই ধারে সুন্দরী বর্মী মেয়েরা ফুল বেচতে বসেছে। ওদেরই মধ্যে যে-তরুণীটিকে রবি সর্বাপেক্ষা সুশ্রী মনে করল, তারই কাছ থেকে দু'আনার ফুল কিনে বসল!

করলি কি? দু'আনা যে আমাদের একদিনের খাইখরচ।

রবি জবাব দিল, ও তুই বুঝবি নে। আফ্‌টার অল্‌ মেয়েটা হল বিউটি!

ইতিমধ্যে গত কয়েকদিন থেকে দু'একজন লোক আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখছিল আমরা জানতুম। ওদের মধ্যে একজন সেদিন মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। লোকটা বাঙ্গালী। বলল, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তোমাদের নিশ্চয় মনে পড়বে তোমরা কোয়ারেনটাইন থেকে পালিয়ে এসেছিলে?

আমরা বললাম, তা হবে, আমাদের অসুখ-বিসুখ কিছু নেই। আপনি কে?

ভদ্রবেশী লোকটা বলল, আমি পুলিস বিভাগ থেকে আসছি, সি-আই-ডির লোক। তোমরা কি কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছ?

কেউটে সাপ, নরখাদক বাঘ এবং ইংরেজ আমলের বাঙ্গালী গোয়েন্দা,—এরা প্রায় সমগোত্রীয়! রবি বলল, অনেকটা প্রায় সেই রকম!

এখানে থাকবে কতদিন?

রবি একটু আত্মাভিমানী। সে ফস করে বলল, যতদিন না পুলিসে ধরা পড়ি!

লোকটা আমাদের আপাদমস্তক যখন পরীক্ষা করছে, তখন সবিনয়ে আমি বললুম, ওর কথা ধরবেন না। আমিই বলি। আমাদের যে অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে তাতে হয় আমাদের গ্রেপ্তার করুন, নয়ত পুলিসে চাকরি দিন্।

পুলিসে চাকরি?—ভদ্রলোক একটু অবাক হলেন।

রবি বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা গোয়েন্দাদের কাজকর্মের ওপর নজর রাখতে পারব!

রবির কণ্ঠে বিদ্রূপ ছিল। আমি একটু ভয়ই পাচ্ছিলুম।

আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি—লোকটা বলল, আবার ঠিক সময়েই দেখা হবে। তবে জেনে রাখা ভাল, বিনোদ চক্কোত্তি ঠাট্টা সহ্য করে না!

লোকটা চলে গেল। আমরা তখন এমনি বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলুম যে, আমাদের সর্বপ্রকার ভয় ঘুচে গিয়েছিল। আমরা প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় এক মাস ধরে আশা-ভরসাহীন সংগ্রাম করে যাচ্ছিলুম। এখন আমরা কোনও ব্যক্তিকে আর গ্রাহ্য করিনে। আমরা নীতিভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছিলুম।

সংশয়-সন্দেহে অবিশ্বাসবাদে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ঘৃণা ও আক্রোশে আমাদের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটছিল। আমরা নৈরাশ্য ও নিষ্ফলতাবোধে ভেঙ্গে পড়ছিলুম। এর ফলে আমাদের ক্রুদ্ধ মন বাঙ্গালী সমাজের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে উঠছিল। ওঁদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা আমাদের সাহায্য করতে পারতেন। আমি ও রবি কাজ চেয়েছিলুম, দয়াভিক্ষা চাই নি। ওঁদের কায়েমী স্বার্থে পাছে ঘা লাগে সেজন্য ওঁরা সতর্ক ছিলেন, কলকাতার কেউ এসে ওঁদের মাঝখানে না বসে! ওঁদের মধ্যে আমরা কুটিলতা, ইতরতা ও স্বার্থপরতা দেখতে পাচ্ছিলুম। অনেক সময় দেখতে পাচ্ছিলুম, ওঁরা সামাজিক সৌজন্য ও স্বাভাবিক ভদ্রতাও রক্ষা করতে পারেন নি। আমার 'জলকল্লোল' নামক গ্রন্থে এ কাহিনীর আনুপূর্বিক আলোচনা করেছি।

আমাদের কাছে শেষ সম্বলস্বরূপ ছিল একটি 'বায়নোকুলার।' ওটি বিলেতী সামগ্রী। এই দূরবীনটি সমুদ্রযাত্রায় অনেক সময় কাজে লাগে। রবির কাছে শুনলাম ওর দাম বুঝি উনিশ পাউণ্ড। সন্দেহ নেই, বিশেষ মূল্যবান। রবি বলল, শোন্, তুই চলে যা। গিয়ে বাবাকে খবর দে। আমি ওই ব্যাটা কবিরাজের আনাচে-কানাচেই থাকব। বাবাকে বলে দিস।

আর কোনও উপায় আমাদের সামনে ছিল না। রাতটা কোনও মতে কাটিয়ে সকাল আটটার পর গেলুম আবার সেই 'পন শপে'। সেখানে তখন দরিদ্র, দুঃস্থ, হতভাগ্য এবং চোর, গাঁটকাটা ও নানা দুষ্কৃতকারীর দল ভিড় করে রয়েছে। ছোট কাউণ্টারের ভিতর দিয়ে দেখি, ঘরখানা স্তূপাকার গার্হস্থ্য সামগ্রীতে ভরা। বাসন-পত্র, ভাল ভাল ছবি, নানা রকম পোশাক, কাঁচের নানাবিধ জিনিসপত্র, রেশমের লুঙ্গি, জরির টুপি, অনেক রকমের ঘড়ি, ছোট ছোট বুদ্ধ মূর্তি, মখমলের জোব্বা, শ্বেতপাথরের তৈরি অ্যাপলো মূর্তি

—আরও বহুরকমের সামগ্রী। আমাদের সময় যখন এল, তখন আমরা দুরবীনটি বাড়িয়ে দিলুম। ওরাই বিচার করে বলবে, এর ওপর কত টাকা দেওয়া চলে! বহুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর ওরা বলল, পনেরো টাকা।

পনেরো টাকা?—রবি আঁতকিয়ে উঠল—ওর দাম তিন শ' টাকা তা জানো?

ওরা সব জানে। দিব্যদৃষ্টি ওদের, আমাদের অবস্থার কথাও জানে। এক সময় জানলা গলিয়ে দুরবীনটি ফেরত দিয়ে ওরা বলল, কুড়ি টাকার বেশি দেওয়া যাবে না।

অনেক ভেবেচিন্তে রবি তাতেই রাজি হল। এটা ত আর বিক্রি নয়, শুধু বাঁধা রাখা হচ্ছে মাত্র। বাবা খবর পেলেই ছুটে আসবেন, তখন ওর কান ধরে ঘড়ি আর বায়নোকুলার আদায় করে নেবো!

সেই দিনই সকাল সাড়ে দশটার সময় ছুটতে ছুটতে আমরা রেঙ্গুন বন্দরে এসে এক শাম্পান নিয়ে রেঙ্গুন নদীর মাঝামাঝি পৌঁছিয়ে জাহাজের সিঁড়িটা ধরলুম। জাহাজ তখন ছেড়েছে। উপর থেকে খালাসীরা দড়ি ঝুলিয়ে সেই সিঁড়ি টেনে তুলল। যেন ছিপের সাহায্যে আমাকে মাছের মতো খিঁচ মেরে টেনে নিল। ওরা আমার এই দুঃসাহসিক জিমন্যাস্টিক দেখে একেবারে হতবাক। আর, আমি যে এভাবে দোলায়মান শাম্পান থেকে সোজা জাহাজের ডগায় উঠে আসতে পারি, এতে আমিও অবাক। রবি তখনও শাম্পান থেকে আমার দিকে চেয়ে হতভম্ব। আমি দূর উপর থেকে হাত নেড়ে বিদায় জানালুম। আমাকে দিল পনেরো টাকা জাহাজ ভাড়া, এক টাকা সর্বপ্রকার খুচরো খরচ, এবং সঙ্গে দিয়ে দিল হাফ পাউণ্ড একখানা পাঁউরুটি এক আনা। বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু, তোমাকে নমস্কার। অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল।

এ জাহাজখানাও অতি বৃহদাকার। নাম 'এডাভানা'। আমার গায়ে সেই উলি-ঝুলি ছেঁড়া ও ময়লা হাতকাটা জামাটা। ধুতিখানা থপথপ করছে ভিজে, মালকোঁচা বাঁধা। মাথায় পাগলের মতো একরাশ এলোমেলো রুক্ষ চুল। খালি পা। পাঁউরুটিখানা বেকায়দায় নদীর জলে ভিজে গেছে। যেমন ভিজেছে ষোলখানা এক টাকার নোটের গোছাটা। আমার আর কিছু নেই, আমি সর্বহারা। আমার সর্বাঙ্গ অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা।

ডেক-এর উপর শুয়ে পড়লুম। আমার শীর্ণকায় চেহারায় আর কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই। আমি ভয়ানক ক্লান্ত, তার চেয়েও বেশি ক্ষুধার্ত। ফুরফুরিয়ে

হাওয়া আসছে দেখে আমি পাঁউরুটিখানা একটু শুকোতে দিয়েছিলুম। ওখানায় আমার তিনদিন চলবে। চারদিনের দিন পৌছব কলকাতায়। কিন্তু শুকোবার আগেই এক সময় উঠে আন্দাজে ভিজে পাঁউরুটিখানার এক-তৃতীয়াংশ কামড়িয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেললুম। কী সুন্দর ধারালো দাঁত আমার! আট আউন্স রুটির এক-তৃতীয়াংশ খেয়ে ফেলতে এক মিনিট লাগল কি? বার বার ভাবছিলুম আর এক কামড় খাওয়া যায় কিনা। না যায় না, কাঠের খুঁটির পাশে সযত্নে রুটির দুই-তৃতীয়াংশ রেখে দিলুম। ওর জলে ভেজা গন্ধটুকুও যেন ভাল লাগছিল!

ফিরতি-পথের কাহিনীটুকু না বললেই হয়ত ভাল হ'ত।

ওই পাঁউরুটিখানা মুখের কাছে রেখেই এক সময় শুয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলুম। কখন বাহির-সমুদ্রে জাহাজ চলে এসেছে জানতে পারি নি। সমুদ্রের সুন্দর বাতাসে আমার ঘুম ঘনীভূত হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি যে প্রবল জ্বরে অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়েছি, এ আমি বুঝতে পারি নি। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গলো, সমুদ্রের একটা বড় ঢেউ ডেক-এর উপরে উঠে আমার সর্বদেহকে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ডুবিয়ে দিল। আমি পলকের মধ্যে হাত বাড়িয়ে পাঁউরুটি-খানাকে ধরতে গেলুম, কিন্তু জলের প্রচণ্ড তাড়নায় সেখানা ছটকিয়ে ভেসে দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল!

পাগলা-ঘণ্টা বেজে উঠেছে জাহাজে। সমুদ্র-লোক ধূসর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তারই ভিতর দিয়ে দানবীয় বেগে সাইক্লোনের ঘূর্ণঝিঞ্ঝা ছুটে ছুটে আসছে। জাহাজের রোলিং আরম্ভ হয়েছে। একবার বাঁদিকে কাত হয়ে প্রায় শুয়ে পড়ছে, তখনই ডেক-এর উপরে উঠে আসছে প্রবল একটা তরঙ্গভঙ্গ, আবার সোজা হচ্ছে, এবং আবার ডানদিকে কাত হয়ে পড়ছে সেই বিরাট ঢেউটাকে তুলে নেবার জন্য! আমি সেই তরঙ্গ-জলের আঘাতে আহত প্রতিহত হয়ে অচেতন জ্বর নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে 'স্নান' করছিলুম!

চোখ বুজে কাঠের চৌকির খুঁটিটা আমি শক্ত ক'রে ধ'রে পড়েছিলুম। জাহাজের প্রচণ্ড দোলায় আমার কাঠ-বমি হচ্ছিল। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা ছুটে গিয়েছিল বহুদূরে সাগর সীমানা পেরিয়ে সেই নারকেলডাঙ্গার বাড়িটিতে —যেখানে এই সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরঘরে প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে মা বসেছেন আদ্যাস্তোত্র পাঠে। আমি শুনছিলুম জননীর সেই কণ্ঠস্বর! "—অরণ্যে রণে দারুণে শত্রু মধ্যে'ইনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে তমেকা গতির্দেবী নিস্তারদাত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে—"

একটু একটু লিখতে আরম্ভ করেছিলুম। কিন্তু যা কিছু লিখছি সব যেন নিজের কাছে অরুচিকর, সব যেন বাতুলের প্রলাপ। প্রত্যেক লেখায় অর্থহীন অজ্ঞানের হাস্যকর প্রতিকৃতি দেখে নিজেই কৌতুক বোধ করি। এক সময় একে একে সবগুলো একত্র করে কুটিয়ে ছিঁড়ে জঞ্জালের সেই বালতিতে ফেলে দিয়ে আসতুম।

সর্বাপেক্ষা লজ্জার কথা, এই অক্ষম রচনার কয়েকটি ছাপা হয়েছিল ফণী পাল আর 'চাঁদমুখ-হীরকদুলের' লেখক শরৎ চাটুয্যের 'গল্প-লহরীতে'। আমার কোনও ছাপা লেখা পড়তে আমার নিজেরই লজ্জা হত।

সারাদিন কাটিয়ে দিতুম মেট্‌কাফ হলে, অর্থাৎ ইম্পিরিয়ল লাইব্রেরীতে। চার্লস গার্ভিস্, ফিলিপ ওপেন্‌হেম বা জন ক্রিস্‌টফার—এরা কেমন একটা সস্তা রস যুগিয়ে দিত। শেক্‌স্‌পীয়র, মিলটন, থ্যাকারে, মেকলে—এরা ছিল দু'চোখের বিষ। বিশেষ করে শেক্‌স্‌পীয়র। ওর পুরনো কালের ইংরেজী বোঝবার জন্য অক্সফোর্ড, ওয়েবস্টার আর চেম্বার্স-এর খানতিনেক অভিধান, পাশে রাখতে হত। হ্যাঁ, দু'চোখের বিষ! সেই জন্য চার্লস ল্যাম্বের থেকে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের গল্পগুলো শুধু পড়ে নিতুম।

প্রতিদিন দুপুরে যাওয়া নারকেলডাঙ্গা থেকে হেয়ার স্ট্রীট এবং ফিরবার পথে আমাদের পুরনো পাড়া পুঁটিবাগান-মানিকতলা হয়ে ফিরে আসা—কম বেশি মাইল আষ্টেক। রাজাবাজার থেকে ট্রাম আছে—কিন্তু কে দেবে আমার দৈনিক রাহাখরচ? চা বা টিফিন? কেন, রাস্তার কলে কি জল ফুরিয়ে গেছে?

শিয়ালদা স্টেশনের ঠিক বাইরে রাস্তার কোণে মুসলমানের একটি প্রসিদ্ধ পরটা ও শিককাবাবের দোকান ছিল। পাছে ওর সুগন্ধ নাকে আসে, এজন্য অপর ফুটপাথ দিয়ে চলে যেতুম। মায়ের শাসন ছিল: খাবার দেখলে লোভ করতে নেই, চেয়ে খেতে নেই এবং ধার করে কখনও কিছু মুখে তুলতে নেই! দিনে একবার যদি এক মুঠো অন্ন জোটে, সেই কি ভগবানের আশীর্বাদ নয়?

সন্ধ্যার পর থেকে কিছুতেই যখন আমার নিঃসঙ্গ জীবনের কয়েক ঘণ্টা আর কাটতে চায় না, তখন আবিষ্কার করলুম আমাদেরই বাড়ির অদূরে এক নোংরা বস্তির মধ্যে একটা নাটুকে আড্ডা। সেই ক্লাবের একটা নামও বুঝি আছে। আমাকে নিয়ে গিয়েছিল প্রতিবেশী বঙ্কুবাবুর ছেলে নরেশ—আমার সমবয়স্ক। সে প্রতিদিন দুপুরে আমাদের বাসস্থানের পিছনের পুকুরে আমাকে সাঁতার শেখাবার চেষ্টা পেত—যা কোনদিনই শিখতে পারি নি!

এই ক্লাবে গিয়ে ঢোকবার পথটা ছিল অন্ধকার, দুঃসাধ্য ও দুর্গন্ধময়। প্রতিবেশীদের নালা-নর্দমা বয়ে যেত ওরই ভিতরে ভিতরে। খাটা পায়খানার বীভৎস নরককুণ্ড চোখে পড়ত ঠিক সামনেই। কাদের বাড়ির ট্যাঙ্ক থেকে জল উপচিয়ে ছিটে এসে লাগত যাতায়াতের পথে। ওরই পাশ কাটিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে পগার ডিঙ্গিয়ে যেতে হ'ত।

সবটাই ছমছমে অন্ধকার। বাঁ পাশে একখানা গোলপাতার চালাঘর। ভিতরের দেওয়ালগুলো মাটির। ছোট ছোট গোটা দুই জানলা, ওতেই হাওয়া-বাতাস আসত যতটা সম্ভব। সুবিধা ছিল এই, মাটির মেঝের সমস্তটা জুড়ে দর্মার উপরে পাটি পাতা, এবং খানচারেক হাতপাখা মজুত থাকত। ক্লাবের চাঁদা মাসে দু'আনা।

প্রথম দিনেই যাদের দেখলুম তাদের মুখ আমার নিতান্ত অচেনা নয়। এ পাড়ারই লোক। এই গলির মোড়ের কাছে মনোহারী দোকানের ফটিক। এ অঞ্চলের যে-নাপিত সকালের দিকে বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এখানে এসে তা'র প্রথম নাম জানলুম বটু। সতীশ আর নিতাই—ওরা ওদের দাদার মসলার দোকানে কাজ করে। যতীনবাবু নাকি শ-ওয়ালেসের কেরাণী। মনিবাবু শুঁড়োর ইস্কুলের মাস্টার। হারু বুঝি ডাকঘরের পিওন। ওদের মধ্যে একমাত্র বীরেশ্বর, যার কথাবার্তা প্রথম দিনেই আমার একটু ভাল লেগেছিল। সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় ছিল, একটি প্রৌঢ় ব্যক্তির আচরণ। লোকটার নাম ক্ষিতি মিত্তির। সে ওই হারিকেন ল্যাম্প-জ্বালা ঘরে ঢুকত না, অন্ধকারে ওই নোংরা আনাচে-কানাচেই সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত কাটাত এবং প্রতি দশ মিনিট অন্তর এসে ক্লাবের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নাটক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে যেত!

আমাদের ক্লাবে এখন 'দেবলাদেবীর' মহড়া চলছে। 'মোশন' মাস্টার হলেন যতীনবাবু। তিনি 'খিজির খাঁর' পার্ট করবেন। তাঁর প্রণয়িনী হলেন 'মতিয়া'। মতিয়ার পার্ট করবে বটু। 'দেবলা' সাজবে সতীশ। পার্ট বিতরণ আগেই হয়ে গেছে, তবে আমি যদি রাজি হই, আমাকে জনৈক সেনাধ্যক্ষের ভূমিকায় নামানো হবে। এটা দেখার দরকার ছিল, ক্লাবের প্রত্যেক মেম্বারই যেন পার্ট পায়। ক্লাবের মেম্বার হয়ে বড়ই আনন্দে এবং উৎসাহে আমার সন্ধ্যাগুলি কাটছিল। এটি লক্ষ্য করছি, যারা নিয়মিত ক্লাবে আসে তাদের অধিকাংশই সিদ্ধি খেয়ে আসে। বীরেশ্বর ওটার নাম দিয়েছিল 'সাকসেস'। ওখানে প্রায় সবাই বিড়ি ফুঁকত, তার ঘন ধোঁয়ায় হারিকেনের আলোটাও ঝাপসা দেখাত।

ওরই মধ্যে হঠাৎ অন্ধকার থেকে সাড়া দিত ক্ষিতি মিত্তির। তা'র সঙ্গে পাবলিক থিয়েটার মহলের সকলেই নাকি পরিচিত। গিরিশ ঘোষ, দানিবাবু, অমর দত্ত, সুশীলা, তারাসুন্দরী, অমৃত বোস, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, ক্ষেত্র মিত্র, অপরেশ মুখুজ্জে, উপেন মিত্র—এঁদের মধ্যে অনেকেই নাকি তার ইয়ারবক্সি! ক্ষিতি মিত্তিরকে দিনের আলোয় কখনও দেখি নি। একদিন লোকটা বিড়ি ধরালো দেশালাই জ্বেলে। সেই আলোয় দেখি, লোকটার খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়ি-গোঁফ। বয়স অন্তত ষাট-বাষট্টি। বেশ বুড়ো চেহারা।

একদিন আমার প্রশ্নের উত্তরে নরেশ চাপা গলায় বলল, ওর খদ্দের অনেক। তাদেরই জন্তে অন্ধকারে ঘোরাফেরা করে!

কেন?

বুঝলে না, ও যে কোকেন বেচে পয়সা কামায়! বেশ ভাল কারবার!

সেইদিন প্রথম জানলুম লোকটার ইতিবৃত্ত। লোকটার বসবাস হ'ল শুঁড়োর ওদিকে রাসবাগানে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর আসে এই বস্তিতে।

এই প্রসঙ্গেই আমার আরেক যতীনকে মনে পড়ছে। আমার চেয়ে সে সাত-আট বছরের বড়। তা'র এক হাতের মাঝখানের বড় আঙুলটা বুঝি কী এক কারণে কাটা গিয়েছিল, সেই কারণে তা'কে বলা হ'ত 'আঙুলকাটা' যতীন। সে আমার দাদার সহপাঠী, এজন্ত সে আমার শৈশব থেকেই পরিচিত। যতীনদা খৃস্টান এবং অবিবাহিত। বাঙ্গলা সাহিত্য নিয়ে সে পড়াশুনো করত এবং কয়েকজন লেখকের সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল।

একদিন অনেক রাত্রে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধ'রে ফিরছিলুম। নন্দ চৌধুরীর গলির মোড়ে যতীনদার সঙ্গে দেখা। সারাদিন পরে মনের মতো সঙ্গী পেয়ে বড় খুশী হলুম। এ পাড়া ছেড়ে বহুদূর নারকেলডাঙ্গায় গিয়ে পড়েছি এজন্ত বড়ই বেদনাবোধ ছিল। যতীনদাকে ভালই বাসতুম।

এ কি, হয়েছে কি তোর? এত টলছিস কেন?—বলতে বলতে আমি তাকে ধ'রে ফেললুম।

এলোমেলো পা ফেলতে ফেলতে সে বলল, রাধু আজ খাওয়ালো রে।

রাধু! সে আবার কে? মেয়েছেলে?

রাঙ্গা-রক্তিম চোখে যতীনদা আমার দিকে ফিরে হাসল। পান খেয়েছে দেখলুম। পরে বলল, দেশি রে দেশি, ছ'আনা পাঁট! পুরো পাঁটই মেরে দিলুম। চল হেদোয় গিয়ে একটু বসি।

হাঁটতে হাঁটতে এসে হেদোয় ঢুকে ডানহাতি একখানা বেঞ্চে বসলুম।

নতুন ধরনের একটা গন্ধ পাচ্ছিলুম যতীনদার মুখ থেকে। এতকাল ধ'রে যে-চেহারায় ওকে দেখে এসেছি, এ সে ব্যক্তি নয়—এ অন্য। আজ প্রথম আমি জানলুম, সে নেশা করে!

আমার কণ্ঠ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। প্রশ্ন করলুম, এ তুই কোথায় নেমে যাচ্ছিস যতীনদা?

যতীনদার ঘাড় গুঁজে পড়ছিল। এবার সে মাথা তুলল। বলল, এ আবার তুই কি বলছিস? যেখানে ছিলুম সেখানেই ত আছি!

তুমি নেশা করেছ? মেয়েছেলের হাত থেকে মদ নিয়ে খেয়েছ!

এবার সোজা সে আমার দিকে তাকাল। বলল, ওরে, তুই মাথায় ঢ্যাঙ্গা হয়েছিস। কিন্তু তুই তেমনি কচি, তেমনি অজ্ঞান। শোন, জীবনটা সোজা পথে চলে না রে—তার পথ চিরকাল আঁকাবাঁকা!

তাই বলে তুমি নোংরায় ডুববে?

কোনটা নোংরা রে? কোনটাই বা শুচিশুদ্ধ?—যতীনদা বলল, তুই না লেখক? চলতি বিশ্বাস, আর চলতি নীতি কি তোর জন্য? তুই যদি সব রকম পুরনো সংস্কারের ফাঁদে পা দিস, তাহলে সেই ফাঁসেই ত জড়িয়ে মরবি। যাকে তুই নোংরা বলছিস, সেটা যে সত্যিই নোংরা কে বললে তোকে?

আমি চুপ ক'রে গেলুম। যতীনদার মাথাটা আবার নুয়ে পড়ছিল। কিন্তু এক সময় মাথা তুলে সে হাসল। বলল, এত কষ্টে তুই লেখাপড়া শিখলি, কিন্তু এক ফোঁটা বিদ্যেবুদ্ধি তোর হল না!

নেশা করলে কি বিদ্যেবুদ্ধি বাড়ে?

বাড়বে কেন, চাপা পড়বে!—যতীনদা বলল, সেটাই দরকার। প্রশ্ন যত দেখা দেবে, তত অশান্তি। যত জানবি তত দুঃখ পাবি। যত আশা করবি ততই মার খাবি। জীবনকে চারিদিক থেকে যত দেখবি, ততই ভুগবি নৈরাশ্যে! কিন্তু সব চাপা পড়ে নেশায়, মনে রাখিস।

এসব কি বলছ তুমি?

জড়িত কণ্ঠের প্রলাপের সঙ্গে যতীনদা বলল, যা বলছি তা মিলিয়ে নিস নিজের সঙ্গে। জ্ঞান যত বাড়বে, দুঃখ তত বেশি। বুদ্ধি যত পাকবে, ততই দেখবি তুই বোকা! কিছু চাসনে কোথাও, কিছু কামনা করে দুঃখ টেনে আনিসনে। যা আসে তাই নে, টানাটানি করিসনে কিছু। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ কতটুকু জানিস তুই? মদ আমি খেয়েছি শুধু নিজের মধ্যেই তলিয়ে যাব ব'লে! প্রবৃত্তিটা পাপ নয়, মনে রাখিস।

কী বললে ?

পাপ এক জিনিস, প্রবৃত্তি অন্য বস্তু ! মদভাঙ খাব, মেয়েদের কাছে যাব, এগুলো পাপ নয় রে, এগুলো জীবনেরই স্বাভাবিক অঙ্গ, আনন্দেরই ক্ষেত্র।

উত্তেজিত হয়ে বললুম, কিন্তু সামাজিক আর নৈতিক অপরাধ ?

ঘাড় তুলে যতীনদা আমার দিকে তাকাল। বলল, তুই ত লেখক হতে যাচ্ছিস। একথা কি জেনেছিস পৃথিবীর সব দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সামাজিক আর নৈতিক অপরাধের থেকে জন্মেছে ? শেক্‌সপীয়র থেকে রবি ঠাকুর— সেই একই কথা। দেখছিসনে চোখের সামনে চোখের বালি, ঘরে-বাইরে আর শ্রীকান্ত ? তুই কি রামায়ণ আর মহাভারত আগুনে পুড়িয়েছিস ? কালিদাসের ঋতু সংহার আর কুমারসম্ভব—কি করবি ওদের নিয়ে ? থাম্, ওসব কথা তুলিসনে।

রাগ করে আমি বললুম, আচ্ছা বলতে পার, যে মেয়েছেলে তোমাকে হাতে তুলে মদ খাওয়াল, সেই তোমার রাধু কেমন প্রকৃতির মেয়ে ?

কেমন ক'রে জানব ?—যতীনদা বলল, তুই কি জানিস তুই কেমন ? রাধু কি জানে কেমন তা'র প্রকৃতি ? তা'র ব্যবহারেই তা'র পরিচয় ! সে শুধু আনন্দিনী ! চল্‌রে এবার উঠি। আমাকে ধর একটু—

ওকে সামলিয়ে নিয়ে চললুম। হেদো থেকে বেরিয়ে যতীনদা বলল, শোন, সুনীতি-দুর্নীতি, ভালমন্দ—সব নিয়েই জীবনের বিচার। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত মনই হ'ল নিষ্পাপ মন ! ওই যে রাধুকে ছেড়ে এলুম, ওখানেই আমার শেষ ! ও থাক ওর জগতে।

ওর বাড়ির কাছাকাছি এসে ওর হাতের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলুম, তোমার হাতের মুঠোয় কি ওটা ?

ও দুটো সন্দেশ রে। রোজই কিনে নিয়ে যাই।

কেন !

যতীনদা বলল, মা যে বিধবা রে, রাত্রে আচমনী কিছু খান না— ।

ওকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে আমি ফিরলুম। কথা রইল সামনের শনিবার দুপুরে আবার আসব। রাত এগারোটা বাজে। আমার পথ অনেক দূর। শুঁড়িপাড়া, মানিকতলা, যুগীপাড়া ছাড়িয়ে পুল পেরিয়ে সোজা—বস্তির পর বস্তি। তারপর এক সময় ভানহাতি নারকেলডাঙ্গার পথ।

শুঁড়িপাড়ার মোড় থেকে পশ্চিম দিকে তখন ভাঙ্গন চলছে। এই ভাঙ্গনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে একের পর এক বস্তি। দিদিমার বাড়ি, দীনু স্যাকরার ঘর,

নলিতবাবুর গলি, গঙ্গার-মার কুটরি, শেতলদের সেই ঝোপড়া, অন্ধ বুড়ো আর হরার মা'র বস্তি, এগুলো একে একে ভাঙছে। অমন যে গজেন ঘোষের সেই 'হলদে বাড়ি', নন্দ চৌধুরীদের পাকা ইমারত, অবিনাশ কবিরাজের পাড়া, গোঁসাই কলু আর খাঁদা শুঁড়ির আড্ডা, এমন কি সেই নিমগাছওলা এ পাড়ার বেশ্যাবাড়িটা পর্যন্ত—একে একে সব নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। ওদেরই সঙ্গে ধ্বংস হচ্ছে পুরনো জীবন আর সাবেকী মনোবৃত্তি। কোদাল আর গাঁইতির ঘায়ে ভেঙে পড়ছে পুঞ্জীভূত যত কুসংস্কার, যত মূঢ়তা আর অজ্ঞান, যত কুশিক্ষা আর অন্ধ আচার!

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেইকালে একটির পর একটি ভাঙন দেখছিলুম।

আমার শৈশব ও কিশোরকালের নিত্যসঙ্গিনী সেই ধনীকন্যা মানু—তাদের বাড়িও ভাঙা পড়ল! তা'রা নেই, কোথায় যেন চ'লে গেছে। কিন্তু আমার মনে রেখে গেছে কেমন একটা অপমানের ক্ষতচিহ্ন, রেখে গেছে কৈশোর-অনুরাগের পদদলিত এক কাহিনী। মানুকে ভুলতে পারা সহজ নয়।

এই বিপুল ভাঙনের আদি-অন্ত দেখে বেড়াতুম যতীনদাকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকাল থেকে। অন্ধকার ও দুস্তর সেই অঞ্চলের ভিতরে ভিতরে কেরোসিনের লম্ফ নিয়ে বসে থাকত শ্লথচরিত্রা টুলিবউ, আর যুমনি, কুলপি-বরফওলা রামু, মল্লিকদের বাড়ির সেই ডাঁটো ঝি—যে-মেয়েটা ওই অন্ধকারে রামুর ঘরে এসে ঘণ্টাখানেক থেকে চ'লে যেত, আর সেই ঘরামিদের ছেলেটা—যার নাম ছিল নন্দ—যে গাঁজা আর চরস কিনে নিয়ে যেত রামুর কাছ থেকে তার বাবুদের জন্য! ওই অন্ধকারের মধ্যেই সংগোপন সরীসৃপের মতো এগিয়ে আসত জেলেটোলা আর সিঙ্গিবাগানের ওদিক থেকে মেয়েছেলেরা। তারা অনেকে এসে ঢুকত কুলি-মজুরের তাঁবুর মধ্যে। যাবার সময় চার আনা আট আনা রোজগার ক'রে নিয়ে যেত।

সন্ধ্যার পরে এ অন্য জগৎ, এ সব হ'ল কলকাতার সুড়ঙ্গলোক—দিনমানে যার প্রত্যক্ষ পরিচয় হ'ল কর্মমুখরতা। সেই ছায়াময় রহস্যলোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যতীনদা অবশেষে আমাকে বা'র ক'রে আনত আলোকোজ্জ্বল কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে!

এই ভাঙনের ভিতর থেকেই পরবর্তীকালে জন্ম নেয় বিবেকানন্দ রোড। এই ভাঙন দেখছিলুম দর্জিপাড়া, শ্যামবাজার অঞ্চলে, দক্ষিণ পাইকপাড়ায়, এণ্টালিতে এবং আরও অনেক জায়গায়। ওদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একে একে সেণ্ট্রাল অ্যাভেনুর সম্প্রসারণ, ভূপেন বোস অ্যাভেনু, দেশবন্ধু পার্ক।

পুরনো পাইকপাড়ার ধানক্ষেত হারিয়ে গেল। এণ্টালিতে মস্ত বাজার। পুরনো কড়েয়া ভেঙে নতুন শহর। বিরাট বস্তি অঞ্চল ভেঙে নাম হ'ল 'পার্ক সার্কাস'।

এই সব ভাঙনের আনাচে কানাচে ঘুরে যতীনদা যে-ধরনের জীবনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়ে দিত, তার সঙ্গে আর যাই থাক, নৈতিক ব্যাখ্যার কোনও সঙ্গতি থাকত না। এক এক সময় ভয় পেতুম কলকাতার সেই ভূগর্ভলোকে আনাগোনার কালে।

লালদীঘির দক্ষিণ-পূর্বে রানীমুদিনীর গলি কেউ কি আজ মনে রেখেছে? যদি যতীনদা আমাকে না নিয়ে যেত সেই বাগবাজারে বিনি ধোপানির বস্তিতে, তবে কি কোনও কালে তা'র খবর পেতুম? কম্বুলেটোলার ভিতর দিয়ে শ্যামপুকুর আর কুমোরটুলি ছাড়িয়ে যাচ্ছি ত যাচ্ছিই। সেই খালের ধার, পুরনো সেই মারাঠা ডীচ লেনের পাশ কাটিয়ে,—সরু গলিটা যেখানে মিশেছে নিয়োগী লেনে। কোথাও তখন পথেঘাটে ইলেকট্রিক আলো নেই। আছে চৌকো গ্যাসের আলো,—যেটা অস্পষ্ট, ছায়া ছমছমে, একটার থেকে অন্যটা অনেক দূরে। যার নিস্তেজ শাদা আলো কলকাতাকে রহস্যময় ক'রে রাখত।

অগণিত সংখ্যক গোলপাতার চালা, কোনটা করোগেট, কোনটা বা খোলার ঘর। কিন্তু ওই সরু গলির দু পাশের সারিতে প্রতি দরজায় একটি-দুটি বা তিনটি মেয়ে সাজগোজ করে সামনে কেরোসিনের কুপি জেলে অপেক্ষা করত, কতক্ষণে কে কার আগে কোন্ পথচারীর নেক-নজরে পড়বে!

কিন্তু এ হ'ল বাইরের দিক। আমার কাছে মিনিট পনেরোর জন্য ছুটি নিয়ে যতীনদা ঢুকে যেত ওই সাপের গর্তে! তারপর এক সময় মেয়ে মহল পেরিয়ে মাঝখানের উঠোন ডিঙিয়ে যে-ঝুপসি কাঁচা মাটির দাওয়ায় গিয়ে নিঃশব্দে হাজির হতুম, সেখানে অধিকাংশই পুরুষ! কালো কালো চেহারা, কেউ যণ্ডা, কেউ দাগী আসামী, কেউ বেশ্যার গর্ভজাত, কেউ মনোহারী সামগ্রী বিক্রি ক'রে বেড়ায়, কেউ ট্রামের কন্ডাকটার, কেউ পাইকারি বাজারে সব্জি কিনে অন্যত্র খুচরো বেচে আসে—। আবার ওদেরই মধ্যে এসে ঢোকে বীটের পাহারাওলা,—সেও দু' চার আনা খরচ ক'রে একটা মেয়েকে নিয়ে দু' ঘণ্টা কাটিয়ে যায়। এ সব কোনও দিন কিন্তু আমার খারাপ লাগে নি। ভয় পেয়েছি, প্রতিবার এই ভূগর্ভে ঢোকার আগে গা ছমছম করেছে, নৈতিক শুচিতার প্রশ্নে মন মাঝে মাঝে থমকিয়ে গেছে, অনেক সময় মনে হয়েছে ভেসে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি, কোথায় যেন ডুবে যাচ্ছি! কিন্তু একবারও মনে হয় নি

আমি অন্যায় করছি, দুর্নীতির তলায় নামছি, অথবা নিজের কাছে কলঙ্কিত বোধ করছি। আশেপাশে ময়লা তাস নিয়ে জুয়াখেলা চলছে, চোলাই মদ নিয়ে বস্তির মেয়েদের কাছে বেচে আসছে এবং তাদেরই মাঝখানে ব'সে যতীনদা পরম আনন্দে বিশেষ একপ্রকার ধূমপান করছে—আর আমি মশগুল হয়ে আড্ডায় জমে যেতুম!

তবু ওরই মধ্যে আমি যেন নিষ্কাম, আমি যেন স্পর্শলেশশূন্য। কেন আমি ওদের নিন্দা করব? পাশে প'ড়ে আছে মাতাল, এপাশে সেই 'মাসি' তার চুল এবং শরীর এলিয়ে হাসি তামাশায় মুখর হচ্ছে, ওপাশে জুয়ার পয়সা নিয়ে ভাগাভাগি চলছে, কেরোসিনের শিখা উঠে ঝুপসি ঘর শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে—আমি আমোদ পাচ্ছি নিজের মনে!

যখন বেরিয়ে আসি,—রাত অনেক। কিন্তু বাগবাজার থেকে নারকেল-ডাঙ্গার পথ সোজা খালধার দিয়ে। মানিকতলায় শুধু বাঁক নেবে যতীনদা,—তা'র মায়ের জন্য সন্দেশ নিয়ে বাড়ি ফিরবে! আমার পথ মাইল চারেক। মল্লিক-লজ পেরিয়ে আরেকটু গিয়ে ডানহাতি।

বাড়ি ফিরি এগারোটা থেকে রাত বারোটার মধ্যে। কেউ জেগে নেই, শুধু মা ছাড়া। মা যেন আমার জীবনের অতন্দ্র প্রহরী! তাঁকে দেখলেই মনে হ'ত আমার সমস্ত অশুচিতা পথের বাইরে ফেলে মন্দিরে এসে ঢুকেছি!

আমাদের ক্লাবটাকে মাঝে মাঝে মনে হত নরককুণ্ড। দিনের বেলা এর আশপাশ অতি বীভৎস। কিন্তু রাত্রির ছায়ায় অনেক কুদৃশ্য ঢাকা পড়ে সেইজন্য আসা যাওয়ায় অতটা আপত্তি দেখা যায় না। তবু ভিতরে ময়লা হারিকেনের সিস, বিড়ির ধোঁয়া, সিদ্ধি-আফিংয়ের নেশায় অনেকে বুঁদ, মাঝে মাঝে দরজা পেরিয়ে দুর্গন্ধের ঝাপটা ভিতরে আসা,—প্রায়ই মনে হত, আমরা যেন নরক-কুণ্ডের মধ্যে কিলবিল করছি!

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর ক্লাবে ঢুকে দেখি, জনৈক সৌম্যদর্শন বয়স্ক যুবক বেশ জমিয়ে ভিতরে বসেছেন। উনি নবাগত, আগে ওঁকে আমি দেখি নি। ভদ্রলোক বোধ হয় সপ্তাহখানেক দাড়িগোঁফ কামান নি। পরনে খদ্দরের পানজাবি, সেটি আধময়লা, খদ্দরের ধুতির সঙ্গে মিলে রয়েছে। বয়স তিরিশ পেরিয়ে কতটা এগিয়েছে ঠাউরে দেখতে হয়। লোকটি অতি বিশুদ্ধ বাংলা, এবং অতি পরিচ্ছন্ন নির্ভুল ইংরেজিতে যে-পরিমাণ কথা বলেন, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে সিগারেট টানেন!

ওখানেই যাচ্ছি। কাল সকাল দশটায় খেয়েদেয়ে আমার ওখানে আসতে পারবে?

হ্যাঁ, নিশ্চয় পারব।

পরদিন থেকে ওঁর কর্মজীবনের সঙ্গে আমার অন্য একটা জীবন আরম্ভ হয়ে গেল। বিধুবাবু প্রথমে আমাকে নিয়ে গেলেন 'প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ' আপিসে। উনি যে প্রবাসীর জনৈক বিজ্ঞাপন-ক্যানভাসার, এ আজ প্রথম জানলুম। তখনকার ব্যবসায়ীরা চট ক'রে বিজ্ঞাপন দিতে চাইত না। বহু-দিনের উমেদারির ফলে যদি বা এক-আধটা বিজ্ঞাপন দিত, তার বিলের দরুন টাকা আদায় ক'রে আনতে রক্ত-আমাশয় হ'ত! এই কাজে উঞ্ছবৃত্তি ছিল প্রচুর। কিন্তু বিধুবাবু ছিলেন একটু অন্যপ্রকারের। তিনি নানা ধরনের বর্ণাঢ্য বক্তৃতা দিয়ে ব্যবসায়ীকে প্রভাবিত করতেন, ইংরেজি কোটেশনের চটক দেখাতেন, হিন্দী বলতে পারতেন, এবং ব্যবসায়ের মূলনীতি সম্বন্ধে এদেশের ব্যবসায়ীরা যে কত অজ্ঞ, সেটা বিশ্লেষণ ক'রে বুঝিয়ে দিতে জানতেন। এই আমি প্রথম জানলুম, উচ্চশ্রেণীর ক্যানভাসার কা'কে বলে। যাই হোক, ওঁকে দেখেছি এইভাবে দৈনিক পাঁচ থেকে দশ টাকা রোজগার করছেন! তার থেকে চা ও জলখাবার খাচ্ছেন দৈনিক দেড় বা দু টাকা। সর্বাপেক্ষা অবাক হতুম ওঁর খয়রাতির হাত দেখে। ওঁর সঙ্গে হাঁটতুম দৈনিক কমবেশি দশ মাইল। চৌরঙ্গী, ধর্মতলা, চাঁদনি, টেরেটিবাজার, রাধাবাজার, তুলোপটি, পগেয়াপটি, মুর্গিহাটা আর পাথুরেঘাটা। কাদায়, বর্ষায়, জলে, পরিশ্রমে আর লোকের ভিড়ে,—ওঁর সঙ্গে আমিও জন্তুর মতন পরিশ্রম করতুম। কিন্তু সেই হাঁটাহাঁটির মধ্যে দেখতুম অন্ধ, আতুর ভিখারি, কাঙ্গাল—এদের মধ্যে বিধুবাবু তাঁর কষ্টার্জিত অর্থ ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

দারিদ্র্য কি পাপ? মোটেই নয়।—বিধুবাবু পথের মাঝখানেই থমকিয়ে বলতেন, ধন বণ্টন ব্যবস্থার কারচুপি—তার থেকে দারিদ্র্য! ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কেমন ক'রে জন্মাচ্ছে বলতে পার? সমাজব্যবস্থায় বিপ্লব না এলে বদলাবে কিছু?

আমি বললুম, দু'চার পয়সা ভিক্ষে দিলে কি সব বদলিয়ে যাবে?

হাসিমুখে বিধুবাবু বললেন, না, ভিক্ষেটা কিছু নয়। ওটা মনুষ্যত্বের সান্ত্বনা! যারা প্রাসাদে থাকে, তারা কাঙ্গালকে দেখতে পায় না, তাই ভিখারির দুঃখ-দুর্গতিও জানে না। কিন্তু আমরা যে ওদের গায়ে-গায়ে থাকি, আমরা জানি সব। মানুষ না খেয়ে যখন কাঁদে, তার গলার আওয়াজ চিনি।

এক-একদিন দেখেছি উনি প্রায় শূন্য হাতে বাড়ি ফিরছেন, কিন্তু সেটি আমার ভাল লাগত না। প্রায় তিন মাস হ'ল ওঁর সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হচ্ছি। ঘুরছি নিঃস্বার্থভাবে। কিন্তু লোকটার বিদ্যাবত্তার পরিবেশটি আমার ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। সব চেয়ে ভাল লাগত ওঁর ঈশ্বর-বিদ্বেষের যুক্তি! দেখতে পেতুম নৈতিক চরিত্র, অধ্যাত্মবাদ, বড় বড় আদর্শ, পূজাপার্বণ, হিঁদু-য়ানির নানা অনুষ্ঠান, ঠাকুরদেবতা, ধর্মবিষয়—এ সব ব্যাপারে ওঁর প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। উনি ধনী সম্প্রদায়ের শত্রু, উনি চান মানুষের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিতে, উনি রুশ বিপ্লবের অনুরাগী। আমার আরেকটি উৎসাহের কারণ ছিল এই, উনি ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, স্কানডিনেভিয়ান, রুশ, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি বহু সাহিত্যের সংবাদ রাখতেন। উনি মুখে মুখে ইউরোপীয় বহু সাহিত্য থেকে কোটেশন উদ্ধার করে আমাকে শোনাতেন! এ ধরনের স্মৃতিশক্তি আগে আমি দেখি নি। শেক্‌স্‌পীয়রের ওপর এরকম দখল এক শিশির ভাদুড়ীরই আছে জানতুম: শুনেছি, শিশিরবাবু বিদ্যাসাগর কলেজে যখন শেক্‌স্‌পীয়র পড়াতেন তখন অন্যান্য কলেজ থেকে অনেক ছাত্র ক্লাস কামাই করে তাঁর আবৃত্তি শুনতে আসত! বিধুবাবুর প্রতি আমার অনুরাগ এইভাবেই বেড়ে যাচ্ছিল।

'প্রবাসী' আপিসে সকলেই বিধুবাবুর সুখ্যাতি করতেন, এবং তাঁরই সূত্রে কারো কারোর সঙ্গে আমি পরিচিত হই। প্রথম পরিচয় হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এটা ১৯২৪। এই বছরেই বেরোয় 'শনিবারের চিঠি'। ওদের আপিস ছিল 'প্রবাসী' আপিসের ভিতরে। 'চিঠির' সম্পাদক হলেন যোগানন্দ দাস—ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের ছোট ছেলে। মধুকরকুমার কাঞ্জিলাল হলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ছোট ছেলে। অনেক লেখক ও লেখিকা ছদ্মনামে 'চিঠিতে' লিখতেন। অন্য এক নব্য যুবক ছিলেন 'শনিবারের চিঠি ও প্রবাসীর' প্রুফ রীডার—তাঁর নাম সজনীকান্ত দাস! ওই চিঠিতে তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা মধ্যে মাঝে ছাপা হত। ওখানেই প্রথম দেখলুম অজাতশত্রু হাস্যরসিক এবং সঙ্গীত বিশারদ নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়কে। ওঁদের অন্যতম আড্ডার স্থল ছিল 'বাসন্তী কেবিন,' অর্থাৎ চায়ের দোকান। আরেকটি আড্ডা প্রবাসীর গেটের সংলগ্ন 'বিপিনবাবুর হোটেল'। শনিবারের চিঠিতে নজরুলের বিরুদ্ধে আক্রোশ, বিদ্বেষ ও বিদ্রূপ—এই সব যাঁরা প্রকাশ করতেন তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার ছিলেন প্রধান। পরে এর কারণটি জেনেছিলুম।

এই সময় নারকেলডাঙায় 'যুব সঙ্ঘ' নামক একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়, এবং আমি তার জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে নির্বাচিত হই। তখন দেশবন্ধুর আমল, এবং তরুণ সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হন। দেশবন্ধু মেয়র। ডাঃ বিধান রায় মহাশয় দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত। ওঁদেরই আদর্শে 'যুব সঙ্ঘ' তৈরি হয়। প্রধান কর্ম ছিল মুষ্টিভিক্ষা, চাঁদা ও পুরনো কাপড়-জামা সংগ্রহ করে দুঃস্থদের মধ্যে বিলি করা। এই সব কাজ চলবার কালে আমরা একটি 'মহতী' সাহিত্যসভার আয়োজন করি। সেই সূত্রেই আমি যাঁদেরকে নারকেলডাঙায় ডেকে আনি তাঁরা হলেন যোগানন্দ দাস, মোহিতলাল, সজনীকান্ত, হেমন্তকুমার, নলিনীকান্ত এবং আরও দু'একজনকে। সভাপতি হন মোহিতলাল। এই উপলক্ষে আমি একটি ছন্দ ও মিলযুক্ত বড় কবিতা লিখি, এবং সেই সভায় পাঠ করি। একে একে সবাই বক্তৃতা করেন। গান গাইলেন নলিনীকান্ত সরকার। পরিশেষে সভাপতি তাঁর ভাষণের পর নিজেই বলেন, তিনি তাঁর একটি কবিতা পাঠ করবেন! তিনি তাঁর জামার পকেট থেকে একখানি নবপ্রকাশিত বই বার করেন, তার নাম 'স্বপন পসারী'। সেই বই থেকে 'কালাপাহাড়' নামক একটি বড় কবিতা তিনি উচ্চ, দীর্ঘ ও তীব্র কণ্ঠে আবৃত্তি করেন। শ্রোতারা বেশ প্রভাবিত হন। লজ্জার সঙ্গেই বলি, আমার সেই অক্ষম ও কাঁচা কবিতাটা বন্ধুরা ছবির মতো বাঁধিয়ে ক্লাব ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখে!

এই বছরেই এক সময় বিধুবাবু বলেন, তুমি যখন লেখক হয়ে উঠছ, তখন এসো, একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করা যাক। সম্পাদক কে হবে? আমি প্রস্তাব করলুম, নলিনীকান্ত সরকার! সুতরাং সেই দিনই দুপুরবেলায় ছুটলুম জেলেটোলা স্ট্রীটে। নলিনীবাবুকে খুঁজে বার করে আমাদের পরিকল্পনার কথা বললুম। তিনি কমপক্ষে মাসিক চল্লিশ টাকা চাইলেন।

চল্লিশ টাকা! ভয় পেয়ে ফিরে এলুম। কিন্তু আমি অদম্য। অবশেষে সম্পাদক হলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহকারী ও হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট অশ্বিনীকুমার ঘোষ—তাঁর বাসস্থান ৯৪-এ, গড়পাড় রোড, সেখানেই কাগজের আপিস হবে—চেয়ার টেবিল র‍্যাক ইত্যাদি পাওয়া যাবে। কাগজের নাম হবে 'বিচিত্রা'। এর কিছুকাল আগে ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামানন্দবাবুর সহকারী ছিলেন, তিনি গিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে। তাঁরই স্থলে এসেছেন অশ্বিনীবাবু—সদাশয় ও অমায়িক ব্যক্তি। তাঁর মিষ্ট প্রকৃতি আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করে।

ঠিক এই সময়টায় আমাকে নারকেলডাঙ্গা ছাড়তে হয়। পারিবারিক অভাব ও অনটন তার মূল কারণ। পঁয়তাল্লিশ টাকা বাড়িভাড়া দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমরা শ্যামপুকুরের তেলিপাড়ার এক অতি সঙ্কীর্ণ চোরাগলিতে একটি পুরনো বাড়ির একতলাটা ভাড়া নিই। নারকেলডাঙ্গা ছাড়ার জন্য আমি খুবই মর্মপীড়া বোধ করেছিলুম। যাই হোক, এই নতুন জায়গার ঠিকানা দিয়ে আমি তদানীন্তন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের সঙ্গে দেখা করে 'বিচিত্রা'র ডিক্লারেশন আদায় করি। ইংরেজ ভদ্রলোক আমাকে একটু নাবালক ও অর্বাচীন মনে করে ঈষৎ সমাদর জানিয়েছিলেন! কিন্তু কিছুকাল আগে গড়ের মাঠে ক্যালকাটা-মোহনবাগানের এক ম্যাচ খেলার কালে এক ইংরেজ বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট আমাকে অকারণে মারধোর করে—সেই কারণে শ্বেতচর্মীদের ওপর আমার বিজাতীয় আক্রোশ ছিল! গান্ধীজীর অহিংসাবাদ আমার কাজে লাগে নি।

ঠিক এই সময়টায় রবীন্দ্রনাথের 'রক্ত করবী' নাটকটি প্রবাসীর ক্রোড়পত্র আকারে প্রকাশিত হয়। অশ্বিনীবাবু সেই ক্রোড়পত্রাকার নাটকটির তিনশ' কপি ছাপাখানা থেকে এনে 'বিচিত্রা'র নতুন আপিসে জমা করেন।

॥ ১৩ ॥

সাপ্তাহিক 'বিচিত্রার' প্রকাশক ও মুদ্রাকর আমি। কিন্তু যেহেতু কাগজটি ছাপা হবে প্রবাসী প্রেস থেকে, সেই কারণে বিধুবাবু অশ্বিনী ঘোষের সুপারিশ নিয়ে ভোলানাথ দত্তর দোকান থেকে চার পাঁচ রীম কাগজ প্রতি সপ্তাহে নেবার বন্দোবস্ত করলেন। মানিক দাস ছিলেন প্রবাসীর ছাপাখানার কর্তা। তিনি বললেন, লেখার কাপি আর কাগজ নিয়মিত যোগান পেলে ঠিক সময়ে প্রতি সপ্তাহে কাগজ বা'র ক'রে দেবো! মলাট ছাড়া ইমিটেশন আইভরি ফিনিশ চব্বিশ পৃষ্ঠা প্রবাসী সাইজের কাগজ, দাম এক আনা!

বিধুবাবুর হাতে কাগজ ও বিজ্ঞাপন আনার ভার। আমার ওপর রইল লেখা সংগ্রহ, প্রুফ দেখা, বিজ্ঞাপন সাজানো, কাগজ বাজারে ছাড়া, এবং সমস্ত হিসাব রাখা। তৎকালে 'ভারতী' গ্রুপের লেখকরাই সাহিত্যের বাজার ছেয়ে রয়েছেন। একে একে তাঁদের কাছে আনাগোনা আরম্ভ করে দিলুম। কাজ একটা পেলুম, মানে আকাশের চাঁদ হাতে এল।

চার্চিলের ভাষায় তখন আমার 'ঘাম আর চোখের জলের' যুগ। আমি

যেন নিয়তির ক্রীড়নক, যেমন খেলাচ্ছে তেমনি খেলছি! মিছে কথা ব'লে যাচ্ছি অনর্গল, কিন্তু নিজের কথা নিজেই শুনে অবাক হচ্ছি। কিন্তু আমি ত মিথ্যা বলিনে, অসাধু চিন্তা করিনে? কোনও দিন কারোকে ঠকিয়েছি, প্রবঞ্চনা করেছি—এ আমার মনে পড়ে না। 'বিচিত্রা'কে কেন্দ্র ক'রে দেখছি, লেখকরা মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যাচার করে, আত্মস্তুতিতে মুখর হয়, যশোলাভের জন্য হাস্যকর চেষ্টায় লিপ্ত হয়। দেখতে পাচ্ছি তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক দুর্বলতা, পারস্পরিক বিদ্বেষের মুখরতা,—যা দেখতে পাচ্ছি তা না দেখলেই ভাল হত। সাহিত্যকর্মীদের সম্বন্ধে সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা।

'বিচিত্রা'র প্রথম সংখ্যা যেদিন বেরোল, সেদিন আনন্দে ডিগবাজি খেলুম। কাগজ-বিক্রেতাদের দলপতি পাতিরামের কাছে নিজেই কাগজ পৌছিয়ে দিয়ে এলুম কলেজ স্ট্রীটে। মোড়ে মোড়ে যেন কাগজ থাকে, কারণ এ কাগজ যুগান্তকারী! কাগজ রাখলুম বাসন্তী কেবিনে, কাগজ রেখে এলুম বিপিনের দোকানে। শিয়ালদার স্টলে, মনোমোহন নাট্যমন্দিরে, হুইলারের দোকানে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে এবং নারকেলডাঙ্গা যুবসঙ্ঘে।

বাসের চলন তখন অল্প অল্প হচ্ছে। রিকশা দেখা দিয়েছে কলকাতার এখানে-ওখানে। ট্যাক্সির দাম বোধহয় চার আনা মাইল। ঘোড়ার গাড়ি সর্বত্র। কোনটাই আমার অবস্থায় কুলোবে না। সুতরাং হাঁটা ছাড়া অন্য পথ নেই।

পর-পর দুই সংখ্যা এত সামান্য বিক্রি হ'ল যে ভয় পেয়ে গেলুম। অর্থনীতিক ব্যাপারটা বিধুবাবুর হাতে। বিজ্ঞাপনাদি তিনিই দেখছেন। আমি আরেকবার কোমর বাঁধলুম।

অশ্বিনীবাবু মাসখানেকের মধ্যে আমার দুটি লেখা ছাপলেন 'বিচিত্রা'য়। একটি ছোট গল্প, অন্যটি 'দার্শনিক' এক প্রবন্ধ। গল্পটি প'ড়ে রামানন্দবাবুর কন্যা এবং সুলেখিকা শ্রীমতী শান্তা দেবী অশ্বিনীবাবুকে জানালেন, প্রবাসীতে এটি ছাপা হ'লে লেখক কিছু টাকা পেতে পারতেন!

টাকা! কথাটা শুনে সেদিন চমকিয়ে উঠেছিলুম। লিখলে টাকা পাওয়া যায় তাহলে? তবে কি সাহিত্য সেবা শুধু কথার কথা মাত্র? ওটা কি তবে ঠিক সেবা নয়, মজুরি? সে-রাত্রে আমার ঘুম হয় নি। কোথায় কি যেন একটা আমার মধ্যে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। তবে কি আপিসের কেরাণীর কলম আর সাহিত্য-স্রষ্টার কলম একই বস্তু? যারা মাটি কাটে,

রাস্তা খোঁড়ে, ফসল বানায়, কল-কারখানা চালায়, সাঁকো বাঁধে, অট্টালিকা নির্মাণ করে—তাদের সঙ্গে কবি, শিল্পী, সাহিত্যকার কি একই পর্যায়ভুক্ত? শাস্তা দেবীর সুখ্যাতি শুনে আমি আহত প্রতিহত হয়েছিলুম।

রবীন্দ্রনাথের কাছে অশ্বিনীবাবু বিচিত্রা পাঠাতেন, এটি আমার জানা ছিল না। হঠাৎ একদিন অশ্বিনীবাবু আমার কাছে এসে বললেন, এই দেখুন, রবীন্দ্রনাথ আপনার কাগজের জন্য একটি কবিতা দিয়েছেন। পড়ুন—

তৎক্ষণাৎ আমি কবির সুন্দর হস্তাক্ষরের কবিতাটি পড়তে বসলুম:

"আনমনা গো আনমনা/তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না।/বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে/তোমারও মন জানব না।/আনমনা গো আনমনা…।"

কবির কবিতাটি নিয়ে বিচিত্রার বিশেষ একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বোধ হয় এই সংখ্যাটিতেই সজনীকান্ত প্রথম স্বনামে তাঁর একটি কবিতা ছাপবার জন্য আমার হাতে দিয়ে যান। সেই কবিতার প্রথম দুটি ছত্র ছিল: "দেহের বসন লুটায় ধরণী, অশনি ঝলকে নয়ন কোণে, হৃদয়ের ভাষ স্ফুরে না অধরে, গুমরি গুমরি ফিরিছে মনে।" সজনী আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন।

পরের মাসের প্রবাসীর 'সঙ্কলন' বিভাগে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। এটি অনেককাল পরে গান হয়ে ওঠে।

দুটি কারণে আমার মধ্যে প্রচণ্ড উদ্দীপনা দেখ দেয়। প্রথম, 'আনমনা' কবিতাটি,—দ্বিতীয়, অশ্বিনীবাবুর মুখের কথা, মহাকবি নাকি আমার দার্শনিক প্রবন্ধটির ওপর চোখ বুলিয়ে অশ্বিনীবাবুকে আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। তা হবে। কিন্তু আমার ওই অক্ষম অপদার্থ রচনার জন্য বাহাদুরিবোধ এল না মনে, এল একটা ভাবাবেগ! সেদিন যেন প্রথম নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করলুম আমার ভিতরের উৎপীড়িত মানবাত্মাকে। আমার সেই উনিশ বছরের জীবনে কতটুকু বা দুঃখ পেয়েছি? কিন্তু সেদিন যেন সব দুঃখ-দুর্গতি, দারিদ্র্যের উৎপীড়ন, অন্নাভাব, নৈরাশ্য—সমস্তই যেন একত্রিত হয়ে আমার গলার ভিতর থেকে ঠেলে উঠল!

সেদিনকার খোয়া-মাড়ানো পথে ও ফুটপাথে, আকাশের আলোয়, ছ্যাকড়া গাড়ির গতিতে, রিকশাওলার ঘর্মাক্ত মুখে… আমি দেখতে পাচ্ছিলুম আমারই ছবি! দেখতে পাচ্ছিলুম আমার ভিতরের ইস্পাতের ফলাটা যেন দুঃখের দ্বারা শানিত হয়ে ঝলমল করছে। আগুনে বার বার দগ্ধ হচ্ছে, কিন্তু কঠিন হয়ে উঠছে বার বার।

বিধুবাবু আমাকে একটি নতুন কথা শিখিয়েছেন, "শ্রমের মর্যাদা"! ওর ইংরেজী সংজ্ঞা হল, dignity of labour! তুমি মেথর, ঝাড়ুদার, তুমি ফেরিওলা, মজুর-মিস্ত্রি, তুমি রিকশা টানো, গাড়ি চালাও, নর্দমা ঘাঁটো··· যাই করো তুমি, সব তোমার "ডিগনিটি অফ লেবার!" এই নিয়ে বিধুবাবু আমাকে এক পরীক্ষায় ফেলেছিলেন।

তখনও নারকেলডাঙ্গায় ছিলুম। ষষ্ঠীতলা আর বড় রাস্তার মোড়ের কাছাকাছি চওড়া নর্দমার ধারে একটা কুকুর মরে পড়েছিল। দিন তিনেক ধরে দেখছিলুম কর্পোরেশনের ধাঙড় ওটাকে এখনও তোলে নি। বিধুবাবু সেইদিকে আমার চোখ ফিরিয়ে বললেন, তুমি কি পারো সকল সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে ওই মরা কুকুরটার সৎকার করতে?

আমি হাসলুম। অহংকার আমার মনকে স্পর্শ করল। আমি যুবসঙ্ঘের সেক্রেটারি। এ-পাড়া ও-পাড়ায় কোথাও মৃত্যু ঘটলে আমাদের কাছে খবর আসত। দরকার হবামাত্র আমরা শবদেহ কাঁধে তুলে নিয়ে যেতুম সেই নিমতলার শ্মশানে···চার মাইল দূরে।

—ভেবে দেখো এটা মানুষের মড়া নয়।

আবার হাসলুম,—মরে গেলে সব দেহই সমান!

বিধুবাবু বললেন, তুমি কিন্তু বর্ণশ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ! ডোমের কাজ করতে যাচ্ছ!

বললুম, বামুনের জাত যায় না!

—কিন্তু হিঁদুয়ানি?

আমি এগিয়ে গিয়ে নর্দমার ধার থেকে মরা কুকুরটাকে তুললুম। একটু দুর্গন্ধ পাচ্ছিলুম। কিন্তু কী এসে যায়? ওটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে সহাস্যে বললুম, চলুন, হিঁদুয়ানির চেয়ে বড় 'ডিগনিটি অফ লেবার'!

জানি এটা ছেলেমানুষী বাহাদুরি। কিন্তু প্রয়োজন হ'লে মুর্দাফরাসের কাজ করব না, এ কেমন কথা? আশেপাশে দু'চারজন লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাদের বিস্ময়চক্ষুর সামনে দিয়েই পচা কুকুরের দেহটি সযত্নে ঝুলিয়ে নিয়ে চললুম!

খালের পুল পার হয়ে সোজা চ'লে এলুম রাজাবাজারের মোড়ে। ওখানে ধাপার মাঠে জঞ্জাল নিয়ে যাবার রেল-ওয়াগন দাঁড়িয়ে থাকত সকাল থেকে সারাদিন। কুকুরের শবদেহটি তারই মধ্যে ফেলে দিলুম।

সেই সপ্তাহ থেকেই আমি 'বিচিত্রা' ফিরি করতে আরম্ভ করেছিলুম।

আমি হকার, এ আমার গৌরব। আমি ঝাড়ুদার, সেও আমার গৌরব। আমি মেহনতী শ্রমিক, আমি ওয়ার্কার—সকল প্রকার কাজই আমার পক্ষে শ্রদ্ধেয়। 'বিচিত্রা' ফিরি করতে আরম্ভ করলুম শিয়ালদা ও নৈহাটির মাঝখানে ট্রেনে ট্রেনে ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে। বিকাল পাঁচটা থেকে রাত আটটা। দাঁতের মাজন, হজমি গুলী, বাতের তেল, মাথা ধরার মালিশ, আমাশার ওষুধ, চানাচুর—এদের ফেরি করছে যারা, আমি তাদেরই সঙ্গে বেচছি একখানা 'বিচিত্রা', দাম এক আনা। কী আনন্দ আমার—যখন এক আনা ফেলি পকেটের মধ্যে।—"বাড়ী ফেরবার আগে একখানা 'বিচিত্রা' নিয়ে যান মশাই! বন্ধুগণ, বাঙ্গালী হ'ল সাহিত্যপ্রিয়, সাহিত্য তাদের মরণ-বাঁচনের বিষয়। এই কাগজে নতুন জীবনের স্বাদ পাবেন। নারী জাগরণের খবর পড়ুন। এ কাগজে বৃটিশ শাসনের কঠোর সমালোচনা দেখবেন! বায়স্কোপের সব খবর আছে। দাম মাত্র এক আনা!'

মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিল, আট-দশখানা ট্রেনে অন্তত পঞ্চাশখানা কাগজ বেচে তবে বাড়ী ফিরব। পঁচিশ পার্সেণ্ট কমিশন, সুতরাং প্রতি কাগজে আমার নিজস্ব এক পয়সা থাকবে! এই ক'রে যদি মাসে উনিশ-কুড়ি টাকা পাই, তবে আমার পয়সা খায় কে? বাড়িতে প্রতি মাসে অন্তত পনেরো টাকা ঠিকই দিতে পারব! স্যার পি, সি, রায় তখন প্রবল আন্দোলন তুলে-ছিলেন, বাঙ্গালীর ছেলে চাকরি-বাকরি না খুঁজে স্বাধীন ব্যবসায়ে নামে না কেন!

একদিকে আমি আকাশ কুসুম রচনা করছিলুম মনে মনে, অন্যদিকে প্রতিদিন কাগজ বিক্রির দরুণ সব দিক থেকে কুড়িয়ে পাঁচ-ছয় টাকা জমা দিচ্ছিলুম বিধুবাবুর কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডারে। রামানন্দবাবুর ছোট ছেলে সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান অশোক চট্টোপাধ্যায়, ভ্রাতুষ্পুত্র হেমন্তবাবু এবং অশ্বিনী ঘোষ মহাশয় যথেষ্ট বদান্যতার পরিচয় দিচ্ছিলেন। কিন্তু ভোলানাথ দত্তর দোকানে এবং প্রবাসী প্রেসে এই চার মাসে মোট কত টাকা দেনা হয়েছে আমার জানা ছিল না। আমি থাকি শ্যামপুকুরে, প্রবাসী প্রেস রাজাবাজারে, ভোলানাথ দত্ত রাধাবাজারে, আপিস গড়পারে এবং বিধুবাবু থাকেন নারকেল-ডাঙ্গায়। পারস্পরিক যোগাযোগ যেন ক্রমশ কমে যাচ্ছিল।

মাস তিনেক পরে হঠাৎ একদিন হেমন্তবাবু আমাকে ধরলেন। বললেন, বিধুর খবর কিছু পাচ্ছিনে। সে কোথায় বলতে পারেন?

বললুম, আমার সঙ্গে কিছুদিন দেখা হয় নি।

ওর কাছে প্রবাসীর বিজ্ঞাপন আদায়ের টাকা জমেছে অনেক—প্রায় হাজারখানেক ত হবেই। স্থদু (অশোক) ওর খোঁজ করছিল !—হেমন্তবাবু নিজেই চ'লে গেলেন।

দিন দুই পরে অশ্বিনীবাবু বললেন, ভোলানাথ দত্তর ওখান থেকে তাগাদা দিচ্ছিল। বিধুবাবুকে দেখতে পাচ্ছিনে। টাকা কি আপনিই দেবেন?

আমি?—একটু ভয় পেয়ে আমি বললুম, আমি কিছু জানিনে ত? সব টাকাই থাকে বিধুবাবুর কাছে। কত টাকা হবে সবসুদ্ধ?

তা প্রায় সাতশ'! ওর মধ্যে ছাপাখানা, ব্লক, দপ্তরি, ভোলানাথ দত্ত —সবই আছে।

সেদিন চিন্তিতভাবে অশ্বিনীবাবু তাঁর বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি বসেছিলুম 'বিচিত্রা' আপিসে। আমি এখানে সর্বময় কর্তা। রোজ আসি সকাল দশটায়, বাড়ী ফিরি রাত দশটায়। কিন্তু টাকা পয়সার তহবিল থাকে বিধুবাবুর কাছে। তিনি টাকা দিতে পারেন নি কেন, এটা আমার জানা দরকার। 'বিচিত্রা'র বিজ্ঞাপনের দরুণ টাকা, এতদিনের নগদ বিক্রির টাকা, প্রবাসীর পাওনা টাকা—সব মিলিয়ে অন্তত হাজার দেড়েক হবে বইকি।

আপিস থেকে বেরিয়ে পূর্ব পথে খালধারে এলুম। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে পুল পেরিয়ে ষষ্ঠীতলায় এসে পৌঁছতে আধঘণ্টার ওপর লাগল। লাইব্রেরির সামনে এসে দেখি পঞ্চুদের বাড়ির দরজার বাইরে তালা লাগানো। খানিকক্ষণ থমকিয়ে গেলুম। গলাটা আমার শুকিয়ে উঠল। আমার চারিদিকের দৃষ্টিপথে কেমন যেন সন্দেহের ছায়া দেখতে পেলুম!

ষষ্ঠীতলা ধরে কিছুদূর পূর্ব পথে এসে দেখলুম, সেই মনোহারির ছোট্ট দোকানে ফটিক তেমনি বসে রয়েছে। আমাকে দেখেই সে উল্লসিত হয়ে উঠল। আমি চলে যাবার পর নাকি এ পাড়া অন্ধকার। ক্লাবে রিহার্সাল বন্ধ আছে, 'যুবসঙ্ঘে' এখন আর কাজ তেমন চলছে না।

—আমাকে এক গেলাস জল দাও, ফটিক।

জল খেয়ে সুস্থ হয়ে আমি বললুম, আচ্ছা ফটিক, বিধুবাবুর বাড়ীতে তালাবন্ধ দেখলুম। ওরা কোথায়?

ফটিক আমার দিকে সটান তাকালো। বলল, কিছু জানো না তুমি?

বললুম, কী জানব?

ফটিক বলল, ভেতরে এসো। এখন দুপুরবেলা খদ্দের নেই। এস—

ভিতরে গিয়ে বসলুম। ফটিক গল্প ফাঁদল। সেই বউটা উপোস করে থাকে। বিধুবাবু কোন কোনও দিন রাত্রে আসে, সকালে বেরিয়ে যায়। এদিকে একদিন রাত্রে বউটার প্রসববেদনা ওঠে। পাশের বাড়ীর লোক জানতে পেরে লাইব্রেরির প্রেসিডেন্ট সুশীলবাবুকে খবর দেয়। দাই আসে। শেষ রাত্রে একটা মেয়ে হয়। সুশীলবাবু নিজের পকেট থেকে সব খরচা দেন। তিনি একজন ঝিকেও রাখেন ওই বউটির সঙ্গে!

—তারপর?

বিধুবাবু গায়েব হয়েছিল দশ-বারো দিন। পরে শুনলুম একদিন হঠাৎ মাঝরাত্তিরে এসে আগে ঝিটাকে তাড়িয়ে দেয়, তারপর বউ ও বাচ্চাকে নিয়ে সেই রাত্রেই নিরুদ্দেশ হয়। চার পাঁচ-মাসের ঘর ভাড়া না দিয়েই কেটে পড়েছে! আমাদের সেই ধীরেন ভঞ্জকে মনে আছে তোমার? সে বিধুবাবুর সব জানে।

—আর কি জানার আছে ফটিক?

—আছে, আছে।—ফটিক বলল—ও মেয়েটি ওর বিয়ে করা বউ নয়! ও ছিল বিধবা। ওকে ফুসলিয়ে বার করে আনে দুই বন্ধু, বিধু আর একজন। প্রথম জন ফুর্তি মেরে পালিয়েছে, বিধু হল দ্বিতীয়। মেয়েটা ওকেই আঁকড়িয়ে ধরে।

আমার কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছিল। বললুম, ওরা এখন কোথায় আছে বলতে পারো, ফটিক?

—আমি ত বলতে পারিনে, ভাই। তবে ধীরেনদা কবে যেন বলছিল, ওরা শুঁড়োর ওদিকে রাসবাগানে বুঝি গা-ঢাকা দিয়ে আছে।

বললুম, তুমি ভাই একটি কাজ করো। বিধুবাবুকে আমার খুবই দরকার। ধীরেনবাবুর কাছ থেকে যদি ওঁর ঠিকানা পাও, রেখে দিয়ো, ভাই। আমি আরেকদিন আসব।

—দাঁড়াও, ফটিক বলল, ধীরেনদা ওষুধ ক্যান্‌ভাস করতে যায়, তুমি জানো। দিন তিনেক আগে সে গেছে বিহারের ওদিকে। ফিরতে তার পনেরো দিন, হয়ত এক মাসও হতে পারে, আমি বলতে পারিনে। তুমি সেই বুঝে এসো।

ফিরবার পথ ছিল আমার দীর্ঘ। হাঁটতে হাঁটতে বিধুবাবুর বক্তৃতার কথাই ভাবছিলুম:

চৌর্যবৃত্তিটা পাপ কে বললে? প্রতারণার কৌশল—সে ত শুধু মস্তিষ্কের খেলা! মানুষ অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না কি? সচ্ছলতা যদি

থাকে তবে কেন চুরি করবে? অর্থবণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটিই ত সাধু ব্যক্তিকে অসাধু করে তুলছে! প্রত্যক্ষ প্রতারণাটা তোমার গায়ে লাগছে, কিন্তু যেটা অপ্রত্যক্ষ,—যার নাম স্টক-এক্সচেঞ্জ, সামান্য একটা তামার পয়সার হেরফের করে বড় বড় ব্যবসায়ীরা যখন লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করে—সেটা কি প্রতারণার কৌশলমাত্র নয়?—বিধুবাবুর কথাগুলো কানে বাজছিল।

কোন্ রাস্তা দিয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছিলুম, অতটা লক্ষ্য ছিল না। শুধু ভাবছিলুম, আমি কি প্রতারিত বিধুবাবুর হাতে? উনি আমার বিশ্বাসকে নষ্ট করে বুক ভেঙ্গে দিয়ে যাচ্ছেন—এ কি সত্যি?

অতঃপর দেখতে দেখতে 'বিচিত্রা'র নাভিশ্বাস উপস্থিত হল। শেষ সংখ্যাটা বাজারে ছেড়ে দিয়ে গড়পারের আপিস ত্যাগ করলুম।

'কল্লোল' মাসিক পত্রিকার প্রথম বছরেই কোন্ মাসে যেন আমার একটি লেখা ছাপা হয়। কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ ছিল না। শুধু হরিহর চন্দ্রকেই আমি রাঙ্গাদা বলে ডাকতুম কয়েক বছর আগে থেকে। সম্প্রতি 'কল্লোলে'র যুগ্ম সম্পাদক গোকুল নাগ মারা গেলেন যক্ষ্মা রোগে, আমি এটি শুনে একটি শোকবার্তা পাঠিয়েছিলুম, সেটি 'কল্লোলে' ছাপা হয়েছে দেখছি।

এদিকে প্রবাসী আপিসের ওঁরা আমার শ্যামপুকুরের ঠিকানা জানতেন, কারণ ওই ঠিকানাটাই 'বিচিত্রার' শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা হত। অশ্বিনীবাবু মধ্যে মাঝে আমার কাছে টাকার তাগাদা দিয়ে লোক পাঠাচ্ছিলেন। বিধুবাবু আমাকে ডোবান নি, ডুবিয়েছেন প্রবাসীকে আর অশ্বিনীবাবুকে। এর মধ্যে আমি কিন্তু নৈতিক অপরাধে অপরাধী! আমি 'বিচিত্রা'র প্রকাশক, আমারও দায়িত্ব ছিল বইকি।

ধীরেন ভঞ্জ বুদ্ধিমান লোক, তারও বাড়ি শুঁড়োর ওদিকে। সে বিধুবাবুর গতিবিধি একটু-আধটু জানত। বিধুবাবুর ঠিকানার একটা বর্ণনা সে রেখে গিয়েছিল ফটিকের কাছে। শ্যামপুকুর থেকে ষষ্ঠীতলা তিন থেকে চার মাইল। একদিন ভোরে উঠে দুর্গা বলে রওনা হলুম।

ফটিকের কাছে ঠিকানার নির্দেশ নিয়ে স্যার গুরুদাসের বাড়ীর পাশ কাটিয়ে রেললাইনের পুলের তলা দিয়ে চললুম শুঁড়ো পেরিয়ে রাসবাগানে। বেলা আন্দাজ ন'টা। বোধ হয় মাঘের শেষ। সকালের হাওয়াটা স্নিগ্ধ। পুলিসের কুকুর যেমন হাওয়ায়-হাওয়ায় অপরাধীর গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগোয়,

আমি তেমনি গলিঘুঁজি এপাশ ওপাশ দেখতে দেখতে গিয়ে একটি ছোট ময়দানের কাছাকাছি এলুম। এদিকে অনেকগুলো ঘোড়ার গাড়ির মেরামতি আড্ডা ও আস্তাবল। কোথাও ঘোড়ার পায়ের তলায় নাল্ বসাবার আগে ছুরি দিয়ে ক্ষুরের চোকলা কাটছে, কোথাও দলাই-মলাই চলছে, কোথাও বা গাড়ি জুতে ঘোড়াকে দানাপানি ও ঘাস দেওয়া হচ্ছে। ঘোড়াকে জল খাওয়াবার জন্য কলকাতা ও শহরতলীর সর্বত্র লোহা-বাঁধানো লম্বা চৌবাচ্চা থাকে। ভিস্তিরা ওগুলোয় জল ভরিয়ে রাখে। ভিস্তির চামড়াভরা জল কেনে বহু পরিবার। কলকাতায় জলের অভাব প্রচুর। গুটি গুটি এগোচ্ছিলুম। রাস্তার নাম 'রাসবাগান লেন'। বাড়ীর নম্বর নেই। আছে বর্ণনা। লেন, বাই লেন, ফার্স্ট লেন, সেকেণ্ড লেন। সে যেন এক গোলক ধাঁধাঁ। হঠাৎ এক ফাঁকা ছোট মাঠের সামনে এসে থমকিয়ে গেলুম।

অদূরে দরজার কাছে এক সুন্দরী মহিলা চোখের জল মুছলেন, এবং তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বছর দশেকের একটি ছেলে। আমি বিধুবাবুর স্ত্রীকে স্পষ্ট করে কোনও দিন চোখ তুলে দেখি নি। কিন্তু ওই ছেলেটি আমাকে দেখামাত্র এগিয়ে এল। কাছে এসে বলল, আপনি কি অমুক?

—হ্যাঁ—

—একবার আসুন, বউদিদি ডাকছেন।

আমাকে সামনে দেখেই বিধুবাবুর স্ত্রী ডুকরিয়ে কেঁদে উঠলেন। মাথায় তাঁর ঘোমটা, মুখখানি আনত।—পরনে আধময়লা যেমন তেমন একখানা মিলের শাড়ি, হাতে সেই ঘন বেগুনী রংয়ের কাঁচের একগাছা চুড়ি। ওঁর ওই প্রকার কান্না দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম।

কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত মাত্র। একথা কে না স্বীকার করবে, সুন্দরী রমণীর বুক-ফাটা কান্না দেখলে পুরুষমাত্রই চঞ্চল হয়ে ওঠে? প্রশ্ন করলুম, বিধুবাবু কোথায়?

—তিনি নেই!

ছেলেটা বলল, তিনি ভোরবেলা উঠে বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেছেন—বউদিদি ছিলেন পুকুরঘাটে।

—কোথায় গেছেন তিনি?

এবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মহিলা বললেন, আজ তিন দিন থেকে ওই বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে আমার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করছিলেন—

—কেন?

নতমুখে মহিলা বললেন, মেয়েটাকে উনি ওই আস্তাবলের লোকদের কাছে বিক্রি করেছেন!

বজ্রাহত কণ্ঠে বললুম, বিক্রি? নিজের মেয়েকে?

ছেলেটা বলল, ওই যে ওপাড়ার আস্তাবল দেখা যাচ্ছে, ওখানে আছে মনসুর আলি, ও সব জানে।

মহিলা তেমনি করেই কাঁদছিলেন।

আমি নিজে রোগাটে, অনাহারী, দুর্বল দেহ। কিন্তু এই শুকনো কাঠের মধ্যেও অগ্নিদেবতার চৈতন্য আছে, ঠিক সময় দাউ দাউ করে জ্বলে! ইস্পাতের জিকলিকে তলোয়ার,—দরকার হলে সর্বাপেক্ষা বলবান দস্যুরও মাথা কাটে! দধীচির অতি শীর্ণ কঙ্কাল, কিন্তু সেই কঙ্কালে বজ্রদণ্ড তৈরি হয়। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা অতি পৈশাচিক প্রতিহিংসা যেন ধকধক করে জ্বলে উঠল। শান্ত কণ্ঠে আমি বললুম, আমি যাচ্ছি এখন, দেখি কি করতে পারি। আবার আমি আসছি আপনার এখানে। এ ছেলেটি কে?

—এঁদেরই বাড়ি। আমরা একখানা ঘর নিয়ে থাকি।

আমি তখনকার মতো চলে গেলুম।

মনসুর আলিকে খুঁজে বার করতে লাগল ঘণ্টাখানেক। চেহারাটা সৌম্য। কাঁচাপাকা দাড়ি, সিপসিপে চেহারা। সে চার-পাঁচখানা ঘোড়ার গাড়ির মালিক। তাদের দেশ বিহার শরিফে। লোকটা বাঙলা বোঝে। আমি বললুম, বাচ্চা মেয়েটা কোথায়, আলিসায়েব?

আমার চেহারা দেখে লোকটা তৎক্ষণাৎ সব বুঝে নিল। বলল, সে বাচ্চা লেড়কি আছে দো মাহিনেকা! লেকিন বাচ্চাকে নিয়ে ত আজ চলে যাচ্ছে আমার শাড়ুভাই?

—কোথায় যাচ্ছে? সে মেয়েকে আমি এখনই ফেরৎ চাই। ফেরৎ দেবে কিনা শুনি!

মনসুর আলি শান্ত কণ্ঠে বলল, বাবু, সাচ্ বলি শুনুন। বাচ্চার বাপটা হারামি আছে! বাচ্চাটাকে জোর করে আমার বিবির কাছে গছিয়ে দিয়ে পঁচিশঠো রুপিয়া লিয়ে গেছে। বাচ্চা মেয়েটা বহুৎ সুন্দর আছে। আমরা ফেরৎ দিতে এখনই রাজি—যদি না বাচ্চাকে রেলগাড়িতে নিয়ে গিয়ে থাকে। বাচ্চাকে লিয়ে গেছে কলাবাগানে। দোপহর বারো বাজে ট্রেন।

বসির মিঞা ফীটন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মনসুর আলি ওকে থামালো। বসিরকে বলে দিল, রহমৎ মিঞার কাছে এঁকে নিয়ে যা। বাচ্চা লেড়কিকো

ওয়াপস দে নে কহোগে। বাবু, এই গাড়িতে আপনি এখনই চলে যান্ কলাবাগানে। টাকাকড়ির কথা পরে হবে।

আমি ছুটে গিয়ে বসির মিঞার ভাড়াটে ফিটন গড়িতে চড়ে বসলুম। এই প্রথম উঠলুম ফিটনে। একটি বলবান ঘোড়া গাড়ি টেনে চলল।

এর পর থেকে যে ঘটনা-পরম্পরা, সে এক দুর্জয় অভিযানের মতো। রাজাবাজারের মোড়ে বৃটিশ-প্রশাসন-বিরোধী এক মিছিলের জন্য গাড়ি আটকিয়ে গেল। বিপ্লববাদীদের একটা অংশ কর্পোরেশনে নানা কাজ নিয়ে ঢুকেছে। লর্ড লিটন এখন বাঙ্গলার গভর্নর। সমগ্র বাঙ্গলা অসন্তোষে ভরা।

আমাদের গাড়ি পটলডাঙ্গার ভিতর দিয়ে কলাবাগান বস্তিতে যখন ঢুকল, তখন পৌনে এগারোটা। সেই বস্তি ছোট ছোট সঙ্কীর্ণ গলিতে বিভক্ত। তার শাখা-প্রশাখা কোন্ দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে মিশেছে বলা কঠিন। বীভৎস নোংরা ও জঞ্জাল চারিদিকে। বসির মিঞা একপাশে গাড়ি রেখে একটি চালাঘরে ঢুকল এবং এক মিনিটের মধ্যে এসে জানালো, রহমৎ মিঞা তার বিবি আর বাচ্চাকে নিয়ে পাঁচ মিনিট আগে হাওড়া স্টেশনের দিকে গেছে।

বসির মিঞার মুখে-চোখে কিছু চাতুরী ছিল। একটু গড়িমসি করছিল। সে চায় আমাদের পৌছবার আগে হাওড়া থেকে গাড়িখানা যেন ছেড়ে যায়।

অনেক চেঁচাচেচির পর আবার ওকে নড়ালুম। গাড়িখানা এবার গলি দিয়ে বেরিয়ে এল হ্যারিসন রোডে আলফ্রেড থিয়েটারের কাছাকাছি। বসির এবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ি ছুটিয়ে দিল। আমি পুলিসের ভয় দেখিয়েছিলুম।

তখন হাওড়া স্টেশনে পৌছতে হ'ত পুরনো পন্টুন্ ব্রীজ পেরিয়ে। হ্যারিসন রোড ধরে সোজা পশ্চিম পথে স্ট্র্যাণ্ড রোড অতিক্রম করলেই সেই পুল। পথের দুধার দেখতে দেখতে যাচ্ছি আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়ে। আজ সেই দিনের কাহিনী যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। স্টেশনের ঘড়ি তখন চব্বিশ মিনিট পিছিয়ে চলে। এপারে এলে ক্যালকাটা টাইম্। এখন পৌনে বারোটা। সওয়া বারোটায় পাটনার গাড়ি ছাড়বে।

বসির আমার কড়া শাসনে ছিল। স্টেশনের পুলিস আপিস আমি জানি। মেয়েটাকে না দিতে চাইলে আমি যা করবার তাই করব। বসির মিঞা প্লাটফরমে এসে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় রহমৎ মিঞাকে ধরল। ওর বিবি বোরখার ঢাকা মুখের থেকে সরিয়ে আমাদের দিকে তাকাল। জানলা দিয়ে দেখলুম, ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাটাকে ন্যাকড়া পেতে বেঞ্চের উপর ঘুম

পাড়িয়ে রেখেছে। আমি সটান গাড়িতে উঠে গিয়ে সেই গ্যাকড়াসুদ্ধ বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে তুলে নিলুম। আমার মনে হচ্ছিল সেদিন আমি এই বাচ্চার জন্য জীবন দিতে পারতুম! রহমতের সঙ্গে বসিরের আলাপাদি আমার বোধগম্য হল না।

সেদিন বাইরে এসে ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলুম। সেই ট্যাক্সিতে বাচ্চাকে নিয়ে যখন রাসবাগানে পৌছলুম, বেলা তখন একটা বাজে। মেয়ে নিয়ে ফিরেছি শুনে পাগলিনীর মতো মাঠের ধারে বেরিয়ে এলেন বিধুবাবুর স্ত্রী। লাজলজ্জা, সম্ভ্রম—সব ভুলে গিয়ে নিজের বুকের কাপড় সরিয়ে বাচ্চার কচি মুখটি স্তনের রক্তিম বিন্দুর উপর তিনি চেপে ধরলেন। পরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ওই দস্যুর হাত থেকে আপনি আমাকে বাঁচান্। আমার মা নেই, কিন্তু বাবা এখনও বেঁচে। আমি যত অন্যায়ই করে থাকি না কেন, বাবা আমাকে ফেলবেন না। আমি ওই বিশ্বাসঘাতকের হাত এড়াতে চাই। আপনি আমাকে দয়া করে বাবার কাছে রেখে আস্থন।

মহিলার নাম নাকি অণিমা। এই কথা স্থির রইল সামনের শনিবারে আমি প্রস্তুত হয়ে এসে ওঁকে কেষ্টনগরে নিয়ে যাব।

এ কাহিনী এখানে শেষ হচ্ছে না, কেন না প্রবাসী ও বিচিত্রার হিসাব রইল বিধুবাবুর কাছে। অশ্বিনীবাবু আমাকে তাগাদা দেবার জন্য রইলেন, ছাপাখানার মানিকবাবু অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং ভোলানাথ দত্তরা তাঁদের বিলের দরুন টাকার অপেক্ষায় রইলেন। প্রবাসীর কর্তৃপক্ষ হয়ত বিধুবাবুর বিরুদ্ধে পুলিসের হুলিয়া বার করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা আর অগ্রসর হন নি। বিধুবাবু বোধ হয় ভদ্রমনের দুর্বলতাগুলি জানতেন।

যাই হোক, আমার কপালে আরেকবার ডিগবাজি খাবার দুর্ভাগ্য ছিল। আমি যথানির্দিষ্ট শনিবারে শ্রীমতী অণিমাকে তাঁর পিত্রালয়ে নিয়ে যাবার জন্য রাসবাগানের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম, কিন্তু অণিমা দেবী ও তাঁর বাচ্চা কেউ নেই বাড়িতে! শুনলুম দিন দুই আগে গভীর রাত্রে একখানা রিক্শা এনে বিধুবাবু তাঁর স্ত্রী ও বাচ্চাকে কোথায় নিয়ে গেছেন কেউ জানে না।

ছেলেটা বলল, ঘর ভাড়াও দিয়ে যায় নি। আমরা সবাই তখন ঘুমোচ্ছিলুম।

এই ঘটনার বছর চার-পাঁচ পরে আমি এই বিষয়টি নিয়ে তৎকালীন 'ভারতবর্ষে' একটি ছোট গল্প লিখি।

গরানহাটার মোড় বলতে বিডন স্ট্রীট আর চিৎপুরের সংযোগ স্থলটিকে বোঝাতো। ওখান থেকে শেয়ারের ঘোড়ার গাড়ি ছাড়ত বরানগরের বাজার পর্যন্ত। বরানগরে আমাদের আত্মীয়কুটুম্ব অনেক। শেয়ারের গাড়িতে নিত চারজন, মাথাপিছু দু'আনা ভাড়া। বরানগরে আমার এক বয়স্ক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা। আলমবাজার জুট মিলে আমার একটা চাকরি জুটতে পারে এমন সম্ভাবনা ছিল।

ইস্কুলে থাকতে আমরা একটি ফুটবল ক্লাব করেছিলুম। নাম ছিল গরানহাটা স্পোর্টিং। রবি সরকার ছিল তার ক্যাপ্টেন। চাঁদা ছিল মাসে দু'আনা, যেটি কোনদিনই দিতে পারি নি। এই গরানহাটার পথ ধরে কিশোর বয়সে বরানগর যাবার কালে একদা মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে একটি গোলাপী রংয়ের পুঁটলি কুড়িয়ে পাই ট্রাম-রাস্তার উপরে। ছোট্ট পুঁটলি, কিন্তু ওজন প্রচুর। পুঁটলিটা হাতে নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলুম। এ টাকার পুঁটলি, অন্য কিছু নয়। কিন্তু এর মালিক কেউ কোনও দিক থেকে ছুটে আসছে না তবু আমার সর্বাঙ্গ থর থর করছিল উত্তেজনায়। আমাকে তখন পিছন থেকে লক্ষ্য করছিল দুজন ঠেলাওয়ালা—তা'রা আমার পিছু নিয়েছিল। অদূরে পূর্ব ফুটপাথে এক সরকারী স্নানাগারের কাছাকাছি যখন এসেছি, তখন ওই দুটো লোক আমাকে ডেকে নিয়ে সেই স্নানাগারে ঢুকল, এবং আমার হাত থেকে পুঁটলিটা কেড়ে নিয়ে বলল, যাও, ভাগো, এ হামার চীজ হ্যায়।

আমি দাঁড়িয়ে রইলুম নির্বোধের মতো। কিন্তু ওদের তর সইল না। পুঁটলি খুলে ওরা দেখল বড় একমুঠো ঘোড়া-মার্কা গিনি। আমি হতবাক হয়ে রইলুম। জীবনে ওই প্রথম দেখলুম গিনির চেহারা কেমন!

সেদিনকার সেই বছর বারো বয়সের অর্বাচীন মূঢ় ছেলেটাকে ভয় দেখিয়ে ওরা বলল, চুরি করে পালাচ্ছিলে, কেমন? এখনো দাঁড়িয়ে থাকলে পুলিসে ধরিয়ে দেবো!

আমি শান্তভাবে বেরিয়ে গেলুম সেই স্নানাগারের ভিতর থেকে। বাড়ী ফিরে ঘটনাটা বলেছিলুম। মা আমাকে আদর করে বলেছিলেন, পরের জিনিসে নাই বা লোভ করলি! বরং এই ত ভাল, যত ঠকবি ততই শিখবি! যা, খেলাধুলো করগে যা—কাঁদিসনে—।

যাই হোক, বরানগরের কাজ সেরে যখন আবার গরানহাটার মোড়ে এসে গাড়ি থেকে নামলুম, বেলা তখন আন্দাজ সাড়ে দশটা। আগের দিন রাত্রে ছিল পূর্ণিমার চন্দ্রগ্রহণ। আজ ভোর থেকে পথে পথে গঙ্গাস্নানের যাত্রীদের খুব ভিড় লেগেছে। সেই ভিড়ের ভিতর দিয়ে যখন ছাতুবাবুর বাজার ছাড়িয়ে পূবদিকে কিছু দূর এগিয়েছি, তখন হঠাৎ পাশ থেকে এক নারীকণ্ঠ আমাকে ডাকল, রাম নাকি রে?

থমকিয়ে ফিরে তাকালুম। কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবিষ্কার করলুম, এ সেই নিবারণ দাসের বউ কেষ্টদাসী। তেমনি সুশ্রী চেহারা আর সুন্দর স্বাস্থ্য। গলায় তেমনি বোষ্টমের পাঁচনরী কণ্ঠী, গায়ে রেশমী একখানা চাদর জড়ানো, পরনে সরু কালাপাড় একখানা ধুতি। পা খালি।

হেসে বললুম, অনেকদিন পরে দেখা। বোধ হয় সাত-আট বছর হবে!

কেষ্টদাসী আমাকে তুই না বলে তুমি বলল,—কী ঢ্যাঙ্গা হয়েছ? অথচ আমার চেয়ে তুমি পাঁচ বছরের ছোট। আজকাল আছ কোথায় তোমরা? মাসিমা কেমন আছেন? তোমার দাদারা, দিদিরা, বউদিদি—সব ভাল ত? তোমার ছোড়দার বিয়ে হয়েছে? দিদিমা আছেন ত? তোমাদের সেই যমদূতের মতন মামা?

একরাশি প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে চললুম। বেথুন কলেজের কোণে ট্রাম রাস্তার মোড়ে এসে কেষ্টদাসী বলল, না, না—এখন বাড়ী ফিরতে হবে না। আমাদের ওখানে চল। এই ত গোয়াবাগানের মোড় ছাড়িয়ে আরেকটু এগোলেই আমাদের বাড়ী—উঃ—

—কি হল?

কি যেন ফুটল পায়ের তলায়!—বলতে বলতে হেঁট হয়ে কেষ্টদাসী পায়ের তলাটা ঝাড়ল তার হাত দিয়ে। একবার পা ফেলল। না, যায় নি। ভিতরটায় বেশ লাগছে, খচখচ করছে।

ওই নিয়েই কেষ্টদাসী ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে হেদুয়া আর স্কটিশ কলেজ ছাড়িয়ে নিরিবিলি ফুটপাথ ধরে চলল। সে আমার বয়সের থেকে অত বড়, আমি তার নির্দেশ অমান্য করতে পারিনে। একদা লুকিয়ে লুকিয়ে আমি ওর ফাই-ফরমাশ খেটে দিতুম, নিবারণ দাসকে লুকিয়ে ওকে খাবার এনে খাওয়াতুম,—তাই কেষ্টদাসী আমাকে খুব ভাল বাসত।

একটি পান-চুরোট-তামাক মেলানো ছোট বেনের মসলার দোকানের সামনে এসে কেষ্টদাসী দোকানের লোকটিকে বলল, হুটু, একে চিনতে পারিস?

এ সেই খোকা, যার কথা তোকে বলতুম।

ঝুটু হাসি মুখে তাকাল আমার দিকে। বলল, আপনাদের সব কথা মাসির মুখে শুনেছি। মাসি, তুমি ওকে ছেড়ো না। আজ পার্বণের দিন, ব্রাহ্মণ-ভোজন করিয়ে দাও। আপনি থেকে যান রামবাবু, এখানে চানটানের কিচ্ছু অসুবিধে হবে না।

আমি বললুম, তা মন্দ কি, ভালমন্দ একদিন খেয়েই যাই!

দোকানটির গায়ে সরু একটি গলি, তারই ডানদিকে এক তেলেভাজা খাবারের দোকান। এই দোকানের বাড়ি একতলা। কেষ্টদাসী আমাকে নিয়ে গলির ভিতরে এক পুরনো বাড়িতে ঢুকে একতলার ছাদে এনে তুলল।

ছাদ খুব বড় নয়। তার দক্ষিণ দিক ঘেঁষে উত্তরমুখী ঘরখানায় কেষ্টদাসী থাকে। পাশেই ছোট একটি করোগেটের চালা। চালার পাশেই একটা কলতলা। একজন মাত্র ব্যক্তির পক্ষে আদর্শ বাসস্থান।

ঘরে এসে গায়ের চাদরখানা খুলে রেখে কেষ্টদাসী পা ধুয়ে এল। আমি তক্তাখানার উপর বসে বললুম, দাসমশাই কদ্দিন মারা গেছেন, দাসীদি?

হাসিখুশী মুখে কেষ্টদাসী বলল, বেঁচেছি,—এই চার বছর হল! আমার সব জ্বালা জুড়িয়েছে। আমি মুক্তি পেয়েছি, খোকা। তুমি ত দেখেছ কতবার, আমার পিঠে আর গায়ে কালশিরের দাগ দিনের পর দিন! এগারো বছরে আমার বিয়ে হয়েছিল, বাইশ বছর বয়স অবধি শুধু ওই ভণ্ড বোরেগীর হাতে মার খেয়েছি! সেই মার খেয়ে তোদের কাছে লুকোতুম। আমার কান্না দেখে তোরা যখন কারণ জানতে চাইতিস, আমি বলতুম, প্রেমাশ্রু! মনে পড়ে?

—খুব মনে পড়ে!—আমি হাসতে লাগলুম।

পাশে এসে একবারটি বসে ছিল দাসীদি। এবার উঠে আমার গায়ের জামাটা ও গেঞ্জিটা ছাড়িয়ে নিল। এসব তার অনেককাল আগের অভ্যাস, আমি তখন খুব ছোট। দাসীদি বলল, বড্ড ময়লা করেছিস জামা-কাপড়। দাঁড়া, আমি সব সাবান দিয়ে কেচে দিচ্ছি। এই নে, একখানা চাদর জড়িয়ে থাক্। ধুতিখানাও ছেড়ে দে।

কেষ্টদাসী গায়ের আঁচলটা পিছন দিক থেকে ঘুরিয়ে আল্‌গা গা ঢেকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে নিচের তলার দিকে গেল। ওর ঘরটিতে আসবাবপত্র বেশ গোছানো। দরজার পাশে ওর পুজো-আহ্নিকের জায়গা। কাঁচের বাক্সের মধ্যে বিষ্ণুমূর্তি, গৌর-নিতাইয়ের ছবি,—প্রতি বাক্সের কাঁচে চন্দনের

ছিটে দেওয়া। রোশন-চৌকিতে পুজোর বাসন সযত্নে সাজানো। একখানা পশমের আসন উলটিয়ে রাখা। আলনায় ঝুলছে যোগিয়া রংয়ের আরেকখানা চাদর, একখানা পাটকরা কালা কাশিপাড় শাড়ি, নতুন গামছা একখানা, একটি প্রমাণ সাইজের সেমিজ। এ-ছাড়া প্যাটরা-বাক্সগুলি বেশ গুছিয়ে রাখা। একটি র‍্যাকের ওপর কয়েকখানা বই গোছানো। রামায়ণ মহাভারত ছাড়া প্রহ্লাদ চরিত্র, অন্নদামঙ্গল, সাবিত্রী উপাখ্যান, নল-দময়ন্তী, শ্রীবৎস-চিন্তা, বেহুলা-লখিন্দর প্রভৃতি বটতলায় ছাপা কয়েকখানা বই। সরু তক্তাখানায় একজনের মতো বিছানা পড়তে পারে।

মিনিট দশেক পরে কেষ্টদাসী ফিরে এল। হাতে তার দু' ঠোঙ্গা খাবার। ঘরে এসে বলল, মুখখানা তোর শুকিয়ে গেছে। কিছু খেয়ে নে।—ওরে, আমার পায়ের তলাটা ভারি কষ্ট দিচ্ছে। কী যে ফুটল!

একখানা কাঁসার থালা এনে সে ঠোঙ্গা দুটো রাখল। তারপর তক্তায় বসে নিজের পায়ের তলাটা দেখল হাত বুলিয়ে। খচখচ করে খুব লাগছে।

বললুম, একটা ছুঁচ দাও, দেখি কি ফুটেছে।

কেষ্টদাসী ছুঁচ বার করে এনে ঠিক হয়ে বসল। আমি ওর একখানা পা আমার হাতের কাছে টেনে নিলুম। তারপর হেঁট হয়ে সাবধানে ছুঁচ দিয়ে একটু একটু খুঁচিয়ে অবশেষে ছোট্ট একটি কাচের কণা বার করে দিলুম। সে খুব স্বস্তি পেল।

অতঃপর পাখানা সরিয়ে নিয়ে হাসিমুখে কেষ্টদাসী উঠে দাঁড়াল। তারপর থালায় রাখল মিষ্টান্ন, গরম গরম বেগুনি আর পেঁয়াজবড়া। খুশী হয়ে বললুম, মনে পড়ে এমনি পেঁয়াজবড়া এনে তোমাকে ছাদে ডেকে চুপি চুপি খাওয়াতুম?

কেষ্টদাসী বলল, এখন আর এসব ভাবতে নেই রে, এখন আমি বিধবা!

—মানে? তুমি খাবে না আমার সঙ্গে?

—খেতে নেই রে!

তৎক্ষণাৎ আমি উত্তপ্ত হয়ে উঠলুম। উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, দাও আমার ধুতি, জামা আর গেঞ্জি, এক্ষুণি আমি চলে যাব।

আমার পথ আড়াল করে দাঁড়াল কেষ্টদাসী। বলল, তুই বিধবার আচার-বিচার নষ্ট করতে চাস?

আমার কণ্ঠে উত্তেজনা ছিল। ফস করে বললুম, তুমি কোনদিন সধবা ছিলে না, দাসীদি!

কেষ্টদাসী চুপ করে গেল। নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুই ঠিকই বলেছিস্ রাম। দে, আমার মুখে তুলে দে। তুই ব্রাহ্মণ, তোর হাতেই প্রথম খাই। তুই আগে কামড় দে, বাকি আধখানা আমার মুখে পুরে দে।

তাই করলুম। সাত-আট বছর পরে মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দু'জনে যেন পরমাত্মীয় হয়ে উঠলুম। একে একে সবগুলি খাচ্ছিলুম দু'জনে। হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে দেখি কেষ্টদাসীর চোখ বেয়ে জলের ধারা নামছে। সে যে কাঁদছিল বুঝতে পারি নি এতক্ষণ। যাই হোক, এক সময়ে সে উঠে দাঁড়াল। বলল, এ আনন্দ জীবনে পাব, এ কখনও ভাবি নি। দাঁড়া, খাবার জল এনে দিই। তুই একটু বিশ্রাম কর, আমি কাজকর্ম সারি, রান্না চড়াই। কেমন?

কেষ্টদাসী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' গ্রন্থখানি বের করে আমার কাছে দিয়ে বলল, মনে আছে তোর, মাসিমা আমার উৎপীড়ন দেখে এ বইখানা উপহার দিয়েছিলেন? তোর মাকে আমি দেবী মনে করি রে! ওঁর মুখে আত্মাস্তোত্র পাঠ কোনও দিন ভুলব না!

কেষ্টদাসীর উৎসাহ লক্ষ্য করার মতো। সে রান্নাঘরে গিয়ে তোলা উনুনে আগুন দিল, তারপর সাবান দিয়ে আমার কাপড়জামাগুলো কেচে নিংড়িয়ে ঝেড়ে ছাদের রোদে শুকোতে দিল। এক সময় ঘরে এসে বলল, এই নে, তোর জামার পকেটে ছিল তিন আনা পয়সা আর এই আধখানা পোড়া সিগ্রেট। তুই বুঝি আজকাল সিগ্রেট খাস? খুব লায়েক হয়েছিস দেখছি।

বইখানার পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে আমি সলজ্জ হাসি হাসছিলুম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হুটু উপরে এসে গেল বার দুই। আমি অতিথি, সুতরাং রান্নাঘরে একটা আয়োজন ছিল বইকি। দ্বিতীয়বার এসে হুটু আমার কাছে বসল। সে আমার সমবয়সী।

বললুম, দোকানের কাজকারবার কেমন?

হুটু বলল, মোটামুটি ভালই। তবে কি জানেন, লোকে বড্ড বেশি ধার চায়! চেনা লোককে ধার না দিয়ে উপায় থাকে না। ওতে টাকাপয়সাও মারা যায়! লোক রেখেছি দুটো, ওরা দশ-দশ কুড়ি টাকা পায়। এদিকে মাসি আর আমি। বাড়িটা নিজের, এই যা সুবিধে। হ্যাঁ, যা বলতে এসে-ছিলুম। আপনি থেকে যান না মাসির এখানে দু'চারদিন? এখানে কোনও অসুবিধে নেই। তবে মাসি ত মাছ ছোঁয় না, আমি নিচের ঘরে মাছ রান্না করে নিই। অনেক সময় হোটেল থেকেও রান্না মাছ আনিয়ে নিই। দু'আনা লাগে এক প্লেট,—বড় বড় দু'খানা রুই মাছের গাদা। চমৎকার রান্না!

নিচের থেকে ডাক এল স্থটুর। সে উঠে চলে গেল।

আমি গুটি গুটি এগিয়ে কেষ্টদাসীর রান্নাঘরে ঢুকলুম। সে বেশ ফলাও করে গুছিয়ে নিয়ে বসেছে। আমাকে বলল, পিঁড়েখানা টেনে নিয়ে বোস।

বললুম, এ যে অনেক আয়োজন! শুক্তো, ডাল, পোরের ভাজা, ছানা-কড়াইশুঁটির ডালনা, লাউ-বড়ির ঘণ্ট,—করেছ কি?

কেষ্টদাসী বলল, মাছরান্না আসছে তোর জন্মে!

—মাছ!—আমি চটে উঠলুম,—মাছ আনলেই ফেলে দেবো! তুমি যা খাও না, আমি তা মুখেও তুলব না! এখনি মানা করো স্থটুকে।

কেষ্টদাসী বলল, আমি জীবনেও মাছ ছুঁই নি রে। আঁষটে গন্ধে আমার বমি আসে। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি স্থটুকে।

স্নান করতে যাবার আগে আমি বললুম, আচ্ছা দাসীদি, আমি যে তোমাকে এক-এক সময় মাছের চপ এনে লুকিয়ে খাওয়াতুম, তোমার মনে পড়ে না?

এলোচুল পিঠের উপর ফিরিয়ে কেষ্টদাসী বলল, ওটা ছিল বোরেগীর ওপর রাগের কথা! ওটা প্রতিশোধ। লোকটা যত বেশি শাসন করত, তত বেশি বিগড়ে যেতুম। আমাকে জিদ পেয়ে বসত। লোকটাকে ঠকাতে পারলে, ধাপ্পা দিয়ে মিছে কথা বলতে পারলে খুশী হতুম।

—তোমার মুখে পেঁয়াজের গন্ধ পেত না?

কেষ্টদাসী আমার দিকে তাকাল। চেয়ে রইল কতক্ষণ। পরে বলল, মুখের কাছে মুখ এনেছে কোনদিন? ওর পায়ের তলায় ঘরের এক কোণে পড়ে থাকতুম্। ওর লম্বা লম্বা মুলোর মতন দাঁত দেখলে ভয় হত!

ফস করে আমি বললুম, আমার বেশ মনে পড়ে দাসীদি, মেজদি আর বড়বউদি বলাবলি করত—তোমার মতন এমন স্থন্দরী মেয়ের সঙ্গে ওই বুড়ো-হাবড়া দাঁতালো লোকটার কেমন করে বিয়ে হয়!

কেষ্টদাসী প্রায় রান্না শেষ করে আনছিল। ভাত হয়ে গেছে। ডালনা নেমেছে। পোরের ভাজা ক'খানা শুধু বাকি। কেষ্টদাসী বলল, মেয়েদের ইচ্ছেতে কি আর এদেশে বিয়ে হয় রে? তা যদি হত তাহলে হাজার হাজার পুরুষকে লাথি খেয়ে ফিরে যেতে হত!

উন্থনের আঁচের আভায় কেষ্টদাসীর রক্তিম মুখখানায় যে-ঘৃণার চেহারা দেখলুম, তাতে ওর জীবনের ব্যর্থতাটাই প্রকাশ পেল। কিন্তু আমিও ত পুরুষ, আমিই বা ছাড়ব কেন? ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠেই বললুম, সব রকমেই লোকটাকে গালাগালি করছ। তবু একটা কথা থেকে যাচ্ছে, দাসীদি। রাত্তিরে দরজায়

খিল এঁটে ওই জন্তুর সঙ্গেই ত তুমি সহবাস করতে!

—সহবাস!—যেন গর্জিয়ে উঠল কেষ্টদাসী,—সহবাস মানে কি তুই জানিস?

আমিও উত্তেজিত হয়ে বললুম, এক ঘরে এক সঙ্গে থাকলে তাকে কি সহবাস বলে না?

এবার হঠাৎ হেসে উঠল সে। বলল, তুই চিরকাল একটু বোকা! ওই জন্যেই তোর ভগ্নিপতিরা তোকে রামখোকা বলে খেপাতো! যা, চান করে আয়। মেয়ে-পুরুষ এক ঘরে থাকলেই তাকে সহবাস বলে না!

আমি উঠে স্নান করতে গেলুম। সুগন্ধী সাবান মেখে স্নানটা ভালই হল।

ফিরে এসে দেখি ঘরের মধ্যে ঠাঁই করে আসন পেতে কেষ্টদাসী ভাত বেড়েছে। গরম ভাতে ঘি খাবার জন্য একদা মায়ের কাছে আবদার ধরতুম, তার মনে আছে। সেজন্য সে ভাতের মুণ্ডির ওপর গাওয়া ঘি দিয়েছে। পাথরের বাটিতে একবাটি চিনিপাতা দই। সে জানে আমি দইয়ের পরম ভক্ত।

কেষ্টদাসী তখনও হাসছিল। কিন্তু খেতে বসবার আগে সে চন্দনের বাটি থেকে চন্দন নিয়ে আমার কপালে, হাতে, বুকে ও পিঠে মাখিয়ে দিল। তারপর জবাকুসুমের শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা তেল নিয়ে আমার সাবানঘষা মাথার চুলে বেশ করে মাখিয়ে চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে দিল।

আমার মনে পড়ছিল সেই শূলী-মোহান্তর আখড়ার সহজিয়া মানদাকে। সেখানে ছিলুম আমি ঠাকুর-গোঁসাই, পরম গুরু, শ্রদ্ধার দ্বারা পূজিত। কিন্তু এখানে সখীভাব। সখীভাবে যেন সেই চিরকালীন শ্রীরাধা!

দু'জনে মুখোমুখি খেতে বসেছিলুম।

নুটুর কথা উঠল। কেষ্টদাসীর বাবার প্রথম পক্ষের বড় মেয়ে মিলি, তারই ছেলে নুটু! নুটুর দোকানের সব উন্নতি মাসির আশীর্বাদে। মাসি পয়মন্ত। কেষ্টদাসীর সব খরচ দেওয়া ছাড়াও নুটু ওর হাতখরচ দেয় মাসে দশ টাকা। কাপড় চাদর লেপ বিছানা এটা ওটা—এসব খরচ আলাদা। নুটুর বিয়ের জন্য কেষ্টদাসী মেয়ে দেখছে!

আমি বললুম, ভালো করে মেয়ে দেখে এনো। ঘর ভালো দেখে নিয়ো। নইলে তোমার অন্ন উঠবে! মনে রেখো, বিয়ের পর মা-বাপ পর্যন্ত পর হয়!

নুটুদের আমিষ রান্না হয় নিচে। কেষ্টদাসী এক সময় গিয়ে দেখে এল, এবং নিশ্চিন্ত হয়ে আবার উঠে এল।

—ওকি, গায়ে জামা দিচ্ছিস যে? এখন যাওয়া হবে না!—এই বলে সে

পূবদিকের জানলাটা বন্ধ করে দিল। ও বাড়ী থেকে এ ঘরের ভিতরটা দেখা যায়।

কেষ্টদাসী আমার জন্য এনেছে চারটে সিগারেট। খুব খুশী হলুম আমি। কাগজের মোড়ক খুলে সে আমার মুখে আগে একটা পান পুরে দিল। ওর থেকে আমি ওর মুখে দিলুম একটা। তারপর ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কেষ্টদাসী আমার মুখে একটা সিগারেট দিয়ে দেশালাই জ্বেলে ধরল। হাসি মুখে আমি বললুম, মাছ না হয় তুমি খাও না, কিন্তু একটা সিগারেট খেতে দোষ কি?

কেষ্টদাসী আমার পাশে তক্তায় শুয়ে একখানা হাতের ওপর মাথাটার ভর দিয়ে বলল, তা আমি খেতে পারি। বেশ ত, তুই একবার টান, আমি একবার টানি!

দু'জনে মিলে একটা সিগারেট বেশ আনন্দ করে টানছিলুম, এমন সময় কেষ্টদাসীর গলায় বিশম লাগল। বিশমটা বেড়ে উঠল পলকের মধ্যে। আমি উঠে বসে ওকে তুললুম। ধোঁয়া গেছে ওর গলায় আটকিয়ে। কাশতে কাশতে ওর দম আটকাবার যোগাড়। এক সময় ওর বিশম থামল। ওর মুখ-চোখ রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে জল এনে ওর মুখে চোখে বুলিয়ে দিলুম।

কেষ্টদাসী লজ্জা পেয়েছিল। সেই জন্য সে কিছুক্ষণ মুখ গুঁজে পড়ে রইল। আমাদের দুজনেরই গায়ে সাদা চন্দনের সুগন্ধ, তার ওপর ওর ভাঙ্গা চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়েছে আমার হাতের ওপর তার ফুলেলা গন্ধ নিয়ে। এবার ও সুস্থ হয়েছে।

যখন ছুটি নিলুম, প্রায় তখন সন্ধ্যা। কেষ্টদাসীর ইচ্ছা ছিল, রাতটা এখানে থেকে যাই। আমি বললুম, বাড়ী চিনে গেলুম, আবার একদিন আসব।

ইতিমধ্যে সে আমার জন্য একজোড়া সন্দেশ এনে রেখেছিল। বিদায় নেবার আগে সন্দেশ দুটো আমাকে খাইয়ে তবে ছাড়ল। •

আমার সহপাঠী বিজন প্রায়ই বলত, হুগলি ডিভিশনের পোস্টাল সুপারিন-টেণ্ডেন্ট আমার মামা। তুই দরখাস্ত করবি একখানা? পোস্টাল পরীক্ষায় পাস করলে চাকরি হয়। একটা চান্স নে না? সামনের মাসেই ওদের পরীক্ষা হবে!

দরখাস্ত একখানা পাঠিয়েছিলুম। এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব আসায়

বুঝতেই পারলুম, বিজন গিয়ে ওর মামার কাছে আবদার ধরেছিল !

মাসখানেকের মধ্যে জেনারেল পোস্ট আপিসের পিছনের লালবাড়ির একটি হল-এ গিয়ে পরীক্ষায় বসলুম। ইংরেজি ডিক্‌টেশন, এরিথমেটিক্, বাংলা আর সেই মোটা পোস্টাল গাইড বইখানা থেকে প্রশ্ন। যথাসময়ে ফলাফল জানলুম, পোস্টাল গাইডে চার নম্বরের জন্য ফেল মেরেছি, বাংলা আর অঙ্কে ভালই, তবে ডিক্‌টেশনে ফার্স্ট হয়েছি। আমাদের ইস্কুলে প্রায়ই স্কচ সাহেবদের কাছ থেকে ডিকটেশন্ নিতে হত। আমার কান খাড়া থাকত এবং বানান ভুল করতুম না।

যাই হোক, পরীক্ষার ফল শুনে যখন হাঁ করে বসে আছি, এমন এক দিনে আলমবাজার জুট মিল থেকে খবর এল, অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পার !

লাফিয়ে উঠলুম সেই ময়লা কাগজের তিন লাইন চিঠি পেয়ে। যথানির্দিষ্ট দিনে আলমবাজার মিলের মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম। চিঠিখানা সঙ্গে নিয়ে এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেবের কাছে হাজির হলুম। লোকটা পাইপ মুখে দিয়ে আমার আপাদমস্তক দেখে বলল, টুমি টো ভড্ডলোক আছো ! হামি চাই মজডুর। এক টাকা ডেলি ! ইটোয়ারে মজডুরি নেই, শনিচরে হাফ।

হাসি মুখে বললুম, আমি পারব, স্যার।

—টুমি এ-বি-সি, ওয়ান-টু-থি্, বসাতে পারবে ? লিখা-পড়ি জানো ?

সাহেবের ধারণা, এসব কাজে নিরক্ষররাই আসে মজুর হয়ে। আমি সহাস্যে বললুম, আমি সব কাজ পারব।

সাহেব বেল্ বাজিয়ে চাপরাসীকে ডেকে বলল, ইন্‌কো লে যাও সর্দারকে পাস। হাফ প্যাণ্ট অওর গেঞ্জি দে দো। মোতায়েন হো গৈ।

মস্ত গোঁফওয়ালা এক স্থূলকায় হিন্দুস্থানীর কাছে আমাকে নিয়ে এল। লোকটা আমার পুরনো নামটাই টুকে নিল,—কাশীনাথ শর্মা।

—শর্মা। তুম বামন হ্যায় ?

ফস করে বললুম, আমি কাজ করতে এসেছি। আমি মজদুর।

আমার কাজ জুটে গেল। পরনে হাফপ্যাণ্ট আর গেঞ্জি, হাতে আল্‌কাতরার টিন আর মোটা তুলি। প্রথম আরম্ভেই লোহার পাত দিয়ে প্রায় পঞ্চাশটা বাঁধানো পাটের গাঁইটের উপর রোমান্ হরপের সঙ্গে নম্বর বসানো। সেই বিধুবাবুর মন্ত্র আমার মধ্যে কাজ করছে, 'ডিগ্‌নিটি অফ লেবার !'

বিরাট এক-একটা হলে এক সঙ্গে বোধ হয় হাজার মেসিন চলছে। পাটের

এত ধুলো আগে জানতুম না। নাকে কাপড় বেঁধে মজুররা মেসিনের কাজে যোগান দিচ্ছিল। সর্দার বলেছে, সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা পাঁচটা। মাঝখানে এক ঘণ্টা টিফিন। টিফিনের আগে ভেঁপু বাজবে।

অপরিসীম উৎসাহ নিয়ে আমি কাজে মেতেছিলুম। দু' ঘণ্টার কাজ আমার হাতে দেড় ঘণ্টায়। মিলের পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গা। চারদিক কী সুন্দর। যে-সব সাহেব কর্তাব্যক্তি তাদের ভাল ভাল দোতলা কোয়ার্টার। তেমনি ফুলের বাগান, মনোরম পরিবেশ। কাজকর্মের মধ্যে যখন ডুবে আছি, তখন একজন মজুর বলল, ওভারটাইম্ ঘণ্টা চার আনা!

সব জায়গাতেই ওভারটাইম। আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি! ওভারটাইমের পয়সায় রাহাখরচ আর জলখাবার ছাড়াও হাতে কিছু থাকে। আমার ওপর ভার পড়ল চটের থলে গুনে গুনে ঠিক জায়গায় নম্বর দিয়ে স্ট্যাক্ করা। আমি স্থির করলুম, সকাল সাতটায় রোজ এসে পৌঁছব, এবং সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত কাজ করে 'টাইম' জমা দেবো। ছুটির দিন কাজ করলে আরও ভাল। দু'টাকা ডেলি শুনলুম।

চটের থলে গুনতে গুনতে নিজের অর্থনীতিক সৌভাগ্য গণনা করছিলুম। প্রত্যেক মাসে হার্ড ক্যাশ অন্তত করকরে চল্লিশ টাকা নিয়ে তবে যাব! তবে হ্যাঁ, মেয়েছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার কথা ভুলতে হবে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডাবাজি আর চলবে না। গড়ের মাঠে খেলা দেখা শেষ করো! সিগারেট ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আর সাহিত্য? ওসব বেকারের বিলাপ! ঘরের মধ্যে বসে অলস রসকল্পনার ফেনা! ওতে কালি, কলম ও কাগজের বাজে খরচ। না, আর আমি ওতে নেই!

নাচতে নাচতে শ্যামপুকুরের বাড়িতে গিয়ে মাকে জানালুম, বুঝলে মা, মন দিয়ে খাটতে পারলে মাসে বেকসুর চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা! তবে আমাকে কি করতে হবে জানো, মা? শ্যামপুকুর থেকে আলমবাজার—যেতে আসতে আট থেকে দশ মাইল! রোজ অতটা যাওয়া ভোরে উঠে···একটু কষ্ট হয়। আমি হয় যাব আহিরিটোলা থেকে ইস্টিমারে, আর নয়ত—

—নয়ত কি?

সলজ্জ কণ্ঠে বললুম, তুমি ত আর দেবে না, শুনে কি হবে?

হাসিমুখে মা বললেন, বুঝেছি তোর মতলব। মুখপোড়া, কেন্ তবে একখানা সাইকেল! যা লাগে দেবো।

—দেবে? সত্যি দেবে বলছ? না চাইতেই দেবে?

মা বললেন, কাল গিয়ে দর জেনে আসিস।

সেদিন রাত্রে আমার ঘুম হয় নি। আমি পুরুষমানুষ, এনে খাওয়াব সবাইকে, এই ত আমার নীতি। আমি নেবো, আদায় করব, অন্তের তহবিলের দিকে তাকাবো—এ উদ্দেশ্য আমার নয়। মনে মনে প্রার্থনা করলুম, আমি যেন মায়ের এই ভালবাসার যোগ্য হতে পারি! কিন্তু তাই বা বলি কেমন করে? আমি যে ভয়ানক অবাধ্য। আমি অপরিণামদর্শী। আমার নিয়মানুগত্য নেই, শৃঙ্খলা সদাচার সামাজিকতা চরিত্রনিষ্ঠা—এসব কিছুই নেই যে আমার। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার শাসন-বাঁধন-হীন মন যেতে চাইছে একটা বন্য জীবনে, রস যেখানে নিবিড় ও একান্ত,—আমি যেতে চাইছি সেই উচ্ছৃঙ্খল অবারিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার দিকে, মানুষ যেখানে সহসা পৌঁছয় না!

যে-সাইকেলখানা আমি কিনলুম, তার নাম হল রাজ্-হুইট্ওয়ার্থ্। বেশ ভাল জাতের খাঁটি জিনিস। সঙ্গে নতুন ধরনের বেল্, আলো, পিছন দিকেরও লাইট্, তার সঙ্গে কিছু যন্ত্রপাতি, সলিউশন্, খানিকটা রবার—যেন সালঙ্কার একটি অস্থাবর সম্পত্তি। সবসুদ্ধ দাম পড়ল প্রায় দেড়শ' টাকা। ভোরবেলা কিছু খেয়ে দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে আলমবাজারে গিয়ে পৌঁছই। সাইকেল চড়ায় আমার সামান্য একটু নাম খ্যাতি ছিল। আমাকে তখন বেশ চিনত সমর শা, চরণা মিত্তির, সুধা বোস—প্রভৃতি যারা বড় বড় সাইক্লিস্ট। যাই হোক, চটকলে গিয়ে আমি ভূতের মতন মেহনত করতুম এবং খাকি হাফপ্যাণ্ট ও ময়লা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে আমি আমার কর্মজীবনে ডুবে যেতুম। প্রভাতকালে আসবার সময় বাড়ী থেকে আমার অতি প্রিয় যে সামগ্রী খেয়ে আসতুম সে হল চারটি পান্তাভাত আর পেঁয়াজচচ্চড়ি, আর নয়ত বাসি রুটির সঙ্গে একডেলা গুড়। দুটোই উপাদেয়। টিফিনে খেতুম মজুরদের দলের সঙ্গে ছাতুর তাল, কাঁচালঙ্কা আর পাকা কলা। চার পয়সার টিফিনে পেট ভরে যেত। ওভারটাইমে খেতুম না।

আমি ওই সুপারভাইসার সাহেবটির সুনজরে পড়বার চেষ্টা করে সাফল্য লাভ করেছিলুম। সপ্তাহ তিনেক বাদে লোকটা যখন জানল আমি কলেজে পড়া ছেলে, ব্যাকরণ-ভুল-করা ইংরেজি বলতে পারি হোঁচট খেয়ে খেয়ে এবং হকি ও ফুটবল ভালই খেলি, তখন ওই লোকটা একদিন আমাকে তুড়ি ও শিস দিয়ে কুকুরকে ডাকার মতো করে ডাকল, এবং ওর প্রসন্ন মুখখানার দিকে চেয়ে শ্বেতচর্মীর প্রতি আমার বহুদিনের ঘৃণা ভুলে গেলুম। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা বলল, টুমার কাজে হামি সন্‌টোস হইয়াছি।—ভো মাহিনা

কাম করো। হামি টুমার উন্নটি করিয়ে দেবো।

আমাকে সাপ্তাহিক মজুরি দেওয়া হত। এক মাস পরে হিসেব করে দেখলুম, আমি একান্ন টাকা উপার্জন করেছি। খাটলেই পয়সা! মোট পাঁচ টাকা এক মাসে আমার হাতখরচ। বাকি টাকা প্রণামী দিলুম মাকে!

সন্ধ্যার পর ফিরে আমার প্রথম কাজ সাইকেলটি ঝাড়ামোছা। ওটাই যেন আমার বিশ্রামের অঙ্গ। জীবনে আমি এই প্রথম আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু পেয়েছি। ওর দুই চাকায়, স্পোকে, চেনে, বল-বেয়ারিং-এ, ওর দুটো আলো আর সীটে—ওর প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে আমার করুণ ভালবাসা মিলিয়ে ছিল। স্থির করেছিলুম, সপ্তাহে একদিন ওকে বিশ্রাম দেবো। আমি সেদিন হাঁটব, কিন্তু ওর বিশ্রাম দরকার। ও আমার জীবনে এনেছে গতি, আনন্দ আর সাচ্ছল্য। সাইকেলটি ঝাড়ামোছার কাজটা আমার পক্ষে যেন সেবা ও শুশ্রূষার কাজ। ওর সমস্ত কলকব্জা আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে ও যেন চিরদিন সুখে থাকে, ও যেন নিত্য জাজ্জ্বল্যমান হয়ে বিরাজ করে। ওর দিকে চেয়ে চেয়ে ওর কথা ভেবে ভেবে আমার আনন্দের আর সীমা থাকে না।

এক গরীব গৃহস্থ-ঘর থেকে হঠাৎ এক কথায় দেড়শ টাকা বেরিয়ে এল, এটার পিছনে সামান্য কথা আছে বইকি। দিদিমা তাঁর বাড়ি বিক্রি করে মাকে কিছু টাকা দিয়ে কাশী চলে যান। মায়ের ইচ্ছা ছিল, কোথাও এক টুকরো জমি কেনা,—পরে ছেলেরা সেই জমিতে ঘর তুলবে! এই সূত্রে মা শিশির ভাদুড়ীকে একবারটি ডেকে পাঠান, কারণ ওঁদের এক টুকরো জমি ছিল সাঁতরাগাছির চৌধুরীপাড়ায় ওঁদের পুরনো ভিটের ঠিক সামনে। শিশিরবাবুরও ইচ্ছা, ওই সাত কাঠা জমিটুকু আমরা নিই! মা এই সূত্রে শিশিরবাবুর হাতে কিছু টাকা দেন। বড় বউদিদির পায়ের ধুলো নিয়ে তিনি বলে যান মনোমোহন নাট্যমন্দিরের ওপর নোটিশ পড়ে গেছে, ওটা ভেঙ্গে সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যু (বর্তমানে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু) টানা হবে বাগবাজার এবং ডান দিকে ঘুরে শ্যামবাজারের পাঁচ-মাথা পর্যন্ত। সুতরাং আমাকে এখন নতুন থিয়েটার করতে গেলে অনেক টাকার দরকার। এ টাকা আমার কাজে লেগে যাবে।

অতঃপর মনোমোহন পাঁড়ে মশায়ের থিয়েটার-বাড়ি ভাঙবার আগেই শিশিরবাবুরা উঠে গিয়ে কর্নয়ালিশ থিয়েটার ভাড়া নিয়ে ওর নামকরণ করলেন 'নাট্যমন্দির'। ওঁদের গৌরবের যুগ আগেই আরম্ভ হয়েছিল। এর পরের বছরে শিশিরবাবু আমাকে একখানা গোলাপী রংয়ের চিরস্থায়ী প্রবেশপত্রের কার্ড দিয়ে বলেছিলেন, তুমি আমাদের 'পাবলিক রিলেশন্সের' দায়িত্ব নিয়ে থেকো!

কিন্তু কিছুকাল পরে শিশিরবাবুর মা বলে পাঠালেন, এমন কাজ কখনো করো না বড়বউমা, তোমার পুঁজির টাকা জলে পড়বে! ওই জমির ওপর মামলা-মোকদ্দমা লেগেই আছে। ও-জমি আমাদের কারো ভোগে আসবে না! শিশিরকে বলেছি তোমার টাকা ফেরত দিতে।

শিশিরবাবু টাকা ফেরত দিয়েছিলেন, এবং তাঁর মা সত্যিই বলেছিলেন।

যাই হোক, আমাদের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার জন্য মায়ের হাত ক্রমশ শূন্য হয়ে আসছিল। সম্পূর্ণ শূন্য হবার ঠিক আগে মা আমাকে সাইকেলটি কিনে দেন।

মেহনত বেশি করতুম, অন্য কর্মীর চেয়ে বেশি কাজ করে দিতুম এবং ওভারটাইমে বহু মালের হিসাব নিয়ে বহু গাঁইটে দাগ টানতুম,—এজন্য আমি এক-আধদিন ছুটিও নিতুম। মাঝে মাঝে ওই সাহেবটার তোষামোদ করার জন্য ভাল ভাল রঙ্গীন ফুল তুলে তোড়া বেঁধে ওর কোয়ার্টারে গিয়ে চাপরাসীর হাতে দিয়ে আসতুম! আমাকে ওরা শর্মা বলে ডাকত।

তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। রৌদ্রদগ্ধ দিনে অসহ্য গরম। আমি সেদিন কাজে যাই নি। মধ্যাহ্নভোজন সেরে দুপুরবেলায় আমার পশ্চিমমুখো ছোট্ট বাইরের ঘরটি ছেড়ে ভিতরে গিয়ে একটু ঠাণ্ডায় বিশ্রাম নিচ্ছিলুম। সদর দরজাটা বন্ধ। সাইকেলখানা ঝাড়ামোছা করে যাতায়াতের পথে যথাস্থানে রেখেছি।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। প্রায় চারটে বাজে তখন উঠেছি। অনেকক্ষণ দেখি নি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়কে। প্রিয় নয়, প্রিয়তম!

এ কি, সাইকেল? সাইকেল কোথায়? সদর দরজা খোলা—

কাঠের উঁচু স্ট্যাণ্ডের ওপর সাইকেল থাকে চেন দিয়ে তালাবন্ধ করা! কে নিয়ে গেল সাইকেল আমার বিনা হুকুমে? কোথা গেল সাইকেল?

—মা-আ-আ-আ—!

মা ছুটে এলেন আমার চিৎকারে। চুপ করে দাঁড়ালেন এক মিনিট। পরে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, চুরিই গেছে! ও সাইকেল তোর নয়। যার জিনিস, সেই নিয়ে গেছে। তারই ভাগ্য!

গায়ে জামাটা চড়িয়ে ছুটে বাইরে গেলুম। কোন্ দিকে যাব চোর ধরতে? ডান দিকে, না বাঁ দিকে? তেলিপাড়ায়, না কম্বুলেটোলায়? শ্যামপুকুরে, না বাগবাজারে? বেলগাছিয়া, না বামুনগাছি?

আমি শুধু ছুটছিলুম এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। আমার দুই চোখে

ছিল হিংস্র পাগলের চাহনি। আমার হাঁটায় আর ছোটায় মিলে গিয়েছিল। আমি যেন প্রাণপণে ছুটছিলুম চোরের পিছনে, আর আমার পিছন থেকে তাড়া করে আসছে যেন অট্টহাসি হেসে আমারই নিয়তি। রায়বাগান থেকে রামবাগান, মুর্গিহাটা থেকে বেলেঘাটা, পাকপাড়া থেকে পালপাড়া, শ্যামবাজার থেকে গোরাবাজার, উলটোডাঙ্গা থেকে ঘুঘুডাঙ্গা, ফড়িয়াপুকুর থেকে কড়েয়া,—আমি শুধু হাঁটছি! শিবপুর থেকে শালিমার, ভাবানীপুর থেকে আলিপুর, নতুনবাজার থেকে রাধাবাজার, শিয়ালদহ থেকে আড়িয়াদহ, বালিগঞ্জ থেকে টালিগঞ্জ, বেনেপুকুর থেকে পাতিপুকুর—প্রতি সাইকেলের দোকানে আর কারখানায়, প্রতি আপিসে, প্রতি গাড়ির আড্ডায়, প্রতিটি কল-কারখানায়। আমি শুধু হাঁটছি আর নিজের বুকের ভিতরকার নিরুপায় ক্ষুধার্ত নেড়ি কুকুরের কান্না শুনছি! শুধু কেবল সাইকেলের জন্য নয়, সাত দিনে দেড়শ' মাইল হাঁটছি শুধু দেড়শ' টাকার অস্থাবর সম্পত্তির জন্য নয়,—আমি হাঁটছি আমার জীবনের সেই প্রথম ভালবাসার জন্য, আমার বুকের ধন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে আমারই নিয়তি,—তাই হাঁটছি আর কাঁদছি। সন্তানহারা নর্তকী ইসাডোরা কেঁদে কেঁদে পথে পথে ফিরেছে তার শোকবিহ্বলতায়। আমার এই মর্মচ্ছেদী বেদনা কি তার চেয়ে গভীরতর ছিল না?

পৃথিবী হাসছে চারিদিকে, সুন্দর আকাশে প্রভাতের জ্যোতির্ময় রৌদ্র হাসছে, মহানগরীর পাড়ায় পাড়ায় কলরোলে হেসে উঠছে সবাই, নাচে-গানে-আমোদে-আনন্দে-কোলাহলে-হট্টগোলে সর্বত্র হাস্যমুখর,—আমি তখন ভালবাসার জন্য কাঁদছি অন্ধকার গলির প্রান্তে এক কোণে দাঁড়িয়ে।

এমনিভাবে যখন সাইকেলের সন্ধানে পথে পথে ফিরছিলুম, তখন একদিন চিঠি এল, হুগলী পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টে তোমার চাকরি হয়েছে। তুমি শ্রীরামপুরে যাও!

শ্রীরামপুরের বড় ডাকঘরে গিয়ে আমার উপস্থিত হবার একটি বিশেষ তারিখ ছিল। তারই জন্য যখন দিন গুনছি তখন ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দার্জিলিংয়ে 'স্টেপ-অ্যাসাইড' নামক বাড়িটিতে দেহরক্ষা করেন। এই সর্বনাশা সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। মোতিলাল নেহরু শোকে মুহ্যমান হন। সুভাষচন্দ্র তখন মান্দালয় কারাগারে বন্দী। দেশবন্ধু তাঁর মৃত্যুর আগে সমগ্র ভারতের রাজনীতিক চেতনাকে জয় করেছিলেন, এবং তার ফলে গান্ধীজী কিছু ছায়াচ্ছন্ন হন। জওয়াহরলাল তখনও যথেষ্ট প্রাধান্য পান নি। এই ঘটনার প্রায় দু বছর আগে ওই দার্জিলিংএই দেশবন্ধুর সহকর্মী

দাশরথি সান্যাল নিউমোনিয়া রোগে মারা যান। আমাদের বাড়ীতে শোকের ছায়া পড়ে। দাশরথি দেশবন্ধু অপেক্ষা প্রায় সাত বছরের বড় ছিলেন।

শত্রুর মৃত্যু ঘটলে বৃটিশ-ভারত গভর্নমেণ্ট তখনকার কালে রাতারাতি উদার হয়ে উঠত। জানত শত্রুর যখন নিপাত ঘটেছে, তখন সেই সূত্রে দুর্নাম কিছু ঘোচানো যাক। তাঁরা দেশবন্ধুর শবদেহ কলকাতায় আনার পক্ষে সর্বপ্রকার সহায়তা করেছিলেন। এই সূত্রে খ্যাতিমান হয়েছিলেন আমাদের এক আত্মীয়, ন্যাড়া গোঁসাই ওরফে অনুপলাল। তিনি দার্জিলিংয়ের লোক। দেশবন্ধুর তদ্বির-তদারকের ভার ছিল তাঁর ওপর। তিনি দাশরথিরও সেবক ছিলেন। যাই হোক, স্বয়ং গান্ধীজী দেশবন্ধুর শব নিয়ে আসছিলেন শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেনযোগে। তিরিশ লক্ষ শোকবিহ্বল জনসাধারণ সেই ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিল!

স্টেশন প্লাটফরমে হাজার হাজার নিরেট জনতার মধ্যে নেংটি ইঁদুরের মতন আমিও দাঁড়িয়েছিলুম। জনতা রুদ্ধশ্বাস, নির্বাক ও নীরব। তৎকালীন কলকাতার সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান ও বৌদ্ধ জননেতাগণ প্ল্যাটফরমে উপস্থিত। তারই মধ্যে হঠাৎ একটা থাপ্পড় মারার শব্দে উপস্থিত সবাই একসঙ্গে চমকিয়ে উঠল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তামাসাচ্ছলে বিপিন পালের পিঠের উপর সজোরে চড় বসালেন! শোকাচ্ছন্ন জনতা অবাক।

আচার্যের এই 'মারাত্মক' ভালোবাসা সেদিন অনেকের কাছেই সুবিদিত ছিল

শ্যামপুকুরের সেই চোরা গলির অভিশপ্ত জরাজীর্ণ বাড়ি, যার নিচের তলাটা ছিল জন্তুর ঝুপসি খোঁয়াড়ের মতো। উনুনে আগুন দিলে ঘণ্টাখানেক অন্ধকার হয়ে থাকত,— ঘুঁটে-কয়লার ধোঁয়া বেরোত না। উপর থেকে বাড়িওয়ালা আপত্তিকর জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে ফেলতো নিচের তলায় এবং তাদের দুর্গন্ধ নোংরা ধোয়াট নামত নিচে, ছিটে লাগত গায়ে। প্রতিবাদ জানালে শুনিয়ে দিত, আমরা তেলিপাড়ার লোক, মনে রাখবেন!

আমরা বেলগাছিয়া পুলের ঠিক নিচে এক গলিতে বাড়ী ভাড়া করলুম। গরীব গৃহস্থ যখন বাসা-বদল ক'রে গরুর গাড়ীতে ঘরবসতি মালপত্র নিয়ে যায়, তখন পথচারীরা তাদের অর্থনীতিক অবস্থা বুঝে নেয়। এই সূত্রে মামার কথাও আসে। আমার মামা গাঁজা-আফিম খেতেন। বোধ হয় সেই কারণেই তিনি তাঁর পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে প্রায়ই সন্দিহান হয়ে উঠতেন! ফলে, স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার জন্য একবার তিনি স্ত্রীকে নিয়ে গরুর গাড়িযোগে পুঁটিবাগান থেকে খড়দহ যাত্রা করেন। তখন আমি খুবই ছোট। সেই গাড়িতে ছোটখাটো মালপত্র আমাকেই তুলতে হয়েছিল। বেশ মনে পড়ে, গাড়ীর সামনে মামা, মাঝখানে তাঁর প্রিয় পুষি বিড়াল এবং গাড়ীর ল্যাজের দিকে ঘোমটা দেওয়া মামী! ওদেরই ফাঁকে ফাঁকে ছেঁড়াকাথা মাদুরের পুঁটলি, তোলা উনুন, বালতির মধ্যে ফালিবাঁধা ঝাঁটা—ঝাঁটার আলগা দিকটা আকাশের দিকে উঁচিয়ে, ১৯ শতাব্দীতে কেনা একটি রংচটা তোরঙ্গ, চটের থলের মধ্যে কলাই ও লোহার বাসন—তা'র ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে ফাটা বেলুন আর খুন্তির ডগা। এ ছাড়া ডাল ভাত রান্নার মেটে হাঁড়ি, তিজেল ও মালসা, জলের ভাঁড়, তার সঙ্গে মামার গড়গড়া আর তালিমারা বিবর্ণ ছাতাটা—যার ভিতর থেকে দু'গাছা লোহার কাঠি বেরিয়ে পড়েছে। ওদেরই মাঝখানে শান্ত হয়ে ব'সে পুষি বিড়ালটি সেদিন কলকাতার শোভা দেখতে দেখতে চলল!

এবম্বিধ স্থান পরিবর্তনের ফলে মামীর নৈতিক শুচিতা কতখানি রক্ষা করা গিয়েছিল, সে আলোচনা আগেই করা আছে।

সে যাই হোক, বিড়ালটার প্রতি সেদিন আমার বড় ঈর্ষা হয়েছিল!

আমাদের গরুর গাড়ি দু'খানা গলির শেষ প্রান্তে এসে বাঁ হাতি ঘুরে এক

কোণে দাঁড়াল। এ বাড়ীর নিচের তলাটা ভাল। রান্নাবাড়ি আলাদা, চকমিলানো উঠোন এবং একটি পুজোর দালান। আমি পেলুম বাইরের ছোট্ট ঘরটি। বাড়িখানা মজবুত।

এই বাড়িতে গুছিয়ে ব'সে একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যোগ দিলুম। প্রবন্ধটির নাম হল, "বাঙ্গলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান"। এটি সাহিত্যকর্ম। তখনকার রেওয়াজ ছিল, মেয়ের নাম দিয়ে কিছু লিখলে হয়ত বিচারকরা একবারটি পাতা উলটিয়ে দেখতে পারে! পুরুষ লেখক হ'লে না দেখেই হয়ত ফেলে দেবে বাতিল-কাগজের ঝুড়িতে! সুতরাং আমি 'মাধুরী দেবী' নাম নিয়ে যে প্রবন্ধটি লিখলুম, সেটি ঠিক দিনের বেলায় দেশালাইর কাঠি জ্বেলে সূর্যকে দেখিয়ে দেবার মতো! সেটি সযত্নে পাঠিয়ে দিলুম যথাস্থানে।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল। শ্রীরামপুরের বড় ডাকঘরে আমার চাকরি হয়েছে, সুতরাং ঠিক দিনটিতে দুর্গা ব'লে বাড়ী থেকে একদিন বেরোলুম। বেলগাছিয়া থেকে বাগবাজারের স্টীমার ঘাট। হোক না কেন বৃষ্টি, সমস্ত হাঁটা পথটাই ত উপার্জনের পথ! অতঃপর স্টীমারে চ'ড়ে বালিঘাটে। সেখান থেকে প্রায় দেড় মাইল হেঁটে গিয়ে বালি স্টেশন। টিকিট কিনে ট্রেন ধ'রে বালি থেকে উত্তরপাড়া, তারপর কোন্নগর, রিষড়া, তারপর শ্রীরামপুর। কী আনন্দ, বালিখালের ধার দিয়ে দিয়ে স্টেশন! আমার বাঁ দিকে হাওড়া জেলা, ডানদিকে হুগলি।

শ্রীরামপুরের বড় ডাকঘর খুঁজে নিলুম। স্বয়ং পোস্টমাস্টার মশায় দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে ধ'রে নিয়ে বসালেন। চেয়ারখানা ভাঙ্গা, পুরনো বাড়ী, আপিসের ভিতরটা ঝুপসি, ওরই মধ্যে তেলের আলো জ্বেলে কাজ করছে পিওনরা। ইনি হলেন রতনবাবু--মনি অর্ডার দেখছেন। ইনি পূর্ণবাবু—রেজিস্ট্রেশন আর সেভিংস, উনি বিনয়বাবু—স্ট্যাম্প আর খাম-পোস্টকার্ড বেচেন। আর ওই বাইরে ব'সে রয়েছে আমাদের বুড়ো গোঁসাই,— মনি অর্ডার ফর্ম লিখে দেয়। তুমি এখন আমারই অ্যাসিস্টান্ট হয়ে কাজ করবে!

ডাকঘরের কাজকর্ম কে না দেখে বেড়িয়েছে! সবাই জানে কি কি কাজ হয় ডাকঘরে। হাসি-হাসি মুখে একে একে সকলের কাজ দেখে বেড়ালুম। মাস্টার মশাই এক সময় তাঁর সই-সাবুদের কাগজগুলি গোছাতে দিলেন। পাঁচ মিনিটের কাজ তিন মিনিটে সারলুম। খাতাপত্র গুছিয়ে দিলুম। ইনসিয়োর করা মোড়কগুলির ওপর যথাযথভাবে গালা ও শিলমোহর পড়েছে কিনা পরীক্ষা করলুম। এনট্রিগুলো মিলিয়ে নিলুম। ইলেকট্রিকের পাখা বা আলো নেই

ঘরে,—দরদর ক'রে ঘাম পড়ছিল। টিফিন বলে কিছু নেই ডাকঘরে। কোনও কোনও কর্মী শুকনো মুখে বাইরে গিয়ে মাঝে মাঝে বিড়ি টেনে আসে। ময়লা জামাকাপড়, বোধ হয় দাড়ি কামাবার পয়সা ও সময় জোটে না, রোগা উপবাসী মুখ, কাজ ক'রে যাচ্ছে অশ্রান্ত। আমি অবেলার দিকে মাস্টার মশাইয়ের নির্দেশে মনি অর্ডারের একটা লম্বা ফর্দ তৈরি ক'রে দিলুম।

মাস্টারমশায় প্রবীণ বয়স্ক, এবং তাঁর মাথায় মস্ত টাক। তিনি আমুদে, সাদাসিধে লোক। সপরিবারে তিনি থাকেন এই বাড়ীরই ভিতর মহলে। দুপুরবেলায় এক সময় সিন্দুকের চাবি বন্ধ ক'রে ভিতরে গিয়ে তিনি চারটি খেয়ে এলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলুম, কয়েকটি ছেলেমেয়ে ভিতর দিকের দরজা দিয়ে আমার দিকে উঁকিঝুঁকি মারছে। নতুন মানুষকে দেখে তাদের মস্ত আমোদ। এক সময় একটু চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, মাস্টারমশাই, আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি ?

মাস্টারমশায় আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। বললেন, স্টেশন মাস্টার, ইস্কুল মাস্টার আর পোস্ট মাস্টার—এদের ছেলেমেয়ে বেশি হয়! ওদের বিয়ে হলে 'পুত্র-কন্তে, আসে যেন প্রবল বন্তে'। সেদিক থেকে আমি বেঁচেছি বাবা, বুঝেছ ? আমার মাত্র পাঁচটি মেয়ে আর চারটি ছেলে! গেল বছর বড় মেয়েটার বিয়ে দিয়েছি আটশ' টাকা খরচ ক'রে। দুশ' টাকা নগদ, আড়াইশ টাকার গয়না, তার ওপর নমস্কারী ফুলশয্যে বরাভরণ বাসন-কোসন, তা বাদে বিয়ের খরচ। একশ' লোকের খাইখরচ। দেনা চেপেছে যাট টাকা! সব জিনিস এখন মাগ্যি!

আমার আর কিছু শোনার দরকার ছিল না। ভদ্রলোক তবু ব'লে চললেন। তিনি হলেন বাগচী এবং শাণ্ডিল্য গোত্র। তাঁদের আদি বাড়ী নদীয়ায়।

সেদিন সন্ধ্যার পর সেই একই পথ দিয়ে বেলগাছিয়ায় ফিরেছিলুম।

এমনি ক'রে প্রতিদিন আসছি আর যাচ্ছি। দৈনিক খরচ চালিয়ে দু'চার পয়সা টিফিন খাব, তা সম্ভব নয়। আমি উপবাস করতে শিখেছি আশৈশব। একদিন স্থির করলুম, না, এভাবে চলবে না! সেই সময় একদিন পথে আলাপ হ'ল দুটি সুদর্শন তরুণ যুবকের সঙ্গে। মিষ্ট প্রকৃতির দুই যুবক—ডাবু লাহিড়ী এবং সুকুমার দত্ত। এঁরা স্থানীয় যুবক মহলে প্রতিপত্তিশালী। তাঁদের কাছে আমার সমস্যার কথা বললুম। তাঁরা আমার জন্ম একটি বাসস্থান ঠিক ক'রে দিলেন।

ঘরটি একটি ডোবার ঠিক পাশে। দুইয়ের মাঝখানে সুরু যাতায়াতের

পথ। ডোবায় জলের চেয়ে জঞ্জাল ও কাদা বেশি। তার মধ্যেও পানাভর্তি। বোধ হয় এ-পাড়ার সমস্ত নোংরা জঞ্জাল ওই ডোবায় পড়ে, এবং এইভাবেই ওটা একদিন বুজবে, বোধ হয় এই ছিল পৌর কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশা।

এ ঘরটি দিনের বেলা খালিই প'ড়ে থাকে। সন্ধ্যার পরে ভিতরবাড়ি থেকে আসে একটি হারিকেন। আমি সকাল-সন্ধ্যা দোকানে দোকানে খেয়ে বেড়াই। বাজারের কাছাকাছি আছে একটা ভাতের দোকান।

রাত্রের দিকে পাড়ার ছেলেরা একে একে ঘরটাতে এসে ঢোকে। এটা যে ড্রামাটিক ক্লাব, এবং 'সাজাহান'-এর রিহার্সাল চলছে, আগে বুঝি নি। স্বয়ং সাজাহান বিড়ি ধরাচ্ছেন ঘন ঘন, তাঁর কন্যা 'জাহানারা' কদর্য ভাষায় 'বাপকে' গালি দিচ্ছে, আওরঙ্গজেব চাঁটি মারছে যশোবন্তকে এবং দারা ও রোশনারা চাপাগলায় অশ্লীল মুখখিস্তি করছে! যখন রিহার্সাল আরম্ভ হয়, রাত তখন ন'টা। আমি ওই ডোবার ধারে মশার কামড় সহ্য ক'রে অন্ধকারে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকি, কতক্ষণে ওদের রিহার্সাল ভাঙবে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ওখানে বসেই আমার ঢুলুনি আসে। ওরা চলে যাবার পর তক্তাখানার ওপরেই একটা ময়লা বালিশ নিয়ে কাৎ হয়ে পড়ি। সমস্ত রাত ধ'রে এ ঘরখানা যে বায়ুরুদ্ধ থাকে এবং বড় বড় মশার সাংঘাতিক কামড়ে যে আমার সর্বাঙ্গে চাকা-চাকা দাগ ফুটে ওঠে, এ আমি গভীর ঘুমের মধ্যে একটিবারও টের পাইনে।

এর মধ্যে আরেক উৎপাত। একদিন ছুটির পর আপিস্ থেকে বেরিয়ে আসছি এমন সময় মাস্টারমশায়ের ছেলেটা আমাকে ডাকল। আমি ওদের বাসার মধ্যে এই প্রথম ঢুকলুম। গিন্নি ফস করে বেরিয়ে এসে বললেন, ওমা, এ যে চাঁদের মতন ছেলে! এসো বাবা, এসো। ওরে শিবু, দে না টুলখানা এগিয়ে। না বাবা, ও চেয়ারখানার পায়াভাঙা, তুমি টুলেই বসো।

এমন সময় মাস্টারমশাই এলেন। আমি কাঁচুমাচু।

গিন্নি বললেন, তা হবে না? বিশ্বের জাহাজ যে! এই ত, উনিই বলছিলেন, কোনও কাজ তোমার হাতেই লাগে না! ছ'মাসের মধ্যেই তোমার মাইনে বাড়বে!

মাস্টারমশাই বললেন, আমার সুপারিশ আমি এরই মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছি। বলেছি, সাতদিনের মধ্যে সমস্ত কাজ শিখে গেছে! আর কিছু নয়, আমারই মাথা উঁচু হ'ল। তোমার উন্নতি মারে কে?—বলতে বলতে তিনি কলতলায় গেলেন।

গিন্নি বললেন, ঠিক লোকের হাতে এসেছ, বাবা। তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না। বলি কোথা গেলি? অ টেঁপি, এবার খাবার নিয়ে সামনে আয়। বাছার মুখখানা যে শুকিয়ে গেছে!

বছর পনেরো-ষোল বয়সের একটি লজ্জাশীলা মেয়ে একটি পেতলের রেকাবিতে একখানা ঠাণ্ডা নিমকি ও একটি মুগের নাড়ু নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। বুঝতে পারা গেল টেঁপি সাজসজ্জা করে চুল এলিয়ে মুখে একটু পাউডার বুলিয়ে সামনে এসেছে। গিন্নি বললেন, তা যাই বলো বাবা, এ মেয়ে আমার লক্ষ্মী। রান্না-বান্নায় হাত একেবারে পাকা। কুটনো-বাটনা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা—যে কাজই দাও, হাসিমুখ। তেমনি ওর পান সাজার হাত! কোলের ভাইবোনদেরকে টেঁপিই ত মানুষ ক'রে তুলল, বাবা।

একখানা নিমকি আর ওই বোট্‌কা গন্ধের মুগের নাড়ু চিবোতে কতক্ষণ লাগে? টেঁপি ক্ষিপ্রহাতে এক গেলাস জল এনে দিল। আমি জল খেয়ে অমায়িক মধুর সৌজন্যে এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, এবার আমি যাই।

টেঁপি হঠাৎ মাথাটা দুলিয়ে চুলের রাশি ঘুরিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। আমি নিতান্ত নাবালক নই। বোনেদের বিয়েগুলো আমার দেখা আছে।

গিন্নি এবার একটু গলা নামিয়ে বললেন, শুনেছি বাবা, হুগলি ডিভিশনের কর্তা নাকি তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে। উনি ত পোস্টমাস্টার, ওঁর খ্যামোতা আমার জানা আছে। এই ত, আমার বড় ছেলে ভোনা এবার একটা পাস করল। ওর কথা তুমি একটু মনে রেখো বাবা।

আজ্ঞে আচ্ছা—

বেরিয়ে আসছিলুম। গিন্নি আবার বললেন, এখন থেকে তুমি আমাকে মা বলো কেমন? কী মিষ্টি ছেলে। আমি তোমার মা।

সহাস্যে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলুম। কিছু দূর পথ পেরিয়ে একস্থলে থমকিয়ে দাঁড়ালুম।—মা? আমার শরীর যেন কাঁপছিল এক বিদ্যুৎ শিহরণে। না, আমি অন্য কারোকে মা বলতে পারব না। মা আমার একজনই। সেই মাকে দেখি নি এক সপ্তাহ। আমি হাঁটিতে হাঁটতে এলুম সেই ডোবার ধারে। সেই ঘর, সেই মশা, সেই অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভবিষ্যতের ছবি আঁকা। না, সে ছবি আজ থাক।

মুখ ফিরিয়ে স্টেশনের দিকে ছুটে চললুম। আজ শনিবার, অনেক গাড়ি আছে। টিকিট কিনে স্টেশনে উঠে এলুম। আমি এই টানে সোজা ছুটে

গিয়ে চেঁচিয়ে মাকে ডাকব।

পথ যেন আর ফুরোচ্ছে না। বালিখাল পেরিয়ে স্টীমারঘাটে এসে দেখি বাঁশি দিচ্ছে স্টীমার। ছুট্, ছুট্—ছুটতে ছুটতে জেটির ভিতর দিয়ে এসে লাফিয়ে উঠলুম স্টীমারে। মাথার উপরে তখন আকাশ ডাকছিল। দড়িদড়া খুলে নিচ্ছিল খালাসীরা।

বাগবাজার ঘাটে স্টীমার থেকে নেমে সোজা দৌড়। আকাশ ভেঙ্গে তখন বৃষ্টি নেমেছে। সবাই ছাতা খুলেছে, সবাই খুঁজছে মাথা বাঁচাবার আশ্রয়। আমি হনহনিয়ে ছুটে যাচ্ছিলুম। নন্দ বোসের গলি, হরলাল মিত্তির—সব ফেলে ছুটছি। তারপর শ্যামবাজার, তারপর পুল—ছুট ছুট। মা যেন হয়ে উঠেছেন বিশ্বজননী, আমি যেন যাচ্ছি তাঁরই মন্দিরে।

যখন মায়ের সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালুম—তখন তাঁর চিরকালের চির-নাবালকের সর্বাঙ্গ বেয়ে বৃষ্টির জল ঝরছে।

সরকারী চাকরি—আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না।

একবার যদি কোনও মতে ঢুকতে পেরেছ তাহলে আর ভাবনার কিছু রইল না! জীবনের সোজা হিসেব নিভুর্ল অঙ্কের মতো কষা হয়ে গেল! তুমি শুধু যন্ত্রচালিত।

কিন্তু তার জন্য প্রতি রাত্রে ওই পচা ডোবার ধারে দমবন্ধ ঘরে ওই ভয়াবহ মশার কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হবো? তার চেয়ে আগুনে পোড়া বা জলে ডোবা ভাল!

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা আস্তানা বার করলুম। শ্রীরামপুর কোর্ট-কাছারির ঠিক সামনে একখানা পুরনো বাড়ির দোতলায় দক্ষিণমুখী একখানা ঘর। ঘরে থাকে আরও দুজন। একজন পুলিসের অ্যাসিস্টাণ্ট সাব-ইনসপেক্টর অন্যজন পঞ্চানন পাল। পঞ্চাননের বাঁ হাতখানা কনুই পর্যন্ত কাটা। শীর্ণকায় এবং কৃষ্ণবর্ণ। উনি আদালতের মুহুরি। পুলিস সাহেবটি আদালতে কাজকর্ম করেন। যাই হোক, ওই ঘরে ওঁদের সঙ্গে আমার জায়গা হয়ে গেল। সীট-ভাড়া মাসে দু'টাকা। আমার জায়গাটুকুতে শতরঞ্চি পড়ল আর মাথার দিকের এক কোণে রাখলুম কালো টিনের স্যুটকেসটি।

আমার পক্ষে সুবিধা এই, নিচের তলায় ছিল পাইস হোটেল। দু'আনায় পেটভরা ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, ছোটমাছের ঝাল, একখানা মাছের ঝোল এবং চাটনি। যদি আরেক পয়সা বেশি দাও তবে গরম ভাতে একপলা ঘি।

কলাপাতায় খেতে দিত, তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যেত কলাইয়ের ডাল বা মাছের ঝোল। তাই উপাদেয়। স্নানাহার সেরে আপিস যাবার পথে গুনগুনিয়ে গান আসত গলায়। দিনগুলো চলে যেত তরতরিয়ে।

এখন আমার অবস্থা সচ্ছল। পরনের পাঞ্জাবিতে মুক্তো বসানো একসেট বোতাম—তার দাম নিয়েছে ছ'আনা! বছর তিনেক আগে বড়দা আমাকে একটা আট টাকা টাকা দামের হাতঘড়ি প্রেজেন্ট করেছিল—সেটা সারিয়েছি আট আনায়। ফিতেবাঁধা একজোড়া জুতো আর গেঞ্জি—দুটোয় গেছে সাড়ে তিন টাকা। আমি এখন ফিটবাবু!

পঞ্চাননের মাইনে পনেরো টাকা, তবে মক্কেলদের কাছ থেকে বকশিশ ইত্যাদি মিলিয়ে কুড়ি-পঁচিশ টাকা আন্দাজ রোজগার করে। একখানা মাত্র হাত চালিয়ে এত টাকা রোজগার—নিশ্চয় গুণবান ব্যক্তি। কিন্তু তার চেহারাটা একেবারেই সুশ্রী নয়, তার ওপর ওই নুলো হাত! মাঝে মাঝে দেখি মেঝের উপর বসে আমার আয়না-চিরুনি নিয়ে এক হাতেই সে টেরি বাগাচ্ছে। মাঝখানে কবে যেন একদিন আমার বোতামের সেটটা সে চেয়ে নিল। বলল, আজ একটু বেড়াতে যাব, তাই তোমার বোতামটা পরে যেতে চাইছি—

—বেশ ত!

আমার তখন অবস্থা ফিরেছে। মন খুশীতে ভরা। রাত্রে যখন খেয়েদেয়ে উপরে উঠে আসি, তখন পাইস-হোটেলের একটা ঝি আমাকে ডেকে অযাচিত-ভাবে এক খিলি পান দেয়। হোটেলেরই সংলগ্ন ঝুপসি ঘরটার ভিতরে দাঁড়িয়ে সে যখন পান নেবার জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকে, তার ডাকার ভঙ্গীটা দেখলে আমার গা যেন ছমছম করে! একদিন পান খাওয়া বন্ধ করলুম।

পুলিস সাহেবের বাড়ি হ'ল বর্ধমানে। তাঁর মাইনে বোধ হয় টাকা পঁয়তাল্লিশ। তিনটি ছেলেমেয়ে। আবার নাকি একটি হবে। তিনি খাকি রংয়ের শার্ট আর প্যাণ্ট পরেন! মাথায় শক্ত চকচকে একটা কালো টুপি। কিন্তু ভদ্রলোক কথাবার্তা বলেন কম, এবং সর্বক্ষণই যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যখনই কথা বলেন, তখনই অভাব-অভিযোগের ক্ষোভ। শ্রীরামপুরে থাকতে গেলে খাই-খরচ, বাস ভাড়া, জলখাবার, ধোবা-নাপিত—সব মিলিয়ে কমবেশি কুড়ি টাকা পড়ে। দেশে বিধবা মা, অবিবাহিত বোন, বেকার ভাই, অসুখ-বিসুখ, লোক-লৌকিকতা—মাত্র পঁচিশ টাকায় কি হয়? আপনি ভাই বেশ আছেন! দিনরাত পকেটে টাকা পয়সা ঝমঝম করছে। সংসারের দায়ধাক্কা

কিছু নেই। দাদারা রোজগার করে...

পঞ্চানন ওর সঙ্গে যুগিয়ে দিল, তুমি ভাই বড়মানুষের ঘরের ছেলে! যেমন দিলদরিয়া মেজাজ, নজরও তেমনি উঁচু! এই ত এক কথায় মুক্তোর বোতাম ছড়াটা আমাকে দিয়ে দিলে—। চাকরি করা তোমাকে মানায় না।

ওর কথা শুনে আমি অবাক। কে বললে, ওকে আমি বোতাম ছড়াটা দিয়ে দিয়েছি? পরতে দিয়েছিলুম শুধু একদিনের জন্য তারপর আর ফেরৎ দেয় নি। ব্যবহার করছে নিয়মিত। ওর ওই কথার পর ছ'আনা দামের বোতাম ছড়াটার ওপর আমার ঘৃণা এসে গেল!

এ সপ্তাহে বাড়ি যাই নি। শনিবারে ছিল সরকারী ছুটির দিন। সেদিন ভোরে উঠে শেওড়াফুলি হয়ে গেলুম তারকেশ্বরে। সেখান থেকে আবার গেলুম হুগলির ইমামবাড়ায়। ভ্রমণ কিছু আমার যখন তখন চাই। আমার চাই গতি। গতি মানে প্রাণ। গতিহীনতার অন্য নাম প্রাণহীনতা!

রবিবারে গঙ্গা—ওটা আমার বাঁধা। গঙ্গায়-গঙ্গায় ভাসছে যেন সেই আমার বাল্যকাল। নৌকায়-নৌকায় আমার মন ঘুরে বেড়ায়। চলন্ত স্টীমার যে গুরুগম্ভীর নাদধ্বনি তোলে, সে যেন আমার রক্তে চিরকালীন একটা বেগের আবেগ আনে। রবিবার সারাদিন কাটে আমার গঙ্গায়—কোর্ট-কাছারির এলাকা ছুটির দিন জনশূন্য থাকে। আমি গিয়ে বসি বটের ছায়ার নিচে, যেখানে তার ঝুরি নেমেছে গঙ্গার স্রোতের উপর। সেই ভরা নদীতীরের বটের ছায়ার তলায় একাকী ব'সে আমি যেন স্থির চক্ষে চেয়ে থাকি আমার নিজের ভিতরে। ভিতরের সে যেন আরেক আমি। চারিদিকের চাঞ্চল্যের মাঝখানে সে যেন আপন আসনে স্থির হয়ে ব'সে থাকে!

এমন সময় একদিন মায়ের চিঠি এল, এই শনিবারে বাড়ি চলে আয়। তোকে নিয়ে যত গণ্ডগোল। বেনামে কোথায় কি লিখেছিস, তার জন্য লোকজন আসবে সামনের রবিবারে। ঠিক আসবি।

শনিবার বিকালে বাড়ী এসে হাজির হলুম। বিশেষ এক প্রতিষ্ঠান থেকে একখানা চিঠি এসেছে 'মাধুরী দেবীর' নামে। কেয়ার অফ—আমার ছোড়-দাদার নাম। হাসিমুখে চিঠিখানা পড়লুম। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, বিচারক-মণ্ডলীর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই, আপনার লিখিত প্রবন্ধ "বাঙ্গলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান" একশ' আটাশটি প্রাপ্ত প্রবন্ধের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এজন্য স্বর্ণমণ্ডিত রৌপ্যপদকটি আপনার প্রাপ্য। আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি আপনাকে অভিনন্দন

জানাইবার জন্য আগামী রবিবার সকাল ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে আপনার বাটীতে যাইবেন। ইতি—

সর্বনাশ! এখন উপায়? বাড়ির সবাই হাসাহাসি করছে আমার এই ছদ্মনামটি নেওয়ার জন্য। মা বলছেন, ত্রাহি মধুস্থদন! মাথায় উঠল স্বর্ণ-মণ্ডিত রৌপ্যপদক। সেদিন সমস্ত রাত ঘরের কড়িকাঠ গুনে কাটল!

পরদিন যথাসময়ে একখানা মোটরগাড়ি এসে গলির মুখে দাঁড়াল এবং জনতিনেক ভদ্রলোক এসে দরজার কড়া নাড়লেন। আমি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানালুম। তখন কথায়-কথায় চা খাওয়াবার ঢালাও রীতি চালু হয় নি। শুধু মিষ্টান্নর সঙ্গে কচুরি, নিমকি, সিঙ্গাড়া। কিন্তু তারপর?

ঠিক সময়টিতে মেজবউদিদি একগলা ঘোমটা দিয়ে একটু আব্রু বাঁচিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল! পরিচয় করিয়ে দিলুম, ইনিই মাধুরী দেবী, আমার দাদার স্ত্রী! রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি ওঁর একান্ত অনুরাগ ও নিষ্ঠা!

অতঃপর ভদ্রলোকরা 'মাধুরী দেবীর' রচনাটি নিয়ে প্রশংসায় যত পরিমাণ মুখর হন, আমার ঠ্যাং দু'খানা ঠিক তত পরিমাণেই ঠকঠক ক'রে কাঁপতে থাকে। ওঁরা বিদায় হ'লে বাঁচি। এদিকে মেজবউদিদিকে বলা ছিল, খবরদার একটি কথাও যেন বলো না! শুধু ঘাড় নাড়বে, নমস্কার জানাবে। একগলা ঘোমটার ভিতর দিয়ে তোমার থুঁতনিও যেন না দেখা যায়। যেন হেসে ফেলো না। ঘোমটার ভিতর দিয়ে লোকগুলিকে দেখবার চেষ্টা ক'রো না যেন। তুমি শুধু পর্দানসীন কাঠের পুতুল! বুঝেছ? মনে থাকে যেন!

মেজবউদি অগ্নিপরীক্ষায় পাস ক'রে গেল।

ওঁরা জানালেন, আগামী অমুক তারিখে 'সঙ্গীত সমাজ হলে' পুরস্কার বিতরণ করা হবে। আপনি উপস্থিত থেকে এই পুরস্কারটি গ্রহণ করলে আমরা বিশেষ বাধিত হবো।

তৎক্ষণাৎ আমি এগিয়ে মেজবউদির ঘোমটার ডগার কাছে মুখ রাখলুম কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। মেজবউদি পূর্ব নির্দেশ মতো নির্বাক। এবার আমি স'রে এসে ওঁদের বললুম, ওঁর পক্ষে সভাসমিতিতে যাওয়া ত সম্ভব নয়, বুঝতেই পারছেন! উনি আমাকে পাঠাবেন একখানা চিঠি দিয়ে। আমিই যাব।

ওঁরা সৌজন্য সহকারে বিদায় নিয়ে যখন গাড়িতে গিয়ে উঠলেন, তখন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমার পক্ষে সুবিধা ছিল এই, দু-চারজন দেশনেত্রী ছাড়া কোনও গৃহস্থের বউ-ঝি সেইকালে সভা-সমিতিতে যেত না।

এর কিছুকাল আগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর গান্ধীজী বেশ কিছুদিন

কলকাতায় ছিলেন, এবং যাবার আগে তখনকার শ্রদ্ধেয় জননেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে কলকাতার মেয়রের পদে বসিয়ে যান। এর ফলে বাঙ্গালার রাজনীতিতে গৃহবিবাদের অশান্তি ক্রমশ ধূমায়িত হতে থাকে এবং গান্ধী-বিরোধী উগ্রপন্থীরা সভাসমিতি ও সংবাদপত্রে নানা কথা বলতে থাকে। এই সময় মান্দালয় জেলে থাকাকালে সুভাষচন্দ্র কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, এবং অনেকের ধারণা, সুভাষচন্দ্রের খাদ্যে বৃটিশ শাসকদের ইঙ্গিতে বিষ মেশানো হয়েছিল। তরুণ সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর মানসপুত্র এবং বাঙ্গলায় সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। তিনি যেমন রূপবান, তেমনি তাঁর যৌবনশ্রী। তিনি সংযতবাক, গম্ভীর, পরহিতব্রতী এবং ব্রহ্মচর্যব্রতধারী। শিবের ছবির পাশে সুভাষচন্দ্রের ছবি টাঙ্গিয়ে বাঙ্গালী মেয়েরা পূজার আসনে বসতো। সুভাষচন্দ্র ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দের উত্তরসাধক। তিনি গীতাধর্মে অনুরক্ত এবং 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'—এই দৈবহিংসায় বিশ্বাসী। সেনগুপ্ত বয়োজ্যেষ্ঠ, সুভাষ কনিষ্ঠ। সেনগুপ্ত গান্ধীপন্থী, অহিংসাবাদে বিশ্বাসী, কংগ্রেসের প্রিয়। কিন্তু এই দুই নেতার পিছনে দাঁড়াল দুই দল এবং সংবাদপত্রগুলিও দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। দেশবন্ধু দলের দুটি প্রধান মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড' ও 'বাঙ্গালার কথা'। এই কাগজ দুটি পরিচালনা করেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, নলিনীরঞ্জন সরকার, শরৎচন্দ্র বসু ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। তাঁদের নাম ছিল 'বিগ ফাইভ'।

যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে 'সঙ্গীত সমাজ' হলে সবান্ধবে গিয়ে দেখি সভাপতি যিনি তিনি মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তিনি ছাড়া স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, আচার্য পি সি রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস এবং আরও অনেকে উপস্থিত। আমার কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছিল। তবু ওরই ভিতরে আমি যেন 'শ্রীমতী মাধুরী দেবী'র প্রতি ঈর্ষান্বিত হচ্ছিলুম! সে যেন আমারই প্রাপ্য সব প্রশংসা লুটে নিয়ে যাচ্ছে! মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি যখন মাধুরী দেবীর লিখিত চিঠিখানা পড়লেন, তখন সভাস্থলে হাত-তালি! কী ন্যাকামি মাধুরীর সেই চিঠিতে! আমি সামান্য অজ্ঞাতনামা লেখিকা, অন্ধকার গৃহকোণের এক বধূ। সেই অন্ধকারে নেমেছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের রশ্মি। আমার রচনাটি তাঁরই আলোয় আলোকিত। আমার কৃতিত্ব কিছু নেই···এ তাঁরই গৌরব!

ন্যাকা, ন্যাকা,—আগাগোড়া ন্যাকা! তবু এক সময় মাধুরী দেবীর নাম উঠল, এবং আমি মঞ্চের উপর উঠে গিয়ে মেয়রের হাত থেকে মেডেলটি নিয়ে

নমস্কার জানালুম। আবার হাততালি!

অতঃপর আগামী কয়েক মাসের মধ্যে 'মাধুরী দেবী'র নামে বোধ হয় পর পর তিনটি প্রবন্ধ তৎকালীন সাপ্তাহিক 'বিজলী' কাগজে ছাপা হয়। তখন 'বিজলী'র দ্বিতীয় পর্যায়। সম্পাদক ছিলেন দুজন। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও সুবোধ রায়। দুজনেই কবি। প্রথম পর্যায়ের 'বিজলী' বেরোয় বোধ হয় ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে। সম্পাদক ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। তৎকালে 'বিজলী'র লেখকদের মধ্যে ছিলেন বারীন ঘোষ, উপেন বাঁড়ুজ্যে, শচীন সেনগুপ্ত এবং বোধ হয় তরুণ কবি নজরুল ইসলাম। এঁরা প্রায় সকলেই শ্রীঅরবিন্দের অনুগামী এবং বিপ্লববাদী। বারীন ঘোষ ও উপেন বাঁড়ুয্যে আন্দামান জেল ফেরৎ। সেই 'বিজলী' ছিল সাংবাদিক জগতের গৌরব। কিন্তু এ 'বিজলী'ও খুব জনপ্রিয়। এই কাগজে ছাপা হবার জন্য মাধুরী দেবীর সেই অক্ষম প্রবন্ধগুলির 'মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে কথায়-কথায়!' আমার নিজের লেখা ছাপা হবার পর আমার একটুও ভাল লাগত না! লেখাগুলি পাঠাতুম শ্রীরামপুর থেকে।

এই বছরে প্রথম প্রকাশ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি আরম্ভ করি। এক তরুণ বয়ঃকনিষ্ঠ বেকারকে খুঁজে পেয়েছিলুম। সে কাব্যোৎসাহী ও সাহিত্যরসিক। নাম সুবল মুখুজ্যে। থাকত বাগবাজারে। সে আমাকে দিয়ে দেশবন্ধু পার্কে আমাদের এক সান্ধ্য আড্ডায় আবৃত্তি করিয়ে নিত। আমার একাকী জীবনে সুবল আমার দোসর হয়ে উঠেছিল। সে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। শ্রীরামপুরে চলে যেত আমার সঙ্গে। সারাদিন কাটিয়ে সে ফিরত বাগবাজারে। শ্রীরামপুরের গঙ্গার জলের পাতায় বসে আমরা দুজনে রবীন্দ্রচর্চায় কাটাতুম। সুবলের বাবার অবস্থা মোটামুটি ভালই। বাড়ীঘর নিজেদেরই। তার বাবা আপিস বেরিয়ে গেলে দুপুরবেলা বাবার হুঁকোয় সে অম্বুরি তামাক খেত। আমিও ছুটির দিনে মধ্যেমাঝে তার বাড়িতে গিয়ে দুপুরবেলায় হুঁকো ধরতুম।

সুবলের বয়স আঠারো, আমার কুড়ি। আমরা উভয়ে ক্রমে ক্রমে উভয়ের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠলুম। বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটের ঠিক পাশে একটি সরকারী নহরের মাথায় শান-বাঁধানো সাঁকোর উপর দুজনে বসে আমরা পশ্চিম সূর্যাস্তের আভায় আরক্তিম গঙ্গার দিকে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ মুখস্থ বলতুম। তখন 'চয়নিকা' কাব্যসংকলন 'সঞ্চয়িতা' হয়ে ওঠে নি! 'পূরবী-মহুয়া-পুনশ্চ' তখনও বেরোয় নি। আমার আবৃত্তির ফাঁকে ফাঁকে সুবল হাতে হাতে যে-তামাক

সাজত, সে ঠিক অম্বুরি তামাক নয়! আমি যখন 'আহ্বান' কবিতাটি আগাগোড়া আবৃত্তি করতুম, তখন মনে হত, অত্যুৎকষ্ট মাদক সেবন ছাড়া এই বিস্ময়কর কবিতার রহস্য-আত্মার মূল ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করা যায় না! আমাদের এবম্বিধ নিষিদ্ধ ধূমপানের মধ্যে রবীন্দ্রকাব্য জড়িয়ে থাকত, এবং রাত এগারোটায় যখন বাড়ি ফিরতুম তখন দুই তরুণ যুবকের চক্ষু রবীন্দ্ররসে ঢুলু-ঢুলু হয়ে আসত!

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব কেবলমাত্র ভল্‌গা নদীতেই তুফান তোলেনি, সেই ঝড়ে হুগলি নদীতেও তরঙ্গের বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর বাঙ্গালী পল্টন যখন মেসোপোটেমিয়া থেকে ফেরত এল, তাদের সঙ্গে ফিরে এল এক হাস্যোচ্ছল তরুণ বাঙ্গালী কবি, কাজী নজরুল ইসলাম। তার সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না চলতি সাহিত্য ও সমাজজীবনের ধারার সঙ্গে। সে ঢেউ তুলেছে নতুন চেতনার। সাহিত্যের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের ধার সে ধারে না, রবীন্দ্রনাথের শিষ্যকুলের সে কেউ নয়, তার চিন্তাধারার ভঙ্গী অন্য প্রকার। সে দলছাড়া, গোত্রছাড়া। সে বিপ্লবী ও বিদ্রোহী। সে সমাজ, ধর্ম, জাতি, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও কাব্যের নীতি—কিছুই মানে না। সে তার প্রত্যেক কবিতায় যেন একটা উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ তোলে, যেটা নতুন। কাজী নজরুল ছাড়া আরেকজনকে দেখা যাচ্ছে, সে 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিকের শিবরাম চক্রবর্তী। তার বক্রোক্তি, বিদ্রূপ, অনুপ্রাস, প্রকাশের তীক্ষ্ণতা, একই শব্দের ধ্বনি নিয়ে বিভিন্ন কৌতুক, বাক্যরচনার চাতুর্য—সব মিলিয়ে শিবরাম চক্রবর্তী অনন্য। অন্য দিকে ধূমকেতুর মতো যাঁর আবির্ভাব, সেই কাজী নজরুল বার করলেন দ্বি-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'। চারদিকে নবসাহিত্য চেতনার একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

বাঙ্গলা সাহিত্যে বামপন্থা এল রুশ বিপ্লবের পর। সর্বহারাদের কথা এল, এল দারিদ্র্য ও দুঃখবাদের কথা। যারা অন্ন ও আশ্রয়হীন, যারা মাথা তুলতে গেলেই মাথা ঠোকে, নোংরা বস্তির যারা মানহারা নরনারী, যারা তাদের ক্লেদক্লিন্ন জীবনে আশা-আশ্বাসের আলো খুঁজে পায় না—তারা এসে পৌঁছল নতুন সাহিত্যভাবনার মধ্যে। বাঙ্গলা সাহিত্যে 'কমিউনিজম' শব্দটার প্রথম প্রচলন করলেন প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রিন্স ক্রপটকিনের কোনও একটি বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ করলেন 'ভারতী'তে।

সাহিত্যে যখন এই প্রকার একটা ভাবান্তর চলছে, সেই সময় অতি

আধুনিক সাহিত্যের আড্ডা 'কল্লোল' গোষ্ঠীতে একটা ভাঙন ধরল এবং মুরলীধর বসুর নেতৃত্বে নতুন এক মাসিকপত্র বাঙলা সন ১৩৩৩-এর আষাঢ় মাসে বেরিয়ে এল। নাম 'কালিকলম'। সম্পাদকদের মধ্যে যাঁকে দেখলুম তিনি হলেন 'কয়লা-কুঠি' সিরিজের সেই লেখক শৈলজা মুখোপাধ্যায়—যিনি আমার আঙুল-কাটা যতীনদার বন্ধু! এখানে এসে শৈলজা হয়ে উঠেছেন শৈলজানন্দ। এর আগে মেয়েলী নাম শুধু শৈলজা—বোধ হয় কাজে লাগত। আমার যতদূর মনে পড়ে শৈলজানন্দর আগে কোনও লেখক অথবা লেখিকা কুলি-কামিন, শ্রমিক-মজদুর প্রভৃতিদের নিয়ে এমন সার্থক ছোটগল্প লেখেননি। তাঁর এই অনন্যতা তাঁকে 'নাটের গুরু' বানিয়েছিল।

আমার কাছে কল্লোল আর কালিকলম দুই ছিল সমান। আমি কালি-কলম-এ গল্প পাঠালুম, তিন দিনের মধ্যে কালিকলমের পক্ষ থেকে আমার কাছে আমন্ত্রণপত্র এল। নাম সই, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সেই বছর প্রথম দেখলুম কয়েকজন লেখক ও সম্পাদককে। তাঁদের মধ্যে প্রথম শৈলজানন্দ, যাঁর প্রকৃত নাম শ্যামল বা শ্যামলানন্দ। তারপর মুরলীধর বসু, পবিত্র গাঙ্গুলী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দীনেশরঞ্জন দাশ, মণীশ ঘটক, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। এদিকে দেখছিলুম জগদীশ গুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, হেমচন্দ্র বাগচী ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মাঝে মাঝে আসে আরও দুই তরুণ—গিরিজা মুখোপাধ্যায় ও হুমায়ুন কবির। কবিরকে কখনো বাঙ্গালীর পোশাকে দেখা যায় না।

আমিই যে মাধুরী দেবীর ছদ্মনামে 'বিজলী'তে লিখি—এই নিয়ে একদিন হাসাহাসি হই-চই হয়ে গিয়েছিল। একে একে দেখছিলুম সাবিত্রীপ্রসন্ন এবং সুবোধ রায়কে। একদিন দেখলুম তরুণ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর জার্মানি যাবার প্রাক্কালে। আরেকদিন কল্লোল আপিসে দেখলুম বুদ্ধদেব বসুকে—তার বয়স তখন বছর আঠারো। খর্বকায় তরুণ—ঢাকা কলেজে বি. এ. পড়ে। ওর সঙ্গে ছিল সুদর্শন অজিতকুমার দত্ত। অজিতের ডাক-নাম টুনু, সেও কবিতা লেখে।

কল্লোল এবং কালিকলম—উভয়েরই লেখক ছিল সর্বজনপ্রিয় নজরুল। সে থাকত তখন কেষ্টনগরে। কিন্তু তার সর্বাপেক্ষা নিকট-বন্ধু হলেন নলিনীকান্ত সরকার এবং তার সব রকমের দায়ধাক্কা পোহাতে হত পবিত্র গাঙুলীকে। যে কোনও আড্ডায় কাজী এলেই হাসি-তামাশার রসরঙ্গ চলত! তার প্রবল

প্রাণশক্তির অতি প্রাচুর্য প্রত্যেক বন্ধুকে নাচিয়ে তুলত। সে নতুন নতুন কবিতা ও গান লিখে আনত। হারমোনিয়ম নিয়ে গান গাইতে বসে গানের প্রতি ছন্দে, সমে এবং মিলে তার হাসির ধমকে-ধমকে যে-আনন্দ মুখর হয়ে উঠত—সেই দৃশ্য যারা দেখে নি, তারা নজরুলকে চেনে নি। চারটি সামগ্রী হাতের কাছে পেলে নজরুল মহা খুশী হয়ে উঠত। এই চারটি সামগ্রীর দাম ছিল মোট ছয় পয়সা। ডবল ডিমের অমলেট, এক পেয়ালা চা, পান ও জরদা।

এই বছরে নজরুল তার একটি প্রসিদ্ধ কবিতা লেখে 'কালিকলম'-এ। কবিতাটির নাম 'মাধবী-প্রলাপ'। কলকাতার পুলিস মহলের বিবেচনায় এই কবিতাটি অশ্লীল বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং সেজন্য সম্পাদক মুরলীধর বসু ও প্রকাশক শিশির নিয়োগীকে দু'চার দিন ধরে থানা-পুলিসে হাঁটাহাঁটি করতে হয়। এ ব্যাপারটি নিয়ে নিত্যানন্দলোকের অধিবাসী নজরুল যে সরস ও সুন্দর অশ্লীল বাক্যটি তার হাসির উচ্চরোল সহ উচ্চারণ করে, সেটি ছাপার অক্ষরে আর প্রকাশ করা চলে না!

আমি কল্লোল-এর প্রথম বছরের থেকে যেমন ওর লেখক, কালিকলম-এরও তেমনি। এই বছর থেকে কল্লোল-এর আকার হল প্রবাসী ও ভারতবর্ষের মতো। পরের বছরে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছিল। কল্লোল-এর এক গল্প-প্রতিযোগিতায় আমার 'নারায়ণ' নামক একটি ছোট গল্প পাঁচ টাকা প্রাইজ পেয়ে গেল! তখনকার দিনের পাঁচ টাকা! নিত্য উপবাসী ব্যক্তির মুখের সামনে যদি কেউ পোলাও-পরমান্ন তুলে ধরে—কেমন লাগে?

'কল্লোল'-এ মাঝে মাঝে ছাপা হচ্ছিল এক মেয়ে-কবির সনেট। সেগুলি উজ্জ্বল এবং মনোজ্ঞ। পরে কোথায় যেন শুনলুম তিনি অল্পবয়স্কা বিধবা। কিছুদিন বাদে এক সময় জেনেছিলুম, তিনি আমারই সহপাঠী নবকৃষ্ণ ঘোষের সহোদরা। এখন তিনি থাকেন আমারই মামার বাড়ীর পাড়ায় দীনবন্ধু লেনে। নাম রাধারানী দত্ত। একদা 'উত্তরা' সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী ও আমি এলাহাবাদগামী এক ট্রেনের কামরায় শ্রীমতী রাধারানী দত্তকে প্রথম দেখি। তখনও তাঁর বিধবার সজ্জা। এই সুন্দরী ও মিষ্টভাষিণী তরুণীকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলুম।

লিলুয়ার এক বাড়িতে নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিধবা রাধারানীর বিবাহ হয়। কালিকলম ও কল্লোল গোষ্ঠীর প্রায় সবাই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলুম।

শনিবারে বিকেলে আসতুম কলকাতায়, সোমবার সকালে চলে যেতুম শ্রীরামপুর। কিন্তু আমার মনে বিদ্রোহের সঞ্চার হচ্ছিল। নিত্যদিন এক

প্রকার অসন্তোষ আমাকে যেন পেয়ে বসে। মর্মের মূল থেকে উঠে আসে যেন এক অতৃপ্তি, সেটা আমার মনের দিগ্‌দিগন্তকে শ্রাবণের কালো মেঘের মতো ছেয়ে ফেলে। আবার ওরই মধ্যে মনে-মনে বিদ্যুৎলতার মতো এক-একটা কঠিন প্রশ্ন ঝলকিয়ে ওঠে। জীবন কি? পথ কি? পরিণাম কি? কী পেয়েছি এবং কীই বা পাই নি?

আমার সামনে দিয়ে বর্ষার ভরা ভাগীরথী ঢেউ তুলে সেই বটের ঝুরিকে নাচিয়ে নাচিয়ে ব'য়ে যেত। আমি ছমছমে সন্ধ্যায় ঘরে উঠে আসতুম।

সেদিন পঞ্চানন বলল, তোমার রিস্টওয়াচটা একটু হাতে পরতে দেবে ভাই? আজ একটু বেড়াতে যাব!

পঞ্চাননের মুখের দিকে তাকালুম। সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়।

—চল না, আজ দু'জনেই একটু বেড়িয়ে আসি?—পঞ্চানন উৎসুখ হয়ে উঠল।

মন্দ প্রস্তাব নয়। আমি তৈরিই ছিলুম। আমার হাতঘড়িটা আমিই ওর ডান হাতে পরিয়ে দিলুম। কারণ বাঁ হাতটা ওর নুলো। আজ তার সাজ-সজ্জার বাহার ছিল!

কাছারিপাড়া থেকে চাতরার এক নিরিবিলি পল্লী মাইল খানেকের মধ্যে। দুদিকেই চালাঘর এবং পথ অন্ধকার। পঞ্চুদা বলল, ভয় পেয়ো না, আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো! এ পাড়া আমার সব চেনা।

দূরে-দূরে পথের এক ধারে তেলের আলো জ্বলছিল। সেগুলো যেন ঠিক প্রেতিনীর চক্ষু! কতদূর যাচ্ছিলুম হিসাব করি নি। হঠাৎ এক স্থলে এসে পঞ্চানন দাঁড়াল। আমি কোনদিকেই এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। এবার দেখলুম এক-একটি চালাঘরের দরজায় দু'তিনটি ক'রে মেয়ে হাসিখুশী মুখে কিলবিল করছে। এক-এক দলের কাছে একেকটি কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। তার থেকে ময়লা শীষ উঠছে। মেয়েগুলির চেহারা ভাল নয়।

পুলকিত কণ্ঠে পঞ্চানন আমাকে ডাকল, আরে, একটু কাছেই না হয় এলে! বলো না কাকে বেশি পছন্দ হয়? এই ছাখো, এটি হ'ল বীণাপাণি, ওটি খ্যান্তমণি, এপাশেরটি মাধু—

কাছে এগিয়ে এসে দেখলুম একে একে! অন্ধকারে সুস্পষ্টভাবে কারোকে সঠিকভাবে দেখা না যায় সেইটিই ওদের যেন ইচ্ছা! ওধার থেকে হঠাৎ একজন মেয়েছেলে বলল, আমি গো আমি। হোটেলে রোজ আমার হাত থেকে পান নিতে · ভুলে গেছ? সন্ধ্যের সময় আমি রোজ দু' ঘণ্টার জন্যে

আমার ঘরে আসি। শুকো মাইনেতে কি আর ঘরকন্না চলে? দু'দুটো বাচ্চা—ইচ্ছে করে কেউ এ পথে আসে না! এসো, আর কেন চক্ষুলজ্জা—?

একদা সেই বিশ্বাসঘাতক চণ্ডাল বিধুবাবু আমাকে পড়তে দিয়েছিল ডস্টয়ভস্কির 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট'। আমি নিজে এখন সেই নৈরাশ্য-বাদী দুঃখী রাসকলনিকভ! আমার মুখ দিয়ে বিড়বিড় করে উচ্চারিত হচ্ছিল, "Sonia, Sonia, I did not bow down to you personally, but to the suffering humanity in your person."

পঞ্চানন ডাকল, ও কি ভাই, ফিরে যাচ্ছ নাকি?

—হ্যাঁ—

ছুটে এল পঞ্চানন। মিনতি ক'রে জানাল, আমাকে তবে একটা টাকা ধার দিয়ে যাও ভাই—

একটা টাকা তার হাতে দিয়ে সেই সন্ধ্যায় ছুটি নিলুম!

সেটা শ্রাবণের শেষ দিকে। রাত দশটার পর থেকে আকাশ যেন বজ্রকণ্ঠে আমাকেই ডাক দিচ্ছিল! সেই বজ্রে শুনছিলুম বংশীধ্বনি! দুকূল-প্লাবিনী গঙ্গার বটের ছায়াতল থেকে সেই বাঁশী আমাকে ডাকছিল! এমন সময় নিচের তলায় পশ্চিমের গলি থেকে সেই মসলার দোকানের ছোকরাটা দোকানের ঝাঁপ ফেলার আগে প্রত্যেক দিনের মতো আজও উদাত্ত কণ্ঠে গান গেয়ে উঠল: "আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে/নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে না যেন করি অপমান—"

ঝম-ঝম-ঝম করে নূপুর-নিক্বণে শ্রাবণের বৃষ্টি নেমেছিল অন্ধকার রাত্রে! আমার ঘুম এসেছিল। এ পাশে পুলিস সাহেব নিদ্রায় নিশ্চুপ, ওপাশে সুখের নিদ্রার মধ্যে পঞ্চাননের নাক ডাকছে।

কখন্ ঠিক মনে নেই, রাত কত তাও জানিনে। হঠাৎ এক সময় ছ্যাঁৎ ক'রে ঘুম ভেঙ্গে গেল! আমার মাথার দিকে কার যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চার অনুভব করলুম। তখনও বাইরে শ্রাবণের প্রবল ধারাবর্ষণ চলছে। রাত নিশুতি। আমি কাঠ হয়ে পড়ে রইলুম।

ঈষৎ বিস্ময়ে আমি সেই ঘন অন্ধকারে চোখ মেলে দেখি, পুলিস সাহেব আমার জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে অতি সন্তর্পণে টাকাপয়সাগুলি বার ক'রে নিয়ে আবার তাঁর জায়গায় ফিরে গিয়ে চুপি চুপি শুয়ে পড়লেন! আমার পকেটে প্রায় টাকা চারেক ছিল। মাস কাবার হ'তে এখনও পাঁচ-ছ'দিন বাকি।

হোক না কেন পুলিসের কর্মচারী! রোজগার ত পঁয়তাল্লিশ টাকা। উপরি নিয়ে না হয় পঞ্চাশ। ঘরে আমারই মতো বিধবা মা, অবিবাহিত বোন, বেকার ভাই, ধোবা-নাপিত, লোক-লৌকিকতা,—তার ওপর নিজের খরচ অন্তত কুড়ি টাকা—। পুলিস চোর নয়, কেউই চোর নয়,—অবস্থার দোষে মানুষ চোর হয়ে ওঠে। ধনাঢ্য ব্যক্তি পকেট মারে না!

যাক্ আমি এখন সর্বস্বান্ত, সুতরাং নিশ্চিন্তে আবার ঘুম এল!

হয়ত আমি এই শ্রীরামপুরেই দাঁড়িয়ে প্রকাশ করতে পারতুম, এখানকার সম্ভ্রান্ত লাহিড়ীরা, সাণ্ডেলরা, কোনও কোনও মৈত্র—আমার নিকট-আত্মীয়! বলতে পারতুম আমার পিসিমার অতি-নিকট কুটুম্ব হলেন রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর গোষ্ঠীর। কিন্তু কেন? ওদের সঙ্গে আত্মীয়তা থাকলেও আত্মার কুটুম্ব ওরা কেউ নয়? ওদের অস্তিত্ব কেন স্বীকার করব আমার জীবনে?

আমি সর্বহারা—এই আমার অহঙ্কার। দারিদ্র্য আমার শ্রেষ্ঠ ভূষণ।

॥ ১৬ ॥

কয়েকমাস আগে একবার হঠাৎ আমার একটা দুর্মতি হয়েছিল, আমি কলকাতার হেস্টিংসের পাড়ায় মিলিটারি ব্যারাকে বসে একটি পরীক্ষা দিয়ে এসেছিলুম! বিষয় ছিল ইংরেজি সাব্‌সটেন্স, ইংরেজি ডিকটেশন ও অঙ্ক। পরীক্ষার ফীস নিয়েছিল পাঁচ টাকা। পরীক্ষার্থী ছিল জনদশেক।

দিন পনেরো পরে জবাব এসেছিল, আমি পাস করেছি এবং অমুক দিনে অমুক সময়ে এবং অমুক স্থলে আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

যথানির্দিষ্ট দিনে গিয়ে দেখি, এটা আলিপুরের হাওয়া-আপিস। সেখানে একটি কক্ষে বসেছিলেন সামরিক পোশাকে এক লেফটেনাণ্ট কর্নেল। তিনি ডাক্তার, তিনিই আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন। খোঁজ নিয়ে জানলুম আমিই একা,—বাকি পরীক্ষার্থীরা সবাই ফেল মেরেছে!

এক সময় কর্নেল আমাকে ডেকে অত্যন্ত আপত্তিকরভাবে আমার শরীর এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে পরীক্ষা করলেন। আমি হেঁট হলুম, চিৎ এবং উপুড় হলুম। শুয়ে শুয়ে একখানা করে পা তুললুম, এবং সেই পা ধরে সাহেবটা হ্যাঁচকা দিতে লাগল। আমাকে দম নিতে বলল, কাশতে বলল, বুক ফোলাতে বলল, এবং এক-আধবার নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্লীল পরীক্ষা করল। সাহেবরা যে নেটিভদের শরীরে এভাবে হাত দেয়, এই প্রথম জানলুম।

তারপর লোকটা হাত ধুয়ে এসে টেবিলে বসল, এবং কি যেন লিখতে লিখতে আমাকে প্রসন্নমুখে বলল, তোমার মতো পারফেক্ট স্বাস্থ্য কোন বাঙ্গালী ইয়ং ম্যানের দেখি নি। আচ্ছা, এবার যেতে পারো। পরে খবর পাবে।

আমি সেলাম ঠুকে পালিয়ে বাঁচলুম। আমি তখনও একটু রোগাটে। কিন্তু সাহেবের মুখে স্বাস্থ্যশ্রীর সুখ্যাতি এমন বস্তু যে, কিছুদিন গর্বের সঙ্গে নেচে বেড়ালুম। নাঃ, এবার মিলিটারি জীবন আমাকে ডাক দিচ্ছে! আমার মধ্যে যে ক্ষাত্রশক্তি পুঞ্জীভূত, এবার তার উদ্বোধন ঘটুক। আমি সৈন্য বিভাগে ঢুকব, বন্য বর্বর জীবন যাপন করব। অরণ্যে, প্রান্তরে, মরুভূমে, মধ্যপ্রাচ্যে, সুদূর প্রাচ্যে, সেলেবিস বোর্নিওতে, দক্ষিণ আমেরিকায়, বারমুডায়, কানাডায়,—সর্বত্র যাব অজানা অনামা এক বাঙালী তরুণ। কেউ জানবে না আমার পরিচয়, কেউ খোঁজ করবে না আমার। আমার হাতে থাকবে শুধু সসাগরা ধরিত্রী! আমাকে বীর্যবান হতে হবে, দুঃসাধ্যের পথে নামতে হবে। আমি কঠিন নিবিড় ক'রে বাঁচতে চাই, আমি দুর্ধর্ষ হ'তে চাই। সমস্ত ভীরুতার বিরুদ্ধে, অনড় জড়ত্বের বিরুদ্ধে, অন্ধ কুসংস্কার আর কুশিক্ষার বিরুদ্ধে—আমার হবে প্রচণ্ড প্রবল জয়যাত্রা। আমি যুদ্ধে যাব, আগুন আর বিপ্লবে ঝাঁপ দেবো, স্যাপার্স আর মাইনার্সের মতো পথ কাটতে কাটতে এগোবো। আমার তেজিয়ান ঘোড়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটবে, ধুলো উড়বে, কপাল বেয়ে গড়াবে আমার ঘাম আর রক্তের ধারা,—আমাকে সৈনিক হ'তে হবে!

আলিপুরের ট্রামরাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আমি যেন আমার অন্তরাত্মার মূল শিকড় ধরে কাঁপছিলুম এক বিচিত্র উত্তেজনায়। না, আমার পথ সাহিত্যের পথ নয়, আমার পথ রুক্ষ রূঢ় জীবনের। আর আমি কলম চাইনে, এবার চাই বন্দুক। দারিদ্র্যের পঙ্কিল অবমাননার তলায় তলিয়ে কেন আমি লিখতে যাব বস্তির বীভৎস নোংরামির কথা—কেন লিখতে যাব নৈরাশ্যের, দুঃখবাদের, বেদনার ও করুণার কাহিনী? কোন্ দেশে নেই অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, পাগল, চোর, লম্পট ও ভিখারী-কাঙ্গালী? কোন্ দেশে নেই বেশ্যা আর যৌনসরীসৃপ। আমি কেন বানাতে যাব বেশ্যাকে সতী ও লম্পট চরিত্রহীনকে প্রেমিক? না, পারব না। রিরংসাকে মনোহর সজ্জা দেবো না!

এবার আমি সাহিত্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলুম। এবার আমি চাইছি সমরানল জ্বলুক। আমি জন্মবিপ্লবী, বিপ্লব-ঘোষণার দিনে আমার জন্ম। পৃথিবীর কোথায় কোন্ দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বলেছে, আমি মনে মনে তাদেরই সঙ্গী। আমি চাইছি বিরাট এক ভাঙন, চাইছি ছারখার, চাইছি

পুরাতনের সর্বনাশা ধ্বংস, আমি চাইছি নতুন এক পৃথিবী। পরিবর্তন নয়, বিবর্তনও নয়,—চাইছি নবজাতককে!

আশ্বিনের মাঝামাঝিতেও বৃষ্টি হচ্ছিল।

আজ শনিবার, আমার মাইনে পাবার দিন। আমার আগেই পঞ্চানন আর পুলিস সাহেব বেরিয়ে গেল। আমার হাতঘড়ি, বোতাম, একটা টাকা ও একটি পানজাবি—আজও পঞ্চানন ফেরত দেয়নি। ওগুলোর ওপর আমারও যেন বিতৃষ্ণা এসে গেছে। আমার পাতলা টিনের বাক্সটায় ছিল আয়না-চিরুনি, সেগুলি এখন পঞ্চাননের নিজস্ব। আমি যে ওদের মালিক, একথা আমিও ভুলতে বসেছি।

স্নানাহার সেরে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বড় ডাকঘরে গিয়ে হাজির হলুম। কী সমাদর সেখানে আমার! গত মাসে মোট চারদিন আমার কামাই, তবু মাস্টারমশায় পরম স্নেহবশত খাতাপত্রে সে-সব 'ম্যানেজ' করে রেখেছেন। আমার অনন্যসাধারণ যোগ্যতা সম্বন্ধে ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার্সে তিনি নোট পাঠিয়েছেন। কী সৌভাগ্য, সেবার সন্দেহবশে পুরনো খাতাপত্র ঘেঁটে একটা মোটা অঙ্কের ভুল বার করে দিয়েছিলুম, তাই রক্ষে। মনি অর্ডার, রেজিস্ট্রেশন, সেভিংস, স্ট্যাম্পস—এদের হিসেব—মাস্টারমশাই বলেন, আমার নখদর্পণে! ইনসিয়োর, পার্সেল, মেলব্যাগ মেলানো, রেল-পিওনের রসিদ, টাকাকড়ি গুনে মেলভ্যানে তুলে দেওয়া—এসব আমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কে করছে? মাস্টার মশাইয়ের কেবলই ভয় পাছে আমার মতন সুযোগ্য কর্মীকে হেড কোয়ার্টার্সে বদলি করে নিয়ে যায়। আমার সহপাঠী বিজন, তার মামা যে হেড আপিসের সর্বেসর্বা। আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে।

টিফিন নেই আজ। তবু বেলা একটা নাগাত মাস্টারমশাই মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য ভিতরে গেছেন। সেই সুযোগে অন্যান্য কেরানী ও পিওনরা একটু বাইরে গিয়ে হাঁপ ছাড়ছে। আমার নিজের অনেক কাজ, একে একে সাজিয়ে গুছিয়ে তাড়া বেঁধে নোট লিখে রাখছিলুম।

এমন সময় দুটো ছেলেমেয়ে ভিতরের দরজাটা একটু ফাঁক করে আমার দিকে চেয়ে কী যেন বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে। আমি একবার মাথা তুলে তাকালুম। হাফ প্যাণ্ট পরা ছেলেটা বলল, আপনার ক্ষিধে পায় না?

হেসে বললুম, না—।

ওদের পিছনে বোধ হয় টেঁপি এসে আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত

তারই ইঙ্গিতে ফ্রকপরা মেয়েটা এবার বলল, ক্ষিধে পেলেই ভেতরে চলে আসবেন !

—সে কি ? ক্ষিধে পেলেই আমাকে খাওয়াবে ?

—হ্যাঁ, ঠিক খাওয়াবো। আপনি যে আমাদের জামাইবাবু হবেন !

অবাক হয়ে ওদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালুম। ওরা খিল খিল করে হেসে হুড়মুড়িয়ে পালালো। বিস্ময় বিরক্তিতে আমি চুপ করে গেলুম।

আগাগোড়া নির্ভুল হিসেব করে সব গুছিয়ে রেখে যখন ছুটি নিলুম, বেলা তখন আড়াইটে। আবার আসতে হবে সেই সোমবার! আবার শুরু হবে নতুন করে সেই 'দিন যাপনের প্রাণধারণের গ্লানি'! আপাতত বিদায় নিলুম!

মাইনে পঁয়ত্রিশ টাকা—সোজা কথা নাকি ? ডাকঘরে বসেই পনেরো টাকা মনি অর্ডার করলুম মায়ের নামে। রাস্তার দোকানে বসে বেশ মোটা জলখাবার খেয়ে নিলুম। ওতেও 'হার্ড ক্যাশ' বেরিয়ে গেল দশ পয়সা। পাইস-হোটেলে এসে ম্যানেজারের দেনা শোধ করলুম সাড়ে চার আনা। ধোবার ঘরে দু' আনা বাকি পড়েছিল—ওর দরজা ঠেলে নাকের ওপর ধরে দিলুম।

ব্যস, আর আমার কোনও দেনা নেই। আমি অঋণী, আমি স্বাধীন, আমি অবারিত। মুক্ত বিহঙ্গ কাকে বলে ? কাকে বলে ছিন্নবাধা ? কাকে বলে সকল সংস্কারমুক্ত বৈদান্তিক ? "দাও আমারে অশোক মন্ত্র অভয় মন্ত্র তব, দাও আমারে অমৃতমন্ত্র, দাও গো জীবন নব।"

আমার আত্মার আর্তনাদ আমাকে ক্ষণে ক্ষণে অস্থির করে তুলছে। আমাকে নবজীবন দাও, অন্ধকারে পথ চিনিয়ে দাও, চারিদিকের পঙ্কিল নরককুণ্ড থেকে আমাকে তুলে ধরো, আমাকে উৎক্ষিপ্ত করো মহাশূন্যে—

ঘরে এসে টিনের বাক্সটার আংটা ধরে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাবো—এ কি, এত হালকা কেন ? একটু অবাক হয়ে মেঝের উপর ব'সে কব্জাটা খুলে দেখি, ভিতরটা সম্পূর্ণই শূন্য। তিন-চারখানা ধুতি, গোটা দুই পানজাবি, নতুন গেঞ্জি, খান চারেক রুমাল, সাবান, তেল, সোয়ান-মার্কা পেন, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম—কোনটার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মা দিয়েছিলেন ছোট্ট একটি প্রসাদী ফুলের পুঁটলি, সেইটি পড়ে আছে শুধু এক কোণে। আর আছে জেবের মধ্যে খান-তিনচার চিঠি আমার নামে।

কে চুরি করেছে, স্বচক্ষে দেখি নি! কেন করব সন্দেহ পঞ্চাননকে অথবা পুলিস সাহেবকে ? কেনই বা অনুমান করব ?

পোড়া মুখে আমি আবার হাসছিলুম!

যাই হোক, চিঠিপত্রগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিলুম। প্রসাদী ফুলের পুঁটলিটি পকেটে পুরলুম। তারপর টিনের বাক্সটা নিয়ে নিচে নেমে এলুম। নিচে তখন রাত্রের রান্নাবান্নার আয়োজন চলছে। মাংস রান্নার গন্ধ বেরিয়েছে।

ম্যানেজার বলল, বাড়ি যাচ্ছেন নাকি, বড়বাবু?

বললুম, না, যাচ্ছিনে। শুনুন, এই সুটকেসটা পঞ্চুদার, ওকে ফেরত দেবেন। আমি যাচ্ছি একটু বিশেষ কাজে—

মিথ্যা বললুম—গত্যন্তর ছিল না। পিছন থেকে ম্যানেজার বলল, এ-বেলা মটন কোর্মা হচ্ছে, খেয়ে বলবেন কেমন! দশ পয়সা ফুল প্লেট!

প্রসাদী ফুল রইল পকেটে—আমি চললুম। ওটা যে আমার দৈবের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস, তা নয়। ওর মধ্যে আমার মা রইলেন! যতদূর আমি যাব, মা যাবেন সঙ্গে! খানা-খোন্দলে পড়তে পারি, বিপথগামী হতে পারি, বিপদে দুর্গমে দুর্গতিতে জড়িয়ে পড়তে পারি—মা থাকবেন সঙ্গে! আমি সর্বহারা, কিন্তু মা-হারা নয়!

বর্ধমানের ট্রেনে আমি উঠে বসলুম।

বৃষ্টিতে ভিজেছে জামাকাপড়। তা ভিজুক, হাওয়ায় এখনি শুকিয়ে যাবে। এখন চারটে বাজে, ছটার মধ্যে বর্ধমান। ডেলি প্যাসেনজারদের ভিড়ের মধ্যে বসে ভাবছিলুম সরকারী চাকরি আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না। শুধু তাই নয়, সেই চাকুরে-ব্যক্তি নিখোঁজ হলে চাকরি ছোটে তার পিছু পিছু।

যাই বলো, আজ আমি বাঁচলুম। চাকরি মানেই পরের অধীনতা আর বাধ্যবাধকতা। আমি কিছু না, আমার স্বকীয়তা কিছু নেই, আমি যেন সরকারের বিরাট যন্ত্রশালার সামান্য একটি স্ক্রু মাত্র, যন্ত্রীরা আছে পিছনে। আমার ইচ্ছার কিছু দাম নেই, শুধু তাদের ইচ্ছার ক্রীতদাস আমি!

বাইরে আকাশ অন্ধকার, বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রান্ত। দু-দিকে সবুজবর্ণ শস্য-প্রান্তর বর্ষার দুর্যোগে যেন খাঁ খাঁ করছে। এ বছর দেবীর নৌকায় আগমন। ফল, শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা!

একে একে অনেকগুলি স্টেশন পার হয়ে গেল। বর্ধমানে যখন গাড়ি এসে থামল, তখনও সঠিক সন্ধ্যা হয়নি। বৃষ্টি ধরেনি, কিন্তু কমে গেছে। স্টেশনে নেমে এক পেয়ালা চা খেতে ইচ্ছে হয়েছিল—কিন্তু থাক। স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখলুম, সামান্য টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমি একটা বিশেষ পথ ধরে চললুম সেরিস্তাদার সাহেবের বাড়ি।

বেশি নয়, মাইল খানেক, মিনিট পনেরোর পথ।

অবশেষে এক বাগানবাড়ির ভিতরে ঢুকে সোজা দোতলায় উঠে এলুম।

—আরে, তুমি ?—ছোড়দিদিমা হাঁকলেন।

—এ কি, তুই হঠাৎ ?—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী চেঁচিয়ে উঠল। এটি বিশ্বনাথের ছোটমামার বাড়ি। তিনি এখানকার সেরিস্তাদার ফণীন্দ্রনাথ আচার্য। ওরা সবাই ডাকে 'ফতোমামা'।

ছোড়দিদিমার চেহারাটি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! দাদামশায় লম্বা সৌম্য পুরুষ। তিনি কানে কম শোনেন, তাই একটা যন্ত্র কানে লাগানো থাকে। অতি ভদ্র ও অমায়িক! আমাকে দেখে বললেন, চাকরি করবে ? আমার হাতে আছে একটা—

বললুম, না—চাকরির শখ মিটেছে। এবার থিয়েটারে নামব, দৌবারিকের পার্ট দিয়ে আরম্ভ করব। আপনি ওঁদের একটু বলে দিন—

দিদিমা বললেন, সে তো চাকরের পার্ট!

—সেই ত ভাল, সবচেয়ে নিচে থেকে আরম্ভ!

ওঁরা সব হাসতে লাগলেন।

আহারাদির পর রাত্রে একটি ঘরে বিশ্বনাথ ও আমার বিছানা একটাই পড়ল। মশা খুব, তাই পাখা খোলা। শুয়ে শুয়ে বললুম, আমাকে ডেকেছ কেন ?

বিশুকাকা বলল, তুই আমাকে কাশী নিয়ে চল, তোর সেখানে অনেক চেনা।

—সেখানে ত থিয়েটার নেই ?

—থিয়েটার! থিয়েটার আমি আর জীবনেও করব না, অনেক শিক্ষা হয়েছে!

হেসে বললুম, কোন শিক্ষাই তোমার হয়নি, বিশুকাকা। এই নিয়ে বার তিনেক বড়বাবুর সঙ্গে তোমার বিরোধ বাধল। কেন বাধল, আমি বেশ জানি। তোমার সুন্দর চেহারা ও 'দেবচরিত্রই' তোমার শত্রু!

বিশ্বনাথ আমার চেয়ে দশ-বারো বছরের বড়। এবার ফস করে সে ধমকিয়ে উঠল, বলল, খুব ফাজলামি শিখেছিস, না ? 'অনড্‌বান' কোথাকার।

—ফাজলামি নয় শোনো।—আমি বললুম, বড়বাবুর সঙ্গে তোমার বিরোধের খবর শুনলে দেশের লোক কি বলবে ? তুমি দেবচরিত্র মানে দেবরাজ ইন্দ্রের চরিত্র! তোমার ইন্দ্রত্ব বড়বাবু আর কতদূর সইবেন ? তুমি ত 'বক্স অফিস'

নও, বস্ত্র অফিস হলেন তিনি। হও না কেন তুমি সহোদর, বড়বাবু তোমার অবাধ্যতা আর বাড়াবাড়ি সইবেন কেন ?

কিছুক্ষণ কন্দর্পকান্তি বিশ্বনাথ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, থাক ও-সব কথা। আমি এখন সন্ন্যাস নিতে চাই, তুই আমাকে সাহায্য কর। আমি বিশুদ্ধানন্দর কাছে দীক্ষা নেবো। চল্ আমরা দুজন কাশী যাই।

আমি খুব হাসছিলুম। বললুম, অর্থাৎ 'গন্ধবাবা'র সাকরেদি করতে চাও ! কিন্তু তোমার জন্যে যে 'বিশুদ্ধ কাননে' আগুন জ্বলবে, সেটি কি গন্ধবাবা নেবাতে পারবেন ?

—কেন এ-সব চালাকি করছিস ? কেন আগুনে জ্বলবে ?

—এই যে বললুম তুমি দেবরাজ—সেই কারণে !—আবার হেসে বললুম, শোনো তবে রবি ঠাকুরের দুটো লাইন : "যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে—।" আমি ছাড়া তোমায় কেউ এত ভাল চেনে না—তোমার সব খবর আমার নখদর্পণে !

বিশ্বনাথ বললেন, নে, যত পারিস গালমন্দ কর, কিন্তু সন্ন্যাসী আমি হবই।

—তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসিনী কে হচ্ছেন ?

—সন্ন্যাসিনী !—বিশুকাকা বলল, ওরে অনড্বান, এবার ঘুমো।

তিনি নিজেই পাশ ফিরে শুলেন। তখন গভীর রাত !

মনে করেছিলুম ছোড়দিদিমার এখানে বেশ কয়েকদিন কাটাবো এবং অতিশয় ভূরি-ভোজের মধ্যে ডুবে থাকব। কিন্তু অঙ্গে-বঙ্গে-কলিঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে। তিন দিনের দিন 'নাটমন্দির' থেকে শিশিরবাবুর বার্তা এসে পৌছল তাঁর ফতোমামার কাছে : 'বিশু নিরুদ্দেশ হবার পর আমরা কেঁদে-কেঁদে বেড়াচ্ছিলুম। পনেরো দিন পরে আজ খবর পেলুম সে তোমার ওখানে। গলায় গামছা দিয়ে করজোড়ে জানাচ্ছি, ওরে বিশু তুই যেখানেই থাকিস, ত্বরায় আমার কোলে ফিরে আয়। ইতি—'

বিশুকাকা বোধ হয় এইটিই চাচ্ছিল। সে আগে একবার প্রাণ খুলে হেসে নিল। আমিও সেই সঙ্গে হাত জোড় করে বললুম, হে দেবরাজ, ঝড়-মেঘ-বৃষ্টির দেবতা, এবার আবার তুমি দয়া করে ফিরে যাও তোমার নৃত্যসভায় ! হে ইন্দ্র, তোমার পলায়নের মূল কারণগুলি আমি জানি, নরনারী নির্বিশেষে যাঁরা তোমার জন্য অশ্রুত্যাগ করছেন, তাঁদের সকলকেই উত্তমরূপে চিনি। আমি বিশ্বাস করি, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে তুমি শিশিরকুমার অপেক্ষা

অনেক বড় অভিনেতা!

—থাম্, অনভ্যান!—বিশ্বনাথ মুখ লুকিয়ে সরে পড়লেন।

সে-যাত্রা সন্ন্যাস নেওয়া তৎকালে স্থগিত রইল, এবং বিশ্বনাথ সোৎসাহে বেলা দেড়টার ডাক-গাড়িতে কলকাতা রওনা হলেন। আড্ডাটা যখন ভেঙেই গেল তখন আমিই বা এখানে ঝুলে থাকি কেন? ছোড়দিদিমা ও দাদামশায়ের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আমি বেরিয়ে পড়লুম বিকালে এবং সন্ধ্যার দিকে পৌনে পাঁচ টাকার টিকিট কিনে এক নিরিবিলি থার্ড ক্লাসে উঠে কাশীযাত্রা করলুম। চলো তীর্থ কাশী! 'হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর, আমারে দিয়েছ শুধু পথ!'

কী সুন্দর লাগল সন্ধ্যারাত্রির আসানসোল। কী মধুর মনে হচ্ছিল ধানবাদ গোমো আর হাজারিবাগ রোড। তারপর গাড়ি যখন গুজণ্ডির অন্ধকার সুড়ঙ্গলোকে ঢুকল—তখন এসেছে দুই চোখে আমার ঘুমঘোর। সব ঘুম আমার সুখের ঘুম—জাগরণ হল দুঃখের। "যত দুঃখ পৃথিবীর/যত পাপ যত অমঙ্গল/যত অশ্রুজল, যত হিংসা হলাহল—"

কাঠের বেঞ্চের উপর পা ছড়িয়ে শুয়েছিলুম, গাড়ি ফাঁকা। পুজোয় আর বড়দিনে শুধু ভিড় হয়, অন্য সময় একজন যাত্রী একখানা পুরো বেঞ্চ নিয়ে থাকে। ভ্রমণেও আনন্দ। খাঁটি ভয়সা ঘিয়ের পুরি আট আনা সের। অর্থাৎ এক-একখানা পয়সা-পয়সা। এক পয়সার চিনাবাদাম খেতে খেতে পঞ্চাশ মাইল গাড়ি চলে যায়। সকালবেলাকার ব্রেকফাস্ট—দুটো ডিমের পোচ, দুখানা মাখন টোস্ট, একটা কলা, ছোট এক পট চা—মোট চার আনা। এক মণ মোট বইলে স্টেশনের কুলি এক আনা। বেনারস সিটি বা ক্যাণ্টনমেণ্ট বা সিকরোল থেকে সোনারপুরার সড়ক পর্যন্ত একা ভাড়া দু' আনা। সাইকেল-রিকশা তখন জন্মায় নি।

পরদিন সকাল আটটায় সোনারপুরার বড়বাড়িতে এসে পৌঁছলুম। এ আমার নিঃসন্তান রায়বাহাদুর মেসোর বাড়ি। যেহেতু নিঃসন্তান এবং অবস্থা সচ্ছল, সেজন্য মাসিমাকে ঘিরে মৌমাছিরা থাকে। মেসোমশাই মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। আমার অন্য দুই মাসির দুই ছেলেকে ওঁরা মানুষ করেছেন, সুতরাং তারাই এই মস্ত স্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে, এটি বলাই বাহুল্য। আমি আসি-যাই, এই আমার আনন্দ। আমি এলে গৃহকর্ত্রী খুশী হন সম্ভবত এই কারণে যে আমি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। কাশীতে আসি আমার আত্মিক আকর্ষণে।

এবারে 'বড়বাড়ি' জমজমাট। আমার সবচেয়ে বড় লাভ আমার দিদিমা,

তিনি এখন কাশীবাসিনী। বয়স প্রায় আশী। তাঁর পেটে যে দস্যুর জন্ম, সেই মামা আছেন পাশের বাড়িতে। মামী তাঁর করাল গ্রাস থেকে ফসকিয়ে পালিয়েছেন বাপের বাড়ি কেষ্টনগরে। মামার অন্নবস্ত্র ও ঘরভাড়া যোগাচ্ছেন তাঁর ধনবতী সহোদরা। কিন্তু বৃদ্ধ মাতুল এখনও লাঠি ঠুকে মাঝে মাঝে হুমকি দিচ্ছেন, এবার এলাহাবাদ হাইকোর্টে দিদিমার বিরুদ্ধে তিনি এক নম্বর মামলা ঠুকবেন। তাঁর পিতা ফল্গুনা ভটচার্যির কলকাতার সম্পত্তি বেনামে স্ত্রীধন বলে বিক্রীত হয়েছে, সেই সম্পত্তি তিনি গোপাল মল্লিকের হাত থেকে উদ্ধার করবেন!

দুর্যোধন তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত আপন সত্যে অবিচল ছিলেন! আমার ধারণা, সকলের আগে মামাই প্রথম স্বর্গে পৌছবেন। হয়েও ছিল তাই। বিরাশী বছর বয়সে দিদিমা পুত্রহারা হয়েছিলেন।

কী আনন্দ কাশীতে! অহল্যাবাঈ ঘাটে এবারে দেখছি ইলেকট্রিকের আলো। পুজোর আর দেরি নেই। দোকানপাটের সাজসজ্জা চলছে। বিশ্বনাথের গলিতে বাঙ্গালী দোকানদাররা বেনারসী শাড়ির ভাণ্ডার নিয়ে বসেছে। সমগ্র কাশী খাদ্যের প্রাচুর্যে ভরা। এক সের ভাল সন্দেশ আট আনা। রাবড়ি পাঁচ আনা। দশ সের ভাল দুধ এক টাকা। কাটা রুই চার আনা। প্রায় এক পোয়া মাছ ফাউ। কাশীবাসীরা অধিকাংশ নিরামিষ খায়, আমরাও তাই। মাংস বা ডিমের বাজার নেই। শুধু কিশোরদাদাদের রান্নাঘরে মাছ রান্না হয়।

আমার ডাকঘরের চাকরি নেবার আগে সুযোগ পেলেই কাশী আসতুম। ১৯২৪-এ দিলীপকুমার রায় কাশীর পাড়ায়-পাড়ায় গান গেয়ে অমৃতের প্রবাহ এনে দেন। তাঁর পরম সুন্দর যৌবনশ্রী, তাঁর কণ্ঠের অপরূপ মাধুর্য, তাঁর স্বভাবচরিত্র ও ব্যবহারের নির্মলতা—এগুলি আমাদের মনকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছিল। তাঁর উদাত্ত মধুর কণ্ঠের সেই 'বঙ্গ আমার জননী আমার, মলয় আসিয়া কয়ে গেল কানে, মুঠো মুঠো রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পায়ে মা গো—' এবং আরও বহু গান স্মরণীয় হয়ে আছে। ওঁর সঙ্গে থাকতেন হাসির গানের নলিনীকান্ত সরকার মশায়। গানে গানে ওঁরা পাগল করছিলেন সমগ্র বাঙ্গালীটোলাকে। ওঁদের আসর বসতো দেবনাথপুরার গোপালবাড়িতে, সোনারপুরায়, পাঁড়ে হাউলিতে, তিল-ভাণ্ডেশ্বরে, রামাপুরায়—এবং আরও নানা পল্লীতে। আমার বন্ধু কালী মাস্টার, বৈদান্তিক কেদারনাথ, বিদগ্ধচিত্ত প্রফুল্ল, সুরসিক পণ্ডিত ননী—আমরা সবাই দিলীপকুমারের গানের নেশায় উন্মত্ত হয়ে

ওঁদের পিছনে পিছনে ধাওয়া করতুম। 'উত্তরা'র সুরেশ চক্রবর্তী ছিল ওঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। তখন 'উত্তরা' একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখপত্র। 'উত্তরা'র লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, ধূর্জটি মুখুজ্যে, রাধাকমল, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায় ইত্যাদি।

এবারে যাঁর কাছাকাছি এলুম, তাঁকে দূরের থেকে বহুকাল ধরে দেখে এসেছি। তখন থাকতুম মানিকতলায় শুঁড়িপাড়ার ভাড়া বাড়িতে। অদূরে আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে লোহাপটির পাশেই এক বাড়িতে থাকতেন শিশির ভাদুড়ীরা, আর ইনি থাকতেন ঘোষ লেনের ভিতরে ঢুকে ঠিক সামনে উত্তরমুখী সুন্দর দোতলা বাড়িটিতে। বাড়িটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পরে এই বাড়িটিতে শিশিরবাবুরা এসে কিছুকাল ছিলেন। তখন ও-বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল।

যাই হোক, এই ভদ্রলোক সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন বড় রাস্তায় এসে পড়তেন, তখন ওঁকে আমি আমাদের বাড়ির দরজা থেকে লক্ষ্য করতুম। ওঁর পরনে কোঁচানো ধুতি, পায়ে পামশু, গায়ে অতি ফিকা নীল রংয়ের দীর্ঘলম্বিত পানজাবি, মাথায় ঘন চুলের রাশি ব্যাক-ব্রাশ করা। কিন্তু ওঁর চলনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল এই, পথের দু-পাশে ওঁর ভ্রূক্ষেপ থাকত না। প্রত্যেক দিন গোধূলিকালে ওঁকে শুধু দেখার জন্য আমি এ-ফুটপাথে অপেক্ষা করতুম। দেখতুম ওঁর বিশাল স্বাস্থ্যবান শরীর, পশুরাজ সিংহের মতো বলিষ্ঠ। উচ্চতায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। ওঁর শান্ত নির্লিপ্ত উদাসীন দৃষ্টি পশ্চিমের পথ অপেক্ষা পশ্চিম আকাশের দিকে নিবদ্ধ থাকত। পথের যানবাহন বা লোক চলাচল— সকল কিছুর প্রতি ওই বিরাট পুরুষ সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। আমার সবিস্ময় শ্রদ্ধা ওঁর পিছু পিছু যেত। ওঁকে আমি ভুলি নি!

আবার কয়েক বছর পরে হঠাৎ ওঁকে দেখি শ্যামবাজারের মোড়ে এক চায়ের দোকানে। বেলা তখন প্রায় এগারোটা—এ সময়ে চায়ের দোকানে ভিড় থাকে না! কোথায় যেন এক অদৃশ্য চুম্বক শক্তি কাজ করছিল আমাদের উভয়ের মধ্যে বহুদিন থেকে। আমি তখন কর্মহীন বেকার। নৈরাশ্য দারিদ্র্য এবং দুঃখবাদ আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। আমি ওই দোকানে একান্তে দু' পয়সার এক পেয়ালা চা নিয়ে সময় কাটাচ্ছিলুম। অকস্মাৎ ওঁর আবির্ভাব ঘটল এক সময়। হ্যাঁ, ইনি সেই ব্যক্তি, সেই বিশাল পুরুষ। সেই ভ্রূভঙ্গী, সেই ঔদাসীন্য, সেই নির্লিপ্ততা। কিন্তু এবার তাঁর পোশাক অন্য রকম। পায়ে স্যাণ্ডাল, পরনে খদ্দরের ধুতি, চুড়িদার ছিটের সেই দীর্ঘলম্বিত পানজাবি

এবং পিঠের দিক থেকে সামনের দিকে টানা বাসন্তী রংয়ের একখানা মোটা খদ্দরের চাদর। তখন ডিসেম্বর মাস। উনি পথের দিকে চেয়ে কি দেখছিলেন জানিনে। হয়ত জনস্রোত, হয়ত জীবন, হয়ত বা কোনও দূর অতীত বা ভবিষ্যৎ। কিন্তু আমার মনে এমন এক নৈবেদ্যর ডালা প্রস্তুত হচ্ছিল যা কোনদিন কারও জন্য সাজাই নি! উনি চা খেয়ে পয়সা দিয়ে এক সময় চলে গেলেন।

কিন্তু কে এই অনন্যসাধারণ পুরুষ! হাজার হাজার মানুষের মধ্যে এঁর মাথা উঁচু হয়! লক্ষ মানুষের মধ্যে কে এই একক?

আরেকদিন ওঁকে দেখলুম শ্যামবাজারের বাজারের ফুটপাথটা যেখানে এসে ভবনাথ সেন স্ট্রীটে শেষ হয়েছে—যার দোতলার মস্ত হলঘরটি শিশিরবাবু ভাড়া নিয়েছেন তাঁর থিয়েটারের রিহার্সালের জন্য। ওই হলে, আমি গিয়েছিলুম শিশিরবাবুর কাছে বিশেষ কারণে। হঠাৎ ফিরে দেখি সেই উনি! আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকালুম। উনি উদাসীন—ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে অন্য দিকে চলে গেলেন।

আমার বন্ধু কালী মাস্টার নিয়ে গেল আমাকে কুচবিহারের কালীবাড়ি ছাড়িয়ে কয়েক পা গিয়ে বাঁ হাতি ফরিদপুরার গলিতে। গলির প্রান্তে একটি বটগাছের ডালপালা নেমেছে, তার অপর প্রান্তে একটি ছোট মসজিদ এবং ছোট ছোট বালকদের জন্য একটি মাদ্রাসা বিদ্যালয়। এই গলি এঁকে বেঁকে গিয়েছে সোনারপুরায়। এই গলিরই কোণের দোতলা বাড়ির নিচের তলাকার ঘরে কালী মাস্টার আমাকে এনে তুলল। ঘরে ঢুকেই দেখি, সেই তিনি!

কালী বলল, এই দেখুন সুধাদা, কাকে এনেছি! এ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আজকাল বেশ গল্প লিখছে—

আমি এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিলুম। উনি আমার প্রতি একবার মর্মচ্ছেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে নস্য নিলেন। নস্যের গুঁড়ো পড়ছে ওঁর হাতকাটা ফতুয়ায়, কিন্তু সেদিকে ওঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাকে দেখে হঠাৎ ওঁর এল প্রবল উত্তেজনা, ফলে উনি প্রবলতর কণ্ঠে হাঁক দিলেন, বিরিজলাল— ?

জনৈক হিন্দুস্থানী ছোকরা ভিতর থেকে ছুটে এল। উনি চায়ের অর্ডার দিলেন। আমার পরে এল কেদার, তার সঙ্গে প্রফুল্ল। অতঃপর এল হাস্যমুখর পরিহাসরসিক অপূর্ব ভটচায্যি। সুরেশ চক্রবর্তী একবার এসে ঘুরে গেল।

শুনলুম গত তিন-চারদিন থেকে ওয়েলস-এর 'আউট-লাইন অব ওয়ার্লড হিসটরি' নিয়ে আলোচনা চলছে! কথাপ্রসঙ্গে এসেছেন বার্নার্ড শ, ফ্যাবিয়ান সোস্যালিজম, ওই সঙ্গে প্রফেসর রাধাকৃষ্ণনের 'ফিলজফি অফ রবীন্দ্রনাথ', তার সঙ্গে উঠল ভাইকাউণ্ট স্যামুয়েলের শেষ গ্রন্থের আলোচনা। কথায় কথায় এল শেকসপীয়র, শেলী, মিড-ভিকটোরিয়ান যুগের ডিকেন্স এবং একালের মেজফিল্ড ও চার্চিলের 'রেটরিক'।

আমরা সবাই তরুণ-বয়স্ক শ্রোতা, আর সুধাদা নিজেই বক্তা, তার্কিক, উচ্চকণ্ঠ ও বিবদমান। সর্বশেষে আসেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ আদ্যোপান্ত সুধাদার মুখস্থ। "বিবাগী মনের ভাবনা ফাল্গুন রাতে/উড়ে চলে মোর উৎসুক বেদনাতে—"

অক্টোবরের মধুর স্নিগ্ধ হাওয়া উঠেছে কাশীতে। নীল নির্মল আকাশ যেন মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে দুগ্ধশুভ্র মেঘদলের রোমাঞ্চ স্পর্শে। দুর্গাপূজার দিন আসন্ন। মহালয়ার তর্পণ শেষ হয়ে গেল বাঙ্গালীটোলার ঘাটে ঘাটে। ঘাটগুলোর থেকে মাটি ও কাদা এখনও সরে নি, তাই গোড়েন ঘাট থেকে সোজা ঘাটের পথ ধরে এখনও দশাশ্বমেধ পৌছনো যায় না। সুধাদা আমাদের দলের নেতা, ওঁর সঙ্গে আমরা দল বেঁধে সড়ক দিয়ে সোজা যাই গোধোলিয়ায়, তারপর দশাশ্বমেধের দিকে। মাঝপথে 'পার্বতী আশ্রম'-এর নিচে সুরেশ মুখুজ্যের ওষুধের ডিপো, তার পাশে হরিবাবুর নতুন চায়ের দোকান—রাস্তার ওপার থেকে হরিবাবু এপারে ঘর নিয়েছেন। ওঁর দোকানে চা খেয়ে সেই দশাশ্বমেধের কালীতলার কাছে হরকুমারের বইয়ের দোকান। ওখানে কয়েক-খানা লোহার চেয়ার টেনে নিয়ে সকাল দশটা থেকে আড্ডা আরম্ভ। চলত প্রায় বেলা দেড়টা দুটো পর্যন্ত।

ওই মধুর-প্রকৃতি হরকুমারের বই-কাগজের দোকানে সুধাদার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে যেতেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—যাঁর একার খরচ ছিল মাসে পাঁচশ' টাকা, যাঁর জন্য রাজসিক রান্না করত এক গোয়ানীজ পাচক, এবং যাঁর নিরঙ্কুশ অশ্লীল পরিহাস হাসির ফোয়ারা ছোটাত! আসতেন প্রতিষ্ঠাবান লেখক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ওরফে সকলের 'বুড়োদা'। আসতেন গা-ঢাকা বিপ্লবী শান্তি চক্রবর্তী এবং মেদিনীপুরের বিপ্লববাদী নেতা যোগজীবন ঘোষ। আসতেন মহেন্দ্রচন্দ্র রায়—যিনি যোহান বোয়ারের 'গ্রেট হাঙ্গার'-এর অনুবাদ করেছেন 'পরম তৃষা' নাম দিয়ে। 'হাঙ্গার' মানে 'তৃষা' নয়—এটি তাঁকে বোঝানো যায়নি! ওঁদের সঙ্গেই এসে ঘুরে যেতেন প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়—

যিনি 'আনন্দসুন্দর ঠাকুর' নামে এখানে-ওখানে সাহিত্য সমালোচনা লেখেন। আমাদের মধ্যে কেদার ও প্রফুল্লর পিছনে দিনরাত গোয়েন্দার খরদৃষ্টি থাকে! সম্প্রতি লখনৌর দিকে কাকোরির কাছে ট্রেন-ডাকাতি হয়ে গেছে, তার জন্য হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টির শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগেশ চাটুয্যে, মন্মথ গুপ্ত, যশপাল, প্রতুল গাঙ্গুলী, আমাদের জিতেনদার ছোট ভাই রাজেন লাহিড়ী—এঁরা ধরা পড়েছেন! অন্যতম প্রধান আসামী শচীন বক্সী পলাতক। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। এই ঘটনার প্রায় আট বছর পর কারাগার থেকে 'বন্দী জীবন'-এর লেখক শচীন সান্যাল আমাকে কয়েকখানি পত্র লেখেন। তিনি কাকোরি ষড়যন্ত্রের নেতা এবং আমার মীরাটের বন্ধু ও লেখক প্রিয়কুমার গোস্বামীর শ্যালক! কিন্তু এসব পরের কথা।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সেইকালে আমরা তন্ময় হয়ে থাকতুম। গায়কের মধ্যে পঙ্কজ মল্লিক, গায়িকাদের মধ্যে কনক দাস আর ইন্দুলেখা ঘোষ। ইন্দুলেখা তখন রবীন্দ্রনাথের খুবই প্রিয় এবং তিনি আমাদের কাশীরই এক বন্ধু, শান্তির সহোদরা। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে সুরেশ চক্রবর্তীর ভেলুপুরার বাড়ীর একতলার ছাদে সুধাদার সামনে বসে কনক দাসের রেকর্ডের গান "না, না গো না/করো না ভাবনা/যদি বা নিশি যায় যাব না যাব না—"। ইন্দুলেখার "রোদন-ভরা এ বসন্ত"। ওই সঙ্গে রেণুকা সেনগুপ্তার "ওহে গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল" অথবা "পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ—"। রেণুকা হলেন অতুলপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

ওই চন্দ্রহাস রাত্রে সঙ্গীতের সুরমূর্ছনার আলো-ছায়াপথ ধরে শাসন-বাঁধনহীন দিশাহারা আমরা যেন সবাই শ্বেতপক্ষ বিস্তার করে রাজহংস বলাকার মতো উড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতুম দূর গগনের অনন্ত শূন্যে ক্রন্দসের সকল সীমা ছাড়িয়ে এক বৈকুণ্ঠলোকে!

যাক, আর আমার কোনও দুশ্চিন্তা নেই! আমার সুদূর ও অদূর ভবিষ্যৎ আমি এবার স্থির করে ফেলেছি। অতঃপর আমি কাশীবাস করব! তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশী ছাড়া আর কিছু ভাবব না। সেদিন রেউড়িতলায় আমাদের সকলের দাদামশায় ও পরিহাসরসিক প্রসিদ্ধ লেখক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে বলে এলুম, আর কোথাও নয়, দাদামশাই। আপনার 'কাশীর কিঞ্চিৎ' পড়ে আমি মুগ্ধ। এখানেই যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে বাবা বিশ্বনাথের পা ধরে পড়ে থাকব!

—মন্দ আইডিয়া নয়, ঐহিক পারমার্থিক দুই হবে।—দাদামশায় হাসলেন,

—কিন্তু কি জানো, মানুষের জীবনে যৌবন হল সর্বশ্রেষ্ঠ কাল, সেই কালটাকে সবাই বলে "বয়স খারাপ।" তোমার বয়স খারাপের জন্য কালভৈরব তাড়া করবেন না ত ?

আমার সঙ্গে কালীমাস্টার ছিল। দাদামশায়ের ইঙ্গিত বুঝে আমরা দুই কৌমার্য ব্রতধারী যুবক উচ্চরোলে হেসে উঠলুম। তখন মাসিক বসুমতী ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় দাদামশায়ের দুটি সরস উপন্যাস ছাপা হচ্ছিল।

আমাদের বড়বাড়ি তখন জমজমাট। উপরতলায় থাকেন নিঃসন্তানা গৃহকর্ত্রী তাঁর মোতি-নামিকা বৈষ্ণবী ঝিকে নিয়ে। নিচের তলায় শিবমন্দিরের পাশে আমরা সবাই। নিচের তলাটা মস্ত। মোট ছখানা ঘর। দুখানা বড় ঘরে দুই মাসির পরিবার: তাঁরাও বিধবা। দুই মাসতুতো ভাই, এক বউ আর দুই বাচ্চা। দুই ভগ্নী প্রায়ই এসে থাকে—তাদেরও ছেলেমেয়ে। এ ছাড়া দিদিমা। আমার নিজের ভাগ্নী বুলি, সেও আছে। বুলির বিয়ে হয়েছে আমার এখানকার মাসতুতো দিদির সতীনপো গোপালের সঙ্গে গত বছর শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে। বিয়ে হয় বরানগর পালপাড়ায়। সেদিন সন্ধ্যায় ছিল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির প্রাকৃতিক তাণ্ডব। বর আমার সম্পর্কে ভাগ্নে, কনে হল ভাগ্নী। আমাদের বাড়ী বেলগাছিয়া থেকে বর যাবে পালপাড়ায়, কিন্তু সকল পথেই কোমর অবধি জল। তার ওপর বড় বড় গাছ পড়ে গিয়ে সকল পথ রুদ্ধ। ওদিকে লগ্ন বুঝি বয়ে যায়, আর এদিকে রুদ্রচণ্ডা প্রকৃতি! গাড়ি ঘোড়া ট্রাম ট্যাক্সি—সমস্ত বন্ধ। ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছা নয়, আজ বুলির বিয়ে হোক! নির্দিষ্ট লগ্ন যথাকালে বয়ে গেল। বর-কনে দূরসম্পর্কের ভাইবোন, এবং উভয়ের একই গোত্র। ছেলেটা বাঙ্গালী হয়েও অধিকাংশ হিন্দুস্থানী, বয়স বছর পঁচিশ, চাকরি করে মধ্যপ্রদেশে রায়পুর জঙ্গলে,—অ্যাসিস্ট্যান্ট ফরেস্ট রেঞ্জার।

রাত এগারোটার পর আমিই কোমর বাঁধলুম। কোথায় কোথায় জল নেমেছে খবর নিলুম। দশগুণ ভাড়া কবুল করে এক ট্যাক্সি নিয়ে এলুম। শেষ লগ্ন রাত দেড়টা থেকে আড়াইটে। তাই সই। দরকার হলে কোথাও থেকে জল ভাঙতে ভাঙতে হেঁটে যাব। বৃষ্টি একটু কমেছে। নাও, এবার ওঠো গোপাল, মালা পরো, টোপর মাথায় দাও। শাঁখ বাজাও তোমরা। ওঠো গাড়িতে। বরযাত্রী কেউ নেই। শুধু পুরুত, নাপিত আর আমি।

তিন থেকে চার মাইল পথ, ট্যাক্সিতে সাধারণত মিনিট পনেরো লাগে।

কিন্তু যে পথেই গাড়ী যায় সেই পথ বন্ধ। পথের সব গ্যাসের আলো নষ্ট হয়ে গেছে, সব দিক ঘন অন্ধকার। বেলগাছিয়া থেকে পাতিপুকুর—তারপর পথ বন্ধ। পাইকপাড়া থেকে ঘুঘুডাঙ্গা—ওদিকটা বন্ধ। মোতিঝিল, গোরাবাজার, যশোর রোড—তারপর আর গাড়ী যায় না! বেলঘরের পথ দুঃসাধ্য। বনহুগলি থেকে নওয়াপাড়া বন্ধ। সুতরাং আবার ফিরে এলুম। এবার সাহস করে চললুম শ্যামবাজার আর টালার পুল পেরিয়ে। লালাবাবুর গির্জা ছাড়িয়ে বড়জোর চিঁড়িয়ার মোড়। তারপর শিখ ড্রাইভার বলল, গাছ পড়ে পথ বন্ধ। পাশে নালা। গাড়ি আর যাবে না। গাড়ি থেমে গেল।

—গোপাল, নেমে এসো ত? এই বলে আমি নিজেই জলের মধ্যে নামলুম।

গোপাল তৎক্ষণাৎ রাজি। সে কাঠখোট্টা, হিন্দুস্থানী মেজাজ তার, তার শরীরের মাংসপেশী দেখলে ভয়ে গা ছমছম করে। সে গাড়ির মধ্যেই টোপর, মালা, সিল্কের পাঞ্জাবি, গরদের ধুতি ও গায়ের গেঞ্জি—সব একে একে ছেড়ে তড়াং করে জলে ঝাঁপ দিল। হাঁটুজল ভেঙ্গে গিয়ে সে প্রকাণ্ড অশ্বত্থের বড় বড় শাখা নড়াতে লাগল। ঘন অন্ধকার চারিদিক। গোপালের পরনে শুধু লজ্জানিবারণী একটি জাঙ্গিয়া। তার কুস্তি পালোয়ানের চেহারা দেখে শিখ ড্রাইভার কিছুটা আড়ষ্ট। আমি সেই সুযোগ নিয়ে ড্রাইভারকে হুকুম করলুম, সর্দারজি, আইয়ে। জেরা হাত লাগাইয়ে—

এবার আমরা তিনজন। প্রাণপণ শক্তিতে গাছের ডাল কিছু কিছু সরালুম। গাড়ি পেরিয়ে যাবার মতো ফুট দশেক ফাঁক হল। আমার কাপড় জামা ভিজে থকথক করছিল। কিন্তু গোপালের পক্ষে আর সাজসজ্জা করা সম্ভব হল না। গাড়ি এবার হাঁসফাঁস আওয়াজ তুলে ধীরে ধীরে জল ভেঙ্গে চলতে লাগল।

সিঁথি-বরানগর ছাড়িয়ে প্রায় টবিন রোডের মোড়ে এসে গাড়ি আবার বন্ধ হয়ে গেল। যাঃ, এবার সর্বনাশ! প্রায় কূলের কাছাকাছি এসে ভরাডুবি! মেসিনে নাকি জল ঢুকেছে। আরেকটু গেলেই ডানহাতি বামুনপাড়া লেন। রাত একটা।

—গোপাল, যদি সুন্দরী বউ পেতে চাও, তবে পিছন থেকে গাড়ি ঠেলো!

শুধু হুকুমের অপেক্ষা। জাঙ্গিয়াপরা গোপাল সেই জলের মধ্যে হাসিমুখে আবার নেমে এসে বলল, আমি একাই পারব, ছোটমামা—তুমি গাড়িতেই থাকো।

গোপালের অপরিসীম শক্তি। সে ঠেলতে ঠেলতে গাড়ি নিয়ে এল, এবং

ড্রাইভার ডান দিকে ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে এ-গলির শেষ পূর্বপ্রান্তে গাড়ি আনল। এ-গলিতে জল দাঁড়ায়নি।

কনেপক্ষ জেনেই ছিল আজ বিয়ে হবে না! তারা সদর দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছে। ওদের পুরুত বাড়ি চলে গেছে। কিন্তু আমাদের শব্দ সাড়া পেয়ে ওরা এসে দরজা খুলল। হইচই উঠল। ওই ডামাডোলের মধ্যে ওরা মঙ্গলশঙ্খটা খুঁজে পেল না!

এদিকে বরপক্ষের নাপিত ব্যাটা ততক্ষণে জাঙ্গিয়াপরা কুস্তিগীর গোপালের মাথায় তাড়াতাড়ি টোপরটা তুলে দিয়ে গলায় মালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।

কে যেন বুলির ঘুম ভাঙ্গিয়ে ছিল। মস্ত বড় একতলা বাড়ির ওই প্রান্ত থেকে ছুটতে ছুটতে এসে সে আমাকে জাপটিয়ে ধরল। কচি কিশোরী মেয়ে। বয়স সবেমাত্র এগারো ছাড়িয়েছে। যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তেমনি সুন্দর মুখশ্রী। অন্য বোনদের তুলনায় ওর রং একটু চাপা। বুলির বয়স যখন মাত্র দশদিন, তখন ওর মা কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে জীবন-মৃত্যুর সমস্যা তোলে। সবাই যখন আঁতুড়ে-মেয়েটার মৃত্যুকামনা করছে, আমি তখন বাচ্চাটাকে বের করে এনে পল্‌তের সাহায্যে ওকে দুধ খাওয়াতুম! তখন আমরা চাল্‌তাবাগানে যুগলকিশোর দাসের গলিতে থাকি। ওর চারিদিকে যখন মৃত্যুকামনা চলছে, তখন আমার কোলে-পিঠে বাচ্চাটা বড় হচ্ছিল। আমার বয়স তখন এগারো। এক বছর অবধি ওর মা রইল শয্যাগত, আর বুলি হয়ে উঠল আমার খেলার সামগ্রী। যখন সুন্দর কণ্ঠে হেসে উঠত, আমি ওর নাম দিতুম 'বুলবুলি'! ওইটুকু বয়সের বেশির ভাগ আমাদের বাড়িতেই ওর কেটেছে। মেয়েটা অতিশয় দুরন্ত বলেই আমাদের সকলের প্রিয় ছিল।

পোষা বাচ্চা কুকুর যেমন প্রভুর গায়ে গা ঘষড়িয়ে আদর জানায় বুলি তেমনি করে আমার গায়ে তার মুখখানা রগড়াচ্ছিল। আমি সকৌতুকে বললুম, এ কি রে, এত কাঁদছিস কেন? ভাবছিলি বিয়েটা বোধ হয় ভেস্তে গেল, তাই না?

বুলি আরও বেশি কেঁদে বলল, বেশ করব কাঁদবো!

আমি ওর পিঠ চাপড়িয়ে বললুম, পোড়ারমুখি, বিয়ের আগে কেউ কাঁদে? কাল যখন বর-কনে বিদেয় হবে, তখন কাঁদবি! আবার হাসবি ফুলশয্যায়। যা শিগগির, এখনই লগ্ন আরম্ভ!

বুলি কেঁদে বলল, নাই বা হত বিয়ে? তুমি কেন এত রাত্তিরে ভিজতে ভিজতে এলে?

আমি ওকে এবার ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলুম। বুলি কাঁদতে কাঁদতে বিয়ের জন্য প্রস্তুত হতে গেল।

শেষ লগ্নে বিয়ে। আগামী কাল ভাদ্র মাস। বুলি কাঁদছিল বটে, কিন্তু জীবনবিধাতা অন্তরীক্ষে আমার দিকে চেয়ে বোধ হয় কৌতুকরঙ্গে হাসছিলেন! বুলির জীবনের শোচনীয় পরিণাম সেদিন আমার সকল কল্পনার অতীত ছিল।

তবু এ বিয়ে হল। বিয়েতে উৎসবের আনন্দ কেউ পেল না। সবাই যেন অবসন্ন ক্লান্ত। আজ বিয়ে হবে না, এইটিই সবাই ধরে নিয়েছিল।

রাত তিনটের সময় খাবার রুচি অনেকেরই চলে গেছে। আর খাবেই বা কি? ছোলার ডালে ফেনা উঠেছে, সমস্ত মাছের কড়াইতে পচ ধরেছে। নরম সন্দেশ থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়েছে, দই-তে আমলাটে গন্ধ।

বিয়ের পর বর-কনে বাসরে উঠল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। আসছে কাল এখান থেকেই বর-কনে সন্ধ্যার গাড়িতে কাশী রওনা হবে।

কাশীর কথাতেই আবার ফিরে আসি। গত বছর শীতকালে বোধ হয় মীরাটে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন বসেছিল। শরৎ চাটুয্যে মশায় ছিলেন মূল সভাপতি। ফিরবার পথে শরৎচন্দ্রকে কাশীতে ধরে আনে 'উত্তরা'র সুরেশ। কয়েক দিন তিনি কাশীতে কাটিয়ে যান। তখন শীতের গঙ্গায় ভাঁটা পড়েছে। ঘাটগুলি সব জেগে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের পরিভ্রমণের সঙ্গীরা সবাই আমাদেরই বন্ধু। সুরেশ, কালীমাস্টার, অপূর্ব, কেদার, প্রফুল্ল, নরেন এবং আরও অনেকে। ওরা সবাই দল বেঁধে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে এখানে-ওখানে যেত।

ঘাটে ঘাটে রৌদ্রে ঘুরে বেড়ানো বড় মধুর লাগে। সেদিন শরৎচন্দ্র গোড়েন ঘাটের ধার দিয়ে সদলবলে পেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক গৈরিকবসন গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত প্রবীণ বয়স্ক ব্যক্তি স্নানের ঘাটে নামছিলেন। তিনি এখানকার কোন্ মঠে ব্রহ্মচারী আনন্দস্বরূপ নামে প্রখ্যাত। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন শিষ্যসেবকও ঘাটে নেমে যাচ্ছিলেন।

কাছাকাছি এসে শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারীর দিকে চেয়ে সহসা থমকিয়ে দাঁড়ালেন।
—আরে, তুমি না সেই আমাদের মণিমোহন?

ব্রহ্মচারীও থমকিয়ে গেলেন। শান্ত দৈব হাসি হেসে বললেন, তুমি না সেই নেড়ু? কাশী এলে কবে?

—এই ত এরা সব ধরে এনেছে আমাকে ভাই।—শরৎচন্দ্র বললেন, তাই

ত অনেক দিন পরে দেখছি তোমাকে। কত দিনের কত কথা মনে পড়ছে!

এরা ওরা সবাই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে গেল। জাতশিল্পী শরৎচন্দ্র বোধ হয় সেদিনের মধুর রৌদ্রে একটু খোসমেজাজেই ছিলেন। হয়ত একটু সকৌতুক, দুষ্টবুদ্ধি তাঁকে পেয়ে বসে থাকবে। তিনি বললেন, বড় আনন্দ পেলুম তোমাকে দেখে হে। বাণপ্রস্থ নিয়েছ মনে হচ্ছে! সেসব দিনের কথা তোমার মনে আছে মণি?

ব্রহ্মচারী সহাস্যে ঘাড় নেড়ে বললেন, কিছু কিছু—।

শরৎচন্দ্র বললেন, ওঃ তুমি খেতে পারতে বটে! মনে পড়ছে, বিনি-ময়রানির ঘরে আমাদের সেই আড্ডা? বিনি তোমাকে চাঁদু বলে ডাকত। তুমি ছিলে একেবারে মদের পিপে!

শ্রোতারা সবাই আড়ষ্ট। স্বয়ং ব্রহ্মচারী আনন্দস্বরূপ স্তব্ধ ও বিমূঢ়। পুরনো বন্ধুকে পেয়ে শরৎচন্দ্র উচ্ছ্বসিত আনন্দে স্মৃতিচারণ করছিলেন, অন্য দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। কিন্তু এই সূত্রে কাশীবাসী একজন সংসারত্যাগী সাধক তাঁর শিষ্যসেবকদের কাছে চিরকালের জন্য হয়ত কৌতুকের পাত্র হয়ে গেলেন!

শরৎচন্দ্রের ডাকনাম ছিল ন্যাড়া!

কথায় কথায় অন্য প্রসঙ্গে এসে পড়েছিলুম। যাই হোক, সেই বুলি—যার বিয়েতে গাছ, পাথর ও কলকাতার সমুদ্র ঠেলতে হয়েছিল, সেই বুলিও এই বড়বাড়িতে রয়েছে। গোপাল সেই যে ফুলশয্যা-বউভাতের রাত্রে টেলিগ্রাম পেয়ে রায়পুরে তার চাকরিস্থলে চলে গেছে, এই পনেরো মাসের মধ্যে সে আর আসে নি। তার অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ, আসবার উপায় নেই। তবে কথা আছে, এই ইংরেজি বছরের মধ্যেই সে একবার এসে বুলিকে নিয়ে যাবে। একদিন আড়াল থেকে কান খাড়া করে শুনলুম, বড় বউদিদি বলছেন দিদিকে চাপা গলায়,—আর নিয়েই বা যাবে কেন? তোমার পুত্রবধূর এখনও 'মাসিকই' আরম্ভ হয়নি যে!

কথাটা আমার কাছে সেদিন যথেষ্ট বোধগম্য হয়নি!

এটা আমার মাসির বাড়ি, কিন্তু বুলির একপক্ষে শ্বশুরবাড়ি। দেবনাথপুরার অন্ধকার এক গলির মধ্যে তার চেয়েও এক অন্ধকার জরাজীর্ণ তেতলা বাড়ি হল দিদির নিজের বাড়ি। প্রাতঃস্মরণীয়া রানী ভবানীর হাত থেকে দিদির স্বামী গোবর্ধন মৈত্র মশায়ের কোন পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা হিসাবে এ বাড়ি পেয়েছিলেন। এরই দোতলায় গোবর্ধনবাবুর বড় বোন শুচিবায়ুগ্রস্তা বৃদ্ধা বিধবা রাজলক্ষ্মী ও নিচের তলাকার ঘুটঘুটি অন্ধকার একখানি ঘরে আরেক প্রবীণা বিধবা সহোদরা গিরিবালা বাস করেন। তেতলাটা গোবর্ধনবাবুর। তিনি মধ্যপ্রদেশের রেলওয়েতে আর-এম-এস-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। বেশ ভাল চাকরি। তখন দিদিরা থাকত ঝাঁসীতে। কিন্তু তখন বিলেতী মদের বড় বোতলের দাম ছিল সাড়ে চার টাকা! ফলে, অধস্তন কর্মচারীরা গোবর্ধনবাবুকে প্রায়ই পাঁজাকোলা করে বেলা বারোটায় গাড়ি থেকে নামতো! এর পরিণামে তাঁকে অকালে কর্মচ্যুত করে সামান্য মাসিক পেন্‌সন্ দিয়ে সরানো হয়। এখন তিনি আফিঙ ধরে আনন্দে আছেন। শ্যালকরা সকলেই তাঁর প্রিয়। যাই হোক, মানুষটি কিন্তু অতি অমায়িক এবং মিষ্ট প্রকৃতির। আমি ওঁর পান-সুঁতির কৌটোয় ভাগ বসাতুম। দিদি ওঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী।

কাশীবাস করা যখন সম্পূর্ণ স্থির করেছি, এবং বন্ধুমহলের চেষ্টায় যখন একটা যা হোক কাজকর্মের ফিকিরে এখানে-ওখানে ঘুরছি, তখন শ্রীরামপুর ডাকঘর থেকে একখানা সরকারী চিঠি ঠিকানা-কাটা অবস্থায় এসে হাজির। লিখছে,

তোমার অনুপস্থিতির জন্য কাজকর্মের অসুবিধা হচ্ছে। যেহেতু তোমার সার্ভিস রেকর্ড সন্তোষজনক, সেই হেতু তোমার অনুপস্থিতির কাল ছুটি হিসাবে মঞ্জুর করা হবে।—বাই অর্ডার, হিজিবিজি নাম সই।

চিঠিখানা ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিলুম।

কাশীবাসীরা কেউ চাকরিবাকরি করে না। শিক্ষকতা আছে, অধ্যাপনা আছে, এক-আধটা বীমা কোম্পানী আছে,—কিন্তু কলকাতার মতন পাঁচরকম সওদাগরি চাকরি বলতে বিশেষ কিছু নেই। বন্ধুবর ননী পোস্টাপিসে আমারই মতন কাজ করে। কালী পড়ায় অ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুলে। কেদার প্রফুল্ল বেকার। আমার এক ভাই প্রভাসও বেকার। কিশোরদাদা বাঙ্গালী-টোলা হাই স্কুলে পড়ান। বাঙ্গালী গৃহস্থের সংসার চলে হয় পেন্‌সনে আর নয়ত মনি অর্ডারে! শুধু আমার অন্যতম স্থানীয় ভগ্নিপতি হলেন হোমিওপ্যাথী ডাক্তার। আমার ভগ্নি তাঁর তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী। মেয়েরা তৎকালে বাঁচতে জানত না, পুরুষদেরকে তাই বার বার বিয়ে করতে হত!

কথাটা কিন্তু সব সময় সত্য নয়। ক্ষিতুরি বুড়ি পঁয়তাল্লিশ বছর আগে বিধবা হয়েছে, রাজলক্ষ্মী ওরফে রাঙ্গাদিদি তিপ্পান্ন বছর আগে স্বামী খুইয়েছেন, গিরিবালার স্বামী মরেছে ওর বয়স তখন দশ বছর। আমি যখন পা টিপে টিপে গোবর্ধনবাবুর তেতলায় উঠতুম, তখন দোতলার অন্ধকার কোণটায় শুচিবায়ুগ্রস্তা বৃদ্ধা রাঙ্গাদিদি উলঙ্গ অবস্থায় নিজের হবিষ্যান্ন প্রস্তুতে অন্যমনস্ক থাকতেন। তাঁর একখানি মাত্র থানধুতি, সেখানা শুকোচ্ছে! তাঁর বিশ্বাস, অন্নমাত্রই অশুচি, এই অন্ন খেয়ে শুধু প্রাণধারণ করা এই মাত্র। আহারাদির পর এঁটো হাতে তেমনি উলঙ্গ অবস্থায় কী শীত কী গ্রীষ্ম—ঠাণ্ডা মেঝের উপর তিনি পড়ে থাকেন। সন্ধ্যাবেলা সেই হাতে সামান্য মিষ্টিমুখ করে আরেকবার স্নান সেরে তবে শুকনো কাপড় পরেন। সমস্ত দুই হাতে, দুই পায়ে তাঁর হাজা, মুখের দুই পাশে ঘা। নিষ্ঠাবতী বিধবার ইতিহাস এই।

সুধাদার ওখানে চলছে রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাখ্যা, বেদান্ত দর্শন, পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্রমবিকাশ, বার্নার্ড শ'র সঙ্গে ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের বিতর্ক। ওঁর ওখানে আসছে শান্তি ঘোষ, আমাদের নরেন, কেশব, প্রবোধ চাটুজ্যে, মহেন্দ্র রায়, যোগজীবনদা,—ওই সঙ্গে আমরা ত আছিই। সকাল আটটা থেকে বেলা দুটো, বিকাল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা। সুধাদার নিত্যনূতন ভাষ্য, নিত্য-নূতন অভিব্যক্তি। তাঁর ঘরে স্তূপাকার বিভিন্ন দেশের মোটা মোটা গ্রন্থ, বিভিন্ন ইংরেজী সব সাময়িক পত্র। কাশীর কারমাইকেল লাইব্রেরী থেকে তাঁর

জন্য বহু রকমের বই আসে, কলকাতার 'ইম্পিরিয়ল' লাইব্রেরী তাঁর কাছে বইয়ের পার্সেল পাঠায়।

এমনি একটা সময় বড়বাড়ির কর্ত্রী এবং পরলোকগত রায়বাহাদুরের আত্মাভিমানিনী স্ত্রী ওরফে আমার মেজমাসিমা আমাকে নিচের তলা থেকে একদিন ডেকে পাঠালেন। আমি সাধারণত ওঁকে এড়িয়ে চলি। নিজের সম্পদ এবং অর্থকৌলীন্য সম্বন্ধে উনি বিশেষ সচেতন, সেটি আমার পছন্দ নয়।

উপরতলায় উঠে এলুম। উনি বললেন, একটি কথার জন্য তোমায় ডেকেছি। এই বেঞ্চিখানায় বসো।

বসে পড়ে বললুম, কি বলুন ?

উনি বললেন, তোমার জন্য পাকা পেঁপে আর খোয়ার সন্দেশ রেখেছি, তুমি খাও।

তৎক্ষণাৎ মিছে কথা বললুম, আমি এই দু'মিনিট আগে খেয়েছি। এখন থাক, পরে খাব।

উনি একটু থতিয়ে গেলেন। কিন্তু তখনই আমার দিকে ফিরে বললেন, তুমি ত কোনদিন কিছু চাও নি আমার কাছে ? একখানি গরম চাদর তোমাকে আমি কিনে দেবো।

এবার আমি হেসে ফেললুম। বললুম, এখন একটুও শীত পড়ে নি, চাদর নিয়ে কি করব ? আপনি ডেকেছেন কেন, এবার বলুন।

উনি বললেন, শোনো বলি। তুমি আমার কথা রাখবে এই মনে করেই তোমাকে ডেকেছি। আমি যদি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থ করতে যাই, তোমার মা বিশু কি আপত্তি করবেন ?

ওঁর কথাবার্তার ভঙ্গী এবং ভাষা ঠিক মাসিজনোচিত নয়। এ যেন আপিসের বড় সাহেব তাঁর কনিষ্ঠ কেরানীকে ডেকে অনুজ্ঞা জানাচ্ছেন! আমি বললুম, আপনি তাঁকে চিঠি লিখে জেনে নিতে পারেন। তবে আমার বিশ্বাস, কিশোরদাদা অথবা প্রভাস—এদের যে কেউ আমার চেয়ে যোগ্যতর হবে।

ওঁর তীর্থযাত্রার প্রস্তাবটি আমার পক্ষে লোভনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু উনি বোধ হয় বিশ্বাস করেছিলেন, ওঁর অনুরোধ মাত্রই আমি নেচে উঠব! এবার উনি বললেন, আচ্ছা, আমি তবে আরেকটু ভাববার সময় নিই, কেমন ?

আমি সহাস্যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলুম।

আমার প্রস্তাবটি উনি নেননি। কিন্তু আমাকে না জানিয়ে সেইদিনই উনি কলকাতায় মাকে চিঠি দিয়েছিলেন, এবং চার দিনের দিন সে-চিঠির জবাব

এসেছে। পাঁচ দিনের দিন সকালে উনি নিজেই নিচে নেমে এসে আমাকে ডাকলেন। বললেন, বিশু লিখেছে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে তার কোনও আপত্তি নেই। তা হলে কি আমি দিনস্থির করব?

—করুন।—আমি সহাস্যে জবাব দিলুম। বুঝতে পারা গেল, আমাকেই উনি সঙ্গে নিতে চান।

ওঁর পক্ষে প্রস্তুত হতে সপ্তাহখানেক লাগল। কিন্তু আমি সর্বহারা, আমার কিচ্ছু নেই। আমার বাক্স-বিছানা, কাপড়জামা—সমস্তগুলো দিয়ে এসেছি শ্রীরামপুরের সেই হাতকাটা পঞ্চাননকে। এ ছাড়া ছেনুমাসির সংসারে রোজ প্রায় চার আনার শাকসব্জির বাজার করে দিই—সে-বাজার প্রচুর। আলু, বেগুন, নতুন ফুলকপি, বান্‌ডা কচু, সাদা মূলো, পালঙ শাক—অজস্র। মাছ, মাংস, পেঁয়াজ—এ মহলে নিষিদ্ধ। ডিম খেতে গেলে সেই দশাশ্বমেধের দিকে হরিবাবুর দোকান! সকালের দিকে গঙ্গাস্নান, পুজো-আর্চা, শিবের জন্য নৈবেদ্যর আয়োজন, জপ-আহ্নিক—সুতরাং সকালে জলযোগের কথাই ওঠে না। বেলা সাড়ে দশটার পরে উনুন ধরানো হয়। মধ্যাহ্নভোজন বেলা সেই দুটোয়। বাঙ্গালীটোলার সব বাড়িতে এই একই রীতি। আমাদের এখানে কচি মেয়ে শুধু বুলি। তাই বড় বউদিদি সকালের দিকে বুলিকে ডেকে নেন নিজের ঘরে।

আমি আছি তাই বুলির দৌরাত্ম্য অব্যাহত। দেবনাথপুরার বাড়িতে সে থাকতে চায় না,—সে-বাড়ি একেবারে খাঁচা। তাই গোবর্ধনবাবু ওকে এখানে প্রায়ই রেখে যান। বুলি এবাড়ি-ওবাড়ির বউ বটে, কিন্তু মূলত সে নাতনী। সেজন্য তার দুষ্টামিটা মাঝে মাঝে নষ্টামিতে পরিণত হয়। এটা ভাঙ্গছে, ওটা ফেলছে, সেটা ছড়িয়ে দিচ্ছে—তার জ্বালায় সবাই অস্থির। আমাকে দেখলে সে যেন আরও বাড়ায়। সকালের দিকে বাঁদরের পাল আসে, বুলি অমনি ছোটে লাঠি নিয়ে। ওর সুন্দর চেহারা ও বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, তার ওপর আনন্দের কল-কোলাহলে সমস্ত বাড়িটাকে মুখর করে রাখে,—বুলি তাই সকলের প্রিয়। কিন্তু আসলে মেয়েটা অতি মূর্খ, তাই নিজের জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সকলকে জ্বালিয়ে তোলে। কৌতুকের বিষয় এই, উপরতলার মেজদিদিমার কাছে বুলি প্রচুর প্রশ্রয় পায়। বুলি তাঁর খুবই প্রিয়।

বুলির খুবই ইচ্ছা, আমি তীর্থে যাবার আগে ওকে কলকাতায় রেখে আসি। কিন্তু ও যে এক পরিবারের পুত্রবধূ, একথা ওর মনে থাকে না। হয়ত এই নাবালিকার যৌগিক দৃষ্টি আমার দূরদৃষ্টিকে ছাড়িয়ে কোনও ভীষণতর ভবিষ্যৎকে

সেদিন দেখে থাকবে। কিন্তু আমার যাবার দিনে সে যখন কাঁদতে বসল, আমি চোখ পাকিয়ে তাড়না করে বললুম, ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে আমার সামনে কাঁদলে এবার এক থাপ্পড় দেবো। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে!

চোখের জলসুদ্ধ মুখ তুলে বুলি একবার আমাকে নিরীক্ষণ করল, তারপর ছুটে এসে আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে আমার পিঠে গুমগুম করে কিল বসিয়ে দিল।

আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন—এদের সম্বন্ধে মেজমাসীর রসবোধ নেই। তা ছাড়া আরেক কথাও আছে। তাঁর অন্যান্য বোনেরা যে-সকল অঞ্চলে তাঁর আগে এসে ঘুরে গেছেন সেসব অঞ্চল উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। তিনি রায়বাহাদুরের স্ত্রী, ওসব জায়গায় যাওয়া তাঁর প্রেসটিজে বাধে। তিনি জয়পুরে এসে নামলেন গোবিন্দজীর জন্য নয়, যশোরেশ্বরী কালীর জন্য। আম্বের দুর্গে নিতান্ত একটা মন্দির আছে তাই, নইলে আম্বেরে যেতেন না। গলতা ওঁর পক্ষে অর্থহীন। শুধু আমার অনুরোধে গিয়েছিলেন যাদুঘরে।

আজমেরে পুষ্কর-তুষ্করে উনি যেতে পারতেন, কিন্তু 'সাবিত্রী'কে পরিত্যাগ করলেন মরুপাথর আর পাহাড়ের ভয়ে। একদিন উনি বললেন, রাজা-রাজড়ার ঘরদোর আমি দেখতে আসি নি, বুঝেছ? ওতে আমার অরুচি। শুধু শিবের প্রতিষ্ঠে যেখানে আছে সেইখানে চলো।

শিব সর্বত্র, এই আমার ধারণা। বললুম, তা হলে যোধপুরে চলুন?

বেশ চলো।

যোধপুরে পৌছলুম। বাজারের দিকে ছিল শিব ও রাধাকৃষ্ণের মন্দির। উনি শিব দেখলেই খুশী। রাজবাড়ির বাইরে সেই পাথরের রেলিং-ঘেরা প্রাঙ্গণ থেকে মরুভূমির চেহারা দেখা বা লালপাথরের পাহাড়গুলো লক্ষ্য করা—এসবে ওঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। যোধপুর থেকে সেই মরুপথে বিকানের, আবার সেখান থেকে ফিরে মাড়োয়াড়--বার বার গাড়িবদল, হয়ত স্টেশনে রাত্রিবাস, হয়ত ধর্মশালা খুঁজে না পাওয়া, হয়ত বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্লাটফরমে কাটানো। যখন রাজকোট হয়ে দ্বারকায় এসে পৌছলুম তখন পনেরো দিন পেরিয়ে গেছে। এটি রুক্মিণীপুরী অর্থাৎ মূল দ্বারকা,—এখানে কাটল পাঁচ দিন। এখান থেকে ট্রেনে ভেট-দ্বারকা। সেটি সত্যভামাপুরী। সেই আরব সমুদ্রের খাঁড়ি পেরিয়ে যাতায়াত। ওটায় লাগল দুদিন। আবার ফিরে আসা রুক্মিণীপুরীতে। আবার দিন তিনেক। তারপর প্রভাসতীর্থ,—যেখানে ব্যাধের বাণে শ্রীকৃষ্ণের

মৃত্যু ঘটে। ওখান থেকে আবার ওখায় গিয়ে পৌছনো, এবং করাচির জাহাজে ওঠবার আগে সমুদ্রমধ্যে বিরাট এক মহাজনী নৌকায়। সমুদ্রের পীড়ায় ওঁর কষ্ট হয়েছিল খুব। কিন্তু আমি প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলুম বড় জাহাজে উঠে। নৌকা থেকে আমাদেরকে সেই জাহাজে তুলে নেওয়া হয়েছিল। তখন শীতের কাল। আকাশ নীল। আরব সমুদ্র যেমনই নীল, তেমনি শান্ত।

পরদিন পৌছলুম বোম্বাই বন্দরের জেটিতে। বোম্বাইতে আছেন বাবুলনাথ আর মহালক্ষ্মী।

এবার খোঁজো ধর্মশালা। খুঁজতে খুঁজতে জনবহুল এক অঞ্চলে এসে পাওয়া গেল মাধোবাগ ধর্মশালা। অনেক সুপারিশ আর অনুনয় বিনয়ের পর আশ্রয় মিললো। মেজমাসির স্থুলাঙ্গ চেহারা দেখে ওরা মনে করেছিল ভাটিয়া বা গুজরাটি বা মারোয়াড়ী ধনপতির স্ত্রী এবং আমি তাঁর ফাই-ফরমাসের অর্ধাহারী তাঁবেদার। আমার মাথায় গামছা জড়ানো, মালকোঁচা ধুতি আর সাবান-কাচা পানজাবি। ধুতিখানা ময়লা. ফলে পানজাবির সঙ্গে মেলে নি। পায়ে খাকি কেড্‌স্‌। আমি এখন আত্মনিগ্রহের অবতার। অর্থাৎ এ যাত্রায় সাবান-তেল-চিরুনি - কোনটাই ব্যবহার করি নি। শুধু নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করি। হবিষ্যান্ন খাই। শতরঞ্চিতে শুই। প্রয়োজন মতো পান্‌জাবির উপর দিয়ে পৈতাগাছটা বার করে রাখি, কারণ ওটায় ব্রাহ্মণত্বের খাতির পাওয়া যায় বেশি। আমি যে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, এটির জন্য 'মাধোবাগ' ধর্মশালার প্রহরীদের কাছে আমার সম্মান বেড়ে গেল। তারা আমায় শর্মাজি বলে ডাকতে লাগল।

বাবুলনাথের জন্য বোম্বাই হয়ে উঠল মেজমাসির কাছে তীর্থ। সুতরাং তিনি ত্রিরাত্রি বাস করবেন। তাঁর কাছে হস্তী-গুম্ফা, তাজমহল হোটেলের ওদিকটা, মেরিন ড্রাইভ, জুহু বীচ—এদের কোনও দাম নেই। তিনি ধর্মশালার ম্যানেজারকে বলে-কয়ে দোতলার কোণে একটি ঘর নিলেন। তাঁর নিজস্ব একটি ঘর দরকার।

আমি তাঁর খিৎমদগার, সুতরাং আমার স্থান বাইরের বড় দরদালানে। ওটা ভাল, কেননা নভেম্বরেও বোম্বাইতে গুমোট। দালানে গড়াগড়ি দিয়ে ভালই শুই। রাত দশটার পর ধর্মশালার সব আলো নিবে যায়, সেই জন্য তার আগেই সব সেরে নিতে হয়। তবে রাস্তার দিক থেকে অনেকটা আলো দালানে এসে পড়ে।

তৃতীয় দিন রাত্রে যখন হাত পা ছড়িয়ে ওই দালানটায় অঘোরে ঘুমোচ্ছি,

তখন একটা সময় কে যেন আমার একখানা হাতের দুটো আঙুলের ডগায় একটু নাড়া দিল। ঘুম যত গভীরই হোক, শরীরের অনেকগুলি স্পর্শকাতর অংশের যে-কোনও একটি ছুঁলেই ঘুম ভাঙে। আমি চোখ মেলে আবছা অন্ধকারে দেখি, হাত তিনেক দূরে একটা মেয়েছেলে শুয়ে হাত বাড়িয়ে আমার আঙুল নাড়ছে।

অনেকটা চাপা গলায় সে প্রশ্ন করল, কভি ক্যা বোল্‌তা ?

অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে আমি হাতখানা সরিয়ে নিলুম, কিন্তু ওর ভাষাটা বুঝতে না পেরে জবাব দিলুম না। এ-পাশ ফিরে শুয়ে রইলুম। রাত সাঁ সাঁ করছিল।

মিনিট পাঁচ-সাত পরে আবার একখানা হাত আমার কাঁধের কাছে নাড়া দিল। আমি সর্পাহতের মতো পাশ ফিরলুম। হিন্দী ভাষা আমার রপ্ত নয়। তবু বললুম, কেয়া বল্‌তা ?

মেয়েছেলেটা এর মধ্যে আরও কাছে সরে এসেছে। এবার হাসি মুখে বলল, কভি—কভি, কভি ক্যা বোলে ?

তখন বুঝলুম তার বক্তব্য। আসবার আগে প্রভাসের হাতঘড়িটা এনেছিলুম। ওটা হাতেই পরা ছিল। মেয়েছেলেটা জানতে চায়, কটা বেজেছে এখন! এবার আমার ঘড়িতে একবার ঠাহর করে বললুম, সওয়া বারো বাজা।

মেয়েটা বয়সে ডাঁটো। বোধ হয় গুজরাটি কি রাজপুতানি হবে। যাই হোক, এত রাত্রে টাইম্‌ জানতে চাওয়াটা একটু বিসদৃশ। সম্ভবত ওর গরম লেগেছে ঘরের মধ্যে, তাই বালিশ একটা নিয়ে এখানেই শুয়েছে। কিন্তু আমার এত কাছাকাছি সরে আসাটা ওর পক্ষে উচিত হয় নি!

আমি এক হাত সরে আবার পাশ ফিরে শুলুম। মেজমাসীর ঘর বন্ধ, নইলে ওঁর ঘরে গিয়ে পড়ে থাকতুম। কিন্তু প্রায় আধ ঘণ্টা অবধি আমি আড়ষ্ট হয়ে রইলুম, পাছে আবার কোন্‌ মুহূর্তে ঠেলা খাই! ওর মধ্যে আবার চোখ বুজেই এক সময় আন্দাজ করলুম, মেয়েছেলেটা একবার এখানে-ওখানে নিঃশব্দে ঘোরাঘুরি করে এসে আমার মাথার দিকে উবু হয়ে বসল, এবং আমার মাথাটা নাড়ল। আমি তাকালুম। এবার সে আর কথা বলছে না। আমিও নির্বাক এবং ভয়ে আড়ষ্ট।

মেয়েটা আমার হাত ধরে তুলল। সেই হাতের মুঠি পরুষ ও কর্কশ। এটা বিদেশ-বিভুঁই। আমার পক্ষে বাধা দেবার বা প্রতিবাদ করার মতো

শক্তি নেই। আমি শুধু অভিভূত নই, সম্মোহিত। আমার হাত ধরে সে নিয়ে চলল চক-মিলানো বারান্দার আরেক দিকে—যেদিকে রাস্তার আলো পড়ে না। আমার কোনও ব্যক্তিত্ব নেই, বুদ্ধি লুপ্ত, চেতনা আচ্ছন্ন। নিরুপায় আমি, আমাকে বোবায় ধরেছে! অতঃপর উভয়ের আচরণ লক্ষ্য করার জন্য সেই জনশূন্য প্রাণীশূন্য ত্রিযামা নিশীথিনী সম্পূর্ণ আড়ষ্ট ও অসাড় হয়ে রইল!

বোম্বাই ছেড়ে কোথা দিয়ে কোন্ দিকে ঠিক আমরা রওনা হলুম আর কিছু মনে নেই। অনেক অজানা পথ, অনেক না-জানা স্টেশন, অনেকবার ট্রেন বদল। একদম গিয়ে নামলুম মহীশূরে। এটি সামন্ত রাজার দেশ। চারিদিকে রুক্ষ প্রান্তর, ছোট শহর, অদূরে পাহাড়—পাহাড়ের উপর দেবী মহিষাসুর মর্দিনীর মন্দির। মেজমাসী থেকে গেলেন তিন রাত্রি, এটি তীর্থস্থান। পাহাড়ে উঠে গেলে এক বাঁকের কাছে মহিষাসুরের বিরাট মূর্তি। তার পর এগিয়ে গেলে দেবীর মন্দির। পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যায়, শহরের মাঝখানে মহারাজার প্রাসাদ।

কিন্তু এ প্রসঙ্গটা ঠিক ভ্রমণের ইতিবৃত্ত নয়। ভাল করে না জানার জন্য অনেকবার একই পথে যেতে হয়েছে। আমাদের পক্ষে হায়দারাবাদের রায়চূড়ে যাবার দরকার ছিল না। বেশ কয়েকদিন আমাদের অযথা নষ্ট হয়েছে। এবার আমরা গেলুম বাঙ্গালোর হয়ে মাদ্রাজ। সেখানে মাউন্ট রোডের কাছাকাছি এক ধর্মশালা 'পরমানন্দ ছত্রম্'—সেখানে রইলুম একদিন। কাশী থেকে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আগে আমরা বেরিয়েছি। পথ থেকে চিঠি দিয়েছি কয়েকখানা কলকাতা ও কাশীতে। মাদ্রাজ থেকে মাদুরাই এসে মেজমাসী বললেন, কিশোরকে একখানা জরুরী টেলিগ্রাম পাঠাও ছয়শ' টাকা তারযোগে এখানে পাঠাতে। হাজার টাকার মধ্যে আর আছে প্রায় একশ' টাকা।

মেজমাসীকে সঙ্গে নিয়ে বড় ডাকঘরে গিয়ে দরকারী সব পরিচয়পত্রাদিসহ হাতের দস্তখৎ রেখে এলুম।

মাদুরাই হল মস্ত তীর্থ, এবং এখান থেকে দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র যাবার পথ পাওয়া যায়। আমরা 'পক্ষীতীর্থ' সেরে মাদুরাইতে ফিরে মীনাক্ষী মন্দির দেখে বেড়াচ্ছিলুম। এদিকে এখন প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছিল।

চতুর্থ দিনে টেলিগ্রাফ যোগে টাকা এল। আমরা নিশ্চিত হয়ে রামেশ্বর-

ধামের দিকে যাত্রা করলুম। পরদিন সেখানে পৌছলুম। সেই বিরাট মন্দির দেখতে আমাদের দু'দিন লাগল। ত্রিরাত্রি বাসের পর আবার মাদুরাই। তারপর পূর্ব ভারতের পথ ধরে বেজোয়াড়া বা বিজয়ওয়াড়া। ভিজিয়ানো গ্রাম, তারপর রাজামন্দিরি। এটি ছোটখাটো তীর্থ, থাকো দিন দুই! আমরা এদিককার ভাষা জানিনে, তাই কী কষ্ট দোকান-বাজারে! সেদিন মধ্যাহ্নকালে নিরিবিলি গোদাবরীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে প্রায় ডুবে মরেছিলুম। নরম মাটি আমার দুই পায়ের তলা থেকে নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছিল। আমার সেদিন ফাঁড়া ছিল।

সেই আমার প্রথম ভারত পরিক্রমা!

খুর্দা রোড হয়ে যেদিন পুরীর 'গোয়েঙ্কা ধর্মশালায়' এসে পৌছলুম, সেদিন দু'মাস পুরতে আর দু'চারদিন বাকি। ভয়ানক ক্লান্ত আমরা, পথের দুর্দশায় ধূলিমলিন। আমি শীর্ণকায়, মেজমাসীর ওজন কিছু কমেছে! আমাদের পরিচ্ছদ, বিছানাপত্র, পোঁটলাপুঁটলি,—যা কিছু সব ময়লা! আমি ধোবা খুঁজে বার করলুম, সাবান কিনলুম। পাণ্ডাকে দিয়ে 'ভোগ' আনার ব্যবস্থা করলুম, কুয়াতলায় মনের মতন করে স্নানে নামলুম। মেজমাসী দুধ-ঘি খাওয়া মানুষ, তিনি পাণ্ডাকে নিয়ে 'ধুলো পায়ে' গেলেন মন্দির দর্শনে। তিনি ভোগ ও পূজা দেবেন, গুণ্ডিচা বাড়ি যাবেন, গোবর্ধন মঠ দর্শন করবেন, এবং স্বর্গদ্বারে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরবেন,—তাঁর অনেক কাজ।

পুরীতে পাঁচদিন। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দিরে একদিন। প্রথম দিন পৌছেই মাকে চিঠি দিয়েছিলুম। সেই চিঠির জবাব এল—যেদিন আমরা যাচ্ছি ভুবনেশ্বরে। মা লিখেছেন—'আমরা বাড়ি বদলিয়ে আর-জি-কর হাসপাতালের পাশের রাস্তায় ভাড়াবাড়িতে এসেছি এক মাস আগে। এ চিঠি পাবামাত্রই তোমরা চলে এসো। ভয়ানক বিপদ যাচ্ছে। শিগ্‌গির চলে এসো।'

এর পর তৃতীয় দিনের সকালে পুরী এক্সপ্রেসে আমরা হাওড়ায় পৌছলুম।

দু' মাস ভ্রমণের পর নতুন ছোট্ট দোতলা ভাড়াবাড়িতে আমরা যেন আছড়িয়ে এসে পড়লুম। কী হয়েছে? খবর কি? কেমন আছ সব? কিসের বিপদ?

শুনলুম বুলির স্বামী গোপাল জংলী জ্বর নিয়ে রায়পুর হাসপাতালে ভর্তি হয়। এক সপ্তাহ পরে মস্তিষ্ক-বিকারের ঘোরে যখন বুলির নাম করে সে

প্রলাপ বকতে থাকে তখন ডাক্তাররা অবস্থা খারাপ ভেবে গোপালের বাবা গোবর্ধনবাবুর কাছে এক জরুরী টেলিগ্রাম পাঠায়। কিশোরদাদা টেলিগ্রাম করেন আমাদের এখানে। এখান থেকে ছোড়দা ও বুলির বড় ভাই তুলু— তু'জনে রওনা হয়ে যায় রায়পুরে। ওদিকে কাশী থেকে প্রভাস বেরিয়ে পড়ে। এগারো দিনের দিন প্রভাস যখন রায়পুর হাসপাতালে ছুটে গিয়ে পৌছয়, তখন গোপালের মৃত্যুর ঘণ্টা তুই বাকি। ছোড়দা ও তুলু গিয়ে পৌছয় বারো দিনের দিন। সেই দিন গোপালের মৃতদেহের সংকার করা হয়!

দ্বিতীয় খবর, গোপালের মৃত্যুর ঠিক সাতদিন পরে গোবর্ধনবাবু হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান্!

তৃতীয় খবর, দিদি অর্থাৎ গোবর্ধনবাবুর স্ত্রী তার স্বামী ও সতীনপোর শোকে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যায়। এখন সে দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় আছে!

আর বুলি?—প্রভাস কি বুলিকে নিয়ে রায়পুরে তার স্বামীর শেষশয্যার কাছে হাজির করেছিল?

না।—

মেজমাসী আর্তস্বরে বললেন, নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল!

সমস্ত কাহিনীটুকু বিশ্বাস করতে বাধে। আমি হতচেতন হয়ে সব শুনলুম। মা শুধু একদৃষ্টে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। আমি বাড়ি ফিরেছি প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে—সেই শ্রীরামপুর থেকে বর্ধমান হয়ে কাশী গিয়েছিলুম! বড়দা ও ছোড়দা তু'জনেই বলল, তুই আজই কাশী চলে যা,— বুলিকে নিয়ে আয়।

স্নানাহারের পর মেজমাসী মাকে ডেকে বললেন, বিশু, তোমার ছোট ছেলেটি এই তু' মাস আমার সঙ্গে থেকে খুবই যত্নে রেখেছিল! ছেলে তোমার যেমন সৎ, তেমনি মিষ্টপ্রকৃতি। ওকে সঙ্গে নিয়ে আমি আজই কাশী যেতে চাই। কি বলো তুমি?

মা বললেন, তোমার বাড়িতে এই সব তুর্ঘটনা ঘটেছে, যেতে হবে বইকি। বেশ, ও যাক্ তোমার সঙ্গে,—বুলিকে আর ওখানে রেখে কি হবে?

আমাকে যেন অনেকটা শুনিয়েই মেজমাসী বললেন, আরেকটি কথা আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি, বিশু। তোমার ছেলে আমাকে সকল তীর্থ ঘুরিয়ে এনেছে, প্রতিদিনের সব খরচ খাতায় টুকে আমার কাছে জমা দিয়েছে। দেখেছি ওর কোনও কিছুতে এতটুকু লোভ নেই! আমি স্থির করেছি, আমার বাড়ির উঠোনের ওপর উত্তর অংশটা ঘরদোর সুদ্ধ ওর নামে আমি উইল করে

দেবো। আমি গিয়েই আমার উকীল বিশু গুপ্তকে ডাকতে পাঠাবো। তোমার ছেলে যাবে-আসবে,—আমার ওখানেই থাকবে। আমি ওর ভার নেবো।

মা চুপ করে সব শুনলেন। তিনি চিরদিন স্বভাব-শান্ত এবং সংযত। শত দারিদ্র্য এবং অনটনের মধ্যেও তিনি অবিচল ও নিরাসক্ত। তিনি জবাব দিলেন না।

সেদিন সন্ধ্যায় কাশীর গাড়িতে উঠলুম মেজমাসীকে নিয়ে, এবং পরদিন সকালে বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশনে নামলুম। তখন যানবাহনের মধ্যে শুধু টাঙ্গা বা একা। আমাদের টাঙ্গা যথাসময়ে সোনারপুরার বড়বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। একটা হইচই পড়ে গেল। ছুটে এল সবাই। আমি গাড়ি থেকে নেমে ফটকের মধ্যে ঢুকে কিশোরদাদার ছোট্ট সুন্দর ছেলে কমলকে তুলে নিলুম।

বাড়িতে শোক-তাপ এখন আর নেই। শ্বশুর ও স্বামীর শ্রাদ্ধ করেছে বুলি একই সঙ্গে। বড় ঘরে ঢুকে দেখলুম দিদির ন্যাড়া মাথা, কোমরে মোটা কাছি বাঁধা। পরনে আল্‌গা পায়জামা, গায়ে একটা জ্যাকেট। আমি কে যেন এক নবাগত, দিদি চেয়ে রইল! বুলির পরনে কালাপাড় ধুতি, মুখে-কপালে-হাতে কালশিরার দাগ, চেহারা শ্রীহীন, মাথার সিঁদুরের জায়গাটা ফ্যাকফ্যাক করছে সাদা। আমাকে দেখে সে এবার আর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল না, উদাসীনভাবে অন্যদিকে চলে গেল! শুনলুম শ্রাদ্ধবাসরেই দিদি হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠে, জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড করে, ঘরদোর-আসবাবপত্র ভাঙ্গচুর করতে থাকে এবং হতচকিত বুলিকে ধরে বেদম মারপিট করে। সেই মার খেতে খেতে বুলির ফিট্ হয়। অতঃপর দিদিকে পিঠমোড়া করে বেঁধে শিবের বাড়ির কোণের ঘরটায় ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে পুরুত ভটচার্যি প্রাণভয়ে পালিয়েছিল, আমার বৃদ্ধা দিদিমাকে মোতিঝি ছুটে এসে দোতলায় নিয়ে যায়। প্রভাস ও কিশোরদা তখন হাল ধরেন। মালপত্র কিনে এনে আবার শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হয়। ছোটমাসী-সহ বড়বউদি বুলিকে সুস্থ করে তুলে ভুলিয়েভালিয়ে শ্রাদ্ধ করতে বসান। পুরুত আবার আসে। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেছে এক মাস হতে চলল।

আমার চিরজীবনের দিদিমার কাছে গিয়ে বসলুম। বৃদ্ধা আমার গলা ধরে শুধু কাঁদলেন অনেকক্ষণ। আমি চুপ করে রইলুম। বাঙ্গালীটোলায় শত সহস্র বিধবাদের মধ্যে আরও দুটি যোগ হল! দিদির বয়স সাতাশ, বুলির এইবার তেরো বছর হবে। ওরা থাকবে ওইভাবে—যতদিন না ওদের

যৌবনকাল ধ্বংস হয়। ভাত-কাপড়ের জন্য চেনামহলে দাসীগিরি করবে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইবে, পাঁচজনের ফাই-ফরমাস খাটবে, রোগ-ভোগ হলে ঔষধ-পথ্য পাবে না, একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে গেলে চরিত্রের দুর্নাম রটবে! এইভাবে দিন চলতে থাকবে—যতদিন না ওরা বিগতযৌবনা হবে! তারপর ধীরে ধীরে আসবে জরা, আসবে প্রৌঢ়ত্ব, আসবে বার্ধক্য। তারপর শুধু মৃত্যুর দিন গোনা। রাঙাদিদি দশ বছরে বিধবা হয়েছেন, এখন তাঁর প্রায় আশী। আছে আরও অনেক বৃদ্ধা আমার জানাশোনার মধ্যে। কাশীর বিধবারা বাঁচে বেশি। কাশীতে মড়ক ছাড়া ওদের গতি নেই!

প্রভাসকে প্রশ্ন করলুম, কেন তুই বুলিকে নিয়ে গেলিনে রায়পুরে?

—আর বলিসনে সে কথা—প্রভাস বলল, কিছুতেই যেতে দিল না ওর শ্বশুর-শাশুড়ী। আমার পায়ে পড়ে বুলির কী কান্না! সে আমার সঙ্গে যাবার জন্য পাগল। আকুলি-বিকুলি কেঁদে বলছিল, মামা, আমি সেই ফুলশয্যের দিনে তাকে দেখেছিলুম···আর এলো না সে! আমাকে তুমি নিয়ে চলো মামা,—পায়ে পড়ি···আমি হাসপাতালে গিয়ে তার মাথার কাছে বসে থাকব।

কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ী অটল। অত ছোট মেয়েকে একা বিদেশে পাঠাবে না তারা। বুলি তখন পাগলের মতন চেঁচিয়ে উঠল, ছোটমামা সামনে নেই, তাই আপনারা আমার ওপর এই অনাচার করতে পারলেন—!

ভাবাবেগে একবার নড়ে উঠে প্রভাসকে কড়া কথা বললুম, তুই না আমার চেয়ে চার বছরের বড়? কেন তুই বুলির কথা রাখলি নে? কেন তুই শ্বশুর-শাশুড়ীর কথায় কান দিয়ে মেয়েটার ওপর এত বড় অবিচার করলি? তোর নিজের বিচারবুদ্ধি ছিল না?

প্রভাস চুপ। আমি আমার দুই চোখের আগুন নিজেই নিবিয়ে দিলুম!

কিশোরদাদা একদিন আমাকে নিরিবিলিতে ডাকলেন। মেজমাসী তখন বুলিকে নিয়ে ওপরে গেছেন। বুলি সারাদিন প্রায় ওপরেই থাকে। মেজমাসী রাত্রেও ওকে রেখে দেন।

কিশোরদা আমাকে ডেকে নিয়ে শিবের বাড়ির উত্তর প্রান্তের ছোট ঘরখানায় এলেন। দেখি সেখানে বড়বউদিও রয়েছেন। কিশোরদা বললেন, শোন্ বলি রে, রাগারাগি করিসনে। বুলিকে তুই কলকাতায় নিয়ে যা।

বউদি বললেন, মা-বাবাকে দেখলে মেয়েটা তবু একটু শান্তি পাবে!

আমার চোখে আবার আগুন জ্বলে উঠল। বললুম, এখন সবাই মিলে ওকে আপনারা সরিয়ে দিতে চান। কিন্তু ওর স্বামী মারা যাবার সময় আপনারা ওকে যেতে দিলেন না কেন? কোথায় ছিল আপনাদের নীতিবুদ্ধি?

কিশোরদা আমাদের সকলের বড় ভাই, উনি আমার অতিশয় প্রিয়। আমি যে ওঁর মুখের ওপর নীতিজ্ঞানের কথা তুলব—এ আমারও স্বপ্নের অগোচর ছিল। উনি তাই আমার দিকে একবার তাকালেন, পরে আমাকে পরম স্নেহে কাছে টেনে নিলেন। বললেন, শান্ত হ, জীবন-মৃত্যুর ঘটনায় কারো হাত নেই। প্রভাসের সঙ্গে গিয়ে স্বামীর মাথার পাশে বসে তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবে ওই কচি মেয়ে, সেই বা কেমন হত রে?

বউদি বললেন, ঠাকুরপো, তোমাকে ডেকেছি অন্য কারণে। বুলিকে আর যেন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না—।

মুখ তুললুম।

কিশোরদা বললেন, শ্বশুরের শ্রাদ্ধের দিন দুই পরে হঠাৎ একদিন দুপুর-বেলায় বুলিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কোথায় গেল, কোথায় গেল—খোঁজ খোঁজ! বুলি কোথাও নেই! এমন সময় বিকেলের দিকে দেবনাথপুরা থেকে ছুটে এলেন রাঙাদিদি। বুলি নাকি তার শ্বশুরের ঘরের মেঝেতে পড়ে গোঁ গোঁ করছে! হ্যাঁ, আমিই আগে গেলুম সেখানে। প্রভাস আমার বন্ধু গোপাল ডাক্তারকে নিয়ে গেল। কোলের মধ্যে শোওয়ালুম মেয়েটাকে। লক্ষণ সুস্পষ্ট। মেয়েটা আফিং খেয়েছে দুপুরবেলায়। গোবর্ধনের আফিংয়ের কৌটোটা পড়ে রয়েছে একপাশে।

—গোপাল নল চালিয়ে পাম্প করতে আরম্ভ করল। রাত দেড়টার সময় মনে হল মেয়েটা বোধ হয় বাঁচতে পারে।

—খুবই ভুল করেছেন আপনারা—আমি বললুম, ওকে বাঁচানো উচিত হয় নি!

—ওখানেই শেষ হয় নি, ঠাকুরপো,—বউদি বললেন, বুলি কী করেছিল জানো গেল বেস্পতিবারে? ভাগ্যি দেখতে পেয়েছিল মিষ্টির দোকানের রামচরণ!

—ব্যাপার কি?

কিশোরদা বললেন, সন্ধ্যেবেলা, তার ওপর ডিসেম্বরের বৃষ্টি! কনকনে ঠাণ্ডা। ছুঁড়ি গা-ঢাকা দিয়ে সোজা গোড়েনঘাটে নেমে গিয়েছে একেবারে ডুব

জলে। একা ওইটুকু মেয়েকে ওই বৃষ্টির মধ্যে জলে নামতে দেখে রামচরণের সন্দেহ হয়। দোকান ফেলে সে ঘাটের দিকে নেমে আসে। বুলি ডুবেছে ততক্ষণে। রামচরণ জলে ঝাঁপ দেয়। যখন ছুঁড়িকে তুলে আনে, তখন সে একপেট জল খেয়ে খাবি খাচ্ছে!

— তারপর?

—নির্জন ঘাট, অত বৃষ্টিতে কেউ কোথাও নেই। রামচরণ ওর মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে লাগল। কতক্ষণ পরে বুলির নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে জল নামতে থাকে! ছুঁড়ির জান্ বড় কঠিন। সেই অজ্ঞান অবস্থায় ওকে দোকানে এনে তোলে। রাত দশটার পর একটু জ্ঞান হলে আমার নাম করে! রামচরণ লোক পাঠায় আমার এখানে। আমি দৌড়ে যাই। রাত এগারোটায় ওকে কাঁধে নিয়ে বাড়ি আসি।

—তুমি ওকে কলকাতাতেই নিয়ে যাও ঠাকুরপো, দেরি করলে আবার হয়ত একটা অঘটন ঘটিয়ে বসবে!

আমি এবার বললুম, ভয় নেই বউদি, আমি এসে পড়েছি, এখন ও আর কিছু করবে না!

— কেমন করে বুঝলে?

— আমি ওকে জানি, বউদি।

পরদিন না ডাকতেই বুলি আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমি সহাস্যে বললুম, কি রে, এর মধ্যে চান্ করা হয়ে গেল? খেয়েছিস কিছু?

আমার প্রশ্ন অবান্তর, বুলি জানে। বুলি বলল, তুমি একবার ওপরে এসো, ছোটমামা।

বুলি আমাকে নিয়ে দোতলায় মেজমাসীর বড়ঘরের পাশ দিয়ে ছাদের ধারে ছোট ঘরটায় নিয়ে এল। সে বুলি নেই, এ বুলি অন্য। বুলি কাঁদল না আজ। বুলির বয়স বেড়ে গেছে দশ বছর। সে বলল, আচ্ছা ছোটমামা, যার মুখখানা আমার আর মনেই পড়ে না, তার মরা মুখখানা দেখলে কিই বা হত? না গিয়ে ভালই হয়েছে!

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বুলি বলল, কিন্তু সে মরেছে, সেজন্যে কি আমার দোষ? দেড় মাস ধরে সবাই মিলে আমাকে কেন মারছে? কী করেছি আমি? এই ছাখো না আমার সব গায়ে শুধু কালশিরে! বেলুন দিয়ে, খুন্তি দিয়ে, হাতা-বেড়ি দিয়ে, নোড়া দিয়ে, শেষকালে লাঠি আর ঝাঁটা দিয়ে —

—থাক্ বুলি! আর কিছু বলিসনে…।

হঠাৎ বুলি ককিয়ে কেঁদে উঠল,—মরতে চাই নি, ছোটমামা। গিরিবুড়ি আমাকে আফিংয়ের কৌটো দেবার জন্যে দেবনাথপুরায় নিয়ে যায়! গোড়েন-ঘাটের দিকে কে আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসে জিজ্ঞেস করো ত? তুমি আসবার আগেই ওরা আমাকে মারতে চেয়েছিল!

—কেন?

—প্রতিশোধ নেবে!—কাঁদতে কাঁদতে বুলি বলল, আমি অপয়া, অলক্ষণে,—আমার জন্যে স্বামী-শ্বশুর মরেছে! তোমাকে ওরা সবাই ভয় করে তাই এখন ভালমানুষ সেজেছে! ওরা সবাই খুনে, বিশ্বাসঘাতক, ওরা জোচ্চোর। আমার সব গয়নাগাঁটি কাপড়-চোপড় কেড়ে নিয়ে ওরা বিক্রি করেছে। আর আমার একখানাও কাপড়জামা নেই, ছোটমামা। শুধু কিশোরমামা আর বড়মামীর জন্যেই আমি বার বার বেঁচে যাচ্ছি! তুমি আসবার আগেই আমি মরতে চেয়েছিলুম, ছোটমামা।

আমি উঠে বাইরে এলুম। মেজমাসীমা তখন রান্না চড়িয়েছেন। এগিয়ে এসে আমি বললুম, বুলি দেখছি আপনার কাছেই রয়েছে কাল থেকে?

—হ্যাঁ—মেজমাসী বললেন, আমার কাছেই বুলি থাক্ যতদিন ইচ্ছে। তবে ওকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়াই এখন ভালো!

—আমি ওকে আজই নিয়ে যেতুম।—আমি বললুম, কিন্তু ওর গায়ের কালশিরেগুলো একটু মিলিয়ে যাওয়া দরকার। ওর এ চেহারা দেখলে সেখানে আপনার এ-বাড়ির খুবই নিন্দে রটবে। সুতরাং দু'চারদিন আমি সবুর করব!

মেজমাসীমা বললেন, ওর গায়ে এত কালশিরে এল কোত্থেকে?

জবাব দিয়ে বললুম, বুলি বলছে একদল বাঁদর ওকে কামড়িয়ে দিয়েছে!—বলতে বলতে আমি নিচে নেমে গেলুম। বুলি দোতলাতেই থাকবে।

সেদিন বুলিকে নিয়ে আমি গোধোলিয়ার দিকে বেরোলুম।

আসবার সময় বড়দা আমার হাতে পঞ্চাশটি টাকা যোগাড় করে এনে দিয়েছিলেন। আমি তাই দিয়ে বুলির খানচারেক ভালো শাড়ি, একখানা গরম চাদর, একখানা ভাল কম্বল ও বালিশ, ওর গায়ের জামা, ওর পায়ের মাপের একজোড়া স্যাণ্ডাল,—এগুলো একে একে কিনলুম। আমি বিশ্বাস করি, বুলি সেই কুমারী কিশোরীই রয়েছে! বিশ্বাস করি, ওর এই দুর্ভাগ্য, উৎপীড়ন আর অপমানের মূলে আমি! আমিই সেই ভয়াবহ অভিশপ্ত শ্রাবণরাত্রির দুর্যোগের মধ্যে প্রকৃতির সব বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে বর নিয়ে গিয়েছিলুম

সেই অন্ধকারে। না, সে বিয়ে মিথ্যে! বুলির আজও তেরো বছর বয়স নয়।

যা আমার পক্ষে অভাবনীয় ছিল, তাও করলুম। সঙ্গোপনে মেজমাসীমার কাছ থেকে আড়াইশ' টাকা ধার করলুম। আমি জানি অন্য কারোকেই তিনি টাকা ধার দেন না। কারণ তাঁর ধারণা, সকলেই তাঁকে শোষণ করার জন্য ওৎ পেতে থাকে। কিন্তু আমি এতদিনে বিশেষ সুনামের সঙ্গে তাঁর কাছে প্রতিষ্ঠালাভ করেছি। সেজন্য তিনি সোৎসাহে ও সানন্দে টাকা বার করে দিলেন। দু'শ' টাকার মধ্যে বুলির হাতের দু'গাছা সোনার বালা, একটি সরু নেকচেন্, কানের দুটো ফুল, একটা স্যুটকেস—এগুলো হয়ে গেল। এ ছাড়া ওর মাথার তেল, সাবান, চিরুনি, কোল্ড ক্রীম, পাউডার, আয়না,—এবং আরেকখানা সিল্কের শাড়ি, এগুলোও দরকার। কালীমাস্টারের কাছে ধার নিলুম পঁচিশ টাকা।

এক সপ্তাহ বাদে বুলিকে নিয়ে কলকাতা রওনা হলুম।

'নাট্যমন্দির' জমে উঠেছে কলকাতায়। যারা চৌরঙ্গী আর লালদীঘির পাড়া ছেড়ে ধর্মতলা স্ট্রীটেও আসে না, যারা মধ্য ও উত্তর কলকাতাকে 'নেটিভ কোয়ার্টার' বলে উপেক্ষা করে চলত, সেই ইংরেজরা পর্যন্ত মাঝে মাঝে দলবেঁধে এসে শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় দেখে যেত। ইংরেজ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও শ্বেতচর্মীকে আমরা সে-সময়ে দেখি নি ও চিনি নি। তখন সাদা চামড়া মানেই হল ইংরেজ। কিন্তু তবুও মধ্যে-মাঝে দু'একজন ফরাসী এসে যেত চন্দননগর থেকে—ওখানে ছিল ওদের স্বাধীন উপনিবেশ, ইংরেজ প্রশাসন এলাকার বাইরে। ওখানে সস্তায় ভাল মদ পাওয়া যেত। সেজন্য কলকাতার শৌখীন বাবুরা, থিয়েটারের লোকেরা, ব্যবসায়ীরা, শুঁড়িরা এবং আরও নানা শ্রেণীর লোক মোটর নিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে চলে যেত চন্দননগরে। কিন্তু শিল্পী, কবি, সাংবাদিক, সাহিত্য-কর্মী—এরা কেউ বিশেষ যেত না। এদের তখন ডাল-ভাত জুটত না! শুধু ওখানকার গল্প শুনে লালাসিক্ত হতো!

'নাট্যমন্দির' এখন জমজম করছে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে। ওই বিরাট বাড়ি ও হল্, শিশিরবাবু ভাড়া নিয়েছেন তিন হাজার একশ টাকায়। ওটাই তখন সমগ্র উত্তর কলকাতার প্রধান আকর্ষণ। আলোকমালায় সন্ধ্যা থেকে সুসজ্জিত! সীতা, আলমগীর, রঘুবীর, নরনারায়ণ, প্রফুল্ল এবং তারপরে ষোড়শী।

'ষোড়শী' হল শরৎচন্দ্রের। মূল বইখানার নাম 'দেনা-পাওনা'। এই বই থেকে প্রথম শিবরাম চক্রবর্তী একটি চমৎকার নাটক উৎপাদন করে এবং সেটি রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী ও সুপ্রসিদ্ধা দেশসেবিকা সরলা দেবীর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকার পূজা-সংখ্যায় তখন প্রকাশিত হয়! 'ষোড়শী' নামটি শিবরামেরই দেওয়া। শরৎচন্দ্র তখন জনপ্রিয়তার উচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁর উপন্যাস যে নাটকাকারে মঞ্চস্থ করা যায়, সেটি সেই প্রথম জানল নাট্যরসিকরা। শিবরাম তার পথিকৃৎ।

এই 'ষোড়শী' নাটকটি পড়ে শরৎচন্দ্র যেমন উচ্চকিত হন, তেমনি অন্য দিকে শিশিরবাবু ও তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু সুধাংশুভূষণ মখোপাধ্যায় ওরফে আমাদের সুধাদা সেই পরিমাণে আকৃষ্ট হন। ওঁরা দুজন ছুটে যান শরৎচন্দ্রের সেই সামতাবেড় বা পানিত্রাস গ্রামে। হাওড়া জেলায় দেউলটি স্টেশনে নেমে

আন্দাজ মাইল দেড়েক মাঠ পেরিয়ে গেলে রূপনারায়ণের তীরে—প্রায় তটেরই কাছে শরৎচন্দ্রের বাড়ি। ওঁরা গিয়ে তিনজনে মিলে বোধ হয় স্থির করেন, শিবরামকে এ ব্যাপার থেকে ছেঁটে ফেলা দরকার। বইখানা আবার নতুন করে ঝেড়ে নতুন ভঙ্গীতে লিখতে হবে। কিন্তু শরৎচন্দ্র নিজে নাট্যকার নন এবং নাটক লেখায় তিনি অভ্যস্তও নন। শিশিরবাবু নিজে নাট্যকার বা লেখক কোনটাই নন। সুতরাং স্থির হল এই, তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যশাস্ত্রবিশারদ সুধাদা নিজে শরৎচন্দ্রকে দিয়ে 'ষোড়শী' নাটকটি নতুন করে লেখাবেন। আরেকটি ব্যবস্থা হল এই, শরৎচন্দ্র সংগোপনে কলকাতায় আসবেন এবং শ্যামবাজারে দেশবন্ধু পার্কের নিকটবর্তী রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে সুধাদার প্রিয়বন্ধু ও ব্যারিস্টার হেমন্ত মিত্রের বাড়িতে বসে কাজ করবেন। সুধাদা তখন ওখানেই থাকেন। যাই হোক, নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া বাইরে এ ব্যাপারটি জানাজানি করতে দেওয়া হয় নি। এই সূত্রে শরৎচন্দ্র প্রায়ই হেমন্তবাবুর বাড়িতে রাত্রিবাস করে যেতেন। কেবলমাত্র সুধাদার জন্যই আমাকে ও-বাড়িতে মধ্যে-মাঝে যাতায়াত করতে হ'ত।

এই ব্যাপারটি নিয়ে শিবরামের সঙ্গে ওঁদের বহু দিন অবধি মনোমালিন্য চলে। 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' গোষ্ঠীর অনেকেই শিবরামের পক্ষে ছিল। কিন্তু সবলের সঙ্গে দুবলের দ্বন্দ্ব কত কালই বা সম্ভব? অবশেষে শিবরাম তামাশা করে কোন কাগজে যেন লিখল, "শিশি-র ভাদুড়ী তুমি, নহ বোতলের"! পরে শুনেছিলুম, শিবরাম কিছু টাকা পেয়েছিল।

'ষোড়শী' নাটকের অভিনয় সমগ্র বঙ্গদেশকে চমৎকৃত করে। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে দর্শকসাধারণ এই সামাজিক নাটকের অভিনয় দেখে আনন্দ-বেদনায় উদ্বেলিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর অভিনয় দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন, এবং তিনি শিশিরবাবুকে ডেকে তাঁর 'তপতী' নাটকটি আবৃত্তি করে শোনান। সেই আসরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের মেজ ছেলে অধ্যাপক অরুণচন্দ্র সেন তৎকালে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়। অরুণচন্দ্রের মারফত কবি আমন্ত্রণ জানান সুধাদাকে।

কবির সেই পত্রের দু-একটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করছি: "কল্যাণীয়েষু, অরুণ, তোর বন্ধু সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয়ের কোনো বাধা নেই। পরিচয় হলে নিশ্চয়ই খুশি হব—কেননা বাংলাদেশে কারো কাছ থেকে বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা পাবার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছি। ৩রা ভাদ্র ১৩৩৬—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুধাদা কিন্তু দুটি কারণে সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি। প্রথম কারণ, তিনি নিজে একটু নিউরটিক, সেজন্য কবির স্তাবক-দলের ভিড়ের মধ্যে তিনি একটু বেমানান হতে পারেন! দ্বিতীয় কারণ, কবি তাঁকে কাব্য আলোচনায় ডাকলে তিনি বেশি খুশী হতেন। রবীন্দ্রকাব্য-দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হিসেবে সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় ও পরে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—এঁদের দুজনকেই অনেকে জেনে এসেছেন। তবে সুধাদার যথার্থ তুলনা আমি আজও খুঁজে পাই নি। তাঁর বিদ্যার গভীরতা, তাঁর পাণ্ডিত্যের সহস্রমুখী ধারা, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব সাহিত্যকীর্তির মূল উপজীব্য, মানবতাবাদের সঙ্গে রসশিল্পের, কাব্যের ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা, চিরন্তন সাহিত্যনীতির সঙ্গে সকল কাব্যের অতীন্দ্রিয়তাবাদের নির্জ্জের সম্পর্ক, মহাকাব্যের সীমাতিক্রান্ত ব্যঞ্জনা—এসব আলোচনায় তাঁর জুড়ি আজও আমার চোখে পড়ে নি। তাঁর অতলস্পর্শ উইসডম বা অধ্যাত্মজ্ঞান তাঁর রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় এমন স্বতঃস্ফূর্ত অনর্গলতায় পরিণত হত যে, তাঁর অন্তরঙ্গরা মুগ্ধ ও অভিভূত অবস্থায় ছয়-সাত ঘণ্টা অবধি স্থাণু হয়ে যেত।

শিশিরবাবুর তুঙ্গে তখন বৃহস্পতি। দিলীপ রায় তাঁর গৌরবোজ্জ্বল কালে ঘোষণা করলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শনকালে তিনি মস্কো আর্ট থিয়েটারে জগৎবরেণ্য অভিনেতা কাচালভ-এর যে অভিনয় দেখে তন্ময় হয়েছিলেন, শিশিরকুমার তাঁর চেয়ে কোন অংশেই কম নন। যাই হোক, এবার শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব ও পরামর্শ অনুযায়ী 'তপতী' বা 'রাজারানী'র নাট্যরূপটি মঞ্চস্থ করলেন। মোট ছয় রাত্রি 'তপতী' অভিনীত হয়, তার মধ্যে একটি রাত্রে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। বাঙলার নাট্যশালার ইতিহাসে এই নাটকের বিস্ময়কর প্রযোজনা ও অভিনয়কলার সর্বাঙ্গীণ পূর্ণাঙ্গতা জ্যোতিষ্কের মতো অদ্যাবধি জাজ্জ্বল্যমান। 'তপতী' নাটকের সার্থক প্রযোজনায় সুধাদার হাত ছিল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন 'সীতা' নাটকের পৌরাণিক পটভূমির বরেণ্য মঞ্চশিল্পী চারু রায়। অতঃপর একে একে শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি নাটক মঞ্চস্থ করেন। তার মধ্যে 'শেষরক্ষা'-ই সর্বজনপ্রিয় হয়।

আমি ইতিহাস লিখতে বসি নি এবং এ কথাগুলি জাতীয় পাঠাগারে বসে গবেষণা করেও বলছিনে। আমি এ সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলুম।

যাই হোক, শরৎচন্দ্রের কথা হচ্ছিল। 'ষোড়শী' নাটকটি মঞ্চস্থ করার প্রাক্কালে শিশিরকুমার প্রাচীরপত্রে শরৎচন্দ্রের নামের পাশে একটি নতুন সংজ্ঞা

জুড়ে দেন, সেটি হল 'অপরাজেয় কথাশিল্পী'। সেদিনকার লক্ষ লক্ষ অনুরাগীর দল এই নতুন সংজ্ঞাটি সানন্দে বরণ করে নিয়েছিল।

নাটকের গঠন, তার অঙ্কের ভাগ, রসের সুষম সংবেদন, চরিত্রের সঙ্গতিরক্ষা, সংলাপের ভিতর দিয়ে নাটকের প্রগতি, নাটকের পক্ষে স্বাভাবিক পরিণতি এবং পরিশেষে সামগ্রিক রসসৃষ্টির দ্বারা সর্বজনমনের কাছে তাকে সংবেদনশীল করে তোলা—এগুলির জন্য সুধাদার কাছে বসে শরৎচন্দ্রকে প্রচুর শ্রমস্বীকার করতে হয়েছে! 'দেনা-পাওনা'য় শরৎচন্দ্রের জীবানন্দ ও অলকার মিলন ঘটেছে, 'ষোড়শী' নাটকে সুধাদা 'জীবানন্দ'র মৃত্যু ঘটিয়েছেন। কেননা, ওটাই নাট্য-পরিণতির নৈয়ায়িক রূপ। কারণ, জীবানন্দ তার প্রথম জীবন থেকেই আত্মনাশের বীজ বহন করে যাচ্ছিল। কাশীতে সুধাদার ফরিদপুরার বাড়ির বৈঠকখানায় রাশি রাশি বই কাগজের তলা থেকে আমিই একদিন বেগুনী কালিতে শরৎচন্দ্রের হাতের লেখা 'ষোড়শী'র কয়েকটি দৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলাম। সুধাদা এগুলি বাতিল করে শরৎচন্দ্রকে দিয়ে আবার লিখিয়েছিলেন!

এর পর অপরাজেয় কথাশিল্পীর 'দত্তা' একই উপায়ে এবং সুধাদার সেই একই প্রকার সহায়তায় পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। 'জীবানন্দ'র ভূমিকার পর শিশিরবাবুর 'রাসবিহারী'র ভূমিকা জনসাধারণকে মুগ্ধ করে।

বোধ হয় এইরূপ একটা সময়ে কোনও কিছু একটা অজ্ঞাত কারণে শিশিরবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের একটা ভুল-বুঝাবুঝি হয়। আমার সঠিক মনে নেই, সম্ভবত স্টার থিয়েটার, ওরফে তৎকালীন 'আর্ট থিয়েটারের' কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' বইটি মঞ্চস্থ করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু সেই একই সময় শিশিরবাবুও 'রমা' নাম দিয়ে পল্লীসমাজ অভিনয়ের আয়োজন করছিলেন। তখন আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে নাট্যমন্দিরের কতকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক ছিল। আর্ট থিয়েটারে অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ও তখন খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। তখন শিশিরকুমার, নরেশ মিত্র ও অহীন্দ্র চৌধুরী—এই তিন প্রতিভার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই নিয়ে কোথাও কোথাও আলোচনাও চলত। ওতে আমরা বেশ কৌতুক বোধ করতুম। নরেশবাবু ছিলেন আর্ট থিয়েটারে, এবং তিনি শিশিরবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সমবয়স্ক। এঁরা তিনজনেই ছিলেন বহুবাজারের প্রাক্তন 'ওল্ড ক্লাবের' সদস্য। অহীন্দ্রবাবু কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ, এবং অতিশয় ভদ্র ও মিষ্ট প্রকৃতির। কিন্তু

শিশিরকুমার ছিলেন তাঁর গুরুস্থানীয়। আমরা দেখেছি অহীন্দ্রবাবু এক সম্মিলিত অভিনয়কালে শিশিরবাবুর পায়ের ধুলো নিচ্ছেন।

অভিনয় ছাড়াও শিশিরবাবু তাঁর প্রখর পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। দেশ-বিদেশের ভাল ভাল সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থ, বিদেশী সাময়িক পত্রিকাদি, অভিনয় ও শিল্পকলা বিষয়ক গ্রন্থাদি তাঁর হাতের কাছে যুগিয়ে দেবার জন্য দু' একজন লোক মোতায়েন থাকত। কিন্তু অন্য দিকে শিশিরকুমার বেশ উগ্র উচ্চকণ্ঠ, অপ্রিয় সত্যভাষী এবং স্পষ্টবাদী। তিনি বাঙ্ময় হয়ে উঠলে বিশেষ কারও পরোয়া রাখতেন না।

'পল্লীসমাজ' আর্ট থিয়েটারে মঞ্চস্থ করা হবে—এইরূপ একটা চুক্তি করে একদা শরৎচন্দ্র শিশিরবাবুকে বলতে এলেন যে, নাট্যমন্দিরে 'রমা' হয়ে আর দরকার নেই! তখন বর্ষাকাল, বৃষ্টি হচ্ছিল। শরৎচন্দ্রের হাতে ছিল একটি ছাতা। তিনি 'নাট্যমন্দিরে' ঢুকলেন, এবং কথায় কথায় শিশিরবাবুকে তাঁর সিদ্ধান্ত ও চুক্তির কথা জানালেন। শিশিরকুমার তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হলেন, এবং উভয়ের মধ্যে একটি বচসাই বেধে উঠল। এই সব পরিস্থিতি সুন্দরভাবে আয়ত্তে আনার জন্য সুধাদা একপ্রকার মোতায়েন থাকতেন। তিনি তখনই তাঁর অপূর্ব মাধুর্যময় কণ্ঠে শিশিরবাবু অপেক্ষা প্রবলতর উত্তেজনায় রবীন্দ্রনাথের সুললিত কবিতা একটির পর একটি মুখে মুখে আবৃত্তি করে বাতাসটাকে ঘুরিয়ে দিতে লাগলেন।

এক সময় এক বাটি চা পান করে শরৎচন্দ্র বিদায় নিয়ে বললেন, শিশির, তবে এখনকার মতন আসি, ভাই?

অপরাজেয় কথাশিল্পীর মুখোমুখি দাঁড়ালেন অপরাজেয় আত্মাভিমানী! শিশিরবাবু প্রবলকণ্ঠে বললেন, দাদা, চলে যাচ্ছেন আপনি, বাধা দেবো না। কিন্তু একথা বলে রাখলুম, ওই ছাতা বগলে করে আবার আপনাকে এই 'নাট্যমন্দিরে' ফিরে আসতে হবে!

সুধাদা এগিয়ে গিয়ে শরৎচন্দ্রের পায়ের ধুলো নিলেন। অনেকের তখন ধারণা হয়েছিল, শরৎচন্দ্র-শিশিরকুমার—উভয়ের মধ্যে এই নিয়ে যে সংঘর্ষ, সেটি দুই সমকালীন বৃহৎ ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। উভয়েই তখন খ্যাতি ও গৌরবের শিখরচূড়ায় সমাসীন। উভয়ের এই সংঘাত আমাদের সকলের মনকে বিষণ্ণ করে তুলেছিল। যতদূর শুনেছি, আমাদের পাড়ায় গজেন ঘোষের আড্ডায় 'ভারতী' গোষ্ঠীর মজলিশে শরৎচন্দ্র ও শিশিরকুমারের মধ্যে প্রথম অন্তরঙ্গতা হয়। সে অনেক দিনের কথা।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আর্ট থিয়েটারে 'পল্লীসমাজ' জমে উঠতে পারে নি। ওটার নাট্যরূপদানে শরৎচন্দ্রের হাত ছিল অনেকখানি এবং তাঁর নির্দেশ তাঁরা বেদবাক্যের মতো বর্ণে বর্ণে পালন করেছিলেন। কিন্তু দর্শকসাধারণ সেটি যথেষ্ট আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারল না। নানা দিক থেকে কড়া সমালোচনা হতে লাগল। আর্ট থিয়েটার একদিন 'পল্লীসমাজ' বন্ধ করতে বাধ্য হলেন।

সেটা শীতকাল। নাট্যমন্দিরের ছোট বৈঠকখানাটার বাইরে নাটক ও সাহিত্যের আড্ডা বসেছিল। সকালের দিকে শিশিরবাবুর ওখানে অনেকেই আসতেন। 'নরনারায়ণ'-এর লেখক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, চারু রায়, সনৎ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী এবং আরও অনেকে। সুধাদা বরাবরই একটু নিউরটিক অর্থাৎ স্নায়ুচাঞ্চল্যের প্রতীক। তিনি একস্থলে স্থির হয়ে বসতে পারতেন না। সেই কারণে অভ্যাগত বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত হয়ে উঠতেন।

সেই একদিন শীতের সকালে শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে শরৎচন্দ্র হঠাৎ শিশিরকুমারের সামনে এসে হাজির।

—আরে, এ কি! আসুন, আসুন, দাদা আসুন। কী সৌভাগ্য আমার—শিশিরবাবু তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন, তোমার কাছে আবার এলুম, শিশির।

সোচ্ছ্বাসে শিশিরবাবু বললেন, আসবেন বই কি, একশ' বার আসবেন! এ আপনারই থিয়েটার, দাদা। আমরা সবাই আপনার একান্ত অনুরাগী—কিন্তু দাদা, এই শীতকাল, এমন মধুর মিষ্ট রৌদ্র—আপনি ছাতা এনেছেন কেন?

শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পরিহাস করে বললেন, বাঃ তুমি যে বলেছিলে, এই ছাতা বগলে করেই আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে!

হাসির সোরগোল উঠল এখানে-ওখানে। সুধাদা উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করে উঠলেন, "—দেবি, চলিতেছিলাম তব কমলবনে/পথের মাঝে ভুলালো পথ উতলা সমীরণে—"

আর্ট থিয়েটারে আর যিনিই থাকুন, সুধাংশু মুখুজ্জে নেই!

কিছুদিনের মধ্যেই সুদৃশ্য ও সুচিত্রিত প্রাচীরপত্র পড়ে গেল, 'নাট্যমন্দিরে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের রমা।'

সমগ্র বাঙ্গলাদেশ আনন্দে আন্দোলিত হয়ে উঠল। মঞ্চস্থ হল 'রমা'।

নাটকের নাটকীয়তা, অনবদ্য উৎকণ্ঠা সৃষ্টি এবং চরিত্রাভিনয়ের মাধুর্য অনেকের পক্ষেই স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বিরাট প্রেক্ষাগৃহ প্রতিদিন জনপূর্ণ। দেড়শ' দুশ' লোক প্রতি অভিনয়ে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখে।

এর কিছুকাল পরে দক্ষিণ কলকাতার বেহালায় মণীন্দ্র রায় মহাশয়ের অট্টালিকায় বসে শরৎচন্দ্র একদা আমাকে বলছিলেন, তুমি কি সেই লোকটির কথা বলছ—সেই যে ছেঁড়া চটি আর ছেঁড়া ধুতি পরে থাকত? মানে, সেই যে-লোকটি নতুন পানজাবি ছিঁড়ে ফেলে সেলাই করিয়ে পরত! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার নাম সুধা মুখুজ্যেই বটে! একটু একটু মনে পড়ছে যেন! আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, শিশির খুব দাম্ভিক? অত বড় অভিনেতা, অমন একজন বিদ্বান, অমন সুন্দর চেহারা—কিন্তু বড্ড দাম্ভিক!

আমার জবাব মুখে-মুখেই ছিল। কিন্তু সেটি শরৎচন্দ্রের মনঃপূত হয় নি। মনে পড়ছে, ঠিক সেইদিন টাউন হলে 'শরৎ-বন্দনা'র একটি মস্ত আসরের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, কিরণশঙ্কর রায় এবং বাঙ্গলার লেখক-গোষ্ঠী। কিন্তু তার কিছুকাল আগে হিজলী জেলে ইংরেজ আমলের পুলিস একদিন গভীর রাত্রে বেপরোয়া গুলী চালাবার ফলে প্রায় তিরিশটি জাতীয়তাবাদী কয়েদী যুবক আহত হয় এবং সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন মারা যান। এর ফলে প্রবল আন্দোলন চলতে থাকে। শরৎচন্দ্র ছিলেন সুভাষচন্দ্রের সমর্থক। সেই সময় সুভাষপন্থী 'বঙ্গপ্রদেশ ছাত্র সমিতির' প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তপন্থী 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি'। উভয় সমিতিতেই আমার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা কম ছিল না, এবং 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' এইভাবে আমি ওই 'শরৎবন্দনা'র অন্যতম মোড়ল হয়েছিলুম। কিন্তু তৎকালের শোকাচ্ছন্ন বাঙ্গলাদেশে 'পথের দাবীর' স্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে নিয়েও মাতামাতি করাটা সেনগুপ্ত-পন্থী ছাত্র সমাজ পছন্দ করে নি। ফলে, টাউন হলের মস্ত অনুষ্ঠান তুমুল হট্টগোল ও হাতাহাতির মধ্যে যখন ভণ্ডুল হচ্ছিল, তখন সেনগুপ্তপন্থীদের মধ্যে গুণদা মজুমদার প্রমুখ কয়েকটি জাতীয়তাবাদী যুবক আমাকে ধরে-বেঁধে সোজা সেই গভর্নরের বাড়ির সামনে একাউন্টান্ট জেনারেল আপিসের বারান্দায় রেখে আসে। আমি জানতুম শরৎচন্দ্রকে এখনই এই পথ দিয়েই টাউন হলে নিয়ে যাওয়া হবে, এবং চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি মণীন্দ্র রায়ের গাড়িতে যখন এসেও পড়লেন—আমাকে আটকাতে হল সেই গাড়ি। শরৎচন্দ্রকে যখন বলা হল 'দক্ষযজ্ঞ' পণ্ড হয়েছে এবং যুবকদের হাতে কারও মান-সম্ভ্রম থাকবে না—

তখন অগত্যা শরৎচন্দ্রকে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল এবং আগাগোড়া ঘটনাটা শোনার জন্য বেহালার জমিদার স্বর্গত সুরেন রায় মহাশয়ের পুত্র মণীন্দ্রবাবু আমাকে তাঁদের গাড়িতে তুলে নিলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্র শিশিরবাবু ও সুধাদার সম্বন্ধে ওই প্রকার মন্তব্য করেছিলেন।— দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স প্রকাশিত নাটক ষোড়শী, রমা, দত্তা প্রভৃতিতে শরৎচন্দ্রের নাম 'নাট্যকার' হিসাবে ছাপা হতে থাকে, যেটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। অথচ কোনও বইতে প্রকৃত নাট্যরূপদাতা সুধা মুখুজ্জের নামোল্লেখমাত্র নেই।

নিজের কথা বলতে বলতে অন্য কথায় গিয়েছিলুম। কিন্তু 'ধান ভানতে ভানতে শিবের গীত' গাইতে মাঝে মাঝে ভালই ত লাগে!

এবার প্রায় চার মাস পরে বাড়ি ফিরেছিলুম। অর্থাৎ মাত্র দশ দিন আগে কাশী গিয়েছিলুম, বুলিকে নিয়ে আবার ফিরে সুস্থির হয়ে বসেছি। বারো বছর বয়সের মেয়েটা যেন প্রকৃতই গোলাপ ফুল—ওদের গোষ্ঠীটাই রূপলাবণ্যেভরা— সে মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক। কাশীতে এই গোলাপের অপমৃত্যু কিছুতেই ঘটল না। এই কিশোরী বিধবা চিরকাল নিজেও জ্বলবে, অন্য সবাইকেও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। সেই জন্য বুলিকে সটান গিয়ে রেখে এলুম বরানগরে ওদের পালপাড়ার বাগানবাড়িতে—ওর মা-বাপের কাছে। আশা করে রইলুম, ওদের খিড়কির পুকুরে পোড়ারমুখী যেন একদিন ডুবে মরে! মৃত্যু ছাড়া ওর অন্য কোনও পথ নেই। অতিশয় রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে বুলি—যারা অন্ধ সংস্কারের বাইরে আধুনিককালের কোনও প্রগতিবাদ স্বীকার করে না। ওরা পুরনো কালের গুরু-পুরোহিতের বংশ।

অতঃপর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যখন মায়ের হাতের সুন্দর নিরামিষ রান্না খাচ্ছি এবং বামাচরণ ভট্টচার্যি মহাশয়ের বদান্যতায় বাড়ির সামনের দোতলার দক্ষিণমুখী ঘরখানায় আমি আর মা গল্প করতে করতে রাত্রে একসময় ঘুমিয়ে পড়ছি, সেই সময়টায় মা একদিন বের করে দিলেন দুখানা সরকারী চিঠি। সেই একই চিঠি। হুগলি ডিভিশন পোস্টাল হেড কোয়ার্টার্স থেকে লেখা, তোমার ছুটি বার বার মঞ্জুর করা হচ্ছে! এই শেষ পত্র অনুযায়ী তুমি অবিলম্বে শ্রীরামপুরের ডাকঘরে এসে কাজে যোগ দাও!

ঘোড়ার ডিম দেবো!

মা বললেন, সে কি রে, এ যে সরকারী চাকরি! হাতের লক্ষ্মী পায়ে

ঠেলবি ? তা হলে করবি কি ?

হাসি মুখে চিঠি দুখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললুম, কি করব তা এখনও ঠিক জানিনে। তবে আমি আপিসের কেরানী হয়ে জন্মাইনি, মা।

মা আমার সর্বংসহা। তিনি আমার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে নিত্যদিন দুশ্চিন্তায় থাকতেন।

আমার হাতে রয়েছে এখন তিরিশ টাকারও বেশি। সুতরাং অবস্থা আমার এখন খুবই সচ্ছল—আপাতত চাকরি না করলেও চলবে। টাকাটা অবশ্য মায়ের কাছেই রেখেছি, এবং তাঁর কাছ থেকে রোজ দু' আনা বা তিন আনা করে চেয়ে নিই। রোজ তিনটে সিগারেট তিন পয়সা, নয়ত দু' পয়সা 'মারিজুয়ানা বা হাসিস'—প্রাদেশিক শব্দটা আর নাই বললুম—ওই নিয়ে সুবল মুখুজ্যের সঙ্গে চলে যেতুম সেই বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটে—আমাদের সেই নিরিবিলি, শান-বাঁধানো আসনে। সেইখানে বসে 'মারিজুয়ানার' ঝোঁকে ডাক দিতুম পশ্চিম গগনের রবীন্দ্রনাথকে—"আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার ফিরেছি ডাকিয়া/সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া।" ইতিমধ্যে আমি গোটা দুই ট্যুইশনিও জুটিয়ে নিয়েছি। দুটো মিলিয়ে মোট মাসিক আঠারো টাকা!

আমি স্বাধীন, আমি স্বচ্ছন্দ, আমি অনর্গল। ঘুঘুপাখির পাখার মধ্যে আমার প্রাণের গতিবেগ খুঁজে পাই, গোধূলিকালের গঙ্গাপথের আকাশে বকের পাঁতির মধ্যে আবিষ্কার করি আমার বর্ণরঙীন কাব্য! আমি কি লেখক ? আমি কি কবি ? না, কিছু না! আমি কেউ না, কারও না! "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন, ছুটত ঘোড়া উড়ত বালি—"

সেদিন সকালে বেঁরিয়ে সোজা গেলুম নাট্যমন্দিরে। খবর পেয়েছিলুম সুধাদা ওখানে আছেন। যা ভয় করেছিলুম ঠিক তাই। সুধাদা ক'দিন ধরেই 'অসুস্থ' হচ্ছেন! তারাকুমার বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখেই সহাস্য ক্রোধের সঙ্গে বললেন, বড্ড খোঁজাখুঁজি চলছে, না? যা না সেই গরানহাটার 'অ্যালেন' হোটেলের দোতলায়, পেয়ে যাবি সুধাদাকে! যা, নেপেনকেও পাবি ওখানে।

আমাদের 'কল্লোল'-এর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন থেকে সুধাদার খুবই ঘনিষ্ঠ। নৃপেন স্বভাব-কবি,. রোমান্টিক ও আদর্শবাদী। 'কল্লোল'-এর আড্ডায় নৃপেন সর্বদা সমুজ্জল! নজরুলের একটা সময়ে পবিত্র গাঙ্গুলীর মতো নৃপেনও ছিল নিত্য সহচর। ওকে আমাদের অনেকেই বলত 'নেপী'। নৃপেন

ছিল কিছু নৈরাশ্যবাদী, এবং তার মধুর ব্যবহারের সঙ্গে তার ভঙ্গীটি ছিল সর্বহারার মতো! বন্ধুমহলে ওটাকে বলা হত 'নৃপেনিজম্'।

ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিলুম, হঠাৎ বেরোলেন বিশ্বনাথ ভাদুড়ী।

বিশ্বনাথের সঙ্গে আমার সেই বর্ধমানে দেখা—যখন উনি স্থির করেছিলেন সন্ন্যাস নিয়ে গন্ধবাবার চেলা হবেন। আমাকে দেখেই উনি বললেন, সেদিন তুই কি করলি বল্ ত? সকলের মাঝখানে বসে অমনি করে 'নর-নারায়ণ' এর কড়া সমালোচনা করলি? ক্ষীরোদবাবু সামনে বসেছিলেন দেখিস নি?

বললুম, না, দেখি নি ত? কিন্তু আমি যে বললুম ওটা পৌরাণিক কাব্য, ঠিক নাটকের মতন মনে হয় না! তুমি ত কেষ্ট সেজেছিলে, তোমার 'সলিলক্বি' মনে করো ত?

—ছি ছি, তুই একেবারে অনড্বান!—বিশ্বনাথ বললেন, শোন্, বড়দা তোকে খুঁজছিল। একবারটি দেখা করে যা। আয়, আমিও যাচ্ছি।

শিশিরবাবুর স্ত্রী আত্মনাশ করেন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে—ওঁরা তখন বাদুড়বাগানের বাড়িতে। অশোকের বয়স তখন মাত্র আট মাস। ওঁর স্ত্রীর শালীনতাবোধ ও মিষ্টপ্রকৃতি আত্মীয়মহলে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। শিশিরবাবু তখন এখানে ওখানে অভিনয় করে বেড়ান। উনি পারিবারিক জীবনে যথেষ্ট গাম্ভীর্য রক্ষা করে চলতেন এবং অন্য পাঁচটি ভাইকে তৈরি করে তোলার দায়িত্ব ওঁর ওপরেই ছিল। বিশেষ করে শেষের তিনটি—হৃষীকেশ, মুরারী ও পুতু ওরফে ভবানী। মেজভাই তারাকুমার ওঁর যথেষ্ট বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু সে অন্য কথা। আমি শৈশবে ও বাল্যে শিশিরবাবুকে দেখলেই ফুড়ুক করে পালিয়ে যেতুম। ওঁর ওই মোটা চশমার নিচে অপেক্ষাকৃত ছোট চোখ দুটো ছিল খুব তীক্ষ্ণ।

এদিক ওদিক ঘুরে শিশিরবাবুর কাছে এলুম। বিশ্বনাথ আমাকে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি ওকে খুঁজছিলে বড়দা, ও কাশী গিয়েছিল!

আমি এগিয়ে বড়বাবুর পায়ের ধুলো নিলুম। উনি বললেন, বাবা বিশ্বেশ্বরের মাথায় হাত বুলিয়ে এসে আমার পায়ে হাত বোলাও কেন?

ভয়ে ভয়ে আমি বললুম, সেটা পাথর, এ দুটো জ্যান্ত পা!

হুঁ! সুধা বলছিল তুমি নাকি লিখতে-টিকতে পারো?

এবার মৃদু ভীরু কণ্ঠে বললুম, লিখতে এখনও শিখি নি, তবে হিজিবিজি কাটি!

বড়বাবু আমার নতমুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, লেখক হতে যাচ্ছ, পড়াশুনো কিছু করেছ?

গলা শুকিয়ে উঠছিল, তবু সাহস করে বললুম, পড়াশুনো করলে পণ্ডিত হয়, কিন্তু লেখক হয় না! আপনি পণ্ডিত, কিন্তু লেখক নন।

হঠাৎ শিশিরবাবু হেসে ফেললেন, তাই দেখে বিশ্বনাথ সোৎসাহে বলে উঠলেন, ওর কোনও কথা সিরিয়সলি নিয়ো না বড়দা, ও একটি চীজ তৈরি হচ্ছে!

আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানালুম। বড়বাবু তখন বললেন, যাক, শোনো বলি। বড় বউদিদিকে বলো, সাঁতরাগাছির জমির টুকরোটা যে মামলায় জড়ানো আমি জানতুম না। না নিয়ে উনি ভালই করেছেন। তুমি কাল সন্ধ্যের পর এসে ঋষির কাউন্টার থেকে বাকি হাজার টাকা নিয়ে যেও।

বাইরে এসে সেদিন বিশ্বনাথের সঙ্গে বচসা বেধে গিয়েছিল। তাঁর ধারণা, আমি অতিশয় চতুর! আমার ধারণা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

যাই হোক, দুদিনের মধ্যেই মেজমাসিমার নামে আড়াইশ' টাকা এবং কালীমাস্টারের পঁচিশ টাকা—এ দুটোই মনিঅর্ডার করে দিলুম। আমার বড়দার আপিসে দেনার দরুণ পঞ্চাশ টাকা শোধ করলুম। মায়ের কিছু কেনাকাটা ছিল, তাতেও গেল টাকা পঁচিশেক। বাকি সাড়ে ছ'শ টাকা মায়ের পোস্ট আফিসের খাতায় জমা দিলুম।

কল্লোল আপিস হল পটুয়াটোলা লেনে, কালি-কলমের আপিস কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় বরদা এজেন্সিতে। দুখানা কাগজেই আমি নিয়মিত লিখি। কল্লোল নিয়ে তখন বেশ হইচই। বুদ্ধদেবের 'রজনী হল উতলা' নিয়ে অমল হোম প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তৎকালীন 'অতি আধুনিক' সাহিত্যের দফারফা করে এসেছেন! তার পরে বুদ্ধদেব লিখেছে এক স্মরণীয় কবিতা 'বন্দীর বন্দনা'। প্রমাণ করেছে সে শক্তিমান কবি। অচিন্ত্য আরম্ভ করেছে 'বেদে' নতুন ভাষাভঙ্গীতে। নবশক্তির শচীন সেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলেছেন, এদের একে একে বিয়ে দিয়ে দাও! বন্ধুরা শচীনের নতুন নাম রেখেছে 'সাচ্ ইনসেন'! এ ছাড়া যুবনাশ্ব ওরফে মণীশ লিখেছে, 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী', আর প্রেমেন্দ্র তার 'পাঁক' নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। অভিজাত সাহিত্যের সমালোচকরা চেঁচাচ্ছে, এরা নাকি সবাই মিলে নোংরা বস্তির নালা-নর্দমার পাঁক নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি আরম্ভ করেছে! কিন্তু পরবর্তীকালে অভিজাত সাহিত্যের মুখপাত্ররা 'কল্লোল-কালিকলম' এর প্রায় প্রত্যেক লেখকের কাছে আমন্ত্রণ জানিয়ে রচনা ভিক্ষা করেছিলেন। আমার লেখা মাঝে মাঝে 'প্রবাসী'তেও ছাপা হচ্ছিল। অচিন্ত্যর একটি কবিতা 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়

মেয়েছেলের নাম দিয়ে।

লেখকদের আর্থিক অবস্থা চিরদিনই শোচনীয়। অতি-আধুনিক গোষ্ঠীর দিন চলে না, অন্ন জোটে না! কেউ যদি কোনও প্রকারে পাঁচটি টাকা পায় তবে সে ধনী। এর মধ্যে কারো কারো আবার অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে। নিজেরই পেট চলে না, তার ওপর আবার বউ। কারও আছে দাদা; কারও বাবা, কারও দিদিমা—কারও বা ঈশ্বর ছাড়া গতি নেই! ওর মধ্যেই এসে দাঁড়িয়েছে জসীম উদ্দিন, মাঝে মাঝে হুমায়ুন কবির আর গিরিজা মুখুজ্যে, আবার ওরই মধ্যে হাওড়ার কোন্ কলেজের সেই মুখচোরা মিষ্টপ্রকৃতি অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। অতি-আধুনিক সাহিত্য কতকগুলি নিরন্ন, দরিদ্র, হতভাগ্যদের হাতে যখন জমে উঠেছে, তখন 'শনিবারের চিঠি'র সজনী দাস বেশ বাগিয়ে ওদের বিরুদ্ধে কলম ধরল!

দেড় বছর ধরে নিয়মিতভাবে আমি 'কালি-কলম'-এ লিখেছিলুম। দ্বিতীয় বছরে পুজোর ঠিক আগে প্রকাশক বরদা এজেন্সি ও কালিকলমের মালিক শিশির নিয়োগীর কাছে একদিন মাত্র দুটি টাকার জন্য হাত পাতলুম। তিনি তৎক্ষণাৎ দুটো টাকা বের করে দিলেন। কিন্তু আশ্বিনের পর মাস চারেক বাদে মাঘ মাসে হঠাৎ নিয়োগী মশায় বললেন, টাকা দুটো ফেরৎ না পেলে তাঁর হিসেবপত্র মেলাবার খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

বলতে গেলুম, এতদিনের এতগুলো লেখার দাম কি দু' টাকাও নয়?—কিন্তু বলতে পারলুম না, শৈলজানন্দ আমার গা টিপলো। পরের দিন আমার এক পুরনো বন্ধুর কাছে ধার নিয়ে শিশির নিয়োগীর দেনা শুধলুম। 'কালি-কলম' সম্পাদক মুরলীধর বসু ঘটনাটা শুনে আনন্দে মুখোজ্জ্বল করলেন। চোখ দুটো তাঁর বড় বড় হয়ে উঠল, আমি মর্মাহত হয়েছি, সেই কারণে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই ত চাই, ভাই। দুঃখের দাহনে যত দগ্ধ হবে ততই ত সাহিত্য চিত্তগ্রাহী হবে! ডস্টয়েভস্কি, গোর্কি, চেকভ—ভাবো ত এদের কথা! বুক ফাটবে, চোখ দিয়ে রক্ত ঝরবে, তবে না সাহিত্যে আসবে প্যাশন্! তুমিই ত বলছিলে সেদিন নুট-হামসুনের কথা! দুঃখ চাই, বুঝেছ? ব্যথা, বেদনা, নৈরাশ্য, অসন্তোষ, দারিদ্র্য, অপমান, অন্নাভাব,—তবে ত সেই সাহিত্য থেকে উঠবে বিপ্লব আর সমাজবিদ্রোহ! তবে ত ভেঙ্গে দেবে সব কুসংস্কার, মূঢ়তা আর অশিক্ষা! মনে পড়ছে না তোমার, "ব্যাঘাত আসুক নব নব/আঘাত খেয়ে অচল রবো/বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক—"? এগিয়ে চলো ভাই, এগিয়ে চলো—প্রাণ দিয়ে জীবন

দিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে শুধু লেখো! দেখছ না চারদিকে অন্যায়, দুর্নীতি, দুরাচার আর মূঢ়তায় জীবন পঙ্গু হয়ে রয়েছে? দেখছ না চারদিকে ঘিরে রয়েছে অচলায়তন? একে ভাঙো, মাথা ঠুকে ঠুকে একে চূর্ণ করো, তোমার কপাল বেয়ে রক্তের ধারা ছুটুক—

কিন্তু যদি না খেয়ে মরি চরম দুর্দশার মধ্যে?

মুরলীদা হেসে উঠলেন উৎফুল্ল আনন্দে। বললেন, সেই ত তোমার সকলের বড় গৌরব! সাহিত্যের জন্য তোমার আত্মোৎসর্গ! সাহিত্যের বড় আদর্শের জন্য তোমার সেই মৃত্যু হবে পরম গৌরবের! পরের 'জেনারেশনে' যারা আসবে তারা তোমার সত্য মূল্য নির্ধারণ করবে।

মুরলীদা সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। নতুন কালের সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর এই আদর্শবাদের পিছনে ছিল ভবানীপুরের মিত্র ইন্‌ষ্টিট্যুশনে তাঁর শিক্ষকতা,—মাইনে পেতেন বোধ হয় আশী টাকা! তাঁর একে একে দুই স্ত্রী মারা যান। তৃতীয়বার বিবাহের বউভাতে আমরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলুম। সেই আসরে গান-বাজনার মধ্যে নজরুল উচ্চহাস্যে যে পরিহাসটি করে, সেটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা চলে না! আদর্শবাদ মুরলীদাকে বেশ মানায়।

সেই সময় প্রতি দোল-পূর্ণিমার রাত্রে সকলের চেষ্টায় চাঁদপাল ঘাট থেকে একখানা নৌকা ভাড়া করা হত। ঘন জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে সেই নৌকা কুড়ি-পঁচিশজন যাত্রী নিয়ে ভাগীরথীর দক্ষিণ জলপথে পাড়ি দিত। কল্লোল ও কালিকলম গোষ্ঠীর অধিকাংশ লেখক ছাড়াও সাহিত্যোৎসাহী নিকট-বন্ধুরা থাকতেন। সঙ্গে থাকত বড় বড় ডেক্‌চিতে লুচি, কচুরি, পোলাও, মাংস, মিষ্টান্ন এবং পানীয় জল। হারমোনিয়ম, বাঁয়া-তবলা, বাঁশী—এগুলোও থাকত সঙ্গে। নজরুল হত মধ্যমণি। গঙ্গায়-গঙ্গায় একূলে-ওকূলে নজরুলের নব নব রচিত সঙ্গীত ও তাদের সুরমাধুর্য ভেসে ভেসে বেড়াত সেই জ্যোৎস্না রাত্রে। সেই নৌকায় আহারাদির পাট চলত। একবার একটি হারমোনিয়মের চাবি ছিল কড়া। টানতে ও টিপতে অসুবিধা হচ্ছিল। নজরুলের পরিহাস তৎক্ষণাৎ তির্যক গতিতে ছুটল। বলল, ও মুরলীদা, তুমি এই 'কুমারী' হারমোনিয়ম কোথা থেকে এনেছ?

উচ্চরোলে সবাই হেসে উঠল।

একবার পূর্ণিমার কোটালে ভয়ানক উঁচু বিরাট এক দৈত্যের মতো বান এসেছিল গঙ্গায়। আমাদের নৌকা আন্দাজ কুড়ি-বাইশ ফুট উঁচুতে উঠেছিল।

তখন আমরা মাঝনদীতে। পশ্চিম পারে বটানিক্যাল গার্ডেনস্, পূর্ব পারে সেই বদরতলা। ত্রাহি মধুসূদন! সেবার বটানিক্যাল্ গার্ডেনস্-এর আঘাটায় আমাদের নৌকা আছড়িয়ে পড়ল। সেদিনের সেই নৌকা ডুবে গেলে তৎকালীন সাহিত্যেরই ভরাডুবি ঘটত, সন্দেহ নেই। যত দূর মনে পড়ছে, তারপর থেকে দোলপূর্ণিমা তিথিতে আর নৌকাযাত্রা করা হয় নি! বান সরে যাবার পর মাঝিমাল্লারা আবার আমাদেরকে অবশ্য নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছিল। সেদিন সকলে বাড়ি ফিরেছিল রাত তিনটেয়। মৃত্যুর গ্রাস থেকে অতি আধুনিক সাহিত্য মুক্তি পেয়েছিল!

না, কিছু ভাল লাগছে না। সারাদিন যা হোক করে কাটে বন্ধুমহলে। সন্ধ্যার পর থেকে সুবল মুখুজ্যে! কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে বিষণ্ণতা পেয়ে বসে। প্রতি নিদ্রাহীন রাত যেন নৈরাশ্যে জরো জরো। পৃথিবী বেদনায় পাণ্ডুর, সূর্য শুধু হলদে, চাঁদ শুধু আকাশের এক গভীর ক্ষত। আমি শুধু ভাবছিলুম আমার কোনও ভবিষ্যৎ নেই! আমি কোনও প্রতিশ্রুতি, কোনও দায়িত্ব, কোনও কর্তব্য পালন করতে আসি নি! আমি চেয়েছিলুম সাংঘাতিকভাবে বাঁচতে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের ওপর দিয়ে হাঁটব, তরঙ্গে তরঙ্গে আহত-প্রতিহত হবো! না, এ নয়, এরা কেউ নয়, এরা সবাই যেন চারদিক থেকে আমার মারণের মন্ত্রপাঠ করছে। না, পারব না, অশিব শক্তির এই চাপা ষড়যন্ত্র আমি বরদাস্ত করব না। এ যেন 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি, নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালি/লাভ ক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ কলহ সংশয়/সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।"

আবার উঠে দাঁড়াই প্রভাতকালে। প্রতি প্রভাতে আমি যেন নতুন করে ভূমিষ্ঠ হই। চারিদিকে দেখি সেই প্রাচীন পৃথিবী। যেন আমার সামনে আবার এসে দাঁড়িয়েছে আরেক নবীনের ডাক। গগনের অনন্ত নীলিমার দিকে চেয়ে দেখি, এ বিশ্বের পিছনে কেউ কোথাও এক অদৃশ্য মহাতেজঃ একা দাঁড়িয়ে রয়েছে,—যেন তার মতো আমিও অনন্ত একা!

এমন এক সময় কাশী থেকে হঠাৎ চিঠি এল : যদি পারিস শিগগির চলে আয়। এখানে একটা কাজ জুটে যেতে পারে। ইতি কালী।

এর চেয়ে সুসংবাদ সেদিন আমার পক্ষে আর কিছু ছিল না। তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীতে স্বাবলম্বী হয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবো, এই ত আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ!

সেই দিনই আমার দুটি গর্দভ-ছাত্রের ট্যুইশনি করা ছেড়ে দিলুম।

কাশীবাস করব এবার চিরস্থায়ীভাবে।—না, অন্যদিকে আর মন দেবো না। সর্বপ্রকার অসৎসঙ্গ বর্জন করব, বদ্ অভ্যাসগুলো ছাড়ব, নেশাপত্রের দিকে মন একেবারেই দেবো না। বরং প্রভাতে গঙ্গাস্নান, সূর্যের দিকে চেয়ে পইতে ধরে গায়ত্রী-মন্ত্র জপ, পূজা-অর্চনা, শিবের মাথায় ফুল আর গোটা দুই-চার আলোচালের দানা ফেলে যাওয়া, চন্দনচর্চিত কপাল, সিক্তবস্ত্রে মন্দিরে মন্দিরে মাথা ঠোকা, সৎগুরু খুঁজে পাওয়া এবং সৎসঙ্গে বাস—এইটিই তো জীবনের একমাত্র কাম্য! জয় গিরিশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো!

যাবার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ করেছি তখন শৈলজানন্দ বলল, আমাকেও তোমার সঙ্গে নাও!

মানে?

শৈলজা বলল, না বাঙ্গলাদেশে আর নয়! ওখানে গিয়ে পড়লে অন্তত একটা মাস্টারিও তো জুটবে! আমি, তোমার বউদি আর দিদিমা। না না, বেশ থাকব। মনের মতন সাহিত্য করব, একটু একটু আফিং খাবো—

বললুম, আফিং খাবে? কেন?

কিচ্ছু বোঝ না তুমি।—শৈলজা বলল, চলো, কাশী গিয়ে সব কথা হবে।

অতএব শৈলজা আমার সঙ্গে কাশী যাবার দিনস্থির করে ফেলল, এবং আমি সেই অনুযায়ী কালীকে চিঠি দিলুম, শৈলজা যাচ্ছে আমার সঙ্গে। ওখানে তুই দশ-বারো টাকার মধ্যে ওর জন্যে একখানা বাড়ি ঠিক করে রাখিস। অমুক তারিখে আমরা যাচ্ছি।

শৈলজা কখনও কাশী যায় নি এবং কালী মাস্টার কোন্ ব্যক্তি তাও সে জানে না। কিন্তু তখন 'কয়লা-কুঠি' সিরিজের গল্পের জন্য শৈলজার খুব নামডাক। সাহিত্যপাঠক মহলে সে সুপরিচিত। কালী তার একজন অনুরাগী পাঠক।

নির্দিষ্ট দিনে শৈলজানন্দ, তার স্ত্রী ও দিদিমাসহ হাওড়া স্টেশনে আমার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলাকার দেরাদুন একস্প্রেসে চড়ল। সর্বাবস্থায় যে-ব্যক্তি লেখকসমাজের একান্ত হিতৈষী সেই পবিত্র গাঙ্গুলী স্টেশনে বিদায় জানাতে এসেছিল।

আমাদের একই গাড়িতে যাচ্ছিল কাশীর তারাকুমার চট্টোপাধ্যায় ওরফে

মণিবাবু। ওকে সবাই ডাকে 'তারামণি' বলে। তার সঙ্গে ছিল তার সহোদরা ভগ্নী। তারামণি হল কালী ও কেদারের বন্ধু, এবং ঝাঁসী স্কুলের হেডমাস্টার প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর। তারামণির বিয়ে আগামীকাল সেইজন্য বোনকে নিয়ে যাচ্ছে কাশীতে। আমাদের মধ্যে বেশ গল্প জমে উঠল।

পরদিন সকালে বেনারস ছাউনি স্টেশনে দেখি কালী দাঁড়িয়ে, সুতরাং শৈলজার পক্ষে আর কিছু অসুবিধা রইল না। 'আউধগর্বী' এলাকায় কালী একটি বাড়ি ঠিক করে রেখেছে। একটি টাঙ্গায় আমার মালপত্র সমেত আমি আর কালী, অপর একটি টাঙ্গায় শৈলজারা। তারামণিরা গেল আরেকখানা টাঙ্গায়।

সোনারপুরার বড়বাড়িতে এসে আমি নামলুম। ওখানে রয়েছেন দিদিমা, মাসীমারা, সপরিবারে কিশোরদা, প্রভাস, থানকাপড়-পরা দিদি,—দিদির মস্তিষ্ক-বিকার সম্প্রতি কিছু কমেছে! ইতিমধ্যে মেজমাসী যে তাঁর ভূসম্পত্তির একটি অংশ আমার নামে উইল করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এজন্য বোধ হয় কিছু কানাকানি হয়ে থাকবে। ফলে, এবার এ বাড়িতে পা দিয়েই তার একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলুম। সম্পত্তির ভাগীদার হতে যাওয়া খুবই বিড়ম্বনা।

আমার জিনিসপত্র বড় ঘরের একটি কোণে গুছিয়ে রেখে আউধগর্বীতে শৈলজার বসবাসের ব্যবস্থাদি দেখতে গিয়েছিলুম। আমার জন্য এখানে ইণ্ডিয়ান প্রেসের বাংলা ডিপার্টমেণ্টে প্রুফ রীডারের কাজ স্থির হয়েছে! প্রেসের ম্যানেজার অপূর্বকৃষ্ণ বসু—যিনি রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থের মুদ্রাকর। আমার মাসিক বেতন পঁচিশ টাকা। এবার আমার সৌভাগ্যের সূচনা। প্রভাস আমাকে বলল, আমার সাইকেলখানা নিয়ে তুই রোজ আপিস যাস।

ফিরলুম তখন বেলা বারোটা। হাসি-খুশী মুখেই ফিরেছিলুম। আগামী পরশু থেকে আমার প্রুফ-রীডারের চাকরি আরম্ভ। গৌরীগঞ্জের ওদিক দিয়ে স্টেশনের পথে দু' পা গলির মধ্যে ঢুকলেই সামনে ইণ্ডিয়ান প্রেস। এটি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের বাংলা শাখা আপিস। এর এখন মালিক হলেন স্বর্গত চিন্তামণি ঘোষের ছেলেরা।

নিচের তলাটা যেন থমথম করছে। ছেনুমাসীর রান্না হয়ে গেছে। বড় ঘরখানা কোনদিন বন্ধ থাকে না, আজ দেখি ঘরে শেকল তোলা। দিদিমা আছেন দোতলায়! দিদি নীরব। যে-দিদি সুস্থ থাকলে বরাবর ছুটে আসে আমার অভ্যর্থনায়, সে কথা বলছে না! আমি গিয়ে বড় ঘরের দরজাটা

খুললুম। এ কি, আমার জিনিসপত্র একেবারে ছত্রখান, চারিদিকে ছড়ানো। বিছানাপত্র বাক্স সব ওলোট-পালট। আমি একবার চুপ করে দাঁড়ালুম। তবে কি যা সন্দেহ করছি তাই? বিষয় মানে কি বিষ? তবে কি সম্পত্তির ভাগীদার হতে পারি, সেইজন্যই এই ধরনের ব্যবহার?

প্রভাস বাড়ি নেই। আমি বাইরে এসে ডাকলুম, মাসীমা? কোথায় আপনারা?

আমার গলার আওয়াজটা স্বভাবতই উঁচু। তখনও মাইক বা লাউড স্পীকারের তেমন চলন হয় নি। ওই কণ্ঠস্বর নিয়েই আমি কলকাতার নানা আসরে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করতুম!

আমার আওয়াজ শুনে ভাঁড়ারঘর থেকে ছেমুমাসীমা এবং ও-ঘর থেকে কিশোরদা বেরিয়ে এলেন। কিশোরদা সব সময়েই আমার প্রতি স্নেহশীল। তিনি বললেন, হ্যাঁ রে, সকালে তুই বেরিয়ে যাবার পরেই এ বাড়িতে একদল পুলিস এসে ঢোকে—!

পুলিস? মানে?

পুলিস বাড়িতে ঢুকে এ-ঘর ও-ঘর খোঁজে, তোর জিনিসপত্র তচনচ করে খানাতল্লাশি চালায়।

কেন? কি অপরাধ?

তুই বোধ হয় খবর পাস নি—কিশোরদা বললেন, এই সেদিন এখানকার গোয়েন্দা পুলিস ইন্সপেক্টর যতীন মুখুজ্জেকে মার্ডার করা হয়। পুলিস চারদিকে জাল ফেলে রুই-কাতলাদের টেনে তুলছে!

হেসে বললুম, আমি তো চুনোপুঁটি!

আমাদের কথা শেষ হয় নি এমন সময় উপর থেকে নেমে এলেন মেজমাসীমা। তিনি গর্বোদ্ধত প্রবল কণ্ঠে আমার মুখের উপর কঠোর ভাষায় বললেন, তোমাকে না ভালো ছেলে, সচ্চরিত্র, সাধু ছেলে ভেবেছিলুম? চোর, ছ্যাঁচড়, ডাকাত, দাগাবাজ গুণ্ডো—এদেরই জন্যে বাড়িতে পুলিস ঢোকে! তোমার জন্যে এ বাড়িতে আমাদের সকলের অপমান—!

প্রথমটা শান্ত হাস্যে আমি বললুম, পুলিস কেন এসেছিল আমার জন্যে, আমি জানিনে। কিন্তু আপনি একটু আস্তে কথা বলুন, কলকাতায় আমার মা আপনার গলাবাজি এখান থেকে শুনতে পাচ্ছেন!

আস্তে বলব?—মেজমাসী সপ্তগ্রামে তুললেন তাঁর কণ্ঠস্বর—কে তুমি? আমার মুখের ওপর কথা বলবার সাহস কে তোমাকে দিল?

বললুম, ওই আপনার পাথরের নুড়িটা,—ওই যার নাম রেখেছেন শিব!

চিৎকার করলেন মেজমাসীমা,—এত বড় আস্পদ্ধা তোমার, এত তেজ, এত অহঙ্কার যে, আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমার সামনে মাথা তুলে এত বড় কথা? রায়বাহাদুরের বাড়িতে পুলিস ঢুকবে তোমার জন্যে? খুনে, ডাকাত, গুণ্ডো—

এবার আমার বজ্রকণ্ঠ সমস্ত বাড়িকে কাঁপিয়ে তুলল,—থামুন। থামুন বলছি—

উনিও চেঁচালেন, কিশোর, অ কিশোর—?

প্রভাস বাড়ি ছিল না, থাকলে আমার পক্ষে সুবিধা হত। কিশোরদা ঘরে ঢুকেছিলেন, আবার বেরিয়ে এলেন। মেজমাসী দম্ভের সঙ্গে আওয়াজ তুললেন, রায়বাহাদুরের বাড়িতে পুলিস বরদাস্ত করব না।

আমার কঠোর কণ্ঠ নিচু হল না। বললুম, দাঁড়ান, শুনে যান আমার মুখের দুটো কথা!

কিশোরদার উপস্থিতি সত্ত্বেও আমার সাংঘাতিক মেজাজ এতটুকুও যে নরম হল না, এটি লক্ষ্য ক'রে মেজমাসী ঈষৎ থতিয়ে গেলেন। আমি তখন শিশিরবাবুর অভিনয় স্মরণ ক'রে নাটকীয় ভঙ্গীতে গলার আওয়াজ সম্পূর্ণ নামিয়ে বললুম, আপনি ধনবতী, কিন্তু বন্ধ্যা, অর্থাৎ হতভাগিনী। আপনি যতবার আমাকে সম্পত্তির লোভ দেখিয়েছেন, ততবারই আমি মনে মনে হেসেছি। চারিদিকের দারিদ্র্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আপনার ওই আধ পয়সা দামের পাথরের নুড়ির জন্য চার হাজার টাকা খরচ করেছেন, আর পাকা তেঁতুলে নুন মাখিয়ে নিচের তলাকার দরিদ্রদের নাকের ডগায় নাড়ছেন—যাতে ওদের মুখে জল আসে।

এ জীবনে মেজমাসী এমন অপমানজনক কঠিন বাক্য কারও কাছেই কখনও শোনেন নি। তিনি দোতলায় উঠে যাবার আগে শুধু নরম কণ্ঠে ব'লে গেলেন, আচ্ছা, মনে থাকবে—।

কিশোরদা আমাকে সাদরে তাঁর ঘরে নিয়ে এলেন, এবং বড় বউদিদি হাসি মুখে ছুটে এসে সোজা আমার থুতনিটা মুচড়িয়ে দিয়ে বললেন, পেটে পেটে তোমার এত কথা ছিল, কে জানত? একেবারে ঝুঁটি ধ'রে নাড়া দিলে? বেশ করেছ ঠাকুরপো, তুমি আমাদের মান রেখেছ। জুজুবুড়ীর ভয়ে আমরা জন্তু হয়ে দিন কাটাই।

কিশোরদা হাসছিলেন। বললেন, যা, চান ক'রে আয়। আমার কাছে

ব'সে খাবি। তোর জন্যে আজ ভাল মাছ এনেছি।

আহারাদির পর কিন্তু কিশোরদার কথাটা রাখতে পারলুম না। সোনার-পুরার পিছন দিকের গলিতে এক হিন্দুস্থানীর বাড়ির দোতলায় একটি ঘর ভাড়া নিলুম মাসিক দু' টাকায়। ঘরটি বেশ ভাল। সামনে কুচবিহারের কালীবাড়ি। মামা থাকতেন মেজমাসীর মুখোমুখি এক বাড়ির নীচের তলায়। আমাদের চেঁচামেচি ও পুলিসের খানাতল্লাশের সংবাদ তাঁর কানে উঠেছিল। পরদিন মামা হঠাৎ আমার ওখানে গিয়ে উঠলেন। বিজয়োল্লাসের হাসি হেসে তিনি বললেন, এই ত চাই—আমার মান রেখেছিস তুই। একেই বলি বাপের ব্যাটা, তুই যে বাঘের বাচ্চা রে। বেশ, দশটা-পাঁচটা চাকরি করবি, আমি তোর ভাতে-ভাত ফুটিয়ে দেবো। এক হাঁড়িতে মামা-ভাগ্নে খাবো, আমাকে শুধু আফিঙের পয়সাটা দিস, বাবা। তোর মেজমাসী তোকে সম্পত্তির লোভ দেখিয়েছিল শুনলুম? খবরদার, লোভ করবিনে। তোরা হলি সন্নিসির গুষ্টি। তোর ঠাকুরদাদা রামকেষ্টপুর ঘাটে আহ্নিক করতে ব'সে দ্বিতীয় পক্ষের মাগীকে সর্বস্ব লিখে দিয়েছিল। রাজারাজড়ার মেজাজ ছিল যে।

মুখ তুললুম মামার দিকে।

মামা বললেন, হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সেই মাগী ছিল বাঁজা, নাম ছিল কাদম্বিনী, তোর নিজ ঠাকুমা গোলাপসুন্দরীর সতীন! গোলাপসুন্দরী নিজের রূপ দেখে নিজেই পাগল হয়েছিল! তিন বছর একটা ঘরে বন্ধ ছিল, সেই ঘরেই সে মরে! তারই মা'র পেটের ভাই হরিদাস খাঁর ছেলে হল শিশির—ওই যে-ছেলেটা থিয়েটার করে! আর সেই কাদম্বিনী মাগী? মাগী ছিল শঠ। কৈকেয়ী যেমন দশরথকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছিল, ঠিক তেমনি! যা চাইবে তাই পাবে। তোর ঠাকুরদাদাটা ছিল গাধা, মাগীর ফাঁদে পা দিয়েছিল! একদিন গঙ্গার ঘাটে ব'সে জপ করছিল, মাগী সঙ্গে নিয়ে গেল সেইখানে উকিল মোক্তার। সাক্ষীসাবুদের সামনে যথাসর্বস্ব মাগী সই করিয়ে নিলে। তোর ঠাকুরদাদার হাতে রইলো শুধু পেতলের একটা ঘটি। ফরিদপুর আর পাবনায় তোদের বড় বড় তালুক, সেসব থাকলে আজ তোদের ভাবনা কি ছিল? তোর ঠাকুরদাদাকে পুড়িয়ে তোর বাপ আমারই সামনে শ্মশান থেকে মাথায় ক'রে নিয়ে এল সেই পেতলের ঘটি। ঘটিটা ছিল ফুটো, তোর বাপের তাইতেই আনন্দ। ওটাই তার পৈতৃক সম্পত্তি।

এবার একটু সঙ্কুচিতভাবে প্রশ্ন করলুম, তিনি কেমন লোক ছিলেন?

মামা বললেন, সে আর তুই কি ক'রে জানবি? লোকটা ছিল দিলদরিয়া,

উঁচু মেজাজ, বুকের ছাতি ছিল বড়, মাল-দার লোক। এদিকে ছিল ডাকা-বুকো, কারও পরোয়া করত না। তার ভয়ে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেতো।

শুনেছি আপনাকে তিনি খুব ভালবাসতেন?

আমাকে? মিছে কথা।—মামা বললেন, আমি তো তার একটিমাত্তর বড় শালা। একদিন একটু নেশার ঝোঁকে আমার বাপ ফলনা ভটচার্যিকে দুটো কুবাক্য ব'লে ফেলেছিলুম, তোর বাপ রাজেন সে কথা শুনে ক্ষেপে উঠেছিল। একগাছা লাঠি নিয়ে আমাকে তাড়া করল। বলল, শালাকে আজ মেরেই ফেলব।—আমি সেবার গোয়াবাগানের পাঁদাড় পেরিয়ে পায়রাটুনি পালিয়ে বাঁচলুম। লোকটা ভয়ানক বদরাগী ছিল।

মামা ছিলেন একমাস আমার সঙ্গে। একই ঘরে ছিলুম দু'জনে। সেই মামা, সেই দানব—সেই হত্যাগ্রহী—যার ছুরি শানাবার আওয়াজ শুনে আমরা বাড়ি ছেড়ে পালাতুম পথে, নয়তো চিলেকোটায়, নয়তো খাটের তলায়; যার হুঙ্কারে বাড়িতে হাঁড়ি চড়ানো দায় ছিল, যার সামনে কেউ কখনো মাথা তোলে নি; রোগা, লম্বা, কালো, কাঁচাপাকা দাড়ি, গাঁজা আফিং ও বিভিন্ন মাদকের প্রভাবে যার মুখের উপরে বীভৎস আক্রোশের ছাপ দেখে এসেছি আশৈশব—সেই মামা। সেই মামা আমার জন্য রাঁধেন, আলু-বেগুন কিনে আনেন, আমার বিছানা পেতে রাখেন, আমার জন্য ভাতের থালা সাজিয়ে বসে থাকেন। তাঁর চোখে আমার যা কিছু সব ভালো। একদিন আমার বাড়িওয়ালা সেই হিন্দুস্থানীর এক আঁটসাঁট সোঁদা মেয়ে নাকি আমার দিকে বাঁকা-চোখে চেয়ে হেসেছিল, মামা গিয়েছিলেন একখানা খুন্তি হাতে নিয়ে তেড়ে ওই মেয়েটার মাকে খুন করতে। নারীজাতির দিকে তাকিয়ে মামা বলতেন, ওদের গুষ্টি খারাপ।

সেই মামার অন্তিম ঘনিয়ে এসেছিল কাশীতে। তখন তিনি নিঃস্ব, স্বভাবের সেই প্রচণ্ডতা কমে এসেছে, এলাহাবাদ হাইকোর্টে এক নম্বর মামলা ঠোকবার কথাটা প্রায় ভুলতে বসেছেন। আছে কেবল সেকালের সেই ক্ষয়িষ্ণু দেহখানা, আছে উনিশ শতাব্দীর জীর্ণ কঙ্কালের ভগ্নাংশ।

শীতকালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু অকালের কি ঝড় আর বৃষ্টি সেদিনকার সেই শ্রাদ্ধবাসরে—সমস্তই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। কলাপাতারা উড়ে পালালো, পুরোহিত পালিয়ে বাঁচল, উনুন নিবে গেল, নিমন্ত্রিতরা গা-ঢাকা দিয়ে প্রাণ বাঁচাল। দিদিমা তখনও বেঁচে। কিন্তু দুর্যোধন সকলের আগেই স্বর্গে গেল।

মামা নিজের সত্যে অবিচল ছিলেন।

দেড় বছর পরে দিদিমার শবদেহ ভস্মীভূত হয়েছিল মণিকর্ণিকার মহা-শ্মশানে। দিদিমা বলতেন, 'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়।' তাঁর কপালে পুত্রশোক ছিল। আশী বছর বাঁচলে অনেক দুঃখ সইতে হয়। যে মৃত্যু পিছনে কাতর কান্না রেখে যায়, সেই মৃত্যুই গৌরবের।

যাই হোক, একদিন দুপুরে ছুটির দিনে হঠাৎ মেজমাসীর মোতি-ঝিকে সঙ্গে নিয়ে বড় বউদিদি আমার এখানে এসে হাজির। মামা ঘরে নেই, তিনি গিয়েছেন কাছাকাছি কোন্ এক তামাকের আড্ডায়। মোতি-ঝি অনেক পুরনো কালের লোক, আমাকে আবাল্য জানে। ঘরে ঢুকেই সে আমার পায়ের কাছে ব'সে খামকা কাঁদতে লাগল—ছোড়দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিরে চলো।

বউদিদি বললেন, তোমার মেজমাসী আমাকে পাঠালেন। তোমাকে আমরা নিয়ে যেতে এলুম ঠাকুরপো। তাঁর বিশেষ অনুরোধ, তুমি ফিরে চলো।

আমি হাসলুম। বললুম, বাঃ, তাঁর তাড়নায় বাড়ি ছাড়ব, আবার তাঁর কথায় বাড়ি ঢুকব—আমি কি খেলার পুতুল? তা ছাড়া যে সম্পত্তি আমি নিজের পরিশ্রমে অর্জন করি নি, সে আমার কাছে ঘৃণ্য। না, আমি যাব না, বউদিদি।

বউদিদি বললেন, তোমার যখন কোনও লোভ নেই, তখন নিজের ওপর বিশ্বাস নেই কেন?

কিন্তু ওঁর ওই নরককুণ্ডে আমি নাই রইলুম?

ওই নরককুণ্ডে যদি শিবের জায়গা হয়, তোমার জায়গা হবে না কেন? —বউদিদি আমাকে সুমিষ্ট তিরস্কার করলেন।

'ইণ্ডিয়ান প্রেসের পণ্ডিত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন যতদূর মনে পড়ে, অষ্টাদশপর্ব মহাভারত সম্পাদনা করছিলেন। আমি ছিলুম তাঁর সহকারী। এই ছাপাখানাটি হল ইণ্ডিয়ান প্রেসের বাংলা বিভাগ। কর্তৃপক্ষের সকলেই থাকেন এলাহাবাদে, এখানে কেবল ম্যানেজার অপূর্বকৃষ্ণ বসু ছাপাখানা পরিচালনা করেন।

পণ্ডিত মশায় সজ্জন ও সাধুপ্রকৃতির লোক, বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। তাঁর বাসস্থান হল গঙ্গামহল এলাকায়, অহল্যাবাঈ ঘাটের গায়ে। তিনি অতিশয় সদাচারী এবং চরিত্রবান। সর্বদা তিনি সদালাপী ও আনন্দময়।

এদের মতো ব্যক্তিরাই কাশীকে পুণ্যময় করে রাখেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। আমি তাঁর সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তাঁর প্রতি খুবই অনুরক্ত হয়েছিলুম।

প্রথম দিকে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমি তাঁর পক্ষে অযোগ্য নই। ক্রমশ আমি সব রকমের হরফ চিনলুম, পৃষ্ঠাসজ্জার কৌশল শিখলুম, অলঙ্করণ বুঝলুম, তারকা ও বিভিন্ন প্রকার চিহ্নাদির উদ্ধৃতিগুলিতে রপ্ত করলুম। পাঠকরা বই পড়ে, কিন্তু তারা জানে না সামান্য একটি মাত্র হরফের চাল-বেচালের পিছনে কি অপরিসীম পরিশ্রম লুকিয়ে থাকে। আমার সুবিধা ছিল এই, 'কালিকলম' ও 'কল্লোলে' প্রচুর প্রুফ দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। প্রকৃতপক্ষে লেখক হলেই প্রুফ-রীডার হতে হয়! আমরা নগণ্য ব্যক্তি—রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত বহুকাল অবধি ছাপাখানার সঙ্গে প্রুফ-রিডিংয়ের কাজ করতে হয়েছিল। এককালে তাঁর নিজের লেখার প্রুফ তিনি অন্যের হাতে দিতেন না। একদা 'ভুল' শব্দটির বানানবিধি নিয়ে তাঁর সঙ্গে এক ছাপাখানার সংঘর্ষ বাধে। তৎকালে 'ভ' অক্ষরটির তলায় 'দীর্ঘ উ' লেখা হত। সুতরাং কবির বানান 'হ্রস্ব উ' কেটে দিয়ে তাঁরা 'দীর্ঘ উ' বসিয়ে দেন। এতে কবি ক্ষুব্ধ হয়ে ছাপাখানায় লিখে পাঠান, 'আমার ভুল, ভুলই থাক!' দুটোই হ্রস্ব উ!

কাজে আমি ফাঁকি দিই না, অবহেলা করি না এবং কোনও কাজ এড়িয়ে চলি না—এটি পণ্ডিতমশায় লক্ষ্য করেছিলেন। সেইজন্য কাশীর নানাপ্রকার পালা-পার্বণে ও উৎসবের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার ওপর কাজ ছেড়ে দিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে তিনি কামাই করতেন এবং আমি সানন্দে কাজ চালিয়ে নিতুম। এক মাস কাজ করার পর তাঁর সুপারিশে আমার পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছিল। এখন আমি স্বচ্ছন্দে কলকাতায় মাকে পনেরো টাকা পাঠাতে পারি। এ ছাড়া মামার রাবড়ি ও আফিংয়ের দরুন মাসে দু টাকা, ছেনুমাসীর ঘরখরচা দশ টাকা। এর পর আমার হাতে থাকে সাত আট টাকা। এই নিয়ে আমি তখন প্রচুর ধনবান, এবং ধনস্রোতে ভাস-ছিলুম!

ছুটির পর সাইকেল নিয়ে তীরবেগে হিন্দু কলেজের ধার দিয়ে ভেলুপুরা হয়ে আউধগর্বীতে শৈলজানন্দর ওখানে রোজ পৌঁছই। শৈলজা একটু একটু আফিং ধরেছে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার জন্য আফিংয়ের প্রয়োজন আছে কিনা, এটি আমরা ভেবে দেখি নি। ওর সঙ্গে আমিও এক দানা আফিং খাই,

তার সঙ্গে এক পেয়ালা চা। গল্প লিখতে গেলে যদি আফিং দরকার হয়, তবে কবিতা লিখতে গেলে গাঁজা অবশ্যই চাই! আমার কাছে এসব প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। তবে কি কবি বা ঔপন্যাসিক মাত্রই গাঁজাখোর এবং আফিংখোর? যাই হোক শৈলজা সেই সময় তার 'ডাকপিওন' নামক এক উপন্যাস আরম্ভ করেছিল 'কল্লোলে'।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিল আমি আফিংয়ের বশীভূত হয়েছি। ওটা খাবার আগে কি উৎসাহ, এবং খাবার পরে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৃথিবীর চেহারা যেন আরও মধুর হতে থাকে। মদে উত্তেজনা আনে, গাঁজায় বৈরাগ্য আনে, সিদ্ধিতে নিবিড় নিদ্রা ও মিষ্টান্নের প্রতি টান আনে, কোকেনে দুষ্প্রবৃত্তি আনে, আর চরসে সপ্তম স্বর্গের প্রতি আকর্ষণ আনে! কিন্তু আফিং? ওটা খেলে দুধের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। আমি দুধ খাই প্রচুর। কাশীতে তখন খাঁটি দুধ টাকায় আট-দশ সের। আফিং খেলে ভণ্ড তপস্বীর আত্মস্থিতি আসে।

মাস দুই পরে হঠাৎ এক রাত্রে আবিষ্কার করলুম, আমি ঘুমোচ্ছিনে, শুধু ঝিমোচ্ছি! পরদিন 'মেটিরিয়া মেডিকা' খুলে দেখি, এইপ্রকার তন্দ্রার নাম ঘুম নয়! এই ঝিমুনির মধ্যে আফিংখোরের মুখের রেখাগুলি অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে বদলিয়ে যায় এবং মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তিতে একপ্রকার দুষ্কৃতকারীর ছাপ পড়তে থাকে। তা ছাড়া আফিংয়ের মতো কোনও নেশা এমন করে মানুষকে ভিতর থেকে কামড়িয়ে ধরে না! সব নেশা ছাড়া যায়, আফিং ছাড়া যায় না। দীর্ঘকাল ধরে আফিং খেলে এর পরিমাণ ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে, এবং তখন ছাড়তে গেলে মৃত্যুর সম্ভাবনাও থাকে। আফিংখোরকে দেখলে সহজেই চেনা যায়। আফিং সাংঘাতিক বিষ!

বটে! সেইদিনই আমি আফিং খাওয়া ত্যাগ করলুম, এবং হঠাৎ দিন দুই পর থেকে কলেরার মতো ব্যাধিতে আক্রান্ত হলুম। তারপর সুস্থ হয়ে উঠে নিজের কান মললুম। নেশা ছাড়তে জানলে তবেই নেশা করা উচিত।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তখনও আমার নিজের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। আমি তখন শুধু মেয়েদের বাইরের খোসাই দেখেছি, শাঁস দেখি নি। বাইরের মোড়ক রঙীন, সর্বাঙ্গে সুকুমার পেলবতা, তাদের সর্বদেহে পুরুষের বাসনার চিহ্ন থরে থরে সাজানো। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কি আছে আমি জানিনে। তা ছাড়া আরেক কথা। আমার নাবালক বয়সে সেই ন'বছরের স্বাস্থ্যবতী নিত্য-উলঙ্গ মেয়েটা—যার নাম ছিল নণ্টু এবং যে কথায় কথায় আমার সঙ্গে কুস্তি-লড়াই

করত, তাকে আমি মেয়ে বলি না! পুঁটিবাগানের সেই ধনবান ঘরের কিশোরী মেয়ে মানু—যে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সঙ্গী ছিল, এবং যে-মেয়ে শাড়ি পরামাত্রই আমার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করল, সেদিন কি সত্যই আমার কিশোর বয়সের নিবিড় আকর্ষণ একটি কিশোরীর হাতে অপমানিত হয়েছিল? তারপর অনেক দিন বাদে এল সেই শূলী-মোহান্ত বাবাজীর আশ্রমের সহজিয়া দলের মানদা। আমার চেয়ে কিছু বয়োজ্যেষ্ঠা ছিল সে—হয়তো কুড়ি বাইশ বছর হতে পারে। কিন্তু তবুও আমি তখন সতেরো-আঠারো বছরের তরুণ তো বটে। আমার মান সম্ভ্রম ইজ্জত সমস্ত নষ্ট করে আমার সর্বশরীরে সাবান ঘষে আমাকে সেই ছায়াচ্ছন্ন কলতলায় মানদা স্নান করিয়েছিল! তারপর থেকে তার আচার-ব্যবহারে আমার মতো 'গুরুঠাকুরের' প্রতি তার যত শ্রদ্ধানুরাগই থাক না কেন, এখন আমার মনে হয় তার অনেকটাই যেন একটু অন্য রকমের। আমি তার কোনও আচরণ ভুলি নি। একদিন সে অত্যন্ত এলোথেলো অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল, ঠাকুর, আমার দিকে চেয়ে ছাখো, এ দেহ তোমার নৈবেদ্যের একটি ফুল! এ ফুল তোমারই পায়ে দেবো!

কথাগুলো শুনতে হয়তো ভাল। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ওর মধ্যে যেন অন্য কথাও ছিল! ওর শরীরের দিকে কোনমতেই মুখ তুলে আমি তাকাতে পারি নি।

তারপর কেষ্টদাসী, জাতবোষ্টমের মেয়ে। আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। আমাকে খাওয়াবে, আমার পরিচর্যা করবে, পুতুলের মতন আদর করবে, কাছে নিয়ে শোবে। আমার মুখের ওপর তার পরলোকগত অকর্মণ্য স্বামীর উৎপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করবে, এবং আমি তার বুকের মধ্যে মুখ রেখে চুপ করে তার গল্প শুনব! কেষ্টদাসীর কোনও দুরভিসন্ধির কথা বলছিনে, কিন্তু তার প্যাশন্ আমার পক্ষে যেন কতকটা দুশ্চিন্তার কারণ ঘটাচ্ছিল।

এরা সবাই মেয়ে, তবু এরা সঠিক মেয়ে নয়। সর্বসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এমন মেয়ে আজও দেখি নি। জায়া, প্রিয়া, জননী, ভগিনী, বারবনিতা, উৎপীড়িতা,—এরা নয়, এদের বাইরে যে-মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আপন সত্য পরিচয় নিয়ে! পুরুষের চোখ দিয়ে মেয়েকে দেখা—সে-দেখা ভুল। এক মেয়ের চোখ দিয়ে অন্য মেয়েকে দেখা—সে-দেখায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকে। অনুরূপা দেবী দেখেছেন যে মেয়েকে, সে-মেয়ে আদর্শবাদের বেড়াজালে বন্দিনী। এর পাশে ইথেল ম্যানিন বা ইসাডোরা ডানকান দেখেছেন

নিজেদেরকে,—সেজন্য সেই দেখা সত্য হয়ে রয়েছে। পুরুষ মূলত নির্বোধ, মেয়েরা সেটি জানে। পুরুষকে দিয়ে ওরা ঘর বানায়, সংস্থান করায়, নিরাপদ ব্যবস্থা করিয়ে নেয়, আবার ওরই মধ্যে নিজেদের সম্বন্ধে স্তুতিবাদ ও সার্টিফিকেট লিখিয়ে ছাড়ে। বাল্মীকির সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সীতার স্তুতিবাদ।

কোন্ কথা বলতে গিয়ে কোথায় এলুম!

কাশীতে গিয়ে শৈলজানন্দ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। মেয়েটির বয়স অল্প এবং মিষ্ট-প্রকৃতি। এই বিবাহের প্রাক্কালে শৈলজার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে আমাকে দু'একটি অপ্রিয় ও দুঃখদায়ক কাজ করতে হয়েছিল। তার প্রথমা স্ত্রী প্রকৃত সাধ্বী এবং পতিগতপ্রাণা। যাই হোক, এ মেয়েটি বোধ হয় বছর চারেক বেঁচেছিল নিঃসন্তান অবস্থায়। পরে বীরভূমের একটি গ্রামে এ মেয়েটির মৃত্যু ঘটে। এর কিছু দিন আগে আমাদের প্রিয় বন্ধু প্রেমেন্দ্রও দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, কিন্তু তার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর। প্রেমেন্দ্র বেহিসাবী ছিল না।

'কল্লোল-কালিকলমের' লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তখন বিয়ে করার যুগ বা হুজুগ চলছে। নজরুলের বিয়ে নিয়ে সে এক মস্ত কাণ্ডকারখানা। "ধূমকেতু" নামক অর্ধসাপ্তাহিকের সে ছিল সম্পাদক। বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সে বেশ বাগিয়ে কলম ধরেছিল। ফলে তাকে কারাগারে যেতে হয়। ইতিমধ্যে সে তার ভাবী স্ত্রীকে পছন্দ করে। তাই নিয়ে মস্ত অশান্তি। জেলের মধ্যে সে উপবাস আরম্ভ করল, এবার সে না খেয়ে মরবে! তার এই সিদ্ধান্ত শুনে দেশসুদ্ধ তোলপাড়। চারিদিকে হইহই, নানা স্থানে সভাসমিতি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে একটি জনসমাবেশে নজরুলের কারামুক্তির দাবি জানানো হয়। নজরুল তখন বিপ্লববাদী জাতীয়তাবাদের প্রতীক এবং বাঙ্গালীর বড়ই প্রিয়। এই সময়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সেক্রেটারি জনাব মুজাফ্ফর আহম্মদ নজরুল সম্বন্ধে খুবই তৎপর ছিলেন। যাই হোক, নজরুলের সমস্ত ব্যাপারটার যাঁরা সন্তোষজনকভাবে নিষ্পত্তি করেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়। নজরুল তখন মাঝে মাঝে নলিনীবাবুর জেলেটোলার বাড়িতে এসে থাকত। তখন হাসি-পরিহাসের দিগ্বিজয়ী নায়ক 'দা'ঠাকুর' ওরফে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় আমাদের সকলের নিকট নমস্য ও প্রিয়পাত্র ছিলেন।

এর পর আগামী কয়েক বছরে একটির পর একটি বিয়ে হয়। অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব, হুমায়ুন, কল্লোলের অতি প্রিয় সুধীন্দ্রিয়, দেবীদাস, মণীশ, সরোজ রায় চৌধুরী,—কেউ আর বিশেষ বাদ রইল না! কেউ নিয়ম-নীতি অনুযায়ী,

কেউ ভাব-আলাপ বা প্রণয়াসক্ত হয়ে, কেউ বাংলার বাইরে গিয়ে, কেউ বা দেশকর্মী মেয়েকে! যে যেমন পারল এবং যে যেখানে পারল! তখনকার কালে লেখক, শিল্পী, কবি, সাংবাদিক বা ছাপাখানার সঙ্গে সংযুক্ত কোনও যুবককে কোনও লোক মেয়ে দিত না! মেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে এবং ভাত-কাপড় জুটবে না—যদি উপযুক্ত কোনও যুবকের হাতে মেয়ে না পড়ে, এই ছিল সাধারণ ধারণা! নজরুলের বাজার ভাঁল ছিল, কিন্তু সে ছিল অমিতব্যয়ী—অভাব-অনটন তার লেগেই থাকত! গ্রামোফোন কোম্পানীতে যোগদান করার পর থেকে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। অন্যান্য লেখকরা —যাদের চাকরি-বাকরি জুটত না—তাদের কপালে ছিল উঞ্ছবৃত্তি।

এই সঙ্গে আমার বিয়ের কথাটাও আসে বইকি। কিছু দিন থেকে রামবাবু নামক এক অমায়িক ভদ্রলোক কাশীর এ বাড়িতে যাওয়া আসা করছিলেন। তাঁর বাড়ি এই কাছেই দেবনাথপুরায়। রামবাবু এ বাড়িতে বিশেষ পরিচিত, তাঁর দুই-তিনটি মেয়ে। লক্ষ্য করেছি উনি প্রথম থেকেই আমার সম্বন্ধে উৎসাহী। একদিন সীমন্‌-চৌহাট্টার গলির মোড়ে সকাল বেলায় ওঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। উনি বাজারের পুঁটলি নিয়ে ফিরছিলেন। অত্যন্ত আন্তরিকতা ও স্নেহের সঙ্গে তিনি আমাকে ওঁর বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন। এক গলি থেকে অন্য গলি, সেই গলি থেকে শাখাম্বিত আরেক গলি। অবশেষে একটি বাড়ির দরজায় উঠে উনি হাঁক দিলেন। দোতলা থেকে কে যেন শেকল টানল, এবং নিচের তলার দরজা খুলে গেল।

আদর-অভ্যর্থনার পর তাঁর একটি মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। রংটা একটু চাপা, মুখশ্রী খুবই সুন্দর। বেশ ছাড়ালো মেয়ে, স্বাস্থ্যের বাঁধুনি হিন্দুস্থানী দেশের সঙ্গে খুবই মানিয়ে গেছে। আমার দু'একটি প্রশ্নের জবাব সে হাসি-মুখেই দিল। কণ্ঠস্বরটি ভাল, দাঁতগুলি সুশ্রী। গায়ের রং আরেকটু উজ্জ্বল হ'লে চমৎকার হত। আমি বেশ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলুম। মেয়েটির নাম অনীতা।

আধ ঘণ্টাখানেক ছিলুম। প্রচুর মিষ্টান্ন খেলুম। আসবার সময় নির্লজ্জের মতো ব'লে এলুম, পাত্রীকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। এ বিয়ে হবে। আপনি আজ সন্ধ্যার পর আমাদের ওখানে আসবেন।

প্রভাস কাশীতে টুমটাম কাজকারবার করে। কখনও সে হাতী, কখনও মশা! সে আমার চেয়ে প্রায় বছর চারেকের বড়। সেদিন রবিবার। দুপুর বেলায় প্রভাসকে নিয়ে খেতে বসেছিলুম। ছেহুমাসীমা ছিলেন সামনে।

আমি বললুম, মাসীমা, রামবাবুর মেয়েটিকে দেখে এলুম। প্রভাসের সঙ্গে চমৎকার মানাবে!

বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে উলুধ্বনির ভিতর দিয়ে প্রভাসের বিয়ে হয়ে গেল। অনীতা ঘরে এল যেন লক্ষ্মীস্বরূপিণী। মেয়েটি কিছু লেখাপড়া জানে, ক্লাস টেন্ অবধি পড়েছে। তার মধুর ব্যবহার ও মিষ্টভাষণে এই বিষাদপুরী যেন ঝলমল করে উঠল। আমার মধ্যে কিঞ্চিৎ অপরাধ-বোধ ছিল বইকি। সুতরাং আমি একটু এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলুম।

দিন কয়েক পরে একদিন খেতে বসে প্রভাসের স্ত্রীকে বললুম, আপনি আমার ছোট বউদিদি হলেন!

অনীতা দেবী সকলের মাঝখানে অসঙ্কোচে বললেন, তোমাকে আমি ঠাকুরপো বলব। কিন্তু আমার চেয়ে তুমি বয়সে বড়। তুমি আমার নাম ধ'রে ডেকো।

উচ্চকণ্ঠে আমি হেসে উঠলুম। বললুম, না, তা পারব না। বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে কেউ নাম ধরে ডাকে না। ওটা শুনতেও খারাপ। বউদিদি আমার কাছে খুব মিষ্টি। বরং আপনি এক কাজ করুন। আপনি সুবাদে বড়, আপনি আমারই নাম ধরে ডাকবেন!

তা পারব না—অনীতা দেবী তাঁর ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা প্রকাশ ক'রে বললেন, তার চেয়ে আপনি আমার অন্য একটা নাম দিন, সেই নামেই আমাকে ডাকবেন।

অনীতার প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগে নি। কিন্তু সেদিন থেকে তার নাম রেখেছিলুম দুর্গারানী। আমি ডাকতুম, দুর্গাঠাকরুন।

বিয়ের জল পাওয়া কাকে বলে আমি জানিনে, কিন্তু দিনে দিনে দুর্গা ঠাকরুন গৌরবগর্বিতা ও তেজস্বতী হয়ে উঠলেন। তাঁর শান্ত ভদ্র অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করে প্রভাসও যেন সতর্ক থাকত। স্বামী হিসাবে প্রভাস অতি উদার ও মিষ্টস্বভাব। কিন্তু প্রভাসের জীবনযাত্রার ধরনের মধ্যে কিছু অসংলগ্নতা ও জটিলতা থাকার জন্য দুর্গাঠাকরুন মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে যেতেন। আর আমি সকাল সাড়ে ন'টায় বেরিয়ে বাড়ি ফিরতুম রাত দশটায়। দুর্গারানী আমার জন্য অপেক্ষা করতেন। মাসখানেকের মধ্যে আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই মধুর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমার আহারাদি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর একটু-আধটু পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করে আমি অতিশয় লজ্জা পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে বাঁচতুম।

॥ ২০ ॥

ইণ্ডিয়ান প্রেসে চাকরি যখন আমার বেশ জমে উঠেছে, সেই সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর গ্রীষ্মের মধ্যে আমার নামে ভারতীয় সৈন্য বিভাগ থেকে একখানা সরকারী চিঠি আসে। আমি যে কলকাতায় হেষ্টিংসে পরীক্ষা দিয়েছি অনেকদিন আগে, সে কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। চিঠির তাৎপর্য হল: সৈন্য বিভাগে আমার চাকরি হয়েছে এবং আমাকে নিজের খরচে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের যে কোনও তারিখে রাওয়ালপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত মারী পাহাড়ে পৌঁছে সৈন্য দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে। ইতি—নর্দার্ন কমাণ্ড হেড কোয়ার্টার্স, ডগসাই, সিমলা!

চিঠিখানা আমার ভিতরে নিয়ে এল 'ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, পাঁজরের উপর আছাড় খাওয়া মরণ সাগরের ডাক।' আমার ভিতরে যেন ভিত কেঁপে উঠল, সমস্ত জীবনের শিকড়ের মূল ধরে কে যেন ভয়ানক নাড়া দিল! আমার ভাগ্যবিধাতা যেন বার বার আমার নোঙর ছিঁড়ে দিয়ে ছিনিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে!

নিজের আগাগোড়া ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ নক্শাটা ভেবে নিতে আমার বরাবরই মিনিট পাঁচেক লাগে। এবারে সম্পূর্ণ একটা রাত্রি নিলুম। পরদিন সকালে চিঠিখানা নিয়ে আপিসে গিয়ে আগে পণ্ডিত মশায়, পরে দোতলায় গিয়ে অপূর্ববাবুকে দেখালুম। আমি যাওয়া স্থির করেছি এবং আজই বিকেলবেলার গাড়িতে কলকাতা যাচ্ছি, তাঁকে জানালুম। তিনি হিসেব ক'রে আমাকে মোট আটাশটি টাকা বার ক'রে দিলেন। আসবার সময় পণ্ডিত মশায় বললেন, আশীর্বাদ করি তোমার উন্নতি হোক, কিন্তু তোমার মতন সুযোগ্য সহকর্মীকে আমি হারালুম! এ দুঃখ আমার অনেকদিন পর্যন্ত থাকবে।

তাঁর চোখ ছলছল ক'রে এল। আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম।

সকলের আগে মা! অন্যের কথা ভাবব অন্য সময়ে। স্টেশনে যাবার আগে প্রভাস আমাকে ব'লে দিল, কিছু ভাবিসনে, আমি সব ম্যানেজ ক'রে দেবো। টাকাকড়ির অভাব যদি ঘটে—আমি ত এখনো মরি নি।

বিকেলবেলাকার দেরাদুন এক্সপ্রেসে আমি কলকাতা রওনা হলুম। কাশী থেকে আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে খরচ হয়েছিল সাড়ে ছয় টাকা। আমার হাতেও কিছু ছিল। মা'র হাতে পঁচিশটি টাকা দিয়ে আমি আনন্দ পেলুম।

মা'র কাছে এসে দাঁড়ালেই আমি যেন সেইকালের অর্বাচীন শিশুতে পরিণত হই। আমি যে সৈন্যবিভাগে চাকরি নিয়ে বহু দূর দেশে চ'লে যাচ্ছি, একথা শুনে মা বললেন, একলা অতদূরে গিয়ে থাকতে পারবি ত ?

আমি খুব হাসলুম। পরে বললুম, কই, তুমি ত জিজ্ঞেস করলে না, বিদেশ বিভূঁয়ে অসুখ-বিসুখ করলে কে দেখবে ?

তোর অসুখ করবে ?—মার গলা ধ'রে এল। বললেন, কা'র জন্যে তবে আমার জপ-তপ-আহ্নিক ? সে সবই কি মিথ্যে হবে ? তুই যা, যেখানে খুশি যা, যতদূরে যেতে পারিস চ'লে যা! কোনদিন তোর পায়ে একটি কাঁটাও কখনও ফুটবে না।

মায়ের এই দৈববিশ্বাসের কথা ভেবে সেদিন আমার রোমাঞ্চ হয়েছিল। আমি মাত্র ছয়দিন ছিলুম কলকাতায়। কিন্তু চারদিনের দিন 'ক্যালকাটা বুক ডিপো' নামক প্রকাশকের মালিক আমার প্রথম অপদার্থ বই 'যাযাবর'-এর জন্য আমাকে একশ' টাকা দিলেন। সেই টাকা নিয়ে অপরাহ্ণকালে বাড়ি ফিরে মা'র হাতে দিয়ে প্রণাম করলুম। সাহিত্যকর্মে এই আমার প্রথম সর্বোচ্চ পরিমাণ উপার্জন! সেদিন মায়ের চোখে আনন্দের অশ্রু দেখেছিলুম!

একে একে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আবার কাশীযাত্রা করলুম। তখন জ্যৈষ্ঠমাসের প্রায় মাঝামাঝি। কাশীর পথের দুইদিক যেন জ্বলে পু'ড়ে যাচ্ছে। আমার শরীর আবাল্য শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। প্রবল বর্ষায় ছাতা ব্যবহার করিনে, প্রচণ্ড গরমে বাড়ির বাইরে থাকি, প্রবল শীতে শুধু খদ্দরের পাঞ্জাবি। আমি কোনদিন অসুস্থ হইনে, এই আমার অহঙ্কার। শাস্ত্রে বলে, সকল ব্যাধির জন্ম অজ্ঞানের থেকে!

আমার যাবার তোড়জোড় নিয়ে তখন আমি ব্যস্ত। কাশীতে কেউ চাকরি করে না। যা ক'রে, সে হ'ল মাস্টারি। কেউ কেউ অধ্যাপক, উকীল, বড়জোর ডাকঘরের লোক। সেদিক থেকে কাশী তখন কলকাতা অপেক্ষা একশ' বছর পিছিয়ে। যাই হোক, আমি একদিন আমার পাঁচসিকে দামের টিনের সুটকেশ, একটি শতরঞ্চি ও বালিশ নিয়ে সেই জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে রাওয়ালপিণ্ডি রওনা হয়ে গেলুম। কাশী থেকে রাওয়ালপিণ্ডি কমবেশি এক হাজার মাইল দূর। ট্রেনে যেতে তখন দুদিনের বেশি লাগে। তখন আমার দিল্লী পর্যন্ত জানা পথ। তারপর আম্বালা, লুধিয়ানা, জলন্ধর হয়ে অমৃতসর। দুই রাত্রি পেরিয়ে গেল। কিন্তু অমৃতসর থেকে লাহোর এবং লাহোর থেকে রাওয়ালপিণ্ডি গরমে খুবই কষ্টকর। লাহোর হ'ল ইরাবতী নদীর ধারে। অতঃপর একে একে বিপাশা,

চন্দ্রভাগা, শতদ্রু ও বিতস্তা—মোট পাঁচটি নদ পার হয়ে উত্তর পশ্চিমের দিকে বহুদূর পর্যন্ত গেলে তবে রাওয়ালপিণ্ডি। রাওয়ালপিণ্ডি জেলা সিন্ধু নদের পূর্ব প্রান্তে শেষ হয়েছে। ওপারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এপারে ভারতবর্ষ। প্রকৃতপক্ষে তখন প্রায় দু'হাজার মাইল লম্বা সিন্ধু নদই তিব্বতের পশ্চিম প্রান্ত থেকে আরম্ভ ক'রে আরব সমুদ্রের উত্তরে করাচির অববাহিকায় শেষ হয়েছে।

রাওয়ালপিণ্ডি জেলা একটি মনোরম উপত্যকা। জলহাওয়া অতিশয় ভালো। এই উপত্যকার উত্তর অঞ্চল শিবলিঙ্গ পর্বতমালার পশ্চিমপ্রান্ত, এখান থেকে অতি সুন্দর কয়েকটি পথের মধ্যে একটি গিয়েছে হাজারা, চিত্রল এবং গিলগিটের দিকে, আরেকটির নাম ঝিলম ভ্যালি রোড—যেটি 'সানি ব্যাঙ্ক' হয়ে 'কোহালার' দিকে নেমে বিতস্তা বা ঝিলম পেরিয়ে দোমেল, উরি ও বরামূলা ছাড়িয়ে শ্রীনগরে গিয়ে পৌছয়। রবীন্দ্রনাথ এই পথে শ্রীনগর গিয়েছিলেন। তিনি 'বান্নাল' বা 'বানিহাল' গিরিসুড়ঙ্গ অতিক্রম করেন নি।

এ অঞ্চলে আমি বহুদিন অতিবাহিত করেছি এবং আমার এই সৈন্য বিভাগের কাজ নিয়ে প্রথম লিখি 'দেশ দেশান্তর' গ্রন্থে, পরে 'দেবতাত্মা হিমালয়ে' এবং 'উত্তর হিমালয় চরিত' গ্রন্থে। সুতরাং এখানে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

শীতের ছ মাস রাওয়ালপিণ্ডি শহরে ও গরমের ছয় মাস মারী পাহাড়ের সাত হাজার ফুট উচ্চভূমিতে বসবাস—এই ছিল তখন সৈন্য দপ্তরের বিধি-ব্যবস্থা। আমার পরিচয় ছিল 'সৈনিক কেরানী'। আমি কাঁচা-হাতের টাইপিস্ট ছিলুম। উপরওয়ালারা খাস ইংরেজ। ক্যাপ্টেন, মেজর, লেফটেনান্ট, কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার, জেনারেল, কোম্পানী কমাণ্ডার, কমিশনড বা নন্-কমিশনড—প্রায় সবাই তখন ইংরেজ। আমাদের কপালে হাবিলদার, সুবেদার, লান্সনায়েক ইত্যাদি। আমি বাঙালী একথা ভুলতে হয়েছিল। পরনে ধুতি বা লুঙ্গি দেখলে লোক জমে যেত। আমি ছুটির দিনে পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করতুম। বাঁশরাগল্লি, চিকা গল্লি, ছাংলা গল্লি, চিপা গল্লি, পিণ্ডি পয়েন্ট, কাশ্মীর পয়েন্ট—সবই ঘুরতুম। 'গল্লি' মানে পাহাড়। কো মানে পাহাড়। সুতরাং এ পাহাড়কে বলা হয় কো-মারী।

তখন আমেরিকান জীপগাড়ির জন্ম হয় নি। সাহেবদের জন্য মোটর থাকত। সাধারণের জন্য ঘোড়া। আমি ঘোড়সওয়ার নই, সেজন্য অশ্বরক্ষীকে সঙ্গে নিতে হত। তন্দুরের মোটা রুটি, শুকনো সিদ্ধ মাংস, আপেল-আখরোট-

আঙুর—এই সব নিয়ে আমার ঝুলি ভরে থাকত। আঙুর টাকায় দশ সের, এককুড়ি কাশ্মীরী আপেলের দাম আট আনা, খোলাসুদ্ধ আখরোট এক টাকায় এক মণ। 'দুম্বা' ভেড়ার রোস্ট করা মাংস আধ সের ছ পয়সা। কিন্তু পাহাড়ী শহর মাত্রেই দুধের দাম বেশি, সেজন্য তিন আনা সের। ভাত কেউ খায় না, সবাই রুটি খায় খাঁটি ঘিয়ে ডুবিয়ে। এক বাটি ডালের ওপর আধ ইঞ্চি ঘি দাঁড়িয়ে থাকে। তরকারি ঘিয়ে রান্না। সরষের তেলের খবর কেউ রাখে না। পাহাড়ের পাঠান কুলিরা পাঁচ সাত মণ বোঝা পিঠে নিয়ে হেঁট হয়ে চড়াই ভাঙে!

আমার চেহারা, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাত্রা—একে একে সব বদলিয়ে যেতে লাগল। ভুলে গেলুম বহু দূরের বাঙলাদেশ। কাশী আর মনেই পড়ে না! আমি কথা বলি পাঞ্জাবী উর্দু'তে, আপিসে ইংরেজি, পাঠানদের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা পুস্তুতে। আমার আমূল পরিবর্তন ঘটল!

মাইনে পাই একশ' চার টাকা, কিন্তু বিভিন্ন খাতে আরও পাই পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ। বাসা ভাড়া, খাইখরচ, দুধ, চাকর, জলখাবার, জমাদারনি—সব মিলিয়ে আমার মাসে পড়ে বাইশ-চব্বিশ, বড় জোর পঁচিশ টাকা। আমি টাকায় ভাসছি! মাসে একবার মনে পড়ে মাকে—যখন পঞ্চাশ টাকার মনিঅর্ডার করি, নইলে তুমি কার, কে তোমার? মাকে ভাবব তখন, যখন বেদনায় যন্ত্রণায় দুঃখে দুর্দশায় বুকফাটা আর্তনাদ করব! যখন স্নেহ ভালোবাসা চাইব, সকরুণ সমবেদনার কল্যাণস্পর্শের জন্য যখন আতুর হবো, এ বিশ্বের সকল দিক নৈরাশ্যের অন্ধকারে যখন ছমছম করবে—তখন মা, শুধু মা, শিরা-উপশিরায় অস্থিপঞ্জরে অন্ত্রতন্ত্রের পাকে-পাকে ঝনঝনিয়ে উঠবে আমার মা!

না, এখন নয়। এখন অন্য কথা, অন্য চিন্তা। এখন ঘন পাইনের অরণ্যের ভিতর দিয়ে আমার ঘোড়া চলুক, এখন পেরিয়ে যাই নিরুদ্দেশ পাহাড়ের অজানা সরাইখানার পাশ কাটিয়ে। এখন আমার সেই মদের ব্রুয়েরীর বন্ধু জনি আর তার বউ রোশন।

লরেন্স কলেজের পথ ধরে কোথায় কোন্ দিকে যেন চলে যেতুম। যেন দূরে দূরে মধ্য এশিয়ার আভাস। সামনে পাইন বনে ভরা ছাংলা গল্লি, তার তলায় তলায় যেন অমরাবতীর ছায়ামধুর পথ। দূর উত্তর-পূর্ব দিগন্তে দেখতে পাচ্ছি নাঙ্গার চূড়া, আরও উত্তরে অস্পষ্ট কারাকোরম।

আমার সহকর্মীদের সমাজে আমি মিলিয়ে গিয়েছিলুম। বাবু জগদীশচন্দর,

আজিজ আহমেদ, রূপলালজী, বাবু লেখরাজ—এঁরা আমাকে সোনার চক্ষে দেখতেন। স্থানীয় এক বৃদ্ধ ডাক্তার বেদী, তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন একটি সেতার এবং আমাকে প্রথম নিয়ে যান দাদা জগদীশের বাসস্থানে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। সেখানে ভাবীজী, মায়া দেবী এবং দাদা জগদীশের কুমারী ভগ্নী সরস্বতী। আমার অপরাধ, সরস্বতীকে আমি দু-চার বার রবীন্দ্রনাথের কবিতা ব্যাখ্যা করে তাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলুম। পশ্চিম পাঞ্জাবের সম্ভ্রান্ত সমাজে যেমন হয়, সরস্বতী খুবই সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী। তার পরনে থাকত শালোয়ার আর লেসতোলা কামিজের ওপর ঘন বেগুনী জ্যাকেট। পিছন দিকে কৃষ্ণসর্পের মতো ঝুলতো দীর্ঘলম্বিত বেণী। কিন্তু আমার চোখে তখনও বাসনার রং এসে পৌছয় নি। আমি একপ্রকার নির্বোধ হাসিমুখে ওদের সকলের রূপরাশির দিকে চেয়ে থাকতুম।

ডাঃ বেদী ঘটকালির দিক থেকে একটু যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলছিলেন। আমার মনকে ঘুষ খাওয়াবার চেষ্টা চলছে। জগদীশ কাপুর ইচ্ছা করলেই আমার চাকরির উন্নতি করে দেবেন। আমার দুশ' টাকা মাইনে হতে দেরি লাগবে না। ওরাও কাশ্যপ গোত্রের ক্ষত্রী ব্রাহ্মণ। সরস্বতী হল ডাঃ বেদীর ভগ্নিপতি গুর্দাস কাপুরের কন্যা। ফলে হল এই, আমি আর ওঁদের বাড়িতে যেতে পারলুম না, এবং ম্যাল-এ ওঁদেরকে সপরিবারে বেড়াতে দেখলেই আমি মাথা নীচু করে চলে যেতুম—পাছে সরস্বতীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়।

বিয়ে করব? কই না, একথা ভাবি নি ত একবারও? আমি বিবাহিত জীবন চাইছিনে, চাইছি বন্য দুর্বার জীবন। বল্গাহারা বাঁধনহারা সেই জীবনটা ভীষণ হোক, দুর্ধর্ষ হোক, বেপরোয়া হোক—সেখানে মেয়েদের ঠাঁই কোথায়? মেয়ে মানে ত আরামের শয্যা, মেয়ে মানে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুগত্য। না, মিলবে না আমার সঙ্গে, মেলাতে পারব না। আমি চাইছি নিত্য উদ্বেলতা, চাইছি তার সঙ্গে গতি, পৌরুষের অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়। আমি চাইছি জীবন-জোড়া বিপ্লব। অহেতুক বিশ্রাম বা অনড় শান্তি আমি চাইনে।

ডাঃ বেদী এ নিয়ে আরেকদিন আলোচনা তুলেছিলেন। সেদিন আমার মেজাজ ভাল ছিল না। বললুম, আমার যোগ্যতা থাকলে আমার চাকরির উন্নতি ঠিকই হবে। এ নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাবেন না। তা ছাড়া দেশে আমার মা আছেন, তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি আমার কথাবার্তা বলা দরকার। আমি নিজেও এসব কথা ভাবিনে।

ওঁদের সমস্যা হল সরস্বতীর নাকি উনিশ বছর বয়স হতে চলল। তা

চলুক, ওতে আমার দায়িত্ব কোথায়? একটি মেয়ে ভরা যৌবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই অপরাধে আমার গলায় ফাঁস টানব? না, অত উদারতা আমায় নেই।

আমি কনিষ্ঠ কেরানী। ফাই-ফরমাস আমাকেই খাটতে হয়। কয়েক মাস কাজে ঢুকেছি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝেই আমার ওপর অর্ডার হচ্ছিল এখানে ওখানে যাবার। আমার কাজ জেনেছি, হাত পেকেছে এবং ফাইলে রপ্ত হয়েছি। এক-একটা ট্রিপ কম নয়। বার বার আমাকে নেমে আসতে হয় মারী থেকে পিণ্ডি। পিণ্ডি থেকেই আমাকে ট্রেনে, টাঙ্গায় বা মিলিটারি ট্রাকে যেতে হয় আমার সঙ্কেকার কাগজপত্র দেখিয়ে। আমি একটু উঁচুদরের বার্তাবাহী বা পিওন—এই আমার পরিচয়। যাই হোক, এইভাবেই গিয়ে পৌছই সেই সব সীমান্ত শহরে—যাদের নাম কোহাট, বান্নু, চাকলালা, ওয়াজিরিস্তান, ডেরা ইসমায়েল খান, ডেরা গাজি খান ইত্যাদি। রুক্ষ, ধূসর তৃণলতাশূন্য পাহাড়-প্রান্তর—দূরে দূরে পাঠান-বস্তি, মাঝে মাঝে সরাই—সেখানে প্রবেশ নিষেধ। আমি সৈনিক-কেরানী, কিন্তু সাহেবদের কাছে আমি নগণ্য এক পেয়াদা মাত্র। এটা সীমান্ত অঞ্চল। ইংরেজরা উপজাতীয়দেরকে বিশ্বাস করে না। ওদের অবাধ স্বাধীনতা বৃটিশরা পদে পদে খর্ব করতে চায়—এই ওদের আক্রোশ। ওরা অতিশয় বলবান, দুর্ধর্ষ এবং ভয়হীন জাতি। এই সব কারণে সাহেবদের মতো আমাকেও কাঁটাতারের বেড়াজালের মধ্যে থাকতে হত। ওদের মধ্যে মিলেমিশে আছে বালুচি-পাঠান, খাজুড়ি-পাঠান, হাজারা-পাঠান। এ ছাড়া আছে মালাকান্দি, মার্দানি, তুচি—আরও নানা সম্প্রদায়। আমাকে নানাবিধ নিষেধ মেনে চলতে হত। সবচেয়ে বড় নিষেধ ছিল, সীমানার বাইরে যাওয়া চলবে না। আমি একটা ধূসর ঊষর রাজ্যে বিচরণ করছিলুম।

আমার এই যাওয়া এবং আসার জন্য সরকারী হিসাব অনুযায়ী সর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ রাহাখরচ পেতুম, কারণ আমি কনিষ্ঠ কেরানী। কিন্তু এই কম পরিমাণটাও আমার কাছে ছিল প্রচুর। যেখানে আমার কুড়ি-পঁচিশ টাকা সবসুদ্ধ পড়ে সেখানে আমি পেয়ে যেতুম কমবেশি একশ' টাকা। সে-সব টাকা খরচ করার উপায় যে ছিল না তা নয়, কিন্তু আমার সাহসে কুলতো না।

একবার আমাকে পাঠানো হল পেশাওয়ারে। সেই প্রথম পেশাওয়ার। আমি 'এম-টি সেকশনের' লোক। সমস্ত যানবাহনের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার জন্য আমাকে গাড়ির সঙ্গে ঘুরতে হত। জমরুদ, আলি-মসজিদ, রক্ত-

বরণ বিরাট শাগাই দুর্গ, লাণ্ডি কোটাল এবং সেই লাণ্ডিখানা পর্যন্ত আমাকে যেতে হত খাইবার গিরি-সঙ্কটের ভিতর দিয়ে। ওখানকার সুড়ঙ্গ-রেলপথ মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল দীর্ঘ—এই রেলপথটি বাঙ্গালী ইনজিনিয়াররা নির্মাণ করেছেন কমবেশি একশ' সুড়ঙ্গ কেটে—এই পথে আফ্রিদি পাঠানদের সঙ্গে আমার দেখা হত। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় যখন তাদের সঙ্গে কথা বলতুম, তারা কৌতুক বোধ করত, এবং ঝুলির ভিতর থেকে দু-একটা আপেল বের করে আমাকে উপহার দিত। আমি দেখতুম ওদের সুন্দর সুদর্শন চেহারা, সাংঘাতিক বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ত বড় বড় চোখ, এবং সরল সহাস্য মধুর ব্যবহার। বৃটিশরা ওদের নামে যত কলঙ্ক রটিয়ে বেড়াচ্ছে, তার একটাও ওদের সঙ্গে মিলছে না। আমি জানতে চাইতুম, ওরা রেলগাড়ি চড়ছে যখন-তখন, কিন্তু টিকিট কাটে না কেন। ওরা বলত, ওদের কাছে টিকিট চাইবার সাহস কারও নেই। তা ছাড়া এটা ওদের এলাকা, এখানে 'দুশমনরা' জবর-দখল করে রয়েছে ওদের গোলাগুলির জোরে। ওদের সবচেয়ে বেশি আক্রোশ পাঞ্জাবী জওয়ানদের ওপর। তাদেরকে ওরা আংরেজকো কুত্তে বলে মনে করে। ওরা ভারত বলে না। বলে, হিন্দুস্তান। যাই হোক, গোরা-ছাউনির বাইরে আমার পক্ষে যাওয়া যদিও ছিল নিষিদ্ধ, তবুও একদিন কয়েক ঘণ্টা ফাঁক পেয়ে গা-ঢাকা দিয়ে গেলুম পেশাওয়ার শহরে। সে-শহর মধ্য এশিয়ার মধ্যযুগীয় শহর। সেখানে আমিই একমাত্র 'হিন্দুস্তানী'। যত দূর দেখা যায় শুধু বালু পাথর পরিকীর্ণ বস্তি। একটি দুটি অনামা গাছ। সবুজ রং বলতে কোথাও কিছু নেই। প্রতি ব্যক্তির হাতে বা কাঁধে বন্দুক। সঙ্গে একটা ঝোলা, তার মধ্যে থাকে শুধু শুকনো মোটা রুটি, বাছুরের কিংবা দুম্বার শুকনো সিদ্ধ মাংস, ওই সঙ্গে আপেল, বাদাম, আঙ্গুর আর রাশি পরিমাণ বন্দুকের গুলি। পরনে ওদের ছেঁড়া ময়লা শালোয়ার, কামিজের ওপর ছেঁড়া জ্যাকেট, মাথায় স্কাল-ক্যাপ, সর্বাঙ্গে একপ্রকার বন্য দুর্গন্ধ। এ জীবনে ওরা কবার স্নান করছে তা আঙ্গুলে গুনতে হয়, সাবান কখনও চোখে দেখেছে কি না সন্দেহ, এবং যদি আমাকে একবারও সন্দেহ করে যে, আমি বৃটিশ পল্টন দপ্তরের লোক, তবে সেইখানেই আমার অনিবার্য অপমৃত্যু—এবং সেই মৃত্যু-সংবাদ কস্মিনকালে আমার আপিসে পৌছবে না। শুধু এই রেকর্ড থাকবে যে, আমি নিরুদ্দেশ।

আমি ভ্রাম্যমাণ এবং ওদের 'মেহমান'—এটা ওরা বিশ্বাস করে নিয়েছিল। ফলে, আমার কপালে সেদিন আতিথেয়তা জুটে গেল। ভেড়ার দুধ মেশানো

কফি, একগোছা কালো আঙুর, রুটি আর মাংস, তার সঙ্গে বাদাম আর আপেল। গত কয়েক মাসে আমার স্বাস্থ্যের চেহারা সম্পূর্ণ বদলিয়ে গিয়েছে। এখন নিয়মিত একসারসাইজ করি, সহকর্মীদের সঙ্গে আমার পুরনো অভ্যাস-মতো পাঞ্জা লড়ি, এবং আমার কব্জির জোর নেহাৎ মন্দ নয়! কিন্তু এখানে এক সমবয়স্ক তরুণ পাঠানের সঙ্গে দুর্মতিবশত পাঞ্জা লড়তে গেলুম, এবং সে বন্দুক ও ঝোলা নামিয়ে হাসিমুখে হাত বাড়ালো। তার সুন্দর, লম্বা ও লৌহকঠিন আঙুলগুলো আমার পাঞ্জা ধরল এবং সেকেণ্ড দশেকের মধ্যে আমার হাত মুচড়িয়ে দিয়ে আমাকে পরাজিত করল! বার বার তিনবারই আমি হারলুম এবং আমার অহঙ্কার চূর্ণ হল! এই ছেলেটাই আমাদের সেই আড্ডায় বসে যখন গজল ভাঁজতে আরম্ভ করল, তখন দেখি তার একখানা পায়ের নিচের দিকে দরদরিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে! আমি যখন সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম, তখন তার মনে পড়ে গেল তার এক বন্ধু রাগের বশে তার পায়ে গুলি মেরেছে! ছেলেটা আমাদের কাফিখানা থেকে একখানা ছুরি নিয়ে নিজের পায়ের সেই অংশটা একটু চিরে দিয়ে দুটো ছররা বার করে দিল! এসব ওর কাছে যেন বিশেষ কিছু নয়।

দ্বিতীয়বার পেশাওয়ারে এলুম যখন লর্ড সাইমন ও মিঃ এটলি—দুজনে দলবল নিয়ে ওখানে এসেছিলেন। ওটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'সাইমন কমিশন'। ওই কমিশনকে বয়কট করার জন্য তখন ভারতব্যাপী আন্দোলন চলছে। আমি ছিলুম সেদিন সাধারণ নাগরিকের পরিচ্ছদে। সুতরাং আমার পিছনে লেগেছিল বৃটিশ ভারতীয় এক দক্ষিণী গোয়েন্দা। বলা বাহুল্য, আমার পকেটে ছিল আমার নিজস্ব পরিচয়পত্র। প্রথমবারের যাত্রায় এতটা বুঝি নি, কিন্তু এবার এসেছি তক্ষশীলা, ক্যাম্বেলপুর ও অ্যাটক হয়ে। তক্ষশীলা থেকে উত্তরে একটি সুন্দর প্রাকৃতিক শোভাসম্পন্ন মসৃণ পথ চলে গেছে হাভেলিয়ান-এর দিকে। তারপর থেকে আমার জানা পথ। পার্বত্য এবং পাইন-বনময় পথ ওখান থেকে একদিকে গেছে নাথিয়াগলি, এবং আরেক দিকে আব্বটাবাদ হয়ে মুজাফ্-ফরাবাদ চলে গেছে। এ অঞ্চলের নাম 'দোমেল', অর্থাৎ দুটি নদীর সঙ্গম। একটি কৃষ্ণগঙ্গা, অন্যটি বেদস্তা, অর্থাৎ বিতস্তা বা ঝিলম্। এই নদীতটের পথের নামই 'ঝিলম ভ্যালি রোড'। কাশ্মীরে পৌঁছবার তখন সহজসাধ্য দ্বিতীয় পথটি হল লাহোর-শিয়ালকোট-সুচেতগড় ও জম্মু। কিন্তু এই পথে 'বান্নাল' বা বানিহাল গিরি-গহ্বর অতিক্রম করতে হত।

যাই হোক, আমার পথের প্রত্যেকটি স্টেশনই হল তখনকার গোয়া

ছাউনি। ইংরেজ তৎকালে বিভিন্ন উপজাতিদেরকে কোনও কারণেই বিশ্বাস করে নি। ওদের প্রকৃত শক্তি ও হিংস্রতার চেহারা কি প্রকার এটি সঠিকভাবে জানার জন্য বৃটিশরা মাঝে মাঝে উপজাতিদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলত। এমন ঘটনা সে-সময়ে প্রায়ই শোনা যাচ্ছিল, দুটি বলবান ইংরেজ সৈন্যকে একজন মাত্র পাঠান খেলার পুতুলের মতন বেড়ার ভিতর থেকে তুলে নিয়ে পালিয়েছে ওদের পার্বত্য বিবরগুলির মধ্যে। সেই বিবরগুলি প্রায় প্রত্যেকটি পাহাড়ে অসংখ্য ছিদ্রের মতো দেখা যায়। আমার মনে হত ওগুলি জন্তুদের গর্ত। এই সুড়ঙ্গ পথগুলি পাহাড়ের অন্তরালে গিয়ে ছোট ছোট বস্তির মধ্যে শেষ হয়। সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অতিশয় উঁচু এক-একটি ওয়াচ-টাওয়ার। এই গম্বুজের উপর থেকে ইংরেজ দুশমণদের গতিবিধি ওরা লক্ষ্য করে। জমরুদ দুর্গ থেকে শাগাই দুর্গের দিকে যাবার পথটা যেন একটা নিত্যকার রণক্ষেত্রের মতো থমথমে। শাগাই থেকে লাণ্ডিকোটাল একটি অতি বিস্তীর্ণ উপত্যকা ইংরেজের সীমিত দখলে রয়েছে—যার একদিকে অর্থাৎ পশ্চিমে আফগান সীমান্ত এবং তিনদিকে পাখতুনদের স্বাধীন ভূভাগ। এই অঞ্চলটির নাম 'ডুরাণ্ড' লাইন। এই লাইনের আশেপাশে ইংরেজদের সঙ্গে ওদের সংঘর্ষ লেগেই থাকে। 'উত্তর হিমালয় চরিত' গ্রন্থে এর বিশদ আলোচনা আছে।

অ্যাটক পুল পার হচ্ছিলুম রাত্রে। সেদিন হিমেল জ্যোৎস্না ছিল। এর আগে ক্যাম্বেলপুর স্টেশনে মেয়েছেলে এক-আধজন যদি কেউ ট্রেনে থাকে—তারা নেমে যায়। হোক না কেন তারা অফিসারদের বউ বা মেয়ে—তারা অ্যাটকের পুল পার হয় না। এটি রাওয়ালপিণ্ডি জেলার শেষ প্রান্ত। এর পরেই উপজাতিদের সীমান্ত—মেয়েছেলের পক্ষে এ ভূভাগ নিষিদ্ধ। তারা ওদিকে নিরাপদ নয়। অ্যাটকের সেতুর নিচে সেই মলিন জ্যোৎস্না ঝিকমিক করছিল সিন্ধুনদ ও কাবুল নদীর ওপর—ও দুটি স্রোত এইখানে মিলেছে। ওই ধূসর জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে যে অস্পষ্ট দেশান্তর সেদিন দেখতে পাচ্ছিলুম সেটি আর যাই হোক, আমাদের পরিচিত ভারতীয় পটভূমির চেহারা নয়। প্রেতচ্ছায়ার মতো নগ্নকায় অনুর্বর একটা পার্বত্যলোক, যেটা বালু-পাথরের কর্কশ রুক্ষতা নিয়ে কালের প্রহরীর মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার দুই চক্ষে যেন ধরা রইল চিরকালের এক বিস্ময়। আমাদের গাড়িতে সে রাত্রে আমি একা নই—ছিল আর দু'জন উপজাতীয় পাঠান। তারা বেঞ্চে ব'সে রয়েছে কিন্তু আমি দাঁড়ালে তবে তাদের মাথার সমান হই। গাড়ির ভিতরে আলো অতি মৃদু, পরস্পরের মুখ ঠাহর করা যায় না। পাছে এ গাড়ি দস্যুর

দ্বারা আক্রান্ত হয়, এ ব্যবস্থা তারই জন্য।

অ্যাটক সেতু পেরিয়ে অপ্রশস্ত কাবুল নদীর ধার দিয়ে আমাদের গাড়িখানা অন্ধকারে মৃদুগতিতে এগোচ্ছে যেন এক অতিকায় এবং কৃষ্ণকায় সরীসৃপের মতো। কিন্তু এ গাড়ি পেশাওয়ারের আগে কোথাও থামবে না এটি জানা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত দুটি পাঠান হঠাৎ এক সময় উঠে সেই চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে গেল। ঠিক সেই সময় আমার গা একটু ছমছম ক'রে উঠেছিল। একেই ত আমি ছাড়া অন্য আর কেউ রইল না এই বৃহৎ কমপার্টমেণ্টে, তার ওপর দরজাটা রইল খোলা।

কিন্তু অজানায় আর অন্ধকারে আমার ভয় পেলে চলবে কেন? আমি পণ্টন-দপ্তরের লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু সেইটিই কি আমার প্রধান পরিচয়? আমি বেরিয়ে এসেছি বাইরের জীবনের অপ্রতিরোধ্য ডাকে। অদৃশ্য কেউ আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে নিরন্তর ইশারায় দূর-দূরান্তরে ডাকছে। আমি সম্মোহনের দ্বারা অভিভূত হয়ে সেই ইশারার পথ ধ'রে চলেছি। সেই ইশারাই কি আমার নিয়তি? সে কি চিরদিন চলেছে আমার সঙ্গে সঙ্গে? তবে কি অশরীরী কেউ আমার হাত ধরে নিয়ে চলেছে এক অজানা থেকে অন্য অজানায়?

পরদিন প্রভাতে সেবার পেশাওয়ারে পৌঁছেছিলুম।

এর মধ্যে একবার ডাক এলো ম্যানুভারিং-এ, অর্থাৎ মিলিটারি কলাকৌশল শিক্ষাদানের একটা ব্যবস্থাক্ষেত্রে আমাদের যেতে হবে। এটা বৃহৎ ব্যাপার। যুদ্ধের প্রয়োজন ঘটলে তার ঘাঁটি প্রস্তুতের শিক্ষানবীশী। আমরা থাকব 'স্যাপার্স অ্যাণ্ড মাইনার্সের' পিছনে। যান্ত্রিক যুদ্ধই হবে আগামীকালের সংগ্রাম নীতি। পথ পরিষ্কার করবে স্যাপার্স অ্যাণ্ড মাইনার্স, তার পিছনে পিছনে যাবে আর্মার্ড ডিভিশন, আমাদের 'এম-টি' রসদ যোগাতে থাকবে তারও পিছন থেকে। যুদ্ধে রসদ যোগানই যুদ্ধের প্রধান কাজ। সীমান্তের দিকে 'কমব্যাটাণ্ট' সৈন্যদলের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য বলতে তখন বোঝাতো পাঞ্জাবী, বশম্বদ পাঠান ও বালুচি এবং শিখ। সেনাপতি বা ব্রিগেডিয়র—সবাই ইংরেজ। এতে পারস্পরিক ঘৃণার মনোভাবটিকে জাগিয়ে রাখা চলত। পাঞ্জাবের মুসলমানদের সঙ্গে পাখতুনদের বিরোধ বজায় রাখা প্রয়োজন! এইসব কারণে এক একটা রেজিমেণ্ট সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভাগ ক'রে রাখা হত। শিখ, ডোগরা, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মারাঠা, ঝাঁসী, গোর্খা, কুমায়ুন—এগুলি সব ছিল পৃথক এবং সূক্ষ্ম দ্বৈতনীতির দ্বারা এদেরকে পরিচালিত করা হত।

ম্যান্নুভারিংয়ের' মাঠে মাঠে এই কলা-কৌশলের নীতি আমার চোখে পড়ত। রাজনীতিক আন্দোলন ছাড়া বৃটিশ শাসকরা ভারতের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল নিয়ে মাথা ঘামাত না। তাদের সমস্ত সামরিক শক্তি নিয়োজিত থাকত উত্তর-পশ্চিম ভারতে। সেই কারণে আমাদের এই নর্দার্ন কমাণ্ড তখন ছিল সর্বশক্তিমান। তৎকালে জঙ্গীলাট থাকত নামে মাত্র বড়লাটের অধীন, সেটা শুধু কাগজে-কলমে—আসলে জঙ্গীলাটের উপরেই থাকত ভারতরক্ষার সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব। রাওয়ালপিণ্ডির ক্যাম্পে তখন সদাসর্বদা শুধু পঞ্চাশ হাজার বৃটিশ সৈন্যই মজুত থাকত। ক্যাম্পটির নাম ছিল 'ওয়েস্টরীজ'।

একমাসকাল ধ'রে ম্যান্নুভারিং চলবে কাশ্মীর এলাকার মধ্যে। আমাদের গাড়ি 'সানি ব্যাঙ্ক' হয়ে কোহালার দিকে নেমে গেল ঝিলম নদীর তীরে। এখানে পুল পার হলেই জম্মু ও কাশ্মীর এলাকা এবং উত্তর-পূর্ব পথ শ্রীনগরের দিকে চলে গেছে। পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার নিচে পাহাড়ঘেরা এক অতি বিশাল প্রান্তরে সেনাদলের কুচকাওয়াজ, হাইল্যাণ্ডার্সদের বিভিন্ন প্রকারের অনুশীলন, সৈন্যব্যূহ-রচনার কলাকৌশল, কামানের গাড়ির গতিবিধির বিভিন্ন নিয়ম নির্দেশ—এই সব একে একে যখন চলছে, তখন সহসা শ্রীনগর থেকে একটি নাটকীয় দুঃসংবাদ এল। কাশ্মীরের মহারাজার তরফ থেকে নর্দার্ন কমাণ্ড হেড-কোয়ার্টার্স জানতে পেরেছেন, গতকাল অমরনাথ তীর্থযাত্রার পথে পঞ্চতর্নীতে ভয়াবহ এক বিশাল অ্যাভালান্স নেমে আসে এবং অগণিত সংখ্যক তীর্থযাত্রী সেই হিমবাহে চাপা পড়ে। তাদের সংখ্যা দু' হাজারের কম নয়। এই মুহূর্তে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রয়োজন।

সেই আমার প্রথম শ্রীনগরে পদার্পণ।

মোটর ট্রাকে রসদ বোঝাইয়ের দায়িত্ব ছিল 'মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট সেকশনের, অর্থাৎ আমাদের। আমি ওদের দলের মধ্যে একজন নগণ্য সহকারী মাত্র—আছি কেবল হুকুম তামিলের জন্য। সুবিধা ছিল এই, ডোগরা আর পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের লোকরাই ছিল অধিকাংশ। মাঝে মাঝে এক আধজন মেজর বা ক্যাপটেন। তখন আমরা ক্যাম্পে খেয়ে নিতুম রুটি মাংস বা সব্জি। শ্রীনগর থেকে প্রথমেই পাঠানো হল প্রায় দুশ' ঘোড়া তাদের পিঠে কম্বলের বোঝা নিয়ে। ঔষধপত্র, মিলিটারি ডাক্তার, প্রচুর খাদ্যসম্ভার ও জ্বালানি কাঠ—এরা গিয়ে পৌঁছতে লাগল পহালগাঁওয়ে—শ্রীনগর থেকে ষাট মাইল দূরে। শোনা যাচ্ছে অধিকাংশ তীর্থযাত্রী নিখোঁজ। হিমবাহের আয়তন ছিল নাকি তিন বর্গমাইল, এবং তা'র উচ্চতা ছিল নাকি পঁচিশ ফুট।

এই দানবাকার বিশাল একটা তুষারশিলা পিছলিয়ে এসেছিল পঞ্চতর্নীর দিকে। পালাবার পথ ছিল না কারও।

স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ছিল কয়েকটি সিন্ধি ও পাঞ্জাবী প্রতিষ্ঠান। কিছু কিছু কাশ্মীরী। আমি ছুটি পেলুম দিন দশেকের। এরপর আবার আমাকে মারী-পাহাড়ের আপিসে রিপোর্ট করতে হবে অমুক তারিখে, অর্থাৎ আমার হাতে সম্পূর্ণ নয়দিন সময় আছে। যদি এখনকার জরুরী অবস্থায় আমি ট্রান্সপোর্ট না পাই, তাহলে ঘোড়া নেবো এবং সেক্ষেত্রে আরও চারদিন আমার ছুটি বাড়বে।

চারিদিকে পাহাড়ঘেরা শ্রীনগরের পথেঘাটে তখন শুধু ঘোড়া। ঝিলমের এপার-ওপার মিলিয়ে তখন শহর। শহর পুরনো এবং দরিদ্র। বস্তিতে, নর্দমায়, সুড়ঙ্গে, দুর্গন্ধে, নোংরায় পুরনো শহর আকীর্ণ, এবং বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এই সামন্ত রাজ্যের মধ্যযুগীয় চেহারা তুলনা করলে খুবই খারাপ লাগে। নগরের 'পশ' এলাকায় আমাদের পক্ষে যাওয়া নিষিদ্ধ। সেটা কাশ্মীর মহারাজার প্রশাসন কেন্দ্র।

ঘোড়া ও টাঙ্গা এই ছিল আমার যানবাহন। চারিদিকে আমার ভূস্বর্গলোক কাশ্মীর, সেই আমার দেখার ইচ্ছা। তখন আমার দুর্বার কর্মোদ্দীপনা এবং তেজোচাঞ্চল্য। দেখতে পাচ্ছিলুম অনাদরে অযত্নে ধূলায় রৌদ্রে ঠাণ্ডায় বর্ষায় আমার দেহচর্ম ও স্বাস্থ্য তৈরি হয়েছে—রোগভোগের ভয় অতটা আমার নেই। সেই কারণে দুর্গমে ও দুঃসাধ্য পথযাত্রায় আমি ভয় পাইনে। সেদিন সন্ধ্যায় সময় ওই তেলের আলোজ্বালা শ্রীনগরের আমীরা-কদলের সামনে লালচৌকে ঘুরে ঘুরে আমি একখানা নতুন টাঙ্গা ও তার সুপুষ্ট ঘোড়াটাকে ঠিক করলুম। প্রতি ঘণ্টায় ছয় আনা দেবো—গাড়োয়ানের সঙ্গে স্থির হল। আমাকে নিয়ে যাবে সোপোর থেকে তেগাঁও, এবং তারপর গুরেজ, লোলাব, দুধনিয়াল, তারপরে আছে কৃষ্ণগঙ্গা ও মধুমতী। আমি কিছুই জানিনে কোন্ পথ দিয়ে কোন্ পাহাড় ডিঙ্গিয়ে কোন্ নদী পেরিয়ে আমি আমার লক্ষ্যস্থল সরস্বতী-শারদাপীঠে পৌছব! শুধু এইখানেই জেনেছি, এখান থেকে কমবেশি একশ' মাইল পথ।

টাঙ্গাওয়ালা শের মহম্মদকে আমি দু' টাকা অগ্রিম দিয়ে রাখলুম। পরদিন সকাল আটটায় আমি যাত্রা করব। স্থির করলুম, আমি 'আমীরা-কদলে'র কাছাকাছি একটা হোটেলে রাত কাটাব—কেননা এখন আমি ছুটিতে আছি।

ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে মানুষের সামাজিক ও নৈতিক জীবন ভেঙ্গে পড়ে। ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি মানুষের পাশব প্রবৃত্তিকে খুঁচিয়ে তোলে। রিলিফের তাঁবু পড়েছিল চন্দনওয়ারি আর পহলগাঁওয়ে কিন্তু ওই সব রিলিফের তাঁবু থেকে একটি যুবতী স্ত্রীলোক কেমন ক'রে যেন ছিটকিয়ে আসে শ্রীনগরে। আমার হোটেলের সামনে ফলের বাজারের কাছে দাঁড়িয়ে যখন তাকে কাঁদতে দেখলুম, তখন আমি এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালুম। বয়সে আমার চেয়ে সে একটু বড়ই হবে। জিজ্ঞেসপড়া করে জানলুম, সে সিন্ধুদেশের মেয়ে। গিয়েছিল অমরনাথে। ফিরবার সময় এই বিপত্তি। 'মহাগুনাস'-এর কাছে সে কোনওমতে পাহাড়ের উঁচুতে উঠে একটা গাছের শিকড় আঁকড়িয়ে ধ'রে সেই অবস্থায় দু'দিন কাটায়। তারপর এক পাঞ্জাবী সাধু তাকে উদ্ধার করে। সাধুর সঙ্গেই সে চন্দনবাড়ি এসে পৌঁছয়, কেননা তা'র দলবল ও সঙ্গীসাথী সবাই ওই হিমবাহের আক্রমণে নিখোঁজ হয়ে গেছে। সাধুই ওকে বাঁচিয়ে সুস্থ করে তোলে। স্ত্রীলোকটি এখন দেশে ফিরতে চায়। ওর কথাবার্তা শুনে আমি ওকে দুটো টাকা দিয়ে চলে গিয়েছিলুম।

কিন্তু ওখানেই শেষ নয়। আমার হোটেলের তেতলায় এক টাকা দিয়ে একটি ঘর নিয়ে আমি সারাদিন পরে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলুম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মনে নেই। যখন চমক ভাঙল তখন চারদিকের নিশুতি চেহারা দেখে বুঝলুম অনেক রাত। আমার খাওয়া হয় নি এখনও। কিছু খেতে গেলে নিচের তলায় যেতে হবে।

আমি কখনই ভাবি নি এ দৃশ্য আমার চোখে পড়বে। সেই স্ত্রীলোকটি যে তার সিপসিপে গেরুয়াধারী সঙ্গীটির সঙ্গে এই হোটেলের তেতলায় উঠে জায়গা নিয়েছে কে জানত? ওটা ঘর নয়, ছাদের ধারে বারান্দাটা চওড়া হয়েছে মাত্র। ওরা সেই নিশুতি রাত্রে রতিরঙ্গে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্থূল রিরংসার বর্ণনায় বক্তার মনোবৃত্তিও কতকটা প্রকাশ পায়। সুতরাং আমার পক্ষে আর কিছু বলার দরকার নেই। শুধু এইটুকু বললেই হবে, এ দৃশ্য আমার জীবনে এই প্রথম! আমার পায়ের শব্দ পেলে পাছে ওই বিবস্ত্রা নারী বিপন্ন বোধ করে, সেজন্য ঘর থেকে আর পা বাড়ালুম না। নিঃশব্দে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলুম। সেই রাত্রির অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমার প্রশ্নগুলো বাদুড় ও চামচিকার মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। এই মেয়েটাকে নিয়ে তৎকালে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে একটি ছোট গল্প লিখেছিলুম।

ভ্রমণবৃত্তান্ত বলে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় এবং এক্ষেত্রে তীর্থযাত্রার বর্ণনা করতেও আমি নারাজ। সে-সব অন্য প্রসঙ্গ।

প্রতিদিন প্রভাতকাল থেকে আমার চোখ খুলছিল নতুন নতুন বিশ্বের দিকে। আমার পুরনো ইতিহাস হারিয়ে গেছে। আমার সেই আগেকার মন বা আগেকার সেই জীবন বিস্মৃতির তলায় মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রতি প্রভাতে আমার নবজন্ম ঘটছে। আমি বিচিত্রের আস্বাদ পাচ্ছিলুম প্রতি পদক্ষেপে।

সোপোর জনপদ ছাড়িয়ে অনেকটা সমতল পথ ধরে বিরাট উলর হ্রদ পাশে রেখে চলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু ঠিক কোন্‌দিকে যাচ্ছি সে আমার ঘোড়াওয়ালা শের মহম্মদ জানে। কাশ্মীরবাসীর সরলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ঘোড়া-ওয়ালাকে আমি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করি। ওর সর্বপ্রকার খাইখরচ আমি দিই। প্রায়ই একই সঙ্গে খাই। ঘোড়ার খাইখরচ ওর নিজের। ওর টাঙ্গা ও ঘোড়া আমাকে অবাক করেছে। ঘোড়াটা বোধ হয় পাহাড়ী বলেই অনায়াসে সে চড়াইপথে উঠে যায়।

'দুধনিয়াল'-এর পর একে একে 'লোধাবন, তেজোবন, জুমাগন্দ, শীতলবন, রঙ্গবতী।' এর পর 'শিরহশীলা', তারপর কৃষ্ণগঙ্গা, ঘোষক্ষেত্র ও মধুমতী। এখান থেকে সোজা উত্তর দিকে নগরাজ নাঙ্গা, পূর্বে হরমহেশ, তারপর তুষার-শুভ্র কারাকোরমের শাখাপ্রশাখা—আমি তখন লোলাব উপত্যকার উত্তর প্রান্তে গণেশগিরি বা গণেশঘাটির দিকে চেয়ে রয়েছি। যেন এ বিশ্বের বিস্ময়-লোক।

গণেশঘাটির চড়াইপথ সেদিন অনায়াসে অতিক্রম করেছিলুম পায়ে হেঁটে। শের মহম্মদকে দশটি টাকা দিয়ে পিছনে রেখে গিয়েছিলুম। সে এক বিজন ভীষণ লোক। প্রাণীশূন্য জনশূন্য পার্বত্য পথ চলে গেছে নদীর ধারে ধারে। মানবসভ্যতার কোনও চিহ্ন নেই কোনদিকে। দেবী সরস্বতী-শারদার মন্দির কারা যেন বিনষ্ট করেছে কতকাল আগে। 'সর্গন' নামে কাছা-কাছি আছে এক নদী, তারই ভিন্ন নাম সরস্বতী। আছে 'মধুমতী' তারই তীরভূমিতে ব'সে নাকি পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করতে হয়। পাহাড়ের ঠিক নিচে এক বস্তির সংবাদ দিয়েছিল শের মহম্মদ। বস্তির বাসিন্দারা দার্দ সম্প্রদায়ের লোক। এদের বিরুদ্ধে অপবাদ আছে এরা পুরুষ-পরম্পরায় ডাকাতি ক'রে খায়। সে যাই হোক, তখন শারদামাহাত্ম্য, শারদাপীঠের কাহিনী, 'শাদিবোলি' এবং আচার্য শঙ্করের শারদাপীঠে আসার কাহিনী কোনটাই

আমার জানা ছিল না। আমি এসেছি এই সুদূর দুঃসাধ্য পথে কেবলমাত্র আমার ভিতরের তাড়নায়।

ওই দার্দ বস্তির ধারে যখন আমি ভয়ে ভয়ে নামছি, তখন কিছু বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিল। পাহাড় থেকে নেমেই দেখি সামনে সহাস্তে দাঁড়িয়ে শের মহম্মদ। এ কি, তুমি? তুমি এলে কোন্ পথ দিয়ে?

তখন গোধূলি কাল। সূর্যের আলো পাহাড়ের নিচে মিলিয়ে যাচ্ছিল। হাসিমুখে শের মহম্মদ এই কথাই জানাল, সে নিজেও দার্দ. তারও মুলুক 'চিলাস' অঞ্চলে। কিন্তু আমাকে একা এদিকে ছেড়ে দিয়ে সে বিশ্বাস করতে পারেনি! আমি পরদেশী, আমার নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। গাড়ি ও ঘোড়া সে রেখে এসেছে তার চেনালোকের কাছে।

সেই রাত্রে ওই বস্তির একটি পাথরের ঘরে শের মহম্মদ দু'চারজন দার্দের সহায়তা নিয়ে আমার জন্য গরম গরম ভাত-মাংস প্রস্তুত করেছিল।

॥ ২১ ॥

সভ্যতাবিবর্জিত কাশ্মীরী দার্দবস্তির সঙ্গে নিজের মনকে মিলিয়ে নিচ্ছিলুম। বন্য জীবন যাপনের প্রতি আমার স্বাভাবিক ঔৎসুক্য লেগে রয়েছে। চর্বির আলো জ্বালা ঝুপসী পাথরের ঘর, ময়লা হাতের রান্না আধসিদ্ধ তিতিরের মাংস, নোংরা কম্বলের মধ্যে জন্তুর গন্ধ, ভেড়ির দুধ আর ভেলিগুড় দেওয়া ফুটন্ত চা—এসব আমার প্রিয়। আমার নিজের পোশাক ত এক এক সময় মন্দ লাগে না! পাতলা কম্বলের পা-জামা, হাতে-বোনা পশমের লং-কোট, পায়ে চপ্পল ও মাথায় চাঁদি-টুপি—আমার বিচারে অতি সুশ্রী পাহাড়ী পোশাক! ওদের আহারে-বিহারে, কাজে ও কথায় যদি নিজকে মিলিয়ে নিতে না পারি তবে আমিই বঞ্চিত থেকে যাব। ওরা 'শার্দিবোলিতে' নিজেদের মধ্যে কথা কয়, কিন্তু ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাঞ্জাবী উর্দু বোঝে। ওরা ভাত, মাছ, মাংস ও বুনো আপেল খায়। মাঝে মাঝে কুল্‌ফা বা কড়ম শাক, লওকি বা কদুর ঘাঁট। বল্ বা শায়র আছে এখানে বা ওখানে,—অতি স্বচ্ছ তার পানীয় জল। রোগ-ভোগ ওষুধ-ডাক্তার কিছু নেই। আছে হয়ত টোটকা কিছু বা পাতার রস। যদি কেউ বাগান বানায়, তবে চেরি, আঙ্গুর, আখরোট, রোজবেরি। আহারের পুষ্টির মধ্যেই ওদের ওষুধ মিলিয়ে থাকে।

দার্দবস্তিতে বাস করছি নিঃসঙ্কোচে। শের মহম্মদ এখানে খুবই পরিচিত।

আরেকজন ঘুরছে আশেপাশে, তার নাম গুলকাশেম। কালো কাপড় পরা একটা বউ কাজ করছে খামারে—সেখানে গাছে গাছে লাল আপেল ঝুলছে। এখন আপেলের মরসুম চলছে,—তিন আনা সের বেচা যায় যদি কুড়ি মাইল দূরে গিয়ে 'মণ্ডিতে' বেচে আসতে পার। লক্ষ্য করে দেখলুম এদের কমবেশি ষাট-সত্তরটা ভেড়া রয়েছে। গুলকাশেম বলল, ওদের পেটের তলায় রেশমের মতো যে নরম লোম গজায়, সেগুলির নাম পশমিনা। দাম অনেক। পাঁচ সের লোম বেচতে পারলে একটি পরিবারের সারা বছরের খোরপোষ চলে যায়।

তুদিনে চার-পাঁচটি মেয়েছেলে দেখলুম। কালো আলখেল্লা ওদের পোশাক। চেহারায় যেন আদিম আর্যজাতির মেয়ে। অত্যন্ত ফর্সা এবং অতিশয় অপরিচ্ছন্ন। পরনে একই কালো পায়জামা। ওদের সঙ্গে ভারতীয় মেয়ের মিল নেই। ভারতবর্ষ কোন্‌দিকে ওরা জানে না! ওদের কাছে ভয়ের পাত্র শুধু পাঠান উপজাতীয় দস্যুরা।

এ তুদিনের ইতিহাস মনে গাঁথা রইল। গুলকাশেম ওর বউ আর বোনকে ডেকে আনল বিদায় নেবার সময়। আমার হাসির সঙ্গে দার্দ মেয়ের হাসি মিললো। কিন্তু আমি জানিনে ওদের 'বোলি', ওরা বোঝে না আমার ভাষা। কিন্তু হাসিতে যে-ভাষা নিহিত থাকে, পৃথিবীর সবাই সেটি বোঝে। হাসি মানে অভ্যর্থনা, সমাদর, আতিথেয়তা! হাসি মানে বিদায়কালের প্রীতি সম্ভাষণ। ওরা এই প্রথম দেখল কোন্ অজানা এক 'বংগাল মুলুকের' মানুষকে।

সেদিন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পাহাড়ী পথে হাঁটার পর শের মহম্মদ আমাকে নিয়ে এল পাহাড়তলীর নিচে—যেখানকার বস্তিতে সে রেখে গিয়েছিল তার গাড়ি আর ঘোড়াটা। ওর চেনালোকের কাছে ঘোড়াটা বেশ ভালই ছিল।

আমার ছুটির সাতদিন ফুরিয়ে গেল। এখান থেকে মাইল দশেক গিয়ে কোন্ এক বস্তিতে পৌঁছে আমরা গাড়ি খুলে দেবো, এবং আগামীকাল এমনি সময় আমরা 'গুরেজ্' পৌঁছব। গুরেজ্ থেকে সোপোরের সেই একই পথ। শের মহম্মদ আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল।

আমার আপিসের 'সুপার' অর্থাৎ বড়বাবু সর্দার মোতি সিং আমাকে যেন একটু স্নেহই করেন। তা ছাড়া আমাদের মেজর সাহেবের একটু সুনজরেই আমি ছিলুম। লোকটা বোধহয় আমার চলাফেরা এবং কাজকর্মে কিছু স্মার্টনেসের আভাস পেয়ে থাকবে। আরেকটি কারণ, মারীপাহাড়ে আমার

'সিমেট্রিওয়ের' মেসের পাশে ছিল একটা জংলা ফুলের ভাঙ্গা। সেই ভাঙ্গা থেকে রঙ্গীন ফুলের একটা গোছা স্বতো দিয়ে বেঁধে রোজ মেজরের টেবলে রেখে আসতুম। ওটার মধ্যে মিশে থাকত একটু তোষামোদ। লোকটা আমার ওই তোষামোদের ফাঁদে পা দিয়েছিল। একদিন লাঞ্চে যাবার আগে হঠাৎ পিছন দিকে এসে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে আমার কানের পাশে বলল, 'ইয়োর ফ্লাওয়ার্স আর মিসিং টু-ডে!' অর্থাৎ আজ তোমার ফুলের গোছা পাইনি!

লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে সেদিন উঠে দাঁড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ করলুম। সর্দারজী প্রমুখ সহকর্মীরা সানন্দে হেসে উঠলেন। কিন্তু লাঞ্চের পর ফিরে এসে মেজর সাহেব যখন দেখলেন, ইতিমধ্যে আমি ফুলের তোড়া এনে তাঁর টেবলে রেখেছি, তিনি একটি ছোট্ট কাগজে ধন্যবাদ লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

তোষামোদে ঈশ্বরকে পর্যন্ত পাওয়া যায়, ইংরেজ-সন্তান মেজর ত সামান্য!

সোপোর থেকে বরামূলায় এসে আমি এটি কাজে লাগালুম। ওখানে পুলিস ব্যারাক থেকে এম্-টি সেক্‌শনকে ধরলুম টেলিফোনে। বোধহয় রূপলালজী ধরেছিলেন। আমি বললুম, আমার ছুটি বাতিল করছি! এখান থেকে আমি মুজফ্‌ফরাবাদ, ড্রস, দির ও গিলগিট হয়ে যাব। আমার পক্ষে ডাইরেক্‌ট্ ইন্‌সপেকসন্ রিপোর্ট দেওয়া সহজ হবে। মেজর সাহেবকে জানিয়ে যদি এখানকার ক্যাম্পে একটা নির্দেশ পাঠান তবে ভাল হয়।

আমার তুঙ্গে তখন বৃহস্পতি। এতদিন পরে ফুলের তোড়াটা কাজে লাগল! ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে এসে পৌছল সর্দার মোতি সিংয়ের 'নির্দেশনামা'। তিনি জানালেন, অমুক তারিখে তুমি আপিসে হাজিরা দেবে। তোমার ট্রান্সপোর্ট ও ক্যাম্পিংয়ের ব্যবস্থা করা হল। হিসেব করে দেখলুম, আরও দুটো দিন হাতে এসে গেল। ফুলের তোড়ার গুণ কত!

টাকার স্রোতে তখন আমি ভাসছিলুম। ফিরে গেলে 'ম্যানুভারিং পিরিয়ড' ও রিলিফের কাজের দরুণ একটা গ্রাণ্ট পাবো। সুতরাং শের মহম্মদের প্রাপ্য টাকার অতিরিক্ত দশ টাকা বকশিশ দিয়ে ফেললুম। বড় আনন্দে সে বিদায় নিল। আমি তাকে জড়িয়ে ধরেছিলুম আবেগে ও উচ্ছ্বাসে।

পোশাক আবার বদলিয়ে ঝোলাটায় পুরেছি। পেটভরে খেয়ে নিয়েছি বরামূলার বাজারে। তারপর ডোগরা সেনাবাসে আমার পরিচয়পত্র দেখিয়ে যখন অপেক্ষা করছি তখন ট্রাক এসে থামল। আমি কাগজ দেখিয়ে ড্রাইভারের

পাশে উঠে বসলুম। অদৃশ্য নিয়ন্তা আবার আমাকে টেনে নিয়ে চলল অজানা থেকে অজানায়। আমি যাচ্ছিনে, যাচ্ছে যেন আরেকজন—যে আমার বুকের মধ্যে থেকে চোখের জানলা দিয়ে বহির্বিশ্বকে দেখে নিচ্ছে!

আনুপূর্বিক কাহিনী এখানে ফেঁদে বলার দরকার নেই। 'উত্তর হিমালয় চরিত' গ্রন্থে এর সুবিস্তৃত বৃত্তান্ত বলা হয়েছে। যাই হোক, আমি দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছিলুম, কিন্তু যাচ্ছি কোন্ দিকে, সে আমি জানিনে। হাতঘড়িতে দেখছি বেলা আড়াইটে বাজে। দোমেল-এর পরে মুজাফ্ফরাবাদ, তারপর টিথওয়াল—চারিদিকে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা। এটা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। ঠাণ্ডা হাওয়া উঠেছে সোনার বর্ণ উপত্যকায়। প্রশস্ত পথ, কিন্তু দুখানা গাড়ি যায় না পাশাপাশি। আমরা 'কেরান' থেকে সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে এসে পৌঁছেছিলুম মিনিমার্গ-এর একটি অফিসার্স ক্যাম্পে। এটি অক্‌জিলিয়ারি ফোর্সের ক্যাম্প, মহারাজার পল্টনের দল এখানে থাকে। কিন্তু আমি এখন নর্দার্ন কমাণ্ডের লোক, আমার খাতির অন্যরকম।

বাইরে ঠাণ্ডা পড়ছে, কিন্তু বায়ুরুদ্ধ ক্যাম্পের ভিতরটা আরামদায়ক। ময়লা তেলের আগুন জ্বলছে একপাশে, ওখানেই খাবার তৈরি হয়। অন্য অংশে দেশী ও বিলেতী মদের কাউন্টার,—যেমন সব অফিসারদের ক্যাম্পে,—যার যে পরিমাণ খুশি পান করে! সুতরাং ওই ময়লা তেলের গন্ধের সঙ্গে দেশী ও বিলেতীর ভরভরে গন্ধ মিলিয়ে একটা বিচিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে।

জনৈক হাবিলদার আমার জন্য নির্দিষ্ট চারপাই ও কম্বল দেখিয়ে দিয়ে যখন চলে যাচ্ছে তখন ওপাশ থেকে একটা গেলাস হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল বচ্চিন্দর সিং। শ্রীনগরে ওর সঙ্গে পাঁচ-ছ'দিন আমি কাজ করেছি। ফলে, বচ্চিন্দর আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সে ডোগরা পল্টনের লোক। কিন্তু এখন বেশ রঙে থাকার জন্য আমাকে দেখেই সে হই-হল্লা করে উঠল। গেলাসটা এক চুমুকে শেষ করে রেখে আমাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে বলল, চলো ইয়ার, পহলে দো-তিনঠো পেগ চঢ়া লো, ফির ভি কাম্ হ্যায়—

বচ্চিন্দর প্রচণ্ড উৎসাহে আমাকে টেবলে বসালো। মাঝখানে এক পাত্রে রয়েছে আঙ্গুর ও বাদাম রাশি রাশি। কিন্তু আজ সে আমার কোনও কথা শুনল না। আমার অগ্নিগর্ভ তরুণ রক্তে সে বিষ মিশিয়ে দিতে লাগল বার বার। তার সঙ্গে মৌসুমী আঙ্গুরের রস, বাদাম এবং মাংসের কাবাব চলতে লাগল একটির পর একটি। পানাদির পর সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল।

সাত হাজার ফুট পাহাড়ের উপরে এলে মিনিমার্গ উপত্যকা—

সেখানে উত্তর কাশ্মীরের ভূস্বর্গ চিত্র। কিন্তু এসব অঞ্চলে অশ্বারোহণ ছাড়া যানবাহনের অন্য কোনও সুবিধা না থাকার জন্য সাধারণ পর্যটকরা আসে না। ইংরেজ বা মহারাজার লোকজন অথবা সরকারী কর্মচারী—তাদের কথা আলাদা। এই নিসর্গলোকের ভিতর দিয়ে রাত সাড়ে নটার পর অন্ধকার উপত্যকাপথে বচ্চিন্দর সিং যেখানে আমাকে নিয়ে গিয়ে তুললো সেখানে আমার পক্ষে ফূর্তিবাজ ও চটুল হয়ে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু আমার ভিতরের একটা অংশ তখনও জমাট তুষারের মতো কঠিন। অনেক সময় আমি ঠাণ্ডা, হিসেবী, এবং অনেক ক্ষেত্রে নড়িনে বা টলিনে!

ঠিক সেই ঝিলম নদীর তীরে কোহালার মতো পরিস্থিতি—যেখানে সেবার আমার বন্ধু খান্না এবং অন্যান্যরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি চাই নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি চাইনে। পুরুষ আর মেয়ে যখন মিলিত হয়, তখন একই রঙ্গ এবং একই রস। পরিস্থিতি ও পটভূমির বৈচিত্র্য ঘটতে পারে, কিন্তু মূল বিষয়টি একই।

অন্ধকারেই সেদিন দেখেছিলুম, বাগান পেরিয়ে আমরা এসে উঠলুম একটি বাংলায়। এটির চেহারা খুব সুশ্রী, তাই এর চলতি নাম 'কটেজ।' বচ্চিন্দর সোজা ঢুকল ভিতরে, এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যেই একটি সুন্দর রক্তনীলবর্ণের শালের জোব্বাপরা তরুণীকে নিয়ে বেরিয়ে এল। হাসিমুখে মেয়েটি আমার করমর্দন করল। তার উত্তাপটুকু আমার ঠাণ্ডা হাতের মধ্যে অনুভব করলুম। কিন্তু ওইটুকুর মধ্যেই সে তার চপল-চঞ্চল যৌবনের ইশারায় বচ্চিন্দর সিংকে উল্লসিত করে তুললো। বন্ধুবরের অবস্থাটা দেখে আমি যেন একটু দুর্ভাবনায় পড়ছিলুম। ইতিমধ্যেই তার বাঁ হাতখানা মেয়েটির পিঠের দিকে ঘুরেছে। এখানে নাকি সভ্রান্ত ও সহজলভ্য 'কটেজ গার্ল' আরও আছে।

বারান্দায় ঠাণ্ডা, সুতরাং মেয়েটির সমাদর অভ্যর্থনার জন্য আমাকেও ভিতরে যেতে হল। এখানেও সেই ভাষার গণ্ডগোল। পাঞ্জাবীবুলি মেয়েটি কিছু জানে মাত্র। তবে তার হাস্যালাপের মধ্যে কিছু কিছু ইংরেজির ফোড়ন থাকার জন্য আমার পক্ষে সুবিধা ছিল।

হাসিমুখে আমি প্রশ্ন করলুম, মিঃ সিং বলছিল তুমি নাকি নাচগান জানো?

মেয়েটি বলল, সে ত কাশ্মীরী নাচগান,—আপনার কি ভাল লাগবে?

আমি সেই আকর্ষণেই এসেছি!

মেয়েটি উৎসাহিত হয়ে উঠল, এবং নিজেই সে পাশের ছোট ঘরটিতে গিয়ে টেবল সাজাতে লাগল। আমিও আমার আড়ষ্টতা ঘুচিয়ে টেবলের ধারে গিয়ে

বসলুম। জলে-ভিজনো বড় শাম্পেনের বোতল খুলে তিনটি গেলাসে ইতিমধ্যেই ছাপাছাপি ঢালা হয়েছে। আশেপাশে নানা রুচিকর খাদ্যের সমারোহ নানা পাত্রে। মাঝখানে মস্ত ফুলের তোড়া। বচ্চিন্দর সিং হল মেয়েটির হাতের পাঁচ, কিন্তু আমাকে সে মিনিট দশেক পর্যবেক্ষণ করে এক সময় তার জোব্বাটা খুলে ফেলল। পলকের জন্য আমি সেই স্বাস্থ্যবতী জাত-কাশ্মীরী তরুণীর অঙ্গশ্রী এবং ফুলকাটা গেঞ্জির দিকে চেয়ে টেবলের পানাহারের দিকে মনোযোগ দিলুম। গেলাসগুলি পরস্পরের সঙ্গে ছুঁইয়ে 'চীয়ার্স' বলে এক ঢোকেই শেষ।

সাম্রাজ্যবাদী ও কূটনীতিক ইংরেজ পর্যটক, উঁচুদরের ইংরেজ মিলিটারি অফিসার, বড় বড় জাগীরদার ও ধনপতি, মাঝে মাঝে আমীর-ওমরাহ—এরা এদিক দিয়ে গিলগিট বা চিত্রল যাবার পথে এইসব সৌখীন 'কটেজ গার্লদের' ঘরে আসে। এরা ঠিক সুলভ বারবনিতা নয়। এদের অনেকে পায় মুক্তোর মালা বা হীরের আংটি, কেউ কেউ রুবির টায়রা। অনেকে দিয়ে যায় সাচ্চাগুরির কাজ করা রেশমের ওড়না। কেউ দিয়ে যায় শাল-দোশালা। খরচ করতে জানে ইংরেজ, জানে মোগল বংশের যারা অবশেষ। কিন্তু কাশ্মীরী মেয়ে সর্বাপেক্ষা ভয় করে উপজাতীয় পাঠানদেরকে। এ মেয়েটি সেই পাঠানদের গল্প করছিল। তারা হাজারা জেলার লোক, মাঝে মাঝে ডাকাতি করে মেয়ে ধরে নিয়ে যায়।

এ মেয়েটি আগেই জানত বচ্চিন্দর সিং আসবে, সে প্রস্তুত হয়েই ছিল। সব রকম আয়োজন রয়েছে ঘরে। উত্তাপের জন্য হল-এর দুদিকে চিম্‌নির নিচে কাঠ ধরানো আছে। সেই সব কাঠ চেনার বা আখরোট গাছের। সেই জলন্ত কাঠের সুগন্ধ ভিন্ন প্রকারের। সব ঘরের মেঝেতে সুদৃশ্য মোটা ও ফুলকাটা কার্পেট পাতা। আখরোট কাঠের ওপর সোনালি পালিশ করা নানাবিধ আসবাব সজ্জা। সেজবাতির অলঙ্করণ অতি মনোজ্ঞ। মাথার উপরে পরকলা কাঁচসমেত আলোর ঝাড় ঝুলছে। মেয়েটি আমার প্রশ্নের উত্তরে জানাল, এ মহলটি তার নিজের। আরও দুটি মহল আছে আর দুটি মেয়ের। দাই ও খিৎমদগার মিলিয়ে আছে ছয়-সাতজন। বুবু, বুয়া, ভাবী—তারাও আছে।

বড় হলটির এককোণে দেখা যাচ্ছে একটি 'সেলার'। তার ফ্রেমের সামনেটা মোটা সোনালি জাল দিয়ে ঢাকা। ওটার মধ্যে বিভিন্ন বিদেশী মদ্য সাজানো। লালবর্ণ আঙুরের মদ, হুইস্কি, শেরি, জিন, সাদা শামপেন, পাশে

ভাষ্কর্ত, ব্র্যাণ্ডি,—আরও যেন কি কি। কোন্ এক নবাব কবে যেন দিয়ে গেছে দেওয়ালে-ঝোলানো একটি 'চাইমিং ক্লক'—তার ভিতরে একটি যান্ত্রিক পাখির মুখের থেকে খাবার পড়ে যাওয়া এবং তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিকটিক শব্দ হচ্ছে। ঘরের মধ্যে গিল্টিকরা চেয়ারগুলি নধর লাল মখমল দিয়ে মোড়া।

বচ্চিন্দর সিংকে যতটা বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল, এখন দেখছি ততটা সে নয়। কিন্তু তার পীড়াপীড়িতে মেয়েটি এক সময় নাচের জন্য উঠে দাঁড়াল। শরীরে বিভিন্ন প্রকার বাঁধন থাকলে নাচতে অসুবিধা। সেজন্য সে কাশ্মীরী ঘাঘরা ছাড়ল, রইল সামান্য মিহি চুনোটকরা অন্তর্বাস। গায়ের সেই পশমিনা গেঞ্জি খুলল। অতঃপর তার সর্বাঙ্গে যা রইল, তা লজ্জানিবারণী সঙ্কেতমাত্র। একসময় তার উরুলোক, নাভিলোক এবং বক্ষযুগল লক্ষ্য করতে করতে আমি নিজের চোখ দুটো অনুভব করলুম,—সে দুটো যেন পাথরের গুলী, আর আমার মুখখানা যেন পিতলের তৈরি—যার কোনও ভাষা নেই।

তিন সপ্তাহ হতে চলল কাশ্মীরী মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছি বইকি। ভিখারী ওদের মধ্যে প্রচুর। শ্রমিক মেয়েও কম নয়। মাঠে-খামারে কাজ করে বহু মেয়ে। গ্রামের দিকে গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়েকে ঘরকন্নার পাট করতে দেখেছি। সকলের পরনে পাজামা, মাথায় ফেট্টি বা কাঁধে উড়ানি, গায়ে পুরোহাতা জোব্বা। হাতে রূপোর বালা, গলায় পলার মালা, কালো চোখেও সুর্মা টানা। রঙ খুবই ফর্সা, মাঝে মাঝে মুখশ্রী ভাল। ওদের বুকের ঠিক মাঝখানে রাঙ্গা রাঙ্গা ছোপ। ওরা শীতের সময় আগুনের কাংড়ি পোশাকের মধ্যে নিয়ে বেরোয়। সেই আগুনের আঁচে ওই রাঙ্গা ছোপ পড়ে। এরা সাধারণ মেয়ে। অভিজাত কাশ্মীরী মুসলমান ও পণ্ডিতের পরিবারে প্রকৃত কাশ্মীরী সুন্দরীরা থাকে—যারা কাশ্মীরের গৌরবের পরিচয়। এই মেয়েটি সেই সমাজের, কিন্তু এর জীবনযাত্রা নীতিশুদ্ধ নয়। ঠিক বারবনিতা না হলেও বারবিলাসিনী। এ ধরনের মেয়ে নোংরা ঘাঁটে না, পাঁকে পা দেয় না, এবং পুরুষের কামাসক্তির সঠিক উপকরণও নয়। এদেরকে 'সোসায়েটি গার্ল' বললে বোধহয় অনেকটা মানায়।

মেয়েটি পেশাদার নর্তকী নয়, এবং আমিও নৃত্যকলাবিশারদ্ নই। তবু আমার বিশ্বাস মেয়েটি নাচতে জানে। বচ্চিন্দরের কথা ছেড়ে দিই, তার অন্তরতন্ত্রের বাঁধন গেছে আল্গা হয়ে। সে বেহুঁশের মতো টলটল করছে এবং মাথা দুলিয়ে তাল দিচ্ছে। আমার পাথরের ডেলার মতো ঠাণ্ডা চোখ দুটো

নর্তকীর সর্বাঙ্গে নড়ে বেড়াচ্ছিল। না, এই চেহারা, এই রঙ, এই উরুলোক, নাভিতল, এমন বুকের গঠন, কটিতট, গুরুনিতম্ব,—আগে আমি দেখিনি। এ যেন এক শ্রেষ্ঠ জীবন্ত চিত্রকলা। এর এই হ্লাদিনী শক্তির মধ্যে যেন সমগ্র অলকাপুরী কাশ্মীরের সমস্ত প্রাকৃত শোভা-সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

মিনিট পনেরো-কুড়ি অবধি বিস্ময়াপ্লুত আমি নিঃসাড় হয়েছিলুম।

নাচের মধ্যেই মেয়েটি গুনগুনিয়ে গান ধরেছিল।

আনুপূর্বিক বর্ণনা থেকে বিরত হচ্ছি। যে ধরনের গান ওর কচি ও মধুর কণ্ঠে শুনলুম, ওতে আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল, বাংলার ভাটিয়ালি এবং রাখালিয়া সুর। বোধ হয় ওর গানের সুরে বহুদূর বাংলার আকাশ বাতাস, নদী প্রান্তর আমার স্মৃতির মধ্যে ফুঁপিয়ে উঠেছিল সেই অজানা জগতের বিবশা রাত্রে।

অনেক রাত হয়েছিল। বচ্চিন্দর সিং মাঝখানে একটু বেহুঁশ এবং অসতর্ক হয়ে পড়েছিল। আমি হাসিমুখে ওকে যে একটু আগলিয়ে রাখছিলুম, মেয়েটি সেটি লক্ষ্য করেছিল। এর মধ্যে এক ফাঁকে মেয়েটি ছোট এক গ্লাসে 'রেডওয়াইন্' খেয়েছিল, আর কিছু নয়। এবার সে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো নির্ভয়ে আমার পাশে এসে বসল। মিষ্ট প্রশ্ন করল, খুশ হোগৈ?

জী!

হঠাৎ মেয়েটি বলে বসল, তুমি খুব শান্ত।—তারপর মুখের কাছে মুখ তুলে বলল, তোমাকে দেখলে ভয় করে না, বিদেশী তুমি!

হাসিমুখে আমি বললুম, এবার আমি যাই।—আচ্ছা, একটা কথা জানতে চাই। তুমি টাকা নেবে ত?

বিদেশীর মুখ-চোখের মধ্যে মেয়েটি কী যেন নিরীক্ষণ করল। কী ভেবে আমার একখানা হাত একবারটি ধরল, আবার ছেড়ে দিল। হয়ত সে ভাবল, আমি নব্যযুবক বটে, কিন্তু এখনও পুরুষ হয়ে উঠিনি। এ বোধ হয় তারও নতুন অভিজ্ঞতা।

এই পর্যন্তই থাক্। বিদায় নেবার সময় পশমের সেই রক্তনীল জোব্বাটা আমিই মেয়েটার গায়ে জড়িয়ে দিলুম! ওটাই সামাজিক ভদ্রতা। মেয়েটি শুধু বলল, টাকার কথা কেন তুলছিলে? তুমি আমার মেহ্মান!

বচ্চিন্দর সিংকে সেদিন ধরে-ধরে ক্যাম্পে যখন আনলুম, রাত তখন বারোটা বেজে গেছে। আসবার সময় মেয়েটা একটি প্রস্তাব করেছিল, সেটি আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আমার সাহসের অভাব ছিল।

এখানে রাত কাটাতে রাজি নই।

রাত সেদিন অতিশয় ঠাণ্ডা। ক্যাম্পের মধ্যে চারপাইতে শুয়ে কম্বল ঢাকা দিলুম। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লুম, না জেগে রইলুম—এতকাল পরে আর মনে নেই। তবে অর্ধতন্দ্রার মধ্যেই একটা অবাস্তব এবং অপ্রাকৃত স্বপ্নাবেশ আমাকে যেন নিশ্চল ও অসাড় করে রেখে দিল। এ কাহিনী যেন আমার রক্তে মিশিয়ে রইল।

ডোগরা স্থবেদারের জান্ বড় কঠিন। আমার তৈরি হবার আগেই বচ্চিন্দর সিং তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে বরামূলায় রিপোর্ট করতে। আমি যখন ক্যাম্প থেকে বিদায় নিয়ে মাধো সিংয়ের ট্রাকে উঠলুম, সকাল তখন আটটা। এ গাড়ি গতকালেরটা নয়, এখানা একটু ছোট। আমার প্রশ্নের জবাবে মাধো সিং বলল, সড়কমে বহৎ খত্‌রা হ্যায়—

মাধো সিংয়ের হাজিরা খাতায় যথারীতি আমি গাড়ির নম্বর, তারিখ, সময় ও আমার নাম লিখে দিলুম। তারপর গাড়ি ছাড়ল। আজ আমি 'বুজিল গিরিসঙ্কট' অতিক্রম করব কিন্তু তার চড়াই অনেক উঁচু। স্থতরাং এই ছোট ভ্যান-এর মতো গাড়ি সেই পথের উপযুক্ত।

আমাদের গতি উত্তরে। দুই ধারে মাঝে মাঝে স্বচ্ছসলিল জলাশয়। মাঝে মাঝে তার জলে লাল পদ্মের সমারোহ। চারিদিকে ঘন পাইনের শোভা যেন আকাশপথে চেয়ে কালের প্রহর গণনা করছে। এখানে-ওখানে এক-এক টুকরো চাষী বস্তি, তারই ফাঁকে ফাঁকে লোমশ ভেড়ারা চরে বেড়াচ্ছে। আমাদের উত্তরের পথ আগলিয়ে রয়েছে দেবশাহীর উত্তুঙ্গ পর্বতমালা গগনচুম্বী প্রাকারের মতো। ওর মধ্যে কোথা দিয়ে 'বুজিল সঙ্কট' অতিক্রম করব, আমার জানা নেই। প্রকৃতপক্ষে সর্বব্যাপী চারিধারে এই গহন পার্বত্য ভূভাগ আমার অজানা। আমার আর মনে পড়ে না, সমতল পৃথিবী কোথাও আছে কিনা। পার্বত্য অরণ্য, ভয় ভীষণ গিরিখাদ, সর্পাকৃতি মুখরা ও প্রখরা গিরিনির্ঝরিণী. জনশূন্য প্রাণীশূন্য এক একটা ভূভাগ এবং চারিদিকের বিশ্বপ্রকৃতির নির্বিকার নীরবতা—এরা যেন সম্মিলিতভাবে আমার মধ্যে নিঃশব্দে এক মহৎকাব্যের জাল বুনে চলেছে। আমার সমস্ত চেতনার মধ্যে থেকে থেকে যেন বেজে উঠছে জলতরঙ্গের মতো একপ্রকার সঙ্গীত—একমাত্র আমিই যার শ্রোতা। কোথায় যেন সঙ্গোপনে আমার অতৃপ্ত বাসনাগুলিকে একে একে সাফল্যমণ্ডিত করছে চারিদিকের

এই হিমালয়। যতদূর চোখ যায়, অপরিসীম অচঞ্চল স্থিরতা, আমি কেবল সেই নিত্যস্থিরের মাঝখানে চঞ্চল উদ্দাম অস্থির। আমি যেন এই বিশ্বব্রহ্ম-লোকের থেকে বিচ্ছিন্ন একবিন্দু প্রাণ—যে-প্রাণ প্রতি ফুলে-ফলে-ফলনে গিরি-শিরে গুহাগর্ভে জলাশয়ে গিরিনির্ঝরে অরণ্য-বিটপীর রহস্যরন্ধ্রে—ঠিক যেন রঙীন প্রজাপতির মতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে!

দীর্ঘবিস্তৃত চড়াই ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে 'বুর্জিল সংকট' অতিক্রম করল। মাধো সিং হাসছিল তার আপন কৃতিত্বে। আমার সামনে আকাশ স্পর্শ করে রয়েছে দেবশাহী গিরিমালা, অন্যদিকে দানবাকার 'নাঙ্গা'। ছাংলাগল্লির চড়াইপথ থেকে যে তৃণলতাশূন্য নাঙ্গাকে প্রস্তরতুষার স্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না, এবার কাছে এসে দেখছি সে যেন উলঙ্গ ফকির! শুধু পাথর, এবং সেই গগনস্পর্শী পাথরের স্তূপের একমাত্র বর্ণ হল ফলসার মতো ফিকে বেগুনী। আমরা দেবশাহী ও নাঙ্গার মধ্যলোকের নালী-উপত্যকা ধ'রে যাচ্ছিলুম প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ভিতর দিয়ে।

বিশ্বলোকের সেই বিস্ময় আজও আমার চোখে লেগে রয়েছে। তবু সেই বিস্ময়ের মধ্যে আমার ভয় নিহিত ছিল। আমার অস্তিত্বের শিকড় উপড়িয়ে হিঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যেন সম্মোহনী মায়া—কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমি জানিনে। গত রাত্রির কথা ভাবছিলুম। বচ্চিন্দর সিং-এর কাছে শুনেছিলুম মেয়েটার নাম বুঝি 'শমরু'। তা হবে। শমরুর মানে জানিনে! কিন্তু অপরূপ সেই লাবণ্যময়ীর আনগ্না দেহশ্রী যেন ছড়িয়ে রয়েছে আমার চোখের সামনে। কাশ্মীরের অরণ্যে, প্রজাপতি-পতঙ্গভরা উপত্যকায়, গিরি-নির্ঝরিণীর শোভায়, অগণিত সংখ্যক পুষ্পমালঞ্চের সৌন্দর্যে মেয়েটার সেই যৌবনশ্রী সর্বত্রই যেন বিস্ফারিত রয়েছে। সে যাই হোক, এটি ভুলতে পারছিনে, 'রেড ওয়াইন্' অনেকটা খেয়ে সম্ভবত মেয়েটা একটু মাত্রাবোধ হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে, সে ঠিক বুঝতে পারেনি শ্লীলতার সীমা সে লঙ্ঘন করছিল কিনা। কিছুক্ষণের জন্য বেহুঁশ নাচের মধ্যে সে ভুলে গিয়েছিল সে মেয়ে! বচ্চিন্দর তখন অনড় হয়ে কুশনের ওপর কাৎ হয়ে পড়েছিল এবং আমি প্রমাদ গুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম!

তখনও সেই বয়সে ঠিক বুঝিনি, শ্লথচরিত্রা নারী নিষ্ক্রিয় পুরুষের সামনে কিছু সতর্ক হয় কিনা। অশান্তদেরকে নিয়েই তার জীবন, সম্ভবত সেই কারণে আমাকে বলল, 'তুমি শান্ত!' তা হবে! আগ্নেয়গিরি যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, ততক্ষণ পারিপার্শ্বিক মানব-সমাজ নিরাপদ! আমার তারুণ্যের ঘুম নাই বা

ভাঙল! অকালে আতাস্বাদ নাই বা হলুম! নিষিদ্ধ ফল গাছেই ঝুলে থাক না কেন!

ভালবাসা শব্দটি একটি সাধারণ সংজ্ঞা মাত্র। ও-শব্দটার ধার ক্ষয়ে গেছে বহুকাল আগে। প্রেম শব্দটাও বহুচলনের ফলে নিজের অর্থ হারিয়েছে। যৌবনের প্রারম্ভ বা প্রথম তারুণ্যের কাল প্রণয়ের কাল হতে পারে, কিন্তু প্রেমের নয়! প্রকৃতির নিয়মে জৈবিক আকর্ষণ-বিকর্ষণে চোখের জল, ব্যথা-বেদনা, হর্ষ-কম্প-পুলক, নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস, বিনিদ্রা ও দিবাস্বপ্ন—এগুলি ওই জৈব আকর্ষণেরই সঙ্কেত, প্রেমের সঙ্গে এদের কোনও যোগ নেই। প্রণয়-কালে যে আকর্ষণে চোখের জল নির্গত হয় সেই একই কারণে প্রণয়ের পাত্র বা পাত্রীর অন্ত্রেতন্ত্রে লালারস নিঃসৃত হয়! প্রাকৃতিক তাড়নায় বা জৈব আকর্ষণে চুম্বন, আলিঙ্গন, দেহ নিপীড়ন—এগুলিতে প্রণয় আছে, কিন্তু প্রেম সেখানে দূরে দাঁড়িয়ে হাসে! শমরু প্রস্তাব করল, তার শয়নকক্ষে বসে রাতটা যেন আমি 'কিসসা-কহানী' করে কাটিয়ে যাই—ওটা তার ভ্রান্ত বুদ্ধি। আনগ্না নর্তকীর শিথিল দেহবল্লরীকে সামনে রেখে যে তরুণ-পুরুষ সারারাত ধরে শুধু গল্প-গুজব করে যায়, সে নপুংসক। এ কথা শমরুও জানে।

মাধো সিংয়ের গাড়ি 'দাস' জনপদ বহুদূর পিছনে রেখে 'আসটোরে' এসে পৌঁছল। আমি তখন ক্ষুধার্ত বটে, কিন্তু ঠাণ্ডায় কাঁপছি। পশমের টুপি কানের ওপর আরও টেনে দিলুম। কিন্তু আসটোরের ছোট মণ্ডি ছাড়িয়ে মাধো সিং আবার গহন পার্বত্যলোকের দিকে চলল, এবং এক সময় ঘুরে ঘুরে উৎরাই-পথে ঘণ্টা দেড়েক বাদে সিন্ধুনদের তীরে 'বুন্‌জি' জনপদে এসে দাঁড়াল।

আকাশে মেঘ করে হাওয়া দিয়েছে। এবার নাঙ্গা ও দেবশাহীর উত্তর-প্রান্তে কারাকোরাম গিরিশ্রেণী যেন সামনে আরও এগিয়ে এসেছে। বরফানি বাতাসের থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাধো সিংয়ের সঙ্গে একখানা চালাঘরে গিয়ে উঠলুম। ঘরখানা কাঁচা পাইনের গুঁড়ি আর পাথরের চাংড়া দিয়ে তৈরি। ভিতরটায় বন্য কাশ্মীরী কাঠের গন্ধ।

সিন্ধুনদের পুল পেরিয়ে আরও চল্লিশ মাইল। এখন বেলা দেড়টা। প্রথমেই মাধো সিং গোটাচারেক পীয়র কোথা থেকে এনে আমার হাতে দিয়ে যাবার সময় বলে গেল, খাবার ব্যবস্থা হচ্ছে, এখানে অপেক্ষা করুন।

চার-পাঁচজন লোক কম্বল জড়িয়ে এসে ঢুকল। এদের অনেকটা চিনি—

এরা 'দার্দ' বা 'বল্টা' নয়। এরা বালতিস্তানী। মুখের চেহারায় মাঙ্গোলীয় ধাঁচ। আমি এদের প্রাদেশিক 'বোলি' এক বর্ণও বুঝিনে। এখানে বৌদ্ধ ও মুসলমান এক সঙ্গে মিলিয়ে থাকে। নামে মুসলমান, ধর্মে বৌদ্ধ—এমন মানুষ অসংখ্য। এখানে এমন বহু মেয়ে আছে, যাদের প্রত্যেকের তিন-চার জন স্বামী! কিন্তু উপজাতীয় পাঠানদের মতো মেয়ে নিয়ে কাড়াকাড়ি বা খুন-জখম নেই।

শুঁটকো সিদ্ধ মাংস ও চাপাটি নিয়ে এল মাধো সিং। গরম বটে, তবে মাংসের গন্ধটা কিছু আপত্তিজনক। কিন্তু মানুষ বা বনমানুষ যা খায়, আমিও তাই খাই। মাংসটা তেমন সিদ্ধ হয় নি, তবে আমার দাঁতের ধারও কম নয়। যদি ঠাণ্ডা জল মুখে দেবার সাহস থাকে তবে যাও হুন্‌জানদীর পাঁতায়, ওখানে পাবে বরফ-গলা জল। যদি তেষ্টা পায়, পীয়র চিবোও—ওতেই কাজ হবে। যদি খেয়ে উঠে হাত ধোওয়ার দরকার হয় তবে রুমাল বার কর, নয়ত কম্বলে হাত মোছ! পাহাড়ে ওসব নিন্দনীয় নয়।

তবে সেদিন বিদায় নেবার আগে মাধো সিং কলাইয়ের মগে ফুটন্ত 'ঘোলা জল' এনে দিয়েছিল! ওটায় চিনি না থাক, কাঁচা চায়ের পাতা ওর মধ্যে ছিল। আমি ওর অনেকটা খেলুম, বাকিটুকুতে মুখ হাত ধুয়ে নিলুম!

সেদিনের শীতার্ত ধূসর গোধূলিকালে গিয়ে পৌছলুম গিলগিটে। এটা মহারাজার এলাকা বটে, কিন্তু সে নামে মাত্র। এদিকের সমস্ত ভূখণ্ডটাই বৃটেনের কঠোর শাসনে নিয়ন্ত্রিত। তাই ওটার নাম দিয়েছে 'গিলগিট এজেন্সি'। আমি যেহেতু নর্দার্ন কমাণ্ডের লোক, সেইহেতু আমার মতো মেনি বিড়ালের জায়গাও এখানে মিলবে। এখানকার যে বিশাল পাথরের দুর্গ উত্তরোত্তর কাশ্মীরে পাহারায় নিযুক্ত রয়েছে, আমাদের কাগজপত্র উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়ে তারই মধ্যে প্রবেশ করলুম।

এখানে আমার জন্য একটি ছোট ক্যাম্পের অ্যান্টি-রুম আগে থেকে নির্দিষ্ট ছিল।

এটা তখন ভারত ঠিক নয়, এবং এটা প্রকৃত অর্থে ঠিক বোধ হয় কাশ্মীরও নয়—কিন্তু এটা মহারাজারই এলাকা। সেই অর্থে এটি ভারতেরই অঙ্গ। তবু সেটি নামে মাত্র। সমতল ভারত থেকে কেউ কখনও আসে না এদিকে। ইংরেজ কারোকে আসতেও দেয় না। পর্যটক যদি ইংরেজ হয়, তবেই সে ছাড়পত্রাদি দেখিয়ে আসতে পারে। বালুচিস্তানের মতো এটাও একটা এজেন্সি। এখানে অন্যপ্রকার প্রশাসন-ব্যবস্থা, অন্য ধরনের বিধিনিষেধ।

এখানে বিচারশালা বা আদালত, পুলিস বা সমাজরক্ষী—এসব নেই। এখানে ইংরেজের সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ সর্বত্র ও সর্বদা সজাগ। এই এলাকার একদিকে সমস্ত উত্তর ভূভাগ জুড়ে রয়েছে তুষারশুভ্র কারাকোরাম তার অগণ্য হিমবাহ নিয়ে, অন্যদিকে হিন্দুকুশের ক্রোড় গিরিলোক—তার নাম হিন্দুরাজ পর্বতমালা। এই দুই গিরিশ্রেণী—যার নিম্নভূমিতে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি—এরা দুদিক থেকে সাঁড়াশির মতো একটি ফ্রেম নিয়ে ভারতের উত্তর সীমানা নির্দেশ করছে। এখানকার স্থানীয় শাসক বা চীফটেন্সরা ভারত ভূখণ্ডকে বলে 'ইন্দসস্তান।'

কিন্তু সিন্ধুনদ পার হলেই মনে হয় ভারতকে পিছনে ফেলে এলুম। এ যেন এসে পড়েছি মধ্য এশিয়ার কোনও বিজন ভীষণ গহন পার্বত্যলোকে। এখানে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সব চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু চারিদিক থেকে নামহারা ও পরিচয়হারা তুষার নদীরা নেমে এসেছে উপত্যকা-পথে।

ইংরেজের বিমানসজ্জা তখন অনুন্নত। বেতার নেই, রেডিয়োগ্রাম, টেলিপ্রিণ্টার বা টেলেক্স তখন স্বপ্নবৎ। ফলে, সংবাদ আনাগোনা তখন সমস্যাজর্জরিত। তখন একমাত্র উপায় ছিল টেলিফোন ও টেলিগ্রাম। এই সব কারণে দিল্লী, গিলগিট ও রাওয়ালপিণ্ডির মধ্যে নিজস্ব বিধিব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছিলুম। আমি পল্টনদপ্তরের লোক হওয়া সত্ত্বেও গিলগিট দুর্গের বহু অংশ আমাকে দেখতে দেওয়া হয় নি। এর ভিতরকার বৃহৎ বারুদখানা, তোপখানা, বিভিন্ন অস্ত্রশালা, বড় বড় আর্টিলারি কামান,—এগুলি সদাসর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে। ইংরেজ তখন বিশ্বাস করে না আফগানিস্তানকে বা বলশেভিক পার্টির নবগঠিত সোভিয়েট ইউনিয়নকে,—যাদের বিরুদ্ধে অকারণে ইংরেজ শত্রুতা করে যাচ্ছে! এ ছাড়া ইংরেজ কাশ্মীরের মহারাজার সঙ্গেও কথায় কথায় খিটিমিটি বাধিয়ে তোলে। ডোগরা সৈন্যদলকে ইংরেজ এখানে অনেকটাই অক্জিলিয়ারী করে রেখেছে—হুকুম ছাড়া তারা বন্দুক ধরবে না। এবং ইংরেজ চায় ডোগরাদের ভিতর থেকে কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবীদেরকে পৃথক করে রাখতে।

ঘুরে ঘুরে আমি এক হাবিলদারকে সঙ্গে নিয়ে দেখে বেড়াচ্ছিলুম। আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। গতকাল এখান থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি মারী পাহাড়ে সর্দারজীর কাছে। যানবাহনের জন্য আমি অপেক্ষা করছিলুম। সকালে গিয়ে এখানকার ট্র্যান্সপোর্টের কর্তা মেজর ম্যাক্লিয়োডকে আমার কাগজপত্র দেখিয়ে আমার পরিস্থিতি জানিয়ে এসেছি। মুশকিল ছিল এই,

আমি দুর্গসীমানার বাইরে কোথাও যেতে পারিনে, এবং একটিমাত্র ওয়াচ-টাওয়ারে উঠে কয়েক মিনিটের জন্য চারিদিকের দৃশ্য দেখে নিতে পারি। তবে হাবিলদার সঙ্গে থাকবে।

তাই সই। আমার বালকোচিত কৌতূহল চিরকালের। কোথায় কী আছে, আমার দেখা দরকার। সমস্তটা আমি যেন গিলে খাচ্ছিলুম। প্রতিটি মুহূর্ত আমার উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু পাছে কেউ আমার এই উদ্দীপনাকে ভুল বোঝে বা সন্দেহ করে, এজন্য আমি সতর্ক ছিলুম। এ দুর্গের সমস্তটাই পাথর ও সিমেণ্টের কাজ। পলস্তারা কোথাও নেই। উদ্দেশ্য ছিল এই, ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ চিরদিন যেন পাথরের মতো কঠিন ও দুর্ভেদ্য থাকে। যাই হোক, উঁচু-উঁচু পাথরের সিঁড়ি ধরে সেদিন অনেক উঁচু ওয়াচ-টাওয়ারে উঠেছিলুম।

সুন্দর দৃশ্য চারিদিকে। কিন্তু এ আকাশ, এ দিগন্ত অজানা। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলুম, ভারত আর আফগানের সীমানা, সামনের গিরি-লোকের ঠিক ওপারে সোভিয়েট ইউনিয়ন, ডানদিকে সিন্‌কিয়াং—যার ভিন্ন নাম তাকলামাকান। এখান থেকে কারাকোরাম অতি নিকটে দেখা যায়। আমার ঠিক দক্ষিণে এখন বিরাট নাঙ্গার শীর্ষলোক। নিচের দিকে অদূরে দুটি তুষারগলা নীলবর্ণ নদী এসে মিলেছে। একটি বেরোচ্ছে কারাকোরামের পশ্চিম এলাকা হুন্‌জা-মুলুকের হিমবাহ থেকে, অন্য নদীটি উত্তর-পশ্চিমের হিন্দুরাজ পর্বতমালা ভেদ করে। হাবিলদার একে একে সব আমাকে দেখাচ্ছিল। এবার আমাকে বলল, তোমাকে হিন্দুরাজ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ফিরতে হবে।

যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে তৃণলতাশূন্য সে পৃথিবী। পাহাড়গুলি যেন নগ্নকায়, অরণ্যের অঙ্গসজ্জা নেই তাদের গায়ে। শুধু ছোট বড় নদী এসে মিলছে এখানে ওখানে। আর মাসখানেকের মধ্যে সব নদী জমে গিয়ে তুষার-শয্যা পাতবে।

নেমে এলুম পনেরো মিনিটের মধ্যে।

অপরাহ্নের দিকে সেদিন আমার পারমিট্ এল। আগামী কাল প্রাতরাশের পর আমি গিলগিট ত্যাগ করে যাব। আমার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। গিলগিট থেকে বেরিয়ে উত্তর পথে কারাকোরামের প্রান্তে 'মিন্‌তাকা' সঙ্কট পেরিয়ে সিন্‌কিয়াং দেখে আসি। কিন্তু ভিন্ন রাষ্ট্রে যাবার অনুমতি ভারতীয়দের পক্ষে নেই। ওর জন্য রয়েছে লাদাখের উত্তরে সেই কারাকোরাম গিরিসঙ্কট।

সুতরাং আমাকে 'মাস্তজ ও চিত্রল' হয়েই ফিরতে হবে। আমি তখন হুকুমের ক্রীতদাস।

মিলিটারি 'কার' আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল। ভিতরে একজন ছিল কোম্পানি-কমাণ্ডার ইংরেজ সেনা, একজন ইংরেজ মেজর ও তৃতীয় জন সুবেদার মেজর। তিনিই গাড়ি চালাচ্ছেন। তাঁর পাশে আমি আড়ষ্ট হয়ে বসেছি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু পার্বত্য পথ। কোথাও উপত্যকা, কোথাও বা গিরি-গর্ভলোক। আমি আড়ষ্ট বটে, কিন্তু মনে ফুর্তি ছিল। আজ সকালে প্রাতরাশে পেয়েছি ফুটন্ত দুধ, কর্নফ্রেক, চিনি, মাখন, হাফ পাউণ্ড পাউরুটি, চারটে সিদ্ধ ডিম, দু'খানা মাংসের বড়া এবং এক কেট্‌লি ফুটন্ত চা। একে বলে হেভি ব্রেকফাষ্ট। পারমিট্ পাওয়া মানে সমস্ত সুবিধাগুলো মিলিয়ে পাওয়া। এখন আর কথায়-কথায় সেলাম ঠোকা নয়, এখন হ্যাণ্ডশেক। আমার নিজের ব্যক্তি-মূল্য কম, পারমিটের মূল্য অনেক বেশি। আমি এখন অফিসার্স র‍্যাঙ্কে। আমার গোঁফ থাকলে চুম্‌রিয়ে নিতুম!

একে একে শেরকিল্লা, গুপিস হয়ে তেরুপাহাড় পার হচ্ছিলুম। হুন্‌জা মুলুকের পরে এটা ইয়াসিন ও ইস্কুমান রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা,—যাদের নাম 'আমীর' এলাকা। ওরা ইংরেজের আধিপত্য স্বীকার করে না,—খুন-খারাপি বেধে ওঠে কথায় কথায়। তেরু পার হয়ে গেলে কাশ্মীর শেষ, তখন আসে চিত্রল রাজ্য। আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল সর্বোচ্চ হিন্দুরাজশৃঙ্গ তিরিচ-মির। গাড়ি এসে পৌঁছল ইয়ারখুন নদীর তীরে 'মাস্তজের' জনপদে। এটা সোয়াৎ-কোহিস্তানের অন্তর্গত শ্বেতবর্ণ পাঠানদের মুলুক। এরই সঙ্গে কাফিরিস্তান সংযুক্ত—যারা শুধু আর্যজাতিভুক্ত হয়েই রয়ে গেছে। শুনেছি ওদের সঙ্গে ভারতের সর্বশেষ সংযোগ ঘটেছিল সম্রাট পৃথ্বীরাজের আমলে। দিল্লীকে ওরা নজরানা দিয়েছিল।

মাস্তজ থেকে চিত্রল বোধ হয় সত্তর মাইল। রাজধানী 'চিত্রল' আমীরের অধীনে। কিন্তু ওরা কাশ্মীরকে নজরানা দেয়। চিত্রল কাশ্মীরের মতো প্রাকৃতিক শোভা সম্পদে সমৃদ্ধ। এসব অঞ্চলের সবিস্তার বর্ণনা 'উত্তর হিমালয় চরিত' গ্রন্থে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

'চিত্রল' আমাকে সেদিন মুগ্ধ করেছিল। তারপর 'দ্রস' থেকে 'দির' এবং সেখান থেকে হাজারার ভিতর দিয়ে মালাকান্দ,—যেটি বন্যপ্রকৃতি পাঠানদের কেন্দ্র। সাহেব কমাণ্ডার বললেন, এখানে দাঁড়াবার দরকার নেই!

তাঁর নির্দেশের অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার। সাহেবরা এদেরকে বিশ্বাস করে না।

মর্দানে এসে সেদিন অপরাহ্নে অফিসার্স ক্যাম্পে লেট-লাঞ্চ করা গেল। চাপাটি, গোস্ত, আলু-পিঁয়াজ সব্জি আর চা। ডালের বদলে ঘিয়ে ডুবিয়ে রুটি খাওয়াতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। শেষকালে এক থালা আঙ্গুর চিবিয়ে উঠে যাওয়া।

অল্প কথায় বলছি বটে, কিন্তু সেই সকাল সাড়ে সাতটার কঠিন ঠাণ্ডার ভিতর দিয়ে এখন পর্যন্ত শত শত মাইল চলে এসেছি। বড় বড় উপত্যকা যখন পার হচ্ছিলুম তখন ঘণ্টায় ষাট থেকে সত্তর মাইল আমাদের গাড়ির গতিবেগ ছিল। আর এক কথা, যদিও আমাদের গাড়িতে দুটো রাইফেল ও দুটো পিস্তল ছিল, তবুও ইংরেজ কমাণ্ডারকে সঙ্গে নিয়ে চলা যথেষ্ট নিরাপদ মনে হয়নি। সীমান্তের পাঠানরা কোনও কালেই ইংরেজের সুহৃদ নয়।

আমাকে যখন ওরা তক্ষশীলার উপর দিয়ে এসে রাওয়ালপিণ্ডির ওয়েষ্টরীজে গোরা ছাউনির কাছে নামাল, বেলা তখন চারটে বেজে গেছে। আমি একখানা টাঙ্গা নিয়ে 'সিটির' দিকে চললুম।

'সিটিতে' পৌঁছেই বাজার ছাড়িয়ে এসে বাস-স্ট্যাণ্ড। আমার ঝোলাটা নিয়ে উঠে বসলুম। এখানে এখনও গরম, রাতটা হয়ত একটু ঠাণ্ডা হয়। এখন আমার সব চেনা, সমস্ত জানা। ভাষা শিখেছি, তর্ক শিখেছি, পথঘাট চিনেছি, এখন রাওয়ালপিণ্ডি আমার মুঠোর মধ্যে। বাবু মহল্লা, কালীবাড়ি, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, আশে-পাশে অলিগলি, গাঙ্গুলী আর ভটাচার্যিদের বাসা, বাঙ্গালীদের পাড়া, পূর্বোক্ত বাবুমহল্লায় ডাঃ সেনের বাড়ি,—এসব আমার নখদর্পণে। ওঁরা সব বলে রেখেছেন এবার দুর্গাপূজোয় কালীবাড়ি স্টেজে যে-থিয়েটার হবে, সেখানে আমাকে 'হিরোর' পার্ট দেবেন। শ্রীমান বটকেষ্টর ভয়ানক উৎসাহ এ বিষয়ে! তার ধারণা বাঙ্গালী সমাজে আমার মতন 'ফিগার' কারও নেই। ওর বউদিদির ঘরে আমাদের ক্যারম্ খেলার আড্ডা বসে যেত। এখন আমি হিরো। আমার উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। আমি এবার থেকে হিরো! জীবন-নাটকে এবার থেকে হিরোর পার্টে নামব। 'নকল পাঞ্জাবী'র লেখক উপেনবাবু তখন থাকতেন পিণ্ডিতে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, হিরোর পার্টে মানাবে!

'সানি ব্যাঙ্ক' হয়ে মারী পাহাড়ে পৌঁছে যখন কাঁধের ঝোলাটা নিয়ে নামলুম, সন্ধ্যা তখন সাতটা। সন্ধ্যা বটে, তবে আলো জ্বলে নি, সূর্য অস্ত যায় নি

এখনও। ছাংলাগল্লির উত্তুঙ্গ শীর্ষে সূর্যরশ্মি রয়েছে। দূরে আমার নিত্য সহচর সেই নাঙ্গার চূড়া—যার অরণ্যজটার চিহ্নমাত্র নেই।

'সিমেট্রিওয়ে' ধরে কতকটা উৎরাই পথে নেমে এসে বাঁ-হাতি আমার বাংলোর বারান্দায় উঠলুম। হঠাৎ দেখি সামনে দু'জন অপরিচিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক সাহেবী পোশাকে উপস্থিত। একজন বসে গড়গড়া টানছেন, অন্যজন পায়চারি করছেন। আমাকে দেখে গড়গড়ার ভদ্রলোক ঈষৎ কাঠিন্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'হু আর ইউ?'

সন্দেহ নেই, লোকটা দাম্ভিক। বললুম, আপনি কে?

আমার প্রশ্নে স্পর্ধা ছিল। তিনি রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'অ্যাম রায় সাহেব এন-সি-গুপ্তা! তুমি কে?'

'ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট সার্ভেণ্ট!'—সবিনয়ে বললুম।

পায়চারি করা ভদ্রলোক থমকিয়ে গেলেন। বললেন, আমি ডি-এন-দাস। এখানে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা সারাতে এসেছি। মিঃ গুপ্ত আমার বিশেষ বন্ধু।

রায়সাহেব গড়গড়া টেনে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'অ্যাণ্ড আর ইউ এ কংগ্রেস-স্কাউনড্রেল?'

প্রায় এক মাস বাদে ফিরে এ ধরনের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলুম না! অতঃপর জানলুম, রায়সাহেব নর্দার্ন কমাণ্ডের পণ্টন দপ্তরে কাজ করেছেন সুদীর্ঘকাল। এখন তিনি খেতাবধারী এবং পেনসনভোগী। ইংরেজ গভর্নমেণ্টকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। সেই কারণেই জাতীয় কংগ্রেস তাঁর কাছে ঘৃণ্য। দেখে মনে হল উনি যেন আমার মাতুলের এক অপভ্রংশ। কিন্তু তোষামোদে আমার হাত পাকা! রাত্রে অতি যত্নে আমি তাঁকে এক ছিলিম তামাক সেজে খাইয়েছিলুম। পরে শুনলুম, রায়সাহেব এখানকার মিঃ গুপ্তের দাদা। এই বাংলো ওঁরই ভাড়া নেওয়া ছিল।

তখন আমার যৌবননিকুঞ্জে যে-পাখিটি কর্কশ কণ্ঠে ডাক দিচ্ছিল সেটি হল পেখমখোলা ময়ূর। বাইরে তার বর্ণের বাহার, নাচনে তার যৌবনছন্দ, কিন্তু তার দীর্ঘ-দীর্ণ কণ্ঠরব বনভূমিকে যেন কাঁপিয়ে তুলতে চায়।

এ আর তোমার ঋতুরাজ বসন্ত নয় যে, বাসন্তী উত্তরীয় উড়িয়ে ফুলে-ফুলে তার সুগন্ধ ছড়িয়ে কোমল-গান্ধারে এগিয়ে আসছে। না, এ অন্য যৌবন। এ যেন দূর পথ ধরে ছুটে আসছে এক দুর্জয় অশ্বারোহী তার জয়কেতন উড়িয়ে,—পথের ধূলায় আর ধূসরতায় তাকে ভাল চেনা যাচ্ছে না। তার কোষমুক্ত শাণিত তরবারি প্রখর রৌদ্রে ক্ষণে ক্ষণে ঝলকে ঝলকে ঝলসিয়ে উঠছে। ওকে দেখলে দুর্ভাবনা আসে মনে। ও যেন 'আসে নির্দয় নবযৌবন ভাঙনের মহারথে'!

আমি যেন কস্তুরীমৃগের মতো শিউরে সচেতন হয়ে উঠি আপন যৌবন-গন্ধে! প্রবল পরাক্রান্ত দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য এক দয়াহীন দস্যু যেন আমার সমস্ত বাঁধন ভেঙ্গে দিতে আসছে! আমার যৌবনের প্রাচুর্য ও প্রবলতা লক্ষ্য ক'রে আমি নিজেই আতঙ্কিত হচ্ছিলুম।

আমার অদৃশ্য নিয়তি মস্ত একখানা হাত দিয়ে আমার পুরনো জীবনটাকে যেন মুছে দিয়েছে। এখন আমি নতুন, আমি সতেজ। সামাজিক বা নৈতিক অপরাধ যদি কিছু করে থাকি, সে সাময়িক প্রবৃত্তি বশত—সে আমার মনে নেই। আমাকে স্পর্শ করে না কিছু, আমার প্রবহমান জলস্রোতে কোনও দাগ পড়ে না। আমার জীবনের দণ্ডে দণ্ডে বিপ্লব-বিবর্তনকে দরকার। তাই আমি সাংঘাতিক ভাবেই নতুন। পেখম-খোলা ময়ূরের কর্কশ ও রুক্ষ কেকারব উঠেছে আমার যৌবন-প্রান্তরে।

প্রায় একমাস পরে আবার আপিসে জয়েন্‌ করেছি। প্রথম দিনটা ছিল করমর্দনের পালা। আমার সেক্‌শন্‌ থেকে আমিই গিয়েছিলুম একা। লেখরাজ, জগদীশচন্দর, আজিজ আহ্‌মেদ বা রূপলাল,—ওঁরা সব গৃহস্থ, ঘরকুনো জীব, বউদের আঁচলধরা। গত মাসের ম্যান্থভারিংয়ে আমার যান্ত্রিক যানবাহন প্রভৃতির বিন্যাসে আমার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া রিলিফের কাজে আমার অশ্রান্ত অধ্যবসায় এবং কো-অর্ডিনেশনে আমার সর্বাঙ্গীণ তৎপরতা—এ সম্পর্কে ভালো রিপোর্ট এসেছে। চন্দনওয়ারি ও

পহলগাঁও ক্যাম্পে আমি যে ডাক্তারদের সহচররূপে চারদিন দিবারাত্র আহত মেয়ে-পুরুষদের সেবা-শুশ্রূষায় লিপ্ত ছিলুম,—এজন্য সার্টিফিকেট পাঠিয়েছেন মিলিটারি আই-এম-এস। এর পর এল অন্য কথা। ইংরেজ সামরিক বিভাগের শৌর্য ও গৌরব না দেখে আমার মতন সৈনিক-কেরানী কেনই বা ফিরে যাবে? আমি ত বৃটিশ-ভারত মিলিটারি সার্ভিসে আত্মনিবেদিত প্রাণ! আমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, আমার মতন লয়াল্ কর্মী আছে কি কেউ এই কো-মারী বা মারী পাহাড়ে? আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মীরা ত কেবলমাত্র চাকুরি-জীবী! কিন্তু আমি? হই না কেন আমি কনিষ্ঠ কেরানী টাইপিস্ট—আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করব। যে কোনও মুহূর্তে আরেকবার আফগান সীমান্ত সংঘর্ষে আমি গিয়ে লড়াইয়ে নামব! প্রাণ দিতে আমার কতটুকু সময় লাগে?

কিন্তু তোমার বাড়ির লোকে কাঁদবে না?—সর্দার মোতি সিং হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন।

গুডনেস্।—আমি সোৎসাহে বললুম, বাড়ির লোক চিরকাল ধরে কাঁদে, সর্দারজী। মা কাঁদে, বোন কাঁদে—সবাই কাঁদে। কিন্তু আমি সৈনিক হয়ে এখানে এসেছি, আপনাদের 'বণ্ডে' সই করেছি চোখ বুজে। যতদিন আমি সৈনিক, ততদিন আমি নির্ভয়।

টিফিনের সময় হাসি-পরিহাসের আসর বসেছিল। রূপলালজী বললেন, তুমি মারা গেলে তোমার মালপত্র বা টাকাকড়ি কে পাবে?

আমি হেসে উঠলুম।—কেন, তার আগে যা-কিছু সব বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে দিয়ে যাব উইল ক'রে! আমার শতরঞ্চি, কম্বল, বালিশ, আমার টিনের বাক্সটা, পোশাক-পরিচ্ছদ—যা কিছু সব। আর টাকাকড়ি? আমাদের চাকর বিশুনলাল কিছুতেই আমার খোলা বাক্স থেকে হাত-সাফাই করতে চায় না। সুতরাং টাকাকড়িও পাবে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট!

উচ্চরোলে সবাই হেসে উঠল।

জগদীশচন্দর প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তোমার মা? তাঁকে কিছু দেবে না?

মা! হঠাৎ যেন বহুকাল পরে বুকের মধ্যে ধাক্কা লাগল। না, মা কিছু চান না! আমি যেন অনেক দূরে কোথায় এই উপ-মহাদেশের পূর্বাস্তলোক বাংলায় ছুটে চলে গেলুম সেইক্ষণে। সেখানে আজ বোধ হয় জন্মাষ্টমী। সকল কাজ সেরে বোধ হয় এতক্ষণে মা গঙ্গায় গিয়ে জপে বসেছেন। জননীর সেই প্রিয় দুর্গাস্তব এখানেই যেন শুনতে পাচ্ছিলুম সকল হাসি-তামাসাকে ছাড়িয়ে

আমার নিভৃত মনে : অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেহনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগৃহে তমেকাগতির্দেবী নিস্তার-হেতু নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে—!

নতুন ক'রে আবার আপিসে বসলুম।

গত মাসের মাইনের সঙ্গে যে পরিমাণ ভাতা পেলুম তা আমার পক্ষে সত্যই অভাবনীয়। টিফিনের সময়ে মা'র নামে বেশ মোটা পরিমাণ টাকা মনি-অর্ডার করলুম। তারপরে যা রইল তার থেকে বাসাখরচ দিয়েও যা পুঁজি করলুম, সে টাকা কেমন করে ওড়াবো সে এক সমস্যা। মদভাঙ খেয়ে আর কতটুকু ওড়াতে পারি? তা ছাড়া ওটা একটা মামুলী মনোবৃত্তি, ওতে নতুনত্ব কিছু নেই। আর এক কথা হতে পারে, মেয়েছেলে! কিন্তু সেবার শমরুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে ভাল করে চোখ বুলিয়ে আমার মনে হয়েছিল, মেয়েছেলের শরীরের তিন-চারটি অংশ যে কোনও পুরুষের মনে খানিকটা ঔৎসুক্য জাগায় সন্দেহ নেই, কিন্তু তার জন্য আমার কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় কেন? আমার সেই ছোটবেলাকার নাবালিকা বন্ধু, সেই স্বাস্থ্যবতী মেয়ে নন্টু—তার শরীরেও ত ওগুলো স্বল্পপরিণত অবস্থায় ছিল, হয়ত বা এতদিনে তার দেহে নতুন-নতুন চিহ্নগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা উঠুক, পৃথিবীর সর্বত্র মেয়েদের ওই একই রূপান্তর। মাঝ থেকে আমি খামোকা সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে তুলি কেন? মেয়েদের ভিতর দিয়ে প্রকৃতি নানা ফাঁদ পেতে রেখেছে, সেই বয়সে এই ছিল আমার ধারণা।

কয়েকটা সাহেব-সুবোর পাড়া আমি বেড়াবার জন্য বেছে নিয়েছিলুম। ম্যালরোডের দুটো সীমান্ত—পিণ্ডি পয়েণ্ট আর কাশ্মীর পয়েণ্ট আমার কাছে পুরনো হয়ে গিয়েছিল। তাই চলে যেতুম পিনাকৃল, কনভেণ্ট প্লেস, স্ট্রবেরি, বাঁশরাগল্লি বা ঘোড়াগল্লির ওদিকে। একে একে ওদের ছাড়িয়ে যেতুম লরেন্স কলেজ। আমি প্রকৃতিপ্রেমী কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ নই, তবু চারিদিকে পাহাড়ের ওক আর পাইনের ঘন বন আমাকে যেন দুর-দুরান্তরে হিমালয়ের টানে টেনে নিয়ে যেত। আমি কবি শেলীও নই, তবু উড্ডীন পাপিয়ার চকিত মধুর চূর্ণকণ্ঠ আমার বুকের মধ্যে যেন কাঁপন ধরিয়ে দিত। বলা বাহুল্য, অশ্বরক্ষী বরকৎ মিঞার সুন্দর ঘোড়াটা আমার জন্য সংরক্ষিত থাকত। ওটায় চড়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত।

ক্রুয়েরীর মদের ভাটিতে তরুণবয়স্ক এক পাঞ্জাবী দম্পতি চাকরি করত। যুবকটির নাম জনি চৌহান, মেয়েটার নাম রোশন। ওদের ছোট্ট বাগানের

বাংলোয় অবসর যাপনের সুবিধা ছিল। কিন্তু জনির মদের মাত্রা বেশি হলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারাত। অথচ জনির কণ্ঠে উর্দু গজল শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতুম। ওরা দুজনেই খৃষ্টান এবং উভয়ের পারিবারিক সম্পর্ক ঠিক বিয়ের পক্ষেও উপযুক্ত নয়! বাড়ি ওদের লাহোরে। কিন্তু ওদের সম্পর্কটা জানাজানি হওয়ার ফলে চার্চের রেভারেণ্ড ওদের বিয়েতে রাজি হন নি। ওরা চাকরি নিয়ে চলে আসে কো-মারীতে। আমি ওদের জন্ত মাঝে মাঝে মাংসের বড়া ভাজিয়ে নিয়ে যেতুম, এবং ওদের কাছে বাংলাদেশের গল্প বলতুম।

আপিসে আমার সতীর্থরা সকলেই আমার চেয়ে বয়সে বড়। কিন্তু ওঁদের মধ্যে আজিজ আহমেদের প্রতি আমি খুবই অনুরক্ত ছিলুম। তিনি শুধু সুদর্শনই নন, তাঁর মতো সুভদ্র, স্নেহশীল, সুশিক্ষিত ও রুচিবান ব্যক্তি খুবই কম দেখেছি। উনি মাঝে মাঝে আমাকে ধরতেন বাংলাদেশের গল্প শোনার জন্ত। মাঝে মাঝে ম্যাল-এ দেখতুম, উনি ওঁর বোর্খা-ঢাকা স্ত্রীকে নিয়ে পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। ওঁরাও লাহোরের লোক। লাহোর হল পাঞ্জাবের প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

আজিজ আহমেদের নালিশ ছিল আমি সকলের বাড়িতে যাই, কিন্তু তাঁর ওখানে বার বার নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও আমি একবারও যাইনে। এ অন্যায়। আমারও বক্তব্য স্পষ্ট। মারী পাহাড়ে সর্বত্র দেখি বোর্খাপরা মহিলা। যদি কারও বাড়িতে গিয়ে দেখি, বোর্খা ঢাকা মহিলা সামনেও আসেন না, কথাও বলেন না—সেটা হবে আমার পক্ষে বিশেষ সঙ্কোচের কারণ। তাই যাব না।

ধ্যেৎ, ফুলিশ!—আজিজ আহমেদ আমার পিঠে টোকা দিয়ে আমার হাতখানা হিঁচড়িয়ে টেনে বললেন, এখনই তোমাকে যেতে হবে।

দুদিন খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে পাহাড়ে। গতকাল বড় বড় করোকাপাতের ফলে কয়েকটা লোক জখম হয়েছে। ওটা আমার খেলা ছিল—ওই টেনিস বলের মতো এক একটা শিলা আমি আকাশ থেকে লুফে নিতুম। বৃষ্টির স্থায়িত্ব হত মিনিট পনেরো। তারপরেই নীলাকাশ, আবার মধুর রৌদ্র। চমৎকার লাগত বৃষ্টি ও রৌদ্রের খেলা।

একটু উৎরাই পথ। সন্ধ্যা তখনও হয় নি। কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। পথ নেমে গিয়ে এক স্থলে ভানহাতি ওঁদের বাংলো। সামনের জানলাগুলোর কাঁচ সব বন্ধ। জানলার নিচে অনেকগুলো ডালিয়া ফুটে রয়েছে। পথ নিরিবিলি।

ভিতরে ঢুকে সামনের ঘরে আমাকে বসিয়ে আহমেদ সাহেব অন্দরমহলে গেলেন। সব জানলা ও দরজায় মোটা রংবাহার পর্দা ঝুলছে। মেঝেতে ভাল কার্পেট পাতা। দেওয়ালে কয়েকখানা ছবি—কোনওখানা বিশিষ্ট ব্যক্তির, কোনওখানা বসন্তশোভার, কোনওখানা বা ইরাবতীর তীরে লাহোর নগরী। শেষখানা হল সুদৃশ্য মক্কাতীর্থের ফটো।

আহমেদ সাহেব এবার গরম জোব্বা, সাদা পায়জামা ও মোজাসুদ্ধ চটি পায়ে ফিরে এলেন। প্রায় তাঁর পিছনে পিছনে ভিতর থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন তাঁর বেগম। আমি উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে নমস্কার জানালুম। ওঁর গায়ে বোর্খা নেই। মহিলা প্রথমেই আমাকে তুমি বলে সম্ভাষণ করলেন তাঁর মধুর কণ্ঠে। উর্দু ভাষায় বললেন, ম্যালে তোমাকে অনেকবার দেখেছি। আমাদের বোর্খায় যে চোখের সামনে জাল থাকে।

থাকতেই হবে—আমি হেসে বললুম, নইলে ত হোঁচট খাবেন। আজ থেকে আমি আপনাকে 'বউদিদি' বলব।

অতঃপর বউদিদির অর্থ টা বুঝিয়ে দিলুম। বাংলাদেশে বড় ভাইয়ের যিনি স্ত্রী, সেই বড় বউদিদি আমাদের চোখে মাতৃতুল্য। আমরা মাতৃজাতির পূজারী, সেইজন্য আমাদের উপাস্য দেবী হলেন—মা! দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, চণ্ডী—সবাই মা! নারীর আদি অন্ত একই রূপ—সে জননী!

বেগম সহাস্যে বললেন, আমি আজ থেকে তোমাকে ছোট ভাই বলব।

মহিলার পরনে ঝলমলে সাটিনের শালোয়ার, মাথায় চুমকি বসানো ফিকে সবুজ ওড়না, গায়ে রক্তনীল বর্ণের মোগল-জ্যাকেট, তার নিচে সাটিনেরই পিরান। পিছনদিকে মস্ত তাম্রবর্ণ বেণী লম্বিত। হাতের সুন্দর আঙ্গুলগুলি মেহেদীর রঙে রঙীন। ওঁর দুই চোখে সুর্মার রেখা। ওঁর মুখশ্রী আমাকে কতকটা যেন অভিভূত করেছিল। কিন্তু যে-মহিলাকে গুরুস্থানীয়া ব'লে স্বীকার ক'রে নিই, তাঁর দেহসৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য করা আমার রুচিতে বাধে। মহিলার পিত্রালয় হ'ল শেখুপুরায়।

আহমেদ হাসছিলেন। বেগম যতবার চান বাংলাদেশের কথা শুনতে, আমি ততই চাই ওঁদের কথা জানতে। বলুন, আপনাদের মধ্যে শ্রেণীবিচার আছে কিনা। কন্যাদায়ের চেহারা কেমন। ফুলশয্যার নাম কি সোহাগ-কি-রাত, বাঁদি আয়া, দাই আর দাসী—এদের মধ্যে কোথায় কি তফাৎ। শিয়া আর সুন্নির মধ্যে ঝগড়া হয় কিনা, বোর্খা ঢাকা দেবার মূল উদ্দেশ্য কি!

—বেগম আমার প্রশ্নগুলি ছাপিয়ে জানতে চাইছিলেন, বাংলাদেশের রাখালরা নাকি বাঁশী বাজায়, নৌকার মাঝিরা নাকি গান গায়, সে দেশে নাকি অনেক রকমের ফল আর সবজি, মাছের নাম নাকি ইলিশ—আরও কত মাছ! তারা নাকি 'কড়ুয়া' তেল দিয়ে রাঁধে। সে দেশে নাকি বড় বড় সাপ আর রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বাঙ্গালী নাকি 'আংরেজকো হটানে চাতে হেঁ!' বাংলাদেশের কোন কোন পাখি নাকি কথা বলে। 'টেগোর' নাকি মহম্মদ ইকবালের মতন 'বয়েদ' লেখেন। সেখানে নাকি থিয়েটার মঞ্চে মেয়েছেলে অভিনয় করে! বিভিন্ন বিচিত্র প্রশ্ন করছিলেন বেগম।

এবার এল গরম-গরম 'সামোসা' সহ মস্ত এক থালায় ক'রে কিসমিস, আখরোট, রোজবেরি, পিয়ার ও আঙ্গুর। এক বর্ষীয়সী ও সুসজ্জিতা পরিচারিকা দু'হাতে দুটি থালা এনে আমাদের সামনে রেখে গেল।

আহমেদ বললেন, রাত্রে তোমার ভাইকে কী খাওয়াবে, মর্জিনা?

মর্জিনা দেবী হাসিমুখে বললেন, মেরে পর ছোড়, জী!

প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম, আমার মেসে যে রান্না হচ্ছে, মিঃ আহমেদ।

আরে, চুপসে বৈঠো ইয়ার— লো সামোসা উঠাও—

না, আমি একা খাব না—আবার প্রতিবাদ জানালুম।

বেগম সহাস্যে যখন তাঁর সরু চুড়িপরা হাত বাড়িয়ে একটি সিঙ্গাড়া তুলে নিলেন, আমি সেই সুন্দর হাতের পেলব লাবণ্য দেখে নর্তকী শমরুর কথা অনেকটা যেন ভুলে গেলুম। যতদিন ধ'রে রয়েছি পাঞ্জাবে অথবা কাশ্মীরে—আমি কোথাও রোগা, কালো, কুরূপা, স্বাস্থ্যহীনা—এ ধরনের কোনও মেয়ে দেখি নি! মুখশ্রী হয়ত অনেক সময় ভাল লাগে নি, কিন্তু স্বাস্থ্য ও রংয়ের গৌরব আমাকে মুগ্ধ করত। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান খাদ্য এখানে সর্বাপেক্ষা সস্তা। সর্বপ্রকার মেওয়া ও ফল এখানে সাধারণ জলখাবার। দুধ, ঘি, মাংস—এগুলি অনেক নিচের স্তরেও পৌঁছয়। ভিখারীরা পায় ঘি-মাখা মোটা চাপাটি, বাসি রান্না-মাংস, একরাশি আখরোট ইত্যাদি।

মর্জিনা বউদিদি নাকি মস্ত এক জায়গীরদার বংশের মেয়ে—মোগল আমলে ওঁদের কে যেন ছিলেন সুবেদার। বউদিদির দরাজ মন-মেজাজের সঙ্গে আহমেদ সাহেবের মিল ঘটেছে বিদ্যায় ও আভিজাত্যে। আহমেদ দু'বার ইংরেজি ও আরবী সাহিত্যে এম-এ পাস করেছেন। তিনি ধনী পরিবারের সন্তান।

সেদিন আমাদের নৈশভোজের তালিকায় পোলাও, চিকেন, কাবাব ইত্যাদি

ছিল। কিন্তু খেতে ব'সে বেগম একটি প্রশ্নে আমাকে বিপন্ন ক'রে তুললেন। তিনি বললেন, জগদীশচন্দরের ভগ্নির সঙ্গে তোমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে, একি সত্যি ?

আহমেদ হেসে বললেন, ক্যা জবাব, কহিয়ে!

নতমুখে আমি বললুম, জবাব কিছু নেই, কারণ এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনে।

মহিলা বললেন, তুমি মরদ ত বটে!

বললুম, মেয়েছেলের ঝুঁকি নেবার মতন মরদ এখনো হই নি, ভাবীজী। তা ছাড়া কি জানেন, আমরা বাঙ্গালী—আমাদের সমাজ, রুচি, অভ্যাস, জীবনযাত্রা, ওঁদের সঙ্গে মিলবে না। আমাদের পরিবারে 'সম্বর্তি' হবে বেমানান।

কিন্তু তুমি ত থাকবে নর্দার্ন কমাণ্ডে! তুমি আর সম্বর্তি!

আপনারা কি বলতে চান একটি মেয়ের জন্য আমি আমার সবাইকে ছেড়ে বিদেশে থেকে যাব ?

আহমেদ বললেন, তোমার চাকরিই তোমাকে ছাড়তে বাধ্য করবে! তা ছাড়া তুমি আসবে-যাবে! ছাড়বেই বা কেন ? সবাই তোমার থাকবে!

আমি চুপ করে খাচ্ছিলুম।

বোধ হয় স্বামী-স্ত্রী দৃষ্টিবিনিময় করছিলেন। এক সময় আহমেদ সাহেব বললেন, এ নিয়ে আলাপ করব নাকি জগদীশের সঙ্গে ?

এবার আমি হেসে বললুম, মনে হচ্ছে আমি একটা যেন ষড়যন্ত্রে প'ড়ে গেছি ? শুনুন বউদিদি, আজ এসব কথা থাক। আমার ভবিষ্যতের ছক আমি এখনও তৈরি করি নি। আপাতত আরেকটা কাবাব আমাকে দিন।

কথাটা তখনকার মতো উড়িয়ে দিয়ে স্বস্থ বোধ করলুম।

আহারাদির পর সেই রাত্রে বিদায় নেবার কালে মজিনা দেবী হঠাৎ জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হলেন। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আজ আমাদের তিনজনের ভিতরে যে ধরনের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সেটি খুব সুলভ নয়। সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক, জাতি শ্রেণী সমাজ ধর্ম ও ভাষা—কোনটাই বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। মজিনা দেবী আমাকে সস্নেহ তিরস্কার ক'রে বললেন, সুতী শার্ট পরে বেরিয়েছ এই ঠাণ্ডায়, অসুখ-বিসুখের ভয় বুঝি নেই ?

আমার জবাব তিনি শুনলেন না। ছোট ভাইয়ের কথায় তাঁর কান দেবার মতো সময় নেই। তিনি ভিতরে গিয়ে একটি ফুলহাতা সোয়েটার বার ক'রে এনে বললেন, ইনকো পিন লো পহলে, তব নিকলো কোঠিসে। এটি তোমার

ভাবীজীর স্নেহোপহার মনে রেখে। যদি বড় বোনের উপহার হাত পেতে নিতে লজ্জা পাও, কাল তোমার দাদার হাতে ফেরৎ পাঠিয়ো।

আমি তাঁর অবাধ্য হ'তে পারলুম না। সোয়েটারটি গায়ে চড়িয়ে সেই রাত্রে বাসায় ফিরলুম। তখন দশটা বেজে গেছে!

পা টিপে টিপে ভিতরে ঢুকলুম। রায়সাহেব ও মিঃ দাস শুয়ে পড়েছেন দেখে স্বস্তিবোধ করলুম। রায়সাহেব আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। অযথা এবং অহেতুক আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কটু ও তিক্ত কথা তাঁর বলা চাই। আমাকে হীন প্রতিপন্ন করা, মর্যাদাহানিকর সমালোচনা করা, কথায় কথায় কঠোর বিদ্রূপ বা চোখ-রাঙ্গানো—আমার পক্ষে প্রায়ই অসহ্য হয়ে উঠছিল। কিন্তু এই বাংলোটা মূলত ওঁরই নামে লীজ নেওয়া সে যেন কবে থেকে। সুতরাং তিনি যদি আমাকে তাড়িয়ে দেন তাহলে আমি অন্ধকার দেখব। এ পাহাড়ে অন্য আশ্রয় পাওয়া এখন একেবারেই অসম্ভব।

রাত্রে পিশু পোকার উৎপাতে প্রায়ই জেগে থাকতে হতো। মশা হ'লে মারতে পারা যায়, কিন্তু পিশুকে ধ'রে মারলেও মরে না! যতক্ষণ নখের ঘষায় পুট্ ক'রে একটি আওয়াজ না হয়, ততক্ষণ পিশু জীবিত! রাত্রে ওকে চোখে দেখা যায় না। সুতরাং প্রতি রাত্রে হাজার হাজার পিশুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অপেক্ষা জেগে থাকা সুহজ।

মনের কথা চেঁচিয়ে ভাবতেও ভয় করে। রাত জেগে জেগে সরস্বতীর কথা ভাবছিলুম। ওদের বাড়িতে যাওয়া ইদানীং আমি বন্ধ করেছি। সরস্বতীর বউদি রত্না ও রত্নার ভগ্নি রাজমোতী—এঁরা দুঃখিত আমি জানি। আমি সেতার বাজানো ভাল করে এখনো শিখি নি, কিন্তু ওঁরা আমার আঙ্গুলের টুংটাং আওয়াজ হলেই বাহবা দেন। সরস্বতী এবার খালসা কলেজে থার্ড ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। তাকে যখন আমি রবি ঠাকুরের কবিতা বোঝাবার চেষ্টা পাই এবং আমার গলায় যখন কোন কোনও কবিতার ছন্দে, শব্দে ও সুরে আবেগের দোলা লাগে—তখন দেখতে পাই ওই অষ্টাদশী মনোরমার দুই চোখে নিবিড় স্বপ্নাবেশ! কবিতার প্রকৃত ব্যঞ্জনা সরস্বতী কতটুকু বুঝবার চেষ্টা করছে আমি জানিনে, কিন্তু মহাকবির কাব্যের অতলস্পর্শ ভাবনার মধ্যে তলিয়ে আমি যখন আত্মবিস্মৃত হ'তে থাকি তখন সরস্বতী যেন আমার প্রকৃত চেহারাটাকে আবিষ্কার করে! যখন সম্বিৎ ফেরে, চেয়ে দেখি ঘরে অন্য মহিলা বা জগদীশচন্দর—কেউ নেই, আছে শুধু আমার মুখের সামনে দুটো সম্মোহিত, শান্ত, বড় বড় কালো চোখ! সেই অনুপ্রাণিত দুটি চোখ যেন

আমার প্রতি প্রশস্তিতে স্মিত মধুর হয়ে উঠেছে। আমাকে চোখ নামিয়ে নিতে হয়।

সরস্বতীর যেন চমক ভাঙে। সে বলে ওঠে, আপনার কাছে বসা আমার সৌভাগ্য। কবি ইকবাল এসব লিখতে পারেন না। 'অওর বলিয়ে!'—সরস্বতী নিজেই আমার 'চয়নিকার' পাতা উলটিয়ে দেয়।—

এরপর আবার আসেন মহিলারা—জলখাবারও এসে পৌছয়।

এই যে মাঝে মাঝে আমাদের দুজনকে রেখে চলে যাওয়া—এর প্রকৃত অর্থ অস্পষ্ট নয়। আমরা পরস্পরের প্রতি আসক্ত হই এটি ওঁদের বাসনা। ওঁরা আসক্তি বোঝেন, রোমান্স বোঝেন না। পাঞ্জাবে কোথাও রোমান্স বা রসকল্পনা সহসা চোখে পড়ে না। ওরা আকর্ষণ বোঝে, টানাটানি করা বোঝে, মেয়ের জন্ত আত্মবলি দেওয়া বোঝে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান বোঝে—বোঝে না শুধু দেহহীন অনুরাগ! ওদের আকর্ষণ বা আসক্তি অতিশয় বস্তুতান্ত্রিক এবং দেহ-কেন্দ্রিক। বোধহয় এই কারণেই ওদের রসসাহিত্য বা উচ্চাঙ্গের কাব্য ঐশ্বর্য সম্পদে সহসা সমৃদ্ধ হতে পারে না। সামাজিক জীবনে রোমান্সের অবলুপ্তি ঘটলে রসসাহিত্যের সর্বনাশ! যে কোনও বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যও রোমাণ্টিক চেতনায় দাঁড়িয়ে থাকে। পাঞ্জাবে বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ—এঁদের সন্ধান পাওয়া কঠিন। পঞ্চনদ গিয়েছে মরুপাথরের ভিতর দিয়ে, গঙ্গার ধারা চলে গিয়েছে সুজলায় সুফলায় মলয়জশীতলায়!

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে এসেছি। হাওয়া নামছে উত্তরের। পাহাড় দিন দিন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বরাবরের নিয়ম অনুযায়ী আবার আমাদের অফিস নেমে যাবে রাওয়ালপিণ্ডির হেড কোয়ার্টার্সে।

এর মধ্যে একদিন পাহাড়ের পথে দেখি, দূর থেকে আসছে জনি আর রোশন। আমি দুপুরের মধুর রৌদ্রে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। সেদিন মাসের শেষ শনিবারের ছুটি। আমাকে দেখে রোশন সেখান থেকেই চিৎকার করল, পালিয়ে যান, শিগগির পালান—জনি আপনাকে খুন করতে যাচ্ছে···ওর হাতে ছোরা—

আমি থমকিয়ে দাঁড়ালুম। জনি আবার মাতাল হয়েছে। মদমত্ত অবস্থায় পাহাড়ের দেওয়াল ঘেঁষে সে এগিয়ে আসছে, তার হাতে লকলকে একখানা ছোরা। কিন্তু টাল সামলাতে পারছে না, রোশন তাকে সামাল দিচ্ছে।

ওখান থেকেই রোশন আবার চেঁচাল—চলে যান, শিগগির পালান—

এবার আমি হাসিমুখে এগিয়ে গেলুম। জনির ক্ষণ-উত্তেজনাকে আমি চিনি। সে তখন জড়িত কণ্ঠে প্রলাপ বকছে—মার ডালেগা, তেরা খুন পিয়েঙ্গে হম্—

রোশন তাকে ঝাপটে ধরার চেষ্টা করল। সেই অবসরে আমি জনির ছোরাশুদ্ধ হাতখানা কঠিন মুষ্টিতে ধরে ফেললুম। বোধহয় একটু বেশি মোচড় দিয়ে থাকব—ছোরাখানা তার শিথিল হাত থেকে রোশন ছিনিয়ে নিয়ে একেবারে পাহাড়ের খাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

জনির প্রলাপ তখনও শেষ হয়নি। তবে এবার ইংরেজীতে বলছে : তুমি আমার জীবনকে ধ্বংস করতে চাও। তুমি শয়তান—তুমি—

সহাস্যে প্রশ্ন করলুম, আমি ?

হ্যাঁ তুমি ! ইউ বাগার ! তুমি আমার স্ত্রীকে বশ করেছো ! সে আর আমাকে ভালবাসে না ! চাক্কুসে তেরে গর্দান হালাল করেঙ্গে !

জনিকে আমি জড়িয়ে ধরেছিলুম। এবার মিষ্টকণ্ঠে বললুম, ছোটভাইকে তুমি হাত তুলে কেমন করে মারবে ? যখন তোমার নেশা কাটবে তখন ত জানবে বিনা দোষে তুমি আমাকে খুন করেছ ? তোমার স্ত্রী আমার শ্রদ্ধেয়া ভগ্নির মতন—।

আসল কথাটা ফাঁস করল রোশন। বলল, তুমি অনেকদিন আমাদের বাড়ি যাও নি, তাইতেই ওর সন্দেহ—

সে আবার কি ?

বুঝলে না ?—রোশন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, ওকে লুকিয়ে আমি নিশ্চয় আসি তোমার খোঁজে—এই ওর সন্দেহ ! তুমি যদি রোজ একবার গিয়ে ওর সঙ্গে গলাগলি করতে, তাহলে আমাকে এ জ্বালা সইতে হত না।

রোশনের চোখে জল এল। জনি তখন আমার গলার মধ্যে মুখখানা ঘষে কুকুরের মতো সোহাগ-সমাদর জানাচ্ছিল। গন্ধ শুঁকে বুঝলুম, পেট ভরে জনি-ওয়াকার ঠেসেছে। মদের ঝোঁকে কী না হয়।

সেদিন ওকে কয়েকটা লেবু নিংড়িয়ে খাইয়ে সুস্থ করে একটা দোকানে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলুম ঘণ্টা তিনেক। রোশন বলল, ওর ভীষণ সন্দেহ-বাতিক।

রোশনের মতো মেয়ের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, এ আমার মনে হত না।

সরস্বতীর মামা ডাঃ বেদী জানতেন আমি অবসর সময়ে লেখাপড়ায় মন

দিই। তিনি নিজের খরচে মধ্যে-মাঝে লাহোর থেকে পার্শেলযোগে দামী দামী বই আনিয়ে দিতেন। কখনও পাঠাতেন এক বাক্স কেক, অথবা এক ঠোঙ্গা কিসমিস। আমি নিচের তলাকার একটা ছোট্ট ছেলে হানিফকে ডাকিয়ে এনে দুজনে মিলে খেতুম। পাঁচ বছরের ছেলেটা আমার আখরোট খাওয়ার সঙ্গী ছিল।

হঠাৎ একদিন প্রবল বেগে আমার জ্বর এল। জ্বর বাড়তে বাড়তে রাত্রের দিকে একেবারে বেঁহুস। এটা বিদেশ, এখানে আপনজন কেউ নেই। বিশুন-লাল শুধু রান্না করে দেয়, একটা মেয়ে-ঝাড়ুদার এসে কাজ সেরে যায়। কেউ কারও খোঁজ রাখে না! রায়সাহেব আর দাসমশাইরা থাকেন বারান্দার ওপিঠে। এপিঠে সিঁড়ির পাশের এক কোণে একখানা চারপাইতে আমি বেহুঁস অবস্থায় একা। মনে হচ্ছে আশা-ভরসা আমার কিছু নেই। মারা যাবার পর যখন আমার পচা শবদেহ থেকে দুর্গন্ধ উঠবে, তখন ওরা প্রাণের দায়ে ছুটে এসে আমার সংকার করবে! তার আগে নয়। আমি এখন মারা গেলে সরস্বতী তার দুর্ভাগ্য থেকে বেঁচে যাবে, রোশন আর জনির ঘরে শান্তি ফিরবে, মঞ্জিনা বউদিদি সোয়েটারটা ফেরৎ পাবেন, রায়সাহেবের হাড় জুড়োবে, বঙ্গসরস্বতী দায়মুক্ত হবেন, এবং আমার টিনের বাক্সটা পেয়ে শ্রীমান্ বিশুনলাল ধেই ধেই করে নাচবে!

কিন্তু মা?

বেহুঁস জ্বর সত্ত্বেও একবার উঠে বসলুম। বিলোল চক্ষে তাকালুম এধার ওধার। কয়েকটা ভাঙ্গা কাঠের খুরসি, খান দুই ছেঁড়া কম্বল, একটা পরিত্যক্ত ময়লা হারিকেন, গোঠা দুই-চার শিশি-বোতল, ফুটো একটা চটা-ওঠা কলাইয়ের বাটি—এই আমার পারিপার্শ্বিক।

আবার আমি শুয়ে পড়ে চোখ বুজলুম। ঠিক যেন তলিয়ে গেলুম অচেতন নিদ্রায়।

তখন অনেক রাত। কত রাত আমার ঠাহর নেই। আমার সেই অথই নিদ্রার মধ্যে কে যেন অতি সন্তর্পণে আমার জ্বরতপ্ত কপালে নিবিড় স্নেহভরে একখানা হাত রাখল! ঈষৎ সচেতন হয়ে ভাবলুম স্বপ্ন কি না! না, স্বপ্ন নয়! তবে কি মা? কই না, এ করস্পর্শে সেই সর্বদুঃখহরণের আস্বাদ নেই ত? তবে কি ডাঃ বেদী? সরস্বতী? রোশন? তবে কি ভাবীজী? তবে কি বিশুনলাল? না, কেউ না,—এ অন্য হাত!

চোখ খুলে তাকালুম। স্নেহসিক্ত দুই চোখ মেলে রায়সাহেব আমার

মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছেন! সেই চোখে অহেতুক বিদ্বেষ, অকারণ আক্রোশ, অযথা ঘৃণা,—কিছু নেই। ঘরে প্রখর আলো জ্বলছে। রায়সাহেব মিষ্ট শান্ত কণ্ঠে বললেন, এই ত আমি, আমি রইলুম তোমার কাছে, বাবা। এ হল কড়া জাতের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা,—এ জ্বর থাকবে না। বিশুন, গরম দুধটুকু নিয়ে আয়।

আমি আবার চোখ বুজলুম।

দিন তিনেক পরে দাসমশায় আমাকে বলেছিলেন, রায়সাহেবের একমাত্র সন্তান তোমারই বয়সী একটি ছেলে গত বছর টাইফয়েডে মারা গেছে। উনি সেজন্য কোথাও স্থির থাকতে পারছেন না! একদা 'দেশ-দেশান্তর' গ্রন্থে এই কাহিনীটি লিখেছিলুম।

মারীপাহাড় ছেড়ে নিচে নামবার সময় হয়েছে। অক্টোবরের প্রায় মাঝা-মাঝি। পল্টন দপ্তরের থেকে বড় বড় কাঠের সিন্দুক একে একে পিঠে বেঁধে নামছে পাঠান-শ্রমিকরা। চার মণ থেকে ছয় মণ এক একটার ওজন। ওরা বলে, পিঠের সঙ্গে আর কপালের সঙ্গে বাঁধনের কৌশলে সিন্দুকের ওজন যায় কমে,—খানিকটা নাকি শূন্যে ঝোলে! আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকতুম ওদের অপরিসীম শক্তি ও স্বাস্থ্যের দিকে। ওরা ভদ্র ও শান্ত। কিন্তু রাগলে আর রক্ষা নেই।

ম্যালে ঠাণ্ডা খুব। এরই মধ্যে দোকানপাট কয়েকটা বন্ধ হয়ে গেছে। ওদের প্রধান কেন্দ্র হল রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর বা মুলতান। পশম ও রেশমের প্রধান কেন্দ্র অমৃতসর।

আমাদের পক্ষে কারও কাছে কারোর বিদায় নেবার দরকার নেই। স্থানান্তরের ঝামেলা চুকলেই আবার পরস্পরের সঙ্গে দেখা হবে। এই উপলক্ষে ছুটি পাব দিন তিনেকের। যাই হোক, জনি আর রোশনের কাছে গিয়ে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আসতে হল। ওরা থাকবে এখানে। তুষার-পাত হবে পাহাড়ে-পাহাড়ে, শাদা হয়ে যাবে পাইনের বন, বরফানি ঝড় বইতে থাকবে মারীতে, আগুন জ্বালিয়ে থাকবে এখানকার পাহাড়ীরা, নিঃসাড় হয়ে যাবে এখানকার জীবন। শুধু ডিসেম্বরের শেষে ইংরেজ সাহেবেরা এদিকে স্কী খেলতে আসবে।

এখন আমি বিবাহিত হলে আমার পক্ষে আর্থিক সুবিধা ঘটত! অর্থাৎ মাত্র চল্লিশ মাইল পথ সস্ত্রীক মালপত্র নিয়ে রাওয়ালপিণ্ডির বাসায় গিয়ে ওঠার

খরচ বাবদ ভাতা পাওয়া যেত পৌনে দু'শ টাকা। বউ থাকলে রামরাজত্ব! কিন্তু আমি একে আইবুড়ো, তায় কনিষ্ঠ কেরানী। আমার কপালে আটান্ন টাকা। মনে মনে অবশ্য জানি, খরচা আমার মাত্র টাকা তিনেক। বাসভাড়া দু'টাকা, টাঙ্গা আট আনা, কুলি চার আনা, আর পকেট খরচা আনা চারেক। প্রতি মাসেই আমার বেশ মোটা অঙ্ক জমছে, এই পঞ্চান্ন টাকা তার ওপর বাড়বে। কিন্তু এ বছর আমার আরেকটু চোখ ফুটেছে। এবার থেকে সিনেমা, সার্কাস, কর্নিভ্যালে জুয়া, বন্ধুবান্ধবসহ বনভোজন, টাঙ্গায় চড়ে ঘুরে বেড়ানো, নতুন নতুন পোশাক। না, নেশাভাঙ নয়, জনি সেবার আমাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছে!

নেমে আসার সময় আবার সেই রক্তবরণ সুন্দর পথ। পাহাড়তলীর উপত্যকায় ওক-পাইন আর শাল-সেগুনের বনে বনে রঙ্গীন পাখিদের কলকণ্ঠ। আশেপাশে ছোট বড় পদ্ম সরোবর। এদেরই ভিতর দিয়ে গাড়ি এসে আমাকে পৌঁছিয়ে দিল রাওয়ালপিণ্ডির বাস-স্ট্যাণ্ডে। একখানা টাঙ্গা নিয়ে আমার চেনা পথ ধরে বাবুমহল্লার প্রান্তে একস্থলে গিয়ে নামলুম।

একতলা পুরনো বাড়ি। এক প্রবীণা শিখ মহিলা হাসিমুখে বেরিয়ে এসে বললেন, সাবাস, লড়কা আ গৈ। ব্যস্, মেরে রোটি বন্ চুকা। আও, বয়েঠ যাও, বেটা।

প্রবীণা মহিলার অত্যুৎসাহ লক্ষ্য করে হাসলুম। অতঃপর কুশল প্রশ্নাদির পর আমি বাক্স আর বিছানা নিয়ে ছাদে উঠে একপ্রান্তে আমার পরিচিত ঘরটিতে উঠলুম। এটির মাসিক ভাড়া পাঁচ টাকা। ঘরে ঢুকে দেখি, একপাশে আমার চারপাইয়ের ওপর তোশক, চাদর ও বালিশ পরিচ্ছন্ন ভাবে পাতা। একখানা চেয়ার রেখেছেন মাতাজী টেবিলের সামনে। অন্য একটি কোণে আঙ্গোটি, কাঠকয়লা রাখার একটি কাঠের বাক্স, ছোট হাঁড়ি-কড়াই আর একটি থালা। তাওয়া আর চিমটা ঠিকই আছে। গোটা দুই কটোরা ও একটি সিসা-গিলাস। তাকের ওপর নুন-মশলার জন্য গোটা চারেক হরলিক্স্-এর খালি বোতল।

মাতাজীর কাছে বসে খানচারেক ঘিয়ে ডোবানো রোটি আর সব্জির ঘঁাট গোগ্রাসে গিলে উঠলুম। তারপর ওঁর হাতে দিলুম পাঁচ আর পাঁচ—দশ টাকা। আটা, ঘি, পেশোয়ারী আতপ চাওল, নিমক-মশালা, জলাহুয়া লকড়ি, আলু-গোবি-পিঁয়াজ, আণ্ডা অওর কালি-মির্চ, চানা-কে-দাল, ভিণ্ডি দো-চার মিলে ত বহুৎ আচ্ছি। মোট টাকা চারেক হয়ত লাগতে পারে। ঝাড়ুদার

উয় জমাদারকে নিয়ে এক রূপ্যা।

আমার যৌবনে তখন উঠেছে জলতরঙ্গ। পা-জামার সঙ্গে মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি চড়ালুম যার ডান কাঁধের দিকটা কাটা। বেলদার স্থতি বোতাম। আমার অতিশয় চওড়া বুকের ছাতি সম্বন্ধে আমি সচেতন। আমার মাথায় থাকত পেশোয়ারী বাবরি চুলের ঝাঁক—যার রং ছিল ফল্‌সার মতো এবং যেগুলো ইচ্ছাকৃত অযত্নের এলোমেলো চিহ্ন বহন করত।

রাস্তাঘাটের লোক অল্পস্বল্প গরম পোশাক ধরেছে। পিণ্ডির রৌদ্র এখনও বেশ তপ্ত। তা ছাড়া আমি নেমেছি সাত হাজার ফুট উপর থেকে। আমার দেহে ঘাম দেখা দিচ্ছে, রৌদ্রে নেমে আমি রাঙ্গা হচ্ছি। আমার এখন তিন দিনের অহোরাত্র ছুটি। এই বিশাল সমতল শহরে এখন আর কেউ কারও খোঁজ রাখবে না। ডাঃ বেদীর মুরুব্বিআনা নেই, রায়সাহেবের নাটকীয় বাৎসল্যের উচ্ছ্বাস নেই, সরস্বতী-রোশন-জগদীশ-জনি-মজিনা-মায়া দেবী-শেঠী —এদের সকলের পারিবারিক ছোঁয়াচ থেকে এখন আমি মুক্ত—এখন শুধু 'নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি/বক্ষ তোর ওঠে রণরণি/নাহি জানে কেউ/রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ/কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা'—

পথ দিয়ে ছুটে চলে গেলুম বাবুমহল্লার দিকে। সেখানে হেম, বটু ও তার বউদিদি। ওখানে মস্ত ক্যারমের আড্ডা। প্রথম দেখাতেই হইচই। ক্রমশ আরও এসে পৌছল—হয়ে উঠলুম আমরা পাঁচ-সাত জন। ডবল বোর্ড—চার জন। বউদিদির নতুন বিয়ে হয়েছে আন্দাজ বছর দুই। তিনিও হইচইতে কম যান না! তাঁকে নিয়ে বসে গেলুম চারজন। ব্যস্, আর কথা নেই। উত্তেজনা এল খেলার মধ্যে। আমার স্ট্রাইক্, মানে আমারই বোর্ড। চান্স দেবো না কারোকে। বউদিদি শুধু বসে থাকুন। আর কি, এক স্ট্রাইকে শেষ। নয় আর পাঁচে চোদ্দ। আবার সাজাও।

বিকেল পর্যন্ত খেলা। চলো বেরোই এবার। হেম বটু অসিত—সবাই তৈরি। চলো, টাঙ্গা নেবো। টাঙ্গা নিয়ে আমরা চললুম যেখানে খুশি। এখন আর পাহাড়ের সেই চড়াই-উৎরাইয়ের ধীরগতি নয়, এখন সমতল—উদ্দাম গতিবেগ। বন্ধুরা উপলক্ষ, কিন্তু আমার চাই চঞ্চলতা, দ্রুততা। টগবগ করে ফুটছে আমার মন, আমি শৃঙ্খলচ্ছিন্ন হতে চাই! আমার প্রাণশক্তি, আমার জীবন-প্রাচুর্য, আমার প্রবল উদ্দীপনা,—যে কোনও উপায়ে খরচ হোক। আমার আগ্নেয় প্রকৃতির মধ্যে জমেছে বিস্ফোরক, জমে উঠেছে

অসহনীয় যৌবনের এক প্রকার বিষাক্ত শোণিত।

হঠাৎ কোচম্যানের হাত থেকে ঘোড়ার রাশ ধরে নিলুম নিজের হাতে। তারপর ছিপটি নিয়ে সপাং করে মারলুম ঘোড়াটার পিছনে। এবার সে দৌড়ল প্রবল বেগে। রাস্তা চওড়া। এবার বাঁ হাতে রাশ ধরে ডান হাতে ছিপটি। বন্ধুরা আড়ষ্ট। রাস্তার দুপাশে সবাই অবাক। তা বলে আর থামে কে? 'শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও/উদ্দাম উধাও/ফিরে নাহি চাও/যা কিছু তোমার সব ফেলে ফেলে যাও—'

এক সময় আবার রাশ হাতে নিল কোচম্যান। আমি শান্ত হলুম। তখন নিশ্চিন্ত বন্ধুদলের মধ্যে হাসির ফোয়ারা উঠল।

একটি খাবার হোটেলের সামনে এসে গাড়ি থামল। কোচম্যান্ চাইল দেড় টাকা,—আমি ঝনাৎ করে ফেলে দিলুম দু টাকা।

পিণ্ডিতে শিখদের তখন আধিপত্য বেশি। দোকান, বাজার, ব্যবসায়, বড় বড় সম্পত্তি—সর্বত্র পাঞ্জাবী শিখ আর হিন্দু 'বেওপারি'। বিরাট একেকটা প্রতিষ্ঠান তাদের। আমরা বড় এক শিখ হোটেলে ঢুকলুম। মাংস, শুধু মাংস খাওয়া চাই আমাদের। চপ, শিককাবাব, কাটলেট্—এসব চাই। বটু অসিত হেম—ওরা ক্ষীণজীবী, ভয়ভীরু, দুব্‌লা-পাতলা—ওরা পেট ভরে খাক্। দাঁড়াও আসছি—

ছুটে বাইরে এলুম। কিনলুম কয়েকটা আপেল, একসের আঙুর, একরাশি চেরি। এক হাতে মাংস, অন্য হাতে মেওয়া। যত খুশি খাও।

বটু বলল, এসব করছেন কি? কত খাবো আমরা?

খেতেই হবে। খাওয়া মানে প্রাণ।—আমি প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললুম, খাওয়া মানে শুধু প্রাণধারণ নয়, প্রাণশক্তির জাগরণ!

পোশাক মানুষের পরিচয়। ইংরেজ মিলিটারি, বা পুলিস সার্জেণ্ট—এদের পোশাক দেখতে দেখতে গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমার চাই কাবুলী পাঠানের পোশাক। পায়ে ঘন্টিবাঁধা জুতো, চুড়িদার জরি-বর্ডার দেওয়া শালোয়ার—যেটা দুই পায়ের দিকে পাকানো। গায়ে বহুৎ লম্বা হাঁটু পর্যন্ত পিরান—দু' হাতে কব্জি বাঁধা, উপর দিকে মখমলের জ্যাকেট, মাথায় চুমকি বসানো মস্ত টার্বান বা পাগড়ি। চোখে ঈষৎ সুর্মা থাক। পিছনে ঘাড়ের দিকে পাগড়ির নিচে আমার লম্বা চুলের ঝালর ঝুলে পড়ুক। আমার নতুন পরিচয় হোক।

সব শ্রেণীর মধ্যে আমি ঢুকতে চাই, সব সম্প্রদায় আমার নিজের। হিন্দী, হিন্দুস্তানী, পানজাবী বা গুর্মুখী, পুস্তু—একটু একটু শিখেছি ওগুলো—যাতে কাজ চলে যায়। ওসব আমারই ভাষা, আমারই দেশের। আমি দৈবাৎ বাঙ্গালী, কিন্তু আমি সর্বভারতের। আমি যেন আমাকেই দেখছি সর্বত্র! এ আমার ভয়ানক শখ, সকলের মধ্যে প্রবেশ করে আমি আমাকেই দেখব নতুন নতুন। সকলের মধ্যেই শুধু আমি নয়, আমারই মধ্যে সবাই!

লেখরাজ আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে সানন্দে বললেন, বড়ি সুরৎ— ! সৌখিয়া কি বাৎ না হ্যায়?

—য্যায়সা সমঝো— ! হাসিমুখে জবাব দিলুম।

ঠাণ্ডা পড়ছিল রাওয়ালপিণ্ডিতে। গোরাছাউনির দিকটায় বেশি ঠাণ্ডা। উত্তর আর পশ্চিম দিক থেকে হাওয়ার সঙ্গে ঠাণ্ডা আসছে। মাঝে মাঝে মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। গরম কোট-প্যাণ্ট মোজা-জুতো ছাড়া এখন আর চলে না। আমার আপিসের সাজ ফিট সাহেবী।

ওই পূর্বোক্ত পোশাক নিয়েই ঘুরছিলুম পিণ্ডি শহরে। পথ চিনে চিনে গিয়ে উপস্থিত হলুম সেন-কোম্পানির ডাক্তারখানায়। এঁরা কাশীর লোক, কিন্তু দুই পুরুষ ধরে আছেন পিণ্ডিতে। একদা এঁদেরই কাছে এক রাত্রির জন্য আতিথ্য নিয়েছিলুম। কিন্তু এঁরা সেদিন আমাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। হয়ত ভেবেছিলেন আমি এক পলাতক বাঙ্গালী বিপ্লবী—পালাচ্ছিলুম নাকি কাশ্মীরের ভিতর দিয়ে মধ্য এশিয়ায়! ফলে, ওঁরা আমাকে সেই রাত্রে ওষুধের আড়তের মধ্যে শুইয়ে রেখেছিলেন। আমি সেই শ্বাসরোধী ঘরের

ওষধিগন্ধের মধ্যে রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছিলুম। সেই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে আমার মনে বিপ্লবের আগুন ধক ধক করে জলেছিল!

ওঁদের সামনে দাঁড়িয়ে পাগড়িটা খুলে বাংলায় সম্ভাষণ করলুম, কিন্তু ওঁরা আমার চেহারা দেখে বা কথা শুনে চিনতেই পারলেন না! আমি অনেকগুলো কথা একে একে মনে করিয়ে দিলুম, কিন্তু ওঁরা বললেন, ওঁদের জীবনে আমার মতো এই চেহারার বাঙ্গালী কোনদিনই দেখেননি! কানাকানিতে শুনলুম, আমি নাকি ছদ্মবেশী এক মুলতানী! বাঙ্গালী হতেই পারে না! আমার পোশাকই আমার পূর্বপরিচয়কে মুছে দিল।

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে আমি চলে এসেছিলুম।

পিণ্ডিতে ঘুরে ঘুরে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম অন্য একটা জনস্রোত। ওরা উত্তর দেশ থেকে দলে দলে নেমে আসছে দক্ষিণে। দক্ষিণ মানে ভারত। ভারতের সমতল নাকি গ্রীষ্মপ্রধান। ওদের চেহারা বিচিত্র। মাথায় বড় বড় চুলের বেণী, গোঁফ এবং দাঁড়িতে কয়েক গাছা করে তামাটে চুল, গলায় অনেকের হাড় ও পলার মালা, পরনে জোব্বা বা আলখেল্লা শতছিন্ন, পায়ে মোটা মোটা হাতে-তৈরি ভেড়ার লোমের জুতো আর মোজা—কাঁধে ঝোলা—ওরা নাকি সিন্‌কিয়াংয়ের উরুম্‌চি ও ইয়ারকন্দের লোক। জাতিতে তিব্বতী ও মঙ্গোলীয়। ওদেরই সঙ্গে সঙ্গে বোঝা নিয়ে আসছে শত শত গাধা, অশ্বতর, কুকুর, লোমশ ছাগল ও ভেড়া। কোন দল খোতানি, চান্‌খানি, বালতিস্তানি বা লাদাখি। বহু মেয়ে-পুরুষের কোলে ভেড়ার বাচ্চা। জলস্রোতের মতো প্রতিদিন ওরা দলে দলে নেমে এসে জড়ো হচ্ছে। ওদের জন্য সরাইখানা আছে, সরকারী তাঁবু আছে এবং হাজার হাজার মানুষের জন্য সংরক্ষিত প্রান্তর আছে। শীতকালের পাঁচ-ছয় মাস অবধি ওদের দেশ তুষার বা বরফে চাপা পড়ে, খাদ্যসামগ্রী মেলে না, পানীয় জল বরফে পরিণত হয়, পালিত পশুরা মরতে থাকে ঠাণ্ডায় আর অনাহারে। সুতরাং বাঁচবার মতো একটু উত্তাপ ওদের পক্ষে দরকার। সরাই বা তাঁবুর মধ্যে যখন আশ্রয় নিয়ে ওরা বসে, তখন দেখি ওদের এলানো পুঁটলির ভিতর থেকে গরু বা চমরের শুকনো পাঁজরা, বাছুর বা ছাগলের ঠ্যাং, পোড়া-পোড়া মোটা জবের চাপাটি, ময়লা নুন এবং চামড়ার বোতলে জব-পচানো পাঁচনের মতো এক প্রকার 'সরাব'। সন্ধ্যায় দেখি মোটা চর্বির ডেলায় লোমের ফাঁস লাগিয়ে প্রদীপ জ্বালে এবং কাঠকুটোয় আগুন ধরিয়ে মাংস পোড়ায়। অনেকবার তারই অসহনীয় দুর্গন্ধ আমাকে ওদের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ওদেরই তাঁবু থেকে পিণ্ডির বড় বড়

'বেওপারিয়া' ভেড়া-ছাগলের লোম কিনতে আসে। কুকুরগুলো ওদের পালিত পশুদের পাহারায় থাকে।

ওরা আমার মনে অনেক রকমের বিস্ময় আনে। ওদের কাছে আছে যেন কোন্ অজানা জগতের সংবাদ। কোথায় তাকৃলা-মাকান, মঙ্গোলিয়া আর সেই গোবি মরুলোক, কোথায় বা সেই আশ্চর্য ভূখণ্ড তুর্কিস্তান আর তাজাকিস্তানের ফারগানা—ওরা সবাই যেন তাদের খবর এনেছে। আমার অবাধ্য কৌতূহল আমাকে একদিন সন্ধ্যায় ওদের মাঠের এক তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। ধূসর দিগন্তলোকে তখন সবেমাত্র সূর্যাস্ত হয়েছে। ওদের পোড়া মাংস, জবের চাপাটি এবং ওই ময়লা সরাব-এর প্রতি আমি মোহগ্রস্ত হয়েছিলুম। ওদের মতন মাথার বিনুনি আমার বড় বড় চুল দিয়ে বানাতে চাই। ওদের ওই শতচ্ছিন্ন জোব্বা পরলে কে আমায় নিন্দে করবে? ওদের ওই জুতো আর মোজার প্রতি আমার যে ভয়ানক লোভ! আমি চাইছি ওদেরই মতো বন্য বিশৃঙ্খল যাযাবরের জীবন!

এক একটা ছোট তাঁবুর বাইরেই অনেকে ব'সে রয়েছে। আবছা অন্ধকারে চেনা যায় না কোন্‌টা পুরুষ আর কোন্‌টা স্ত্রীলোক। তবে এক-এক স্ত্রীলোকের মাথায় চূড়ার মতো উঁচু টুপি, সে-টুপির দু'দিকটা মোড়া—তারা হ'ল লাদাখি মেয়ে। আমি অমনি একটা গোলাকার মঙ্গোলীয় তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়ালুম। ওখানে আগুন জ্বালা হয়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে আরও দু পা যখন এগিয়েছি, তখন হঠাৎ একটা কালো লোমশ কুকুর কোথা থেকে ফুঁসিয়ে তেড়ে এল। হিংস্র কুকুরের সেই আকস্মিক তাড়না কেমন ক'রে সামলাবো—এটি পলকের মধ্যে বিবেচনা ক'রে একটি লোকের গায়ে-গায়ে ব'সে পড়তে বাধ্য হলুম। লোকটা এক প্রকার শিস দিল। কুকুরটা থামল। আমার বুক তখনও ধড়ফড় করছে।

লোকটা আমার দিকে তাকাল। হাসল একটু। ঘাড় নেড়ে বলল, ইন্দস্তান?

আমি ঘাড় নেড়ে সহাস্যে সায় দিয়ে জানালুম, হ্যাঁ, আমি ইন্দস্তানের লোক। কুকুরটা এতক্ষণে বোধ হয় বিশ্বাস করল আমি ভেড়া-ছাগল চুরি করতে আসিনি। লোকটা এবার আমার পিঠের ওপর হাত চাপড়ালো। অর্থাৎ যেন ভয় না পাই।

কেউ কারও ভাষা জানিনে, শুধু ইশারা আর ইঙ্গিতে চালাচ্ছি! ওই ইঙ্গিতেই এক সময় ধূমপানের সরঞ্জাম নিয়ে এল একটা মেয়েছেলে! অতঃপর

লম্বা একটা কলকের মধ্যে মসলা পুরলো। লোকটা বলল, বুররা।

আমি হাসিমুখে দেখছিলুম। আগুনের ডেলা হাতে করে নিয়ে লোকটা কলকেটার মধ্যে ফেলে টানতে লাগল। অন্ধকার প্রান্তর তখন ঠাণ্ডা হয়েছে। কাশীস্থানে একদা প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, না, এ জীবনে মাদক সেবন আর নয়! কিন্তু মঙ্গোল বংশজাত এই ব্যক্তি আমার মুখে চোখে বোধ হয় একাগ্র আসক্তির ছবি দেখে থাকবে। সুতরাং এক সময় সে কলকেটা আমার দিকে বাড়ালো। আমি তৎক্ষণাৎ সেটি গ্রহণ ক'রে দু'হাতে মুখে ধরলুম এবং আমার বহুদিনের আত্মনিগ্রহের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বোধ হয় একটু বেশি দমেই টেনে থাকব—ফলে, লম্বা কলকের ভিতরটা প্রদীপের মতো জ্বলে উঠল! ওটা নাকি 'বুররা' —কিন্তু মিনিট খানেকের মধ্যেই উপলব্ধি করলুম, ওটা একালের 'হাসিস'। এরা তুর্কিস্তানের মঙ্গোল।

মেয়েছেলেটা আগুনের মধ্যে কাঁচা মাংস পোড়াচ্ছিল দেখে আমি পকেট থেকে একটা টাকা বার ক'রে লোকটার দিকে বাড়িয়ে বললুম, গোস্ত···গোস্ত-রোটি!—নিজের মুখে হাত দিয়ে আমার খাবার ইচ্ছাটা জানালুম।

লোকটা যেন লুফে নিল সপ্তম এডোয়ার্ড মার্কা রূপোর টাকাটা। টাকাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এপিঠ ওপিঠ খুঁটিয়ে দেখল। আমার তখন পরনে ছিল মুসলমানদের মতো চাঁদি ক্যাপ এবং আধময়লা পায়জামার উপর কামিজ। চাঁদি ক্যাপটি মাথা থেকে তুলে আমি সহাস্যে লোকটার মাথায় পরিয়ে দিলুম।

কুকুরটা এবার সামনে থেকে উঠে অন্যত্র চলে গেল।

একপ্রকার বীভৎস বোটকা গন্ধ উঠছিল ওই আগুন থেকে। কিন্তু ওতেই আমার লোভ। মেয়েছেলেটা চিমটে দিয়ে পোড়া মাংসখণ্ডটা উলটিয়ে আগুনে রেখে এবার উঠল এবং সে যখন মাথা নিচু ক'রে তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে গেল, তখন দেখি ভিতরের ঝোলাঝুলির পাশে মস্ত এক ঈগল পাখি লোমপাকানো দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ব'সে রয়েছে।

স্ত্রীলোকটি আবার বাইরে এল, দেখি তার হাতে ফাঁস দেওয়া বড় একটা চামড়ার বগলি। ওই বাঁধা বগলির সঙ্গে সুকৌশলে চামড়ারই নল লাগানো। ওরা জল খায় না, খাদ্যের সঙ্গে 'জাঁড়' খায়—ওটাই ওদের 'সরাব'।

এবার আমি বেশ গুছিয়ে সানন্দে চেপে বসলুম। ওদের মনোহরণ করার পক্ষে একটা টাকা আর ওই ছয় আনার টুপিটা খুব কাজে লেগেছে।

সেদিন আমার বাসায় কত রাত্রে ফিরেছিলুম, আসবার পথে ক'বার বমি

করেছিলুম এবং একতলার ছাদে ওঠবার কালে সিঁড়িতে একবারের বেশি হোঁচট খেয়েছিলুম কিনা—এসব কথা এতকাল পরে আর সুস্পষ্ট মনে পড়ছে না। তবে আমার শিখ-মাতাজি আমাকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে বলেছিলেন, মেরে লাল বেটা, সরাব পিওগে ত' আংরেজি সরাব পিও—জাঁড় পিনেসে জাইদি চক্কর আতি হেঁ—মেরে মরদ অওর লড়কা দোনো বহুৎ হুঁশিয়ার আদমি হ্যায়—

উনি জানিয়ে দিলেন ওঁদের ঘরে দেশী সরাব ঢোকে না।

না, বিদেশ-বিঁভূয়ে এসব আচরণ ভালো নয়। আমার প্রবৃত্তি আর কৌতূহল আমাকে অসৎপথে নিয়ে যাচ্ছে! জীবনের পাঠ থেকে এইরূপ জ্ঞানার্জনের বাসনা আমার সর্বনাশ করতে উদ্যত। না, আর নয়। আমার এখন বাইশ বছর বয়স উত্তীর্ণ। তেইশে পড়েছি। আমার পক্ষে সংযম, কঠোর ব্রহ্মচর্য, অনাসক্তি, নিষ্কাম কর্মযোগ—এগুলি একান্তই দরকার। স্বামী বিবেকানন্দর পাড়ায় আমি মানুষ, তাঁর সব বাণী ও রচনা আমার মুখস্থ—এ সব কি আমার শোভা পায়? শুধু স্বামীজী কেন? আমাদের বাড়ির চারিদিকে যাঁদের বসবাস ছিল বা আছে, তাঁরা ত' সবাই প্রাতঃস্মরণীয়! বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগর, তা'র কোলের কাছে জগদীশ বসু আর আনন্দমোহন বসু, ওপাশে কেশব সেন, এপাশে রাজা রামমোহন, বাড়ির গায়ে ডি-এল-রায়, দক্ষিণে দীনবন্ধু মিত্র, পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথ, গোয়াবাগানে শরৎকুমারীর বাবা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তাঁর নাতি যামিনী আমার সহপাঠী, সামনে ডি-এল-রায়ের শ্বশুর ডাঃ প্রতাপ মজুমদার—আর ক'জনের নাম করব? এঁদের প্রভাবের মধ্যে থেকেও আমার এই অধঃপতন? ধিক আমাকে।

প্রভাতে উঠে স্নান করলুম ঠাণ্ডা জলে। পৈতাটা বাক্স থেকে বার করে গলায় চড়িয়ে দশবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলুম। স্নানাদির পর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। কিন্তু অন্তর্যামীকে জানালুম, না, এখন নয়। যখন রান্নাবান্না শেষ করব, তখন খেয়ো! এখন থেকে খাই-খাই করো না!

আজ রবিবার—অনেক কাজ। খবরের কাগজ 'ট্রিবিউন' কখানা একবার উলটিয়ে নেব, চিঠিগুলোর জবাব দেবো। বিশেষ করে 'কালিকলম'-এর সম্পাদক মুরলীধর বসুর চিঠিখানা পড়ে রয়েছে—ওটার জবাব দেওয়াই চাই। পবিত্র গাঙ্গুলীর তাগাদায় পর-পর দুটো গল্প পাঠিয়েছি 'কল্লোল'-এ। শৈলজার চিঠিখানা এখনও খুলিনি। প্রভাসের স্ত্রীর চিঠির জবাব আজও দেওয়া হয়নি। মায়ের নামে মনিঅর্ডার করেছি, তার রসিদ এখনও ফেরত আসেনি।

মুরলীদা তাঁর চিঠিতে নানা কথার পর লিখেছেন, 'ভারতবর্ষ' এতদিন পরে কল্লোল-কালিকলমের লেখকদেরকে আমন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়েছে। সম্প্রতি ইন্দোরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি জলধর সেন প্রবাসী বাঙ্গালী লেখকদের নামোল্লেখ করতে গিয়ে তোমার কথাও বলেছেন। তুমি যে রাওয়ালপিণ্ডিতে রয়েছ তা তিনি জানেন। কিছুদিন আগে উনি 'ভারতবর্ষে' লেখার জন্য তোমাকে একখানা ভাল চিঠি দিয়েছেন শৈলজার হাতে। শৈলজা সে চিঠি কি তোমার কাছে এখনও পাঠায়নি? এবার থেকে তুমি ভারতবর্ষেও লিখো। ওরা পারিশ্রমিক দেবে।

অতঃপর কাশী থেকে লেখা শৈলজার চিঠিখানা পড়লুম। তলার দিকে প্রেমেন্দ্র লিখেছে কয়েক লাইন। তাহলে দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু এখন কাশীবাস করছে! খবরটা পড়ে খুবই উদ্দীপনা বোধ করলুম। কিন্তু চিঠিখানার মধ্যে জলধর সেনের চিঠির উল্লেখ মাত্র নেই।

নিজের রান্নাবান্না নিজেই আমি করি। শিখ-মাতাজি সর্বপ্রকার উপকরণ আমার ঘরে পাঠিয়ে দেন, আমি টাকা ধরে দিই। ভোরে উঠে সর্বাগ্রে চা, দুপিস ডবল-রোটি এবং আণ্ডা-ফ্রাই। কাঠ-কয়লার উনুন, অসুবিধা নেই। অতঃপর লেখাপড়া ঘণ্টা দেড়েক। তারপর ভাত চড়িয়ে স্নানে যাই। পিণ্ডিতে ভাত খাবার সুবিধা পাই। মারীতে সব সময় চাপাটি। এখানে রাত্রের দিকে মাংস। আপিস থেকে ফিরি 'দুম্বা' ভেড়ার মাংস নিয়ে—ওটার দাম অত্যন্ত বেশি, আট আনা সের দর। ওটায় হাড় বিশেষ থাকে না এবং সিদ্ধ হতে সময় নেয় না।

পেশাওয়ারি আতপ চালের ভাতে শ্রেষ্ঠ খাঁটি ঘি ঢেলে দিই। তার সঙ্গে আলু, ডিম, গোবি, এক আধটা ভিণ্ডি, দু'একটা সয়াবিন—সব মিলিয়ে এক পাক। মাছ বা 'কড়ুয়া' তেল ভুলে গেছি। ভাতের মধ্যেই খানিকটা সন্ধব লুন ও লাল লঙ্কার গুঁড়ো ফেলে দিই। অতি উপাদেয় লাগে। আপিস এখান থেকে দেড় মাইলেরও বেশি। যখন গিয়ে পৌছই, তখন আটটা পঁয়তাল্লিশ! তিন চার মিনিট এদিক ওদিক হয়ে গেলে জবাবদিহি করতে হয়। ওরা সবাই স্নানাদি সেরে ব্রেক-ফাস্ট করে বেরিয়ে আসে, সুতরাং সময় পায়। কিন্তু আমি ঘরদোর পরিষ্কার করি, বিছানা গোছাই, ভোরের চায়ের সঙ্গে ট্রিবিউন পড়ি, লেখাপড়া করি এবং রান্না চড়াই। তারপর দাড়ি কামানো, স্নানাহার, ফিটফাট সাহেবী পোশাক চড়ানো। অতঃপর হাঁটতে হাঁটতে অথবা ছুটতে ছুটতে আপিস যাওয়া—কোথাও যান-বাহন নেই!

যতদিন না বুড়ো হবো, যতদিন না কর্মক্ষমতা শেষ হয়, যতদিন না পেনসন পাই—ততদিন এইভাবে চলতে হবে! মাস দেড়েক আগে হঠাৎ একদিন কামাই করেছিলুম ক্যারম খেলার নেশায়। পরদিন সর্দার মোতি সিং চোখ রাঙালেন। বললেন, এটা দপ্তর, 'মুখোলখানা' নয়। তুমি সরকারের চব্বিশ ঘণ্টার 'নোকর'। তোমার এই গাফিলতি কেউ বরদাস্ত করবে না!

একদিন কামাই হলে কি খুব অন্যায় হয়, সর্দারজী?

আলবৎ হয়!—মোতি সিং ফুঁসিয়ে উঠলেন—আমার চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলো না! তুমি ডিসিপ্লিন ভেঙেছ। এটা পল্টন দপ্তর! তুমি সপ্তাহে দেড়দিন ছুটি পাও, মাসের শেষে দুদিন। মনে রেখো, তুমি এখনো 'প্রবেশনারি পিরিয়ডে' আছ!

অর্থাৎ তিনি আমাকে তিরস্কার সহ সতর্ক ক'রে দিলেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ, আমার জিম্মায় কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল রেকর্ডগুলি থাকে, তার চাবি আমিই রাখি। গতকাল এতে আপিসের কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে।

ওই গোপনীয় দলিলপত্রের সিন্দুকে আফগানরাজ আমানুল্লাকে গদিচ্যুত করার পক্ষে বৃটিশ ষড়যন্ত্রের কতকগুলি নকশা ছিল। কর্নেল ওগুলি একবার পরীক্ষা করতে চেয়ে পাননি। সর্দারজীর উষ্মার কারণ হ'ল এই।

আমার মধ্যে অশান্ত বিপ্লব জেগে উঠছিল কিছুদিন থেকে। মনে হচ্ছিল আমার কাল পূর্ণ হতে চলেছে। আমি চব্বিশ ঘণ্টার চাকর, এ ছাড়া আমার অন্য কোনও পরিচয় থাকতে পারে না। বাঁধা ছকের মধ্যে আমাকে থাকতে হবে, প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের নিয়মবাঁধা জীবন যাপন না করলে আমার অন্য উপায় নেই। "ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী/মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই/সে কথা যে যাই পাসরি।"

ঐক ঠাঁইতেই আছি, ছোট্ট একটি ঘরে। চিড়িয়াখানায় পশুরাজ সিংহের জন্য যে খাঁচা থাকে, তার চলাফেরার জন্য সেটা প্রশস্ত হওয়া চাই। সে বন্দী, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নেই। আমি আমার বর্তমান জীবন-ব্যবস্থার খাঁচায় বন্দী, আমার পালাবার পথ নেই!

নবেম্বরের বৃষ্টি নেমেছে রাওয়ালপিণ্ডিতে, ডিসেম্বরের দেরি নেই। সেই বৃষ্টির সঙ্গে বরফানি ঝড়ো হাওয়া, এ চলছিল দিনের পর দিন। মাতাজি আমার প্রতি স্নেহশীল, তিনি আমার স্নানের জন্য সকাল সাতটায় গরম জল পাঠাচ্ছিলেন। সেই জল আমি ফেলে দিয়ে 'কালাপানিতেই' স্নান করছিলুম। ছাদের ঠাণ্ডায় ঘুরলে শীতে দাঁতি লেগে যায়। আপিস যাবার পথে সবাই

ছাতা মাথায় দিচ্ছে—আমি ছাড়া। পৌনে নটায় আপিসে যখন পৌঁছই তখন কোট প্যাণ্ট মোজা জুতো ভিজে থকথক করছে। মাথা থেকে জল পড়ছে, হাত দুখানা নীল হয়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডায়। এমনি দিনের পর দিন। সেই মেঘ আর বৃষ্টিতে ধূসর পাহাড় শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে আমি কামনা করতুম, অন্তত আমার নিউমোনিয়া একবারটি হোক, আমি কিছুদিন এই প্রাত্যহিক রুটিন থেকে নিষ্কৃতি পাই এবং আমার এই সর্বনেশে স্বাস্থ্য কিছু কৃশতা লাভ করুক! কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, নিউমোনিয়া-ব্রঙ্কাইটিস দূরের কথা, আমার মাথাটি পর্যন্ত ধরে না! বরং ছোট আয়নাটা ধ'রে মাঝে মাঝে নিজের মুখ-খানায় দেখি, ঠাণ্ডায় গাল দুটো পাঞ্জাবী মেয়েদের মতো রাঙ্গা। আমার গা ঘিন ঘিন ক'রে উঠত।

খবরের কাগজে দেখছিলুম সমস্ত ভারতে ইংরেজ বিদ্বেষ ঘন হয়ে উঠেছে। সাইমন কমিশন সর্বত্র ধিকৃত। বড়লাট লর্ড রেডিং চলে যাচ্ছেন, আসছেন লর্ড আরুইন। বাংলায় স্ট্যানলি জ্যাকসনের রাজত্ব চলছে। পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট কলকাতায় কর্মতৎপর। বিদ্রোহী বাংলা সুভাষ বসুর করতলগত। পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু সুভাষকে সমর্থন জানাবেন কিনা ভাবছেন। এবার কলকাতায় কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। মূল সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু।

সন্দেহ নেই, আমি অস্বস্তিবোধ করছি কিছুকাল থেকে। আমার স্বাধীন ও বন্ধনহীন জীবন নয়, এই আমার অস্বস্তি। নিত্য দ্বন্দ্বে দোলায়মান নই, অশান্ত সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ নেই—আমি যেন নির্জীব, আমি যেন ছককাটা ছাঁচে ঢালা নিরুপায় একটা প্রাণী তলিয়ে যাচ্ছি লক্ষ লক্ষের জনস্রোতে। আমার চারিদিকে আর দারিদ্র্য-দৈন্য নেই, অন্ন খুঁটে খাবার সংগ্রাম নেই, নিত্য জীবনরক্ষার প্রাণান্তকর গ্লানি ঘুলিয়ে উঠছে না—এ কেমন? যারা সতীর্থ, তা'রা বলছে, তুমি খুব ভালো, তুমি সুযোগ্য, তুমি অধ্যবসায়ী ও অক্লান্ত। তা'রা দেখতে পাচ্ছে না আমার চিত্তলোকের বিদ্রোহ, দেখতে পাচ্ছে না আমার মধ্যে লকলকে বিদ্রোহের শিখা! এখন আমার অজস্র অর্থ, প্রচুর বিভব, সুখে ও সুখাদ্যে আমি গরীয়ান। কিন্তু এখন আর আমি সুখ চাইনে, দুঃখও চাইনে—আমি চাই যন্ত্রণা! কোথায় সেই দৈবযন্ত্রণা—যা আমাকে দিশাহারা করবে? অন্নে রুচি থাকবে না, অর্থে আসক্তি থাকবে না, নিদ্রা থাকবে না রাত্রে, স্পৃহা থাকবে না সম্ভোগে—সেই মহৎ যন্ত্রণা কোথায়? আমি যেন আমারই প্রতি বিরূপ হয়ে উঠছিলুম।

এমনি একটা মানসিক অবস্থা যখন চলছে তখন একদিন মাসের শেষ শনিবার সকালে ডাঃ বেদী হঠাৎ এসে উপস্থিত। সেটা ছুটির দিন। অত্যন্ত শীতেও রৌদ্র ঝলমল করছিল। আমি স্নানাদি ও জলযোগ সেরে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিয়েছিলুম। বৃদ্ধ সোজা এসে ঘরে ঢুকে সম্ভাষণ জানালেন। বললেন, ইয়ং ম্যান, এমন চমৎকার দিনে পথেঘাটে ছুটোছুটি না ক'রে ঘরে বসে আছ? বাতে ধরবে যে?

হাসিমুখে উঠে ওঁকে বসালুম। বললুম, বাতে ধরলে তখন আপনাকেই ডাকব।

অর্থাৎ এখন ডাকছ না!—বেদী বললেন, অর্থাৎ আমাকে ডাকার দরকার হবে না। অর্থাৎ এখন যে এসেছি, এটা তুমি চাইছ না! এই বলতে চাইছ ত?

আমি হাসছিলুম।

বেদী বললেন, না, এ আমি হতে দেবো না। তোমাকে আমরা সবাই মিলে সামাজিক ক'রে তুলব। আমি লক্ষ্য করেছি, একলা থাকলেই তোমার মনে ভ্যাম্পায়ারের উৎপাত বাড়বে। আমি ডাক্তার, আমি জানি তুমি ডিপ্রেসনে ভুগবে! চলো আমার সঙ্গে।

আপনার সঙ্গে? কোথায়?

যেখানে যেদিকে খুশি—বেদী বললেন, নিচে আমার গাড়ি আছে। যদি ফীস্ট করতে চাও, আমি রাজি। যদি ট্যাক্সিলার ওদিকে যেতে চাও, আমি তাতেও রাজি। তবে একটা কথা নিশ্চয় জেনো, আজ তোমাকে আমি হাত পুড়িয়ে রাঁধতে দেবো না। নাও, তৈরি হও—আমার ওখানে খাবে।

বৃদ্ধ কোনও অজুহাত শুনলেন না। গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে সোজা চললেন জনবহুল শহরের দিকে। পিণ্ডির বাজারের ধার দিয়ে শহরের বড় নহর পেরিয়ে খালসা কলেজ ছাড়িয়ে তিনি এলেন এক সম্ভ্রান্ত পল্লীতে। সেখানে বড় বড় বাড়ি, কোলে-কোলে বাগান, নিরিবিলি সুন্দর পথ। এ যেন একটা 'পশ' অঞ্চল। উচ্চ অবস্থাপন্ন শিখ এবং হিন্দুরা এদিকে গায়ে গায়ে থাকে।

বেদী নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। আমাকে এক বাগানবাড়ির ফটকের সামনে এনে নামালেন। অতঃপর গাড়িখানা পাশের গ্যারাজে ঢুকিয়ে রেখে বাঁ হাতখানা সাদরে আমার কোমরে জড়িয়ে ভিতরে নিয়ে চললেন।

ধবধবে শাদা লেশপাড় একখানা শাড়ির ওপর একটি ফিকে নীল রংয়ের ফ্লানেল জ্যাকেট-কোট পরে ডাঃ বেদীর বৃদ্ধা স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। বয়সের

আন্দাজে মাথার চুল বেশি শাদা। আমি ওঁর পরিচিত। নিচু হ'য়ে আমি সহাস্যে প্রণাম জানালুম বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে।

বেটা, কুশল হো?

জি।

হাসিমুখে বৃদ্ধা বললেন, দিমাক বিগড়ে হুয়ে ক্যা?

হঠাৎ হেসে ফেললুম। বললুম, না মাতাজি, আমি খুব আনন্দে আছি।

এমন সময় বেদী ধ'রে নিয়ে এলেন আরেক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে। এঁকে চিনিনে, কিন্তু ইনিই আমার হাত ধ'রে সামনের মস্ত ঘরে নিয়ে গিয়ে সমাদরের সঙ্গে বসালেন। ইনিই গুর্দাস কাপুর—জগদীশচন্দর ও সরস্বতীর পিতা এবং বেদীর ভগ্নিপতি। আমি অনুমান করতে পারি কেন এখানে আমাকে আনা হয়েছে। কাপুরসাহেব আমার সঙ্গে আলাপ করতে বসলেন। বাবু জগদীশের কাছে ইনি আমার সম্বন্ধে অনেক শুনেছেন বুঝলাম।

আমি বিব্রত বোধ করি বাইরের সৌজন্য ও শালীনতা দেখে, কিন্তু আমার মনের সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই অস্পষ্ট নয়। ওখানে ধোঁয়া রাখিনে।

এ বাড়িরই একটা অংশে থাকেন ডাঃ বেদী, অন্য অংশটায় কাপুরসাহেব। কাপুর সাহেবের কাকার গোষ্ঠী হলেন শিখ, এবং তাঁর কাকার বড় ছেলে মহিন্দর সিং কাঁচা পাকা দাড়ি ও মস্ত পাগড়ি সমেত এসে আমার সঙ্গে আলাপ করতে বসলেন। একই পরিবারের একটা অংশ শিখ, এমন উদাহরণ শত সহস্র। 'বাপ হিন্দু, ছেলে শিখ—যেখানে সেখানে। এটা হল জাতি, ওটা হল গোষ্ঠী। শিখ জামাই, হিন্দু শ্বশুর। গাছটা হিন্দু, তার একটা ডাল শিখ। যেমন আমাদের কাশীর সুধীন রায়। তার মাথা ন্যাড়া, পরনে দশ-টুকরো শেলাই করা গেরুয়া কাপড়, সে নাকি বৌদ্ধ। সে থাকে 'ভিক্ষুর' বেশে।

এখন দেখছি আমাকে এখানে ধরে আনা হবে, এটি আগে থেকে সবাই জানতেন। আমি সুদূর বাংলাদেশের ছেলে, কিন্তু পাঞ্জাবের প্রান্তে এসে আমি নাকি তলিয়ে গেছি পাঞ্জাবী সমাজে। আমার নাকি সব বদলিয়ে গেছে। আমার আহার্যের উপকরণ, রীতি-প্রকৃতি, মুখের ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আলাপের ভঙ্গী, জীবনযাত্রার চেহারা, ইয়ার-বক্সি,—সবই নাকি এখন পাঞ্জাবী। ওঁরা নাকি আমাকে এখন ওঁদের নিজের লোক বলে দাবি করতে পারেন! আমার 'অ্যাডাপটেবিলিটি' নাকি অসাধারণ। এখন আমাকে কথায়-কথায় আর ইংরেজী বলতে হয় না, আমি গুর্মুখী ও পুস্তুতে রপ্ত।

গল্পগুজবে আমিও মেতে উঠেছিলুম ওঁদের সকলের সঙ্গে। এতক্ষণ পরে

এসে দেখা দিলেন বাবু জগদীশচন্দর। তিনি সগুস্নাত। তাঁর চেহারা, রং ও স্বাস্থ্য খুবই সুন্দর। উনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, তিরিশ-বত্রিশ হবেন। ওঁর মধুর ব্যবহারের প্রতি আমি খুবই অনুরক্ত। আমার সহকর্মীদের মধ্যে উনিই সিনিয়র এবং সর্দার মোতি সিংয়ের ঠিক নিচে। আমি সকলের নিচে, শুধু আমার নিচে হল পেয়াদা, চাপরাসী, ড্রাইভার ইত্যাদি। ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থাদি আমি দেখিশুনি।

এর মধ্যে একে একে এসে পৌঁছেছেন আমাদেরই বন্ধু, সহকর্মী ও পরিচিতরা। সদানন্দ, নাসির আহমেদ, অমর সিং, রূপলালজী এবং আরও। আজ এখানে সকলেই আহারাদি করবেন। ডাঃ বেদী হলেন 'লালজি' অর্থাৎ লালা লজপৎ রায়ের বন্ধু। সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে রাজনীতির আলোচনা উঠল। কেউ কেউ শুনেছেন এর পরের বছরে নাকি লাহোরে কংগ্রেস বসবে। কিন্তু সবই নাকি মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা। এখন সকলের চোখ কলকাতায়।

ঘরের বাইরে থেকে মেয়েরা জগদীশচন্দরকে ইশারা করছিলেন। ওঁদের সঙ্গে মারী পাহাড়ে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। বিশেষ করে রত্না, রাজমোতী, মায়া শেঠী প্রভৃতি। কিন্তু আমার গা কেঁপে উঠল যখন বাবু জগদীশ আমাকে বললেন, চলো ফিরু, অন্দরমে আ যাইয়ো—

তিনি নিজেই উঠলেন এবং আমাকে ডেকে নিয়ে ভিতরে চললেন। গুর্দাসজি অলক্ষ্যে আমার দিকে তাকালেন। আমি তখন যেন 'নবমীর পাঁঠা', —হাড়িকাঠের দিকে যেন আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! কিন্তু অত ভয়ই বা কিসের? জোর ক'রে কি আমাকে দিয়ে কেউ গলায় মালা দেওয়াবে?

জগদীশ আমাকে দোতলায় তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ওইটুকুর মধ্যেই আমার ছোটবেলার একটি ঘটনা মনে এল। চাটুয্যেদের বড় বউ একদিন এক ঠ্যাং-খোঁড়া তরুণ সন্ন্যাসীকে দুপুরবেলা রাস্তা থেকে ডেকে পাঠালেন। সন্ন্যাসীর নাম সত্যনারায়ণ ঠাকুর। বড় বউ তাকে প্রশ্ন করে জানলেন, তা'র এখনও মধ্যাহ্নভোজন হয়নি। ছেলেটা আখ্‌খুটে। বলল, আমি ভিক্ষে করে খাই। বড় বউ তাকে চর্ব্যচুষ্য করে খাওয়ালেন। পরে বললেন, তোমাকে আমি পাঁচটা টাকা দেবো, তুমি আমার একটা কাজ করে দেবে! ঠাকুর এক কথাতেই রাজি। বড় বউ তখন নবনির্মিত শ্রীমানী বাজার থেকে এক ছড়া গাঁদাফুলের মালা আনালেন। ঘরে ছিল তাঁর চীনা সিঁদুর। তারপর ও-ঘর থেকে ডেকে আনলেন তাঁতীদের সেই ডাগর মেয়েটাকে। মেয়েটা কুণ্ঠিত লজ্জায় সত্যনারায়ণের সামনে এসে দাঁড়াল। বড় বউ বললেন, এই মালাগাছটা

যুমনির গলায় পরিয়ে দাও, সিঁদুর দিয়ে দাও ওর সিঁথিতে।

পাঁচ টাকার লোভে সত্যনারায়ণ তৎক্ষণাৎ বড় বউর নির্দেশ পালন করল। কিন্তু পরে সে আবদার ধরে বলল, নতুন বউকে নিয়ে থাকব না আজ রাত্তিরে?

রাত্তিরে থাকবে?—বড় বউ বললেন, তা হলে ও-পাঁচ টাকা নতুন বউকে দিয়ে যেতে হবে।

সত্যনারায়ণ অনেকক্ষণ ভাবল। ভেবেচিন্তে দেখল, তার এই নতুন কনে-বৌ অপেক্ষা পাঁচটা টাকার দাম অনেক বেশি। সুতরাং সে যাত্রায় সত্যনারায়ণ পালিয়ে বাঁচল। বহুকাল পরে শুনেছিলুম, যুমনি ছিল চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

উপরতলায় উঠে লাউঞ্জ-এ ঢুকতেই মহিলারা হাস্যরোলে কলরব ক'রে উঠলেন। আমারও মেজাজ শরিফ ছিল। আমিও উচ্চকণ্ঠে উল্লাসে ওঁদের সঙ্গে যোগ দিলুম। বাবু জগদীশ জানালেন, 'সানিয়ালা' এতক্ষণ বুড়োদের মজলিসে জমে গিয়েছিল! লো বয়ঠো, টেগোরকা এক পোয়েম্ রিসাইট্ করো!

ওরই মধ্যে একটিবার দেখে নিয়েছি সরস্বতীকে অর্থাৎ আমার ভাবী বধূকে! ভাবী কিংবা অবশ্যম্ভাবী এখনও ঠিক বুঝতে পারছিনে। তবে উনি সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে আনম্র নমস্কার বিনিময় করেছেন। ওর পরনে আজ কমলাবর্ণ শালোয়ার, গায়ে আসমানী রংয়ের বেলদার ফ্লানেলের জোব্বা, মাথার বেণীবন্ধে দুটি রক্ত গোলাপ। রৌদ্রের আভায় সুন্দরী কুমারীর ভরা যৌবন ঝলমল করছে!

জগদীশের স্ত্রী রত্না নিয়ে এলেন বাদাম আর কিসমিস, আনলেন ক্ষীরের মিষ্টান্ন। জগদীশের মা এলেন। রাজমোতীর পাশে এসে বসলেন ডাঃ বেদীর স্ত্রী। জানলার ধারে দাঁড়ালেন মায়া দেবী, সরস্বতী এবং তার কলেজের এক সহপাঠিনী,—তার নাম এখনও শুনিনি!

হাতের কাছে বই নেই। তবু মহাকবির 'বোধন' কবিতাটি আমার মুখস্থ ছিল। আমি সেটি আবৃত্তি আরম্ভ ক'রে দেবার আগে ওদেরকে বুঝিয়ে দিলুম, দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণের পথ পরিক্রমায় অগ্রসর হয়েছেন সূর্যদেব! সেই চিরকালীন বার্তা এসে পৌঁছেছে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরলোকে। বিদায় নিচ্ছে শীতের অঙ্গসজ্জা, ঋতুরাজ বসন্ত আসছেন তাঁর বাসন্তী উত্তরীয় উড়িয়ে। না, আমার চোখ যেন সরস্বতীর আকুলিত মুগ্ধ দৃষ্টির উপর না পড়ে। 'বোধন' কবিতাটির অংশবিশেষ আমি ধরে নিলুম:

"বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন তাহার, সৃষ্টি তাহার খেলা/দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা/মূল্যহীনেরে সোনা করিবার পরশ পাথর হাতে আছে তার/তাইত প্রাচীন সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেলা।

"বলো জয় জয়, বলো নাহি ভয়—কালের প্রয়াণ পথে আসে নির্দয় নবযৌবন ভাঙনের মহারথে।/চিরন্তনের চঞ্চলতায় কাঁপন লাগুক লতায়-লতায়/থর থর করি উঠুক পরাণ প্রান্তরে পর্বতে।"

বলতে বলতে এক সময় ওদেরকেই বোঝাবার জন্য অনুপ্রাণিত কণ্ঠে ইংরেজিতে চেঁচিয়ে উঠলুম, and yonder, in the dales and meadows and mountains, the new abundance of life is sprouting forth!

"বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়, করো ত্বরা, করো ত্বরা!/সাজাক পলাশ আরতিপাত্র রক্ত-প্রদীপে ভরা।/দাড়িম্ব বন প্রচুর পরাগে হোক প্রগল্‌ভ রক্তিম রাগে/মাধবিকা হোক সুরভিসোহাগে মধুপের মনোহরা!"

আবৃত্তির কালে আমি ঈষৎ আত্মবিস্মৃত হই। আমার দেহ, মন, চক্ষু ও কণ্ঠ কাঁপে। আমি যেন সেই প্রকৃতি, আমিই ঋতুরাজ,—আমার সামনে থেকে সরে যায় সাম্প্রতের আবরণ। আমার পাঁজরের মধ্যে সেই ১৯০৫-এর জন্মলগ্নে আষাঢ়ের ঝিল্লীঝনক রাত্রের মতো রক্তের কোলাহলের মধ্যে আনে "ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, পাঁজরের উপর আছাড় খাওয়া মরণ-সাগরের ডাক—"

এবার আমি চুপ ক'রে গেলুম। মিনিট দুয়েক সবাই স্তব্ধ। আবেগ-উদ্দীপনায় আমার কান দুটো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। মুখ তুললুম সরস্বতীর দিকে। সেইক্ষণে একবারটি আমার মনে হয়েছিল, আমাদের দু'জনের চারটে চোখ ছাড়া এই বৃহৎ লাউঞ্জে এবং এর বাইরে সমগ্র বিশ্বলোকে জীবন-স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এক সময় একা সরস্বতী নতমুখে বাইরে চলে গেল।

মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন হয়েছে পাশের ডাইনিং হলে। সেখানে মেঝের উপর প্রায় ঘরজোড়া গদি পাতা। গদির উপর বসে সবাই খাবে। ঠাণ্ডার কালে অনেক গৃহস্থের এইটিই রেওয়াজ। জুতো ছেড়ে ওই গদির একপাশে জায়গা নেবার আগে জগদীশকে এধারে ডেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলুম, আজ সবাইকে ডেকেছেন, কোনও উৎসব আছে বুঝি?

বাবু জগদীশচন্দর উল্লসিত হাসি হেসে বললেন, তুমি বড়ই চতুর, আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে চাও যে, তোমাকে দেখার জন্য সবাই এসেছেন।

সহকর্মী এবং অতি ভদ্রচিত্ত রূপলালজি আমাকে তিরস্কার করছিলেন। এবার বললেন, বাবু সানিয়াল, মনে রেখো তুমি খুবই সৌভাগ্যবান।

থালার উপর গরম গরম চাপাটি। পাশে এক বাটি গালানো ঘি। ডালের বাটির উপর ঘি দাঁড়িয়ে। মসলাদার গোবি। ভিণ্ডিকা-রসা। তরিতরি আলু পিঁয়াজ। পাঁপড়। ইম্‌লি-অদ্‌রক-কি-খাট্টা। সিন্‌ত্রা, কালাকন্দ্‌, দহিবড়ে, বাদাম আওর কিসমিস!

থই থই করছে উপাদেয় সুভোজ্য। যেন লোভ সাজানো রয়েছে থরে থরে। কিন্তু আহারে আমার রুচি চলে গিয়েছিল!

অপরাহ্নকালে একে একে সবাই বিদায় নিচ্ছিলেন। আমি যাব কালী-বাড়ির দিকে বটুদের ওখানে। সেখানে ক্যারম্‌ খেলার সঙ্গী জুটবে। ডাঃ বেদী ওঁর গাড়িতেই ওখানে আমায় পৌঁছিয়ে দেবেন।

রূপলালজি বিদায় নেবার পর আমি মহিলাগণের কাছে আপাতত বিদায় নিচ্ছিলুম। শ্রীমতী সরস্বতী আরক্তিম লজ্জায় সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি কিছু গাম্ভীর্য রক্ষা করছিলুম।

নিচের তলাকার হল্‌ পেরিয়ে যখন বাগানে নেমেছি, বাবু জগদীশ আমাকে একান্তে ডাকলেন। বললেন, তোমার সার্ভিস রেকর্ড কর্নেলের খুব পছন্দ এ তুমি নিশ্চয় জানো। সামনের চব্বিশ তারিখে উনি তোমার 'প্রবেশনারি পিরিয়ড' শেষ করে দিতে চান্‌। তুমি পার্মানেণ্ট হয়ে যাচ্ছো। একশ পঁচিশ টাকায় তোমার স্টার্টিং হচ্ছে।

বাবু জগদীশচন্দর আমার হাতখানা টেনে সহাস্যে হ্যাণ্ডশেক করলেন।

॥ ২৪ ॥

সামরিক দপ্তরে আমার চাকরি স্থায়ী হচ্ছে পাঁচজনের আশীর্বাদে এবং প্রতি মাসের পয়লা তারিখে হার্ড ক্যাশ একশ' পঁচিশ টাকা আমার হাতে আসবে, এটা রোমাঞ্চকর। কো-মারীতে থাকতে প্রতি মাসে মাইনে পেয়ে পাহাড়-তলীর একান্তে গিয়ে মাইনের টাকাটা বার বার গুনতুম। গুনে গুনে যেন ফুরোয় না! সেই মাছের কারবারের পর আর কবে দেখেছি একশ' চার টাকা একসঙ্গে? যদি বা দেখে থাকি, সে টাকা নিজের বলে জেনেছি কখনো? তাই মাঝে মাঝে মনে হত আমি টাকায় ভাসছি! উপার্জনের এক-চতুর্থাংশও যখন খরচ হত না, তখন ভয়ে-ভয়ে ভাবতুম, এত টাকা নিয়ে কী করব, কোথায় রাখব!

এই চাকরি এবার পার্মানেণ্ট হচ্ছে। একুশ টাকা মাইনে বাড়ছে। যদি বশম্বদ হয়ে থাকতে পারি, তবে এ-চাকরি আগুনে পুড়বে না, জলেও ডুববে না! অতঃপর উন্নতির পর উন্নতি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি—এবং সেই বৃদ্ধি আমার পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোন্ শিখরে গিয়ে পৌছবে—ভাবলে গা ডৌল হয়ে আসে! নিজে সম্পূর্ণ একটা ফ্ল্যাট নেবো, চার হাজার টাকায় বিলেতী একখানা বেবি-অষ্টিন কিনে ড্রাইভিং শিখবো, পাশে বসিয়ে নেবো সরস্বতীকে—পরনে থাকবে তার ওই নীলাভ সাটিনের শালোয়ার, গায়ে রক্তনীল বর্ণের মোগলাই জ্যাকেট, আতাম্র তার বেণীবন্ধে প্রিমরোজের গুচ্ছ, নম্রমধুর হাস্যে মিলিয়ে থাকবে অপরাজেয় লাবণ্যের মাধুর্য। তারপর না হয় দূর থেকে দূরে চলে যেতুম দুজনে! শুধু তুমি আর আমি! "কপোত-কপোতী যথা থাকে উচ্চ বৃক্ষচূড়ে—"

কিন্তু আমার জন্মলগ্নে ছিল বোধ হয় শনি!

যথারীতি চব্বিশ তারিখে সকাল পৌনে ন'টার মিনিট দুই আগেই আমি আপিসে গিয়ে হাজির হলুম। আমার হাতে ছিল গোলাপ ও সূর্যমুখীর একটা গুচ্ছ রেশমী লাল সুতোয় বাঁধা। আমাকে দেখামাত্রই আজ অফিস-সুপার সর্দার মোতি সিং সানন্দে একখানা হাত বাড়িয়ে করমর্দন ও অভিনন্দিত করলেন। তারপর একে একে বাবু জগদীশ, আজিজ আহমেদ, রূপলাল ও লেখরাজ। সকলের মুখে হাসি ও শুভেচ্ছা। ওঁরা জানেন আমি ফুলের তোড়া এনেছি কার জন্য!

সর্দারজির অনুমতি নিয়ে করিডর পেরিয়ে আমি 'ডি-ডি-এস-টি'র কক্ষে ঢুকলুম। পক্বকেশ কর্নেল কোলিন্স মস্ত টেবলের সামনে ব'সে কাগজপত্র দেখছিলেন।

'মে আই কাম ইন্ স্যার ?'

'ও ইয়েস—'

'গুড মর্নিং—'। কয়েক পা এগিয়ে আমি ফুলের তোড়াটা তাঁর হাতে দিলুম এবং তিনি সহাস্য ধন্যবাদের সঙ্গে সেটি গ্রহণ করলেন। আবার বলি, তোষামোদে আমি বরাবরই সিদ্ধহস্ত।

হিয়ার্স এ গুড নিউজ ফর ইউ, মিঃ সানিয়াল।—কর্নেল কোলিন্স ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বার করে উপরের প্রথম কাগজখানা সামনে ধরলেন। মোটা কাগজখানার উপর দিকে সরকারী সিল্ করা—'অন্ হিজ্ ম্যাজেস্টিজ্ সার্ভিস'। বাঁ-দিকে একটি রাজকীয় প্রতীক-চিহ্ন। কাগজখানা সুন্দরভাবে টাইপ করা। কিন্তু তলার দিকে দস্তখৎ ছিল না। এবার সেখানায় সই করে কর্নেল প্রসন্নমুখে বললেন, একটু আগেভাগেই তোমাকে পার্মানেণ্ট করা হচ্ছে। তোমার সার্ভিস রেকর্ড ভাল। বি হ্যাপি, মিঃ সানিয়াল।

কাগজখানা উনি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ যেমন বছর দশেক আগে ভারতবাসীকে 'রাউলট্ অ্যাক্টের রিফর্ম' দিতে চেয়েছিল !

আমি নতমুখে পিছন দিকে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কাগজখানা নিলুম না। ওই শনিগ্রহই আমার আচরণে কঠিন প্রতিজ্ঞা যুগিয়ে আমাকে শান্ত ও অবিচল করে রেখেছিল।

'হোয়াট্স্ দি ম্যাটার ?'

আমি অধোবদন।

'হোয়াটস্ রং উইথ ইউ, সানিয়াল ? টেল্ মি ইফ আই ক্যান্ হেল্প ইউ ?'

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপর মুখ তুললুম। নম্রকণ্ঠে বললুম, স্যার, এ-চাকরি আমি ছেড়ে দেবো স্থির করেছি। আমি চলে যেতে চাই !

কোলিন্স কতক্ষণ স্তব্ধ চক্ষে আমার চোখের দিকে তাকালেন। পরে তিনি আমার কাগজখানার প্রতি আরেকবার চোখ বুলিয়ে বললেন, পুয়োর ফেলো,—আচ্ছা, বাইরে গিয়ে বসোগে।

ওঁকে নত নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিলুম।

আমার স্বচ্ছন্দ হাসিমুখ দেখে সর্দারজি ও সহকর্মীরা যখন প্রফুল্লমনে আমাকে আরেকবার সমাদর জানাচ্ছিলেন, তখন ভিতর থেকে বেল্ বাজলো। সর্দারজি তৎক্ষণাৎ আসন ছেড়ে উঠে কর্নেলের ঘরের দিকে ছুটলেন। আমি রেমিংটন মেসিনে আমার নিজের মৃত্যুর পরোয়ানা অর্থাৎ ইস্তফা-পত্র টাইপ করতে বসে গেলুম।

সুদীর্ঘ মিনিট পাঁচেক, তারপর হতবুদ্ধির মতো সর্দারজি এ ঘরে ফিরে এলেন। যিনি একদা আমার মাত্র একটি দিনের কামাইয়ের জন্য কঠোর তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'এটা সরকারী দপ্তর, আড্ডাখানা নয়,'—আজ তাঁর মুখের চেহারা অন্যরূপ। মুখে চোখে যেন তাঁর পরাজয়ের গ্লানি।

এরপর আমাদের ওই সেকশনে যে অশান্ত একটা কলরব উঠল, সেটার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু শনি নয়, আমাকে যেন ভূতে পেয়েছিল! রাজার চাকরি কেউ বিনা কারণে হাসিমুখে ছাড়ে, এটা অবিশ্বাস্য। এ কেমন ছেলে যে বেকার অবস্থার ভয় পায় না, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে, যে-ডালে বসে সেই ডাল কাটে, নিশ্চিন্ত সুখী জীবনের প্রতি যার মোহ নেই,—এ ছেলে কেমন? এ ছেলে অপরিণামদর্শী, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনাহীন, অস্থির-মতি। এ ছেলে চটুল-প্রকৃতি, বিশ্বাসহন্তা, ক্ষণমর্জি—এ শুধু নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে! 'বঙ্গালিকো বিশওয়াস নেহি করনা চাই।'

অদূরে দেখছিলুম বাবু জগদীশ মাথা হেঁট করে পেন্সিল দিয়ে কি যেন হিজিবিজি কাটছিলেন। বোধ হয় ওই আঁকিজুঁকির মধ্যে তিনি আপন সহোদরা 'সর্বতির' ভবিষ্যৎ নকশা এঁকে যাচ্ছেন। ওঁর প্রতি আমার একান্ত অনুরাগ উনি জানেন।

সেদিন টিফিনের কালে এক সময় সর্দারজি কয়েক পা এগিয়ে এসে হঠাৎ উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, কাল তোমার কোর্ট মার্শালে বিচার হবে তা জানো?

ওঁদের সকলের এই প্রকার মনশ্চাঞ্চল্য আমার পক্ষে কৌতুকের কারণ হয়েছিল। আমি বিনীত সৌজন্যের সঙ্গে বললুম, কোর্ট মার্শালের পর কি আমার পাওনাটা চুকিয়ে দেবেন, সর্দারজি?

উনি বোধ হয় আমাকে একটু ভয় দেখাবার জন্যই বললেন, কর্নেল সাব তোমার বিচার করবেন। তোমার মাথায় লাল ক্যাপ পরানো হবে এবং এগারো জন সৈন্য বেয়নেট-রাইফেল নিয়ে তোমাকে তাগ্ করবে!

আমি অত্যন্ত ভীরু, তাই গলা শুকিয়ে উঠল। তবু হাসিমুখে বললুম, কোর্ট মার্শাল আগে কখনো দেখিনি। এ আমার নতুন অভিজ্ঞতা হবে, সর্দারজি।

মনে করেছিলুম আপিসের ছুটির পর গা-ঢাকা দিয়ে কেটে পড়ব। কিন্তু তা হল না, ওরা সবাই ওৎ পেতে ছিল। সবাই এসে আমাকে ঘিরে ধরল, এবং নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল। আজিজ আহমেদ বললেন, তোমাকে চ্যাংদোলা করে আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আটকিয়ে রাখব! 'অ্যায়সা বদ্‌কাম নেহি বরদাস্ত করেঙ্গে।' বাবু জগদীশ আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, তোমার রম্ভাভাবীজি কত মন খারাপ করবেন তুমি কি ভাবছ না? একবারও কি তুমি ভাবছ না একটা ফ্যামিলির সবাই তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে? কেন চলে যাচ্ছ তুমি?

আমার মধ্যে কিছু আবেগের স্পর্শ লেগে থাকবে। বাবু জগদীশকে আমি জড়িয়ে ধরলুম। তাঁর গলার কাছে মুখ রেখে বললুম, নিয়তি আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভাবীজি যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

উনি আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন একান্তে। একটু চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি সর্স্বতীর ওপর কোনও কারণে রাগ করে এ বিয়ে নাকচ করছ?

অবাক কাণ্ড! আমি হেসে উঠলুম।—এ-সব মনেও আনবেন না দাদা জগদীশ। এ-সব আমার পক্ষে অভাবনীয়।

একে একে বাঁধন কাটতে সময় কিছু লাগল। কোর্ট মার্শালে বিচার আমার হয়নি, কেননা আমি রেগুলার স্টাফের কেউ নই এবং এখন কোনও জরুরী পরিস্থিতিও নয়। প্রায় একশ' তিরিশ টাকা আমি বাকি বকেয়া সমেত পেয়ে গেলুম। বটু আর হেমদের কাছে বিদায় নিলুম। ওদের বউদিদি আমাকে 'ডানপিটে' বলে গালি পাড়লেন। 'নকল পাঞ্জাবী'র লেখক উপেন ঘোষকে বিদায় সম্ভাষণ জানালুম।

শিখ-মাতাজি আমার কাছে টাকা নিতে চান না। কিন্তু তিনি আমার জন্য অনেক করেছেন। জোর করে তাঁকে পঁচিশটি টাকা গছালুম। আমার তহবিলে দীর্ঘকাল ধরে তখন অনেক টাকা জমেছে। একবার ভাবলুম ছুটে যাই আমার নিত্য-কল্যাণকামী ডাঃ বেদীর ওখানে, দেখা করে আসি গুর্দাস কাপুর মহাশয়ের ওখানে। কিন্তু ভাবলুম আমার মধ্যে কি সরস্বতীর জন্য কোনও দুর্বলতা আছে? তবে কি যাবার আগে তাকে শুনিয়ে যেতে চাই, "ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে/তোমার বিকচ ফুলবনে দেরি করিব না মিছে/ফিরে চাহিব না পিছে/দিন শেষে বিদায়ের ক্ষণে—"

না, যাব না!

পরদিন গোধূলিকালের দিকে আমি 'ফ্রনটিয়ার মেল' ট্রেনের একটি থার্ড ক্লাস কামরায় উঠলুম। আমার পোশাকপত্র কিছু বেড়েছে, আমি পরিচ্ছদ-বিলাসী হয়ে উঠেছি। আমার ঢিলা-হাতা শীতের গাউন, তিন-চারটে গরম স্যুট, গোটা দুই লং কোট, পাগড়ি-শালোয়ার-জ্যাকেট-টুপি ও ক্যাপ সব মিলিয়ে অনেকগুলো জঞ্জাল! তিন চার জোড়া জুতো, আট-দশ জোড়া মোজা, হ্যাণ্ডব্যাগ, পোর্টমাণ্টো, ভদ্র কিছু বিছানা ও কম্বল, কিছু শৌখীন প্রসাধন সামগ্রী, একৃসারসাইজের জন্য চেষ্ট-একস্‌প্যাণ্ডার—আগাগোড়া অপব্যয়ের পরিচয়! এরা আমার বাঁধন, এদের থেকে মুক্তি পাওয়া চাই। আমি একদা এই দূর বিদেশে এসেছিলুম দরিদ্রের সজ্জায়, সেই চেহারাতেই আমি ফিরে যাব। আমি পাঠ নিয়েছি বিশেষ একটা জীবনে, অভিজ্ঞতা আহরণ করেছি অপরিচিত একটা জগতে বিচরণ করে—সেই আমার সঞ্চয়। আমি যেন থেমে যেতে বসেছিলুম একটা সম্পদ-সৌভাগ্যের চক্রান্তে। এবার আমি আরেকবার গতিলাভ করলুম। আমাকে যেতে হবে জীবনের পথ ধরে অনেক দূরে, দূর থেকেও দূরে! আমার অশ্রান্ত গতিকে আমি থামতে দেবো না। আমার পথ কোনও দিন শেষ হবে না।

নিরবচ্ছিন্ন একা। কিন্তু অদ্ভুত লাগছে আজ নিজের নিঃসঙ্গতা। পিছনে ফেলে যাচ্ছি এমন একটা জীবন যেটা আগাগোড়া অবাঙ্গালী। জনি আর রোশন পড়ে রইল দূর পিছনে। ওরা জেনে রইল আবার আমি ওদের সামনে গিয়ে হাজির হব আসছে বছরে—যখন ওক, আখরোট আর শিশমের বনে প্রজাপতিরা রঙীন পাখায় ঘুরবে। সেই শারদাপীঠের উপত্যকাপথে মধুমতীর পাশ দিয়ে আমি আর শের মহম্মদ! মিনিমার্গের বচ্ছিন্দর সিং এবং সেই স্মরণীয় রাত্রে শমরুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা! বন্ধুবর খান্নার সঙ্গে সেই সানি-ব্যাঙ্ক থেকে কোহালায় গিয়ে সেই কটেজ গার্ল-এর ঘরে ওদের সেই নেশাভাঙের হুড়োহুড়ি! পহলগাঁওয়ের পাইন বনের নিচে সেই সেবাকর্মের ক্যাম্প। আমার চোখের সামনে দিয়ে সরে যাচ্ছে ছবির পর ছবি।

রেলপথের দুদিকে ধূসর অন্ধকারের ছায়ার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলুম আমারই ভবিষ্য জীবনের ভৌতিক একটা চিত্র। এ তুই কী করলি রে? এ যে সর্বনাশা হঠকারিতা, এ যে চরম আত্মনাশের পথ ধরেছিস! মাথা ঠাণ্ডা হলে দেখবি, সোনালী ধানভরা সোনার তরীকে নিজের হাতে তুই ডুবিয়ে দিয়ে এলি! স্বাস্থ্য তোকে উজ্জ্বল করেছিল, সাচ্ছল্য ও সৌভাগ্য তোর গৌরব এনেছিল, ভবিষ্যতের সর্বপ্রকার নিরাপত্তা—সব তোর ঘুচল। এখনও সময়

আছে, এখনও নিশ্চয়ই কোলিন্সের চিঠিখানা তাঁর ফাইলে ধরা রয়েছে—এখনও ফিরে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে বসে যা যদি নিজের ভালো চাস !—আমি হাসলুম।

সেদিন অনেক রাত্রে তন্দ্রার মধ্যে অনুভব করছিলুম, আমার মস্তিষ্কের মধ্যে ঢুকে এক শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত নেড়ি কুকুরের ছানা অবিশ্রান্ত কেঁউ কেঁউ করছে ! সে নালিশ জানাচ্ছে, প্রতিবাদ করছে, কথায়-কথায় তর্ক তুলছে। অন্যদিকে আমারই বুকের মধ্যে কোনও এক সঙ্গোপন কোণে আশ্রয় নিয়েছে যে-জন, সে হরিণনয়না ! সেই আয়ত দুই নিবিড় চোখ জলে ভরো-ভরো। সে যেন রাজেন্দ্রাণী, শিবতপস্বিনী। সে যেন আমারই কানে কানে আমারই প্রিয় কবিতার চরণ ধরে গুনগুন করছে তার কোমল মধুর কণ্ঠে : "আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়ন কোণে/সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে/ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ, যাবে সে সুদূর পুরে—/শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে বাজিবে ব্যাকুল সুরে।" আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলুম, গুর্দাস-জির বাড়িতে রাত শেষ হতে চলল ! তাঁদের সেই অন্ধকার ঘরের বিছানায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চোখের জল ফেলছে সরস্বতী। মিসেস কাপুর আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ডাকলেন, এত কাঁদচিস কেন রে ?

সরস্বতী যেন সাড়া দিল না। বড় বড় দুই চোখে অন্ধকারকে সে ধরে রইল।

সমস্ত রোমান্টিক ছবিটি দেখতে দেখতে কখন আমি ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলুম।

ঘুম ভাঙলো এক সময়। কে যেন পায়ের উপর চাপ দিল। উঠে বসে দেখি সকালে গাড়ি থেমেছে "ঝিলম" স্টেশনে। একটি সুশ্রী যুবক আমার পায়ের দিকে জায়গা নিয়েছে। জানলা দিয়ে দেখি ঝিলমের পুল। নদীর ওপারে মস্ত এক মন্দির, আশেপাশে দেবস্থান। ঘাটে ঘাটে স্নানার্থীদের জনতা। যুবকটিকে প্রশ্ন করে জানলুম, এটি হিন্দুতীর্থ, সামনে রঘুনাথজি অর্থাৎ শিবের মন্দির। জম্মু পাহাড়ের মীরপুর এলাকা ছেড়ে ঝিলম নদী প্রথম নামছে পাঞ্জাবের সমতলভাগে। যেমন হৃষীকেশের নীলধারা হরিদ্বারে এসে হয়েছে গঙ্গাবতরণ। আমি পিণ্ডি যাবার পথে একদা ঝিলম হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু সে রাত্রের দিকে।

ছেলেটার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। সে আমারই সমবয়সী। নাম গোলাম মনসুর। ওদের বাড়ি লাহোরে। ওরা পশমের ব্যবসায়ী। ওদের এজেন্সি

আছে জম্মু, ধারিওয়াল, লুধিয়ানা, অমৃতসর, মিঞাবালি প্রভৃতি শহরে। আমি বললুম, মিঞাবালি, দাউদখেল, দরিয়াখাঁ, ডেরা ইসমায়েল খাঁ, ডেরা গাজি খাঁ, মুলতান—ওসব আমার বেশ পরিচিত। আমি চাকলালা, কোহাট, বান্নু, রজমাক—যখন-তখন যাই। সিন্ধুসাগর দোওব, রেচনা দোওব,—বারি দোওব—এসব অঞ্চল আমার খুবই পরিচিত।

কথায় কথায় মনসুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে উঠল। আমার আলাপচারি শুনে ওর ধারণা হল আমি পাঞ্জাবী। আমি যে বাঙ্গালী এবং বিদেশ-বিঁভুয়ে গিয়ে বাঙ্গালীর ছেলে যেমন চালিয়াতি করে, আমিও তার ব্যতিক্রম নই। ওকে জানালুম, আমি পল্টন দপ্তরের লোক, আমি যাচ্ছি অমৃতসরে। মনসুর জানালো ওর আব্বা গিয়েছেন হজ করতে, এখনও ফেরেননি। ওর মা মারা গেছেন বছর দুই আগে যখন মনসুর বি-এ পড়ে। আব্বা ওকে কারবারে বসিয়ে দিয়েছেন, এম-এ পড়তে দেননি।

শিখ-মাতাজি আমার সঙ্গে একরাশ খাবার দিয়েছিলেন, সেগুলো হ্যাণ্ড-ব্যাগের মধ্যে থেকেই গেছে। এবার মনে পড়ে গিয়ে সেগুলো বার করলুম এবং মনসুরকে জবরদস্তি করে আমার সঙ্গে খেতে বসালুম। সবগুলো একদম ঠাণ্ডা। তা হোক। ভালো ঘিয়ের পুরি, মাংসের বড়া, সিদ্ধ ডিম, এক থালা আঙ্গুর, মনক্কা, বাদাম, আপেল, বড় লঙ্কার আচার ইত্যাদি। মনসুর এই শর্তে খেতে বসল যে, আমি লাহোরে ওর বাড়িতে নামব। আমি রাজি হয়ে গেলুম। তরুণ বয়সে বন্ধুত্ব পাতাতে দেরি লাগে না। ওটা যৌবনপ্রাচুর্যের অন্যতম লক্ষণ।

ঝিলম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব পথে মোটামুটি মাইল পঞ্চাশেক এলে গুজরাট শহর। এটা জম্মুর দক্ষিণ অঞ্চল পাঞ্জাবের মধ্যে। এখান থেকে শিয়ালকোট কাছে—আমার বন্ধু পণ্ডিত সদানন্দের বাড়ি। গুজরাট থেকে আরও পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে গুজরানওয়ালা। এ অঞ্চলের নাম রেচনা দোওব। সামনেই চন্দ্রভাগার শাখা।

লাহোর গোরা ছাউনি স্টেশনে যখন এসে পৌছলুম তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। এবারে পেলুম ইরাবতী। এই বিরাট শহরের ভিতর দিয়ে টাঙ্গায় চড়িয়ে মনসুর আমাকে নিয়ে চলল ওদের বাড়িতে। মাঝখানে 'মণ্ডির' কাছে রয়েছে অনেক উঁচু এক টাওয়ার ক্লক। দিল্লীর মতো এখানেও নগর রক্ষার প্রাচীর, তার একেকটি গেট হল প্রবেশ ও প্রস্থান পথ। সেই জনবহুল বাজার-অঞ্চলের ভিতর কোথা দিয়ে কোথায় গিয়ে পড়লুম, এখন আর মনে পড়ে না। প্রচুর

শীত পড়েছে এখন লাহোরে।

মনস্থরের মা বেঁচে থাকতেই ওর আব্বা আরেকবার বিবাহ করেন। সেই মহিলা আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। মস্ত বড় বাড়ি, কিন্তু সামনের অংশটায় কাজ-কারবার এবং নানা লোকের চলাফেরা। ওঁরা থাকেন ভিতর মহলে। মহিলা আমাকে 'বেটা' বলে সম্বোধন করলেন এবং আমি তাঁকে আম্মাজি বললুম। তিনি আমাকে সস্নেহে নিয়ে গেলেন ভিতর দিককার মহলে। মনস্থর এক খিৎমদগারকে দিয়ে আমার জিনিসপত্র তুলে নিয়ে গেল। গাড়িভাড়া কিছুতেই সে নিল না।

চারিদিকে অবস্থাপন্ন পরিবারের পরিচয় সুস্পষ্ট। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। চেয়ে দেখছি সামনে নিজামের মস্ত অয়েলপেন্টিং ছবি। মনস্থর বলছিল ওরা মির্জাদের গোষ্ঠী। নবাব ওদের সরকারী টাইটেল। আমি বলেছি এই কাছেই শেখুপুরায় আমার মজিনা বউদিদির পিত্রালয়, তাঁর বাবাও নবাব বংশের।

ওঁদের এজেন্টরা আসেন নানা অঞ্চল থেকে, তাঁদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা। তাঁদের জন্য ঘরদোর, গোসলখানা, রসই-বনানা,—সব আলাদা। কিন্তু আমি এজেন্ট নই, সুতরাং আম্মাজি দোতলায় যে ঘরটিতে আমাকে বসালেন সেটি পারিবারিক অতিথির জন্য নির্দিষ্ট। আমি মনস্থরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

দুই বন্ধু মধ্যাহ্নভোজনে বসেছি এমন সময় সামনে এল মনস্থরের সহোদরা। হাসিমুখে নমস্কার জানালো 'বন্দেগি'। আমি বললুম, 'আদাব'। আমি হঠাৎ চমকে উঠেছিলুম। গায়ে চুমকি বসানো ফিকে সবুজ ওড়না, কিন্তু মেয়েটি যেন আরেক সরস্বতী! ওর নাম মেহেরবানু। বি-এ পড়ছে লাহোরের উইমেনস্ কলেজে। আজ 'পহলা হিজরি, জিলকাইদের'—তাই আজ কলেজের ছুটি। আমার চিত্তবিকলনের জন্য সহসা মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে পারলুম না। মেয়েটা আমাদের সামনেই টেবলে খেতে বসল। আম্মাজি বসলেন তার পাশে। আমাদের গল্পগুজব আরম্ভ হয়ে গেল।

মনস্থর ধরে বসল, আমাকে অন্তত দিন তিনেকের জন্য এখানে 'মেহমান' হয়ে থাকতে হবে। লাহোরে আমি নতুন, সুতরাং আমাকে নিয়ে ওরা এখানে-ওখানে বেড়াতে যাবে। শালিমারবাগ, হ্যাংগিং গার্ডেনস, শাহী মসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিসমহল,—আরও কি কি যেন ঘোরাবে। মেহেরবানু বলল, আমাদের কলেজে তোমাকে নিয়ে যাব। আজ জুম্মাবার, ইতোয়ারে সকালবেলা আমরা পিকনিক করতে যাব তোমাকে নিয়ে। আমাদের বন্ধুবান্ধব, আম্মা, সবাই যাবে। মণ্টগোমেরির 'দরিয়া-কিনারে' আমাদের বাংলো আছে।

আমরা মোটরে যাব—সড়ক বহুৎ আচ্ছ হৈ।

ইতিমধ্যে আমি হাসির স্রোত বইয়ে দিয়েছিলুম। এই প্রথম জানালুম আমি বাঙালী। বংগালি? ওরা অবাক! আমি বললুম, হ্যাঁ, বংগাল মেরে 'বোলি'। ওরা বলল, বংগালিকো হিম্মৎ বহুৎ জায়দি হ্যায়। আজাদিকে লিয়ে বহৎ লড়াই করতে হৈ। সুভাষ বোসভি বংগালি!

দু দিন আমাকে লাহোরে থাকতে হয়েছিল। মণ্টগোমেরি এ-যাত্রায় স্থগিত রয়ে গেল। আবার আমি আসব। কবে—তা এখন বলা সম্ভব নয়। কিন্তু মনসুর ও মেহেরবানুর সঙ্গে প্রীতির বন্ধন পাকা হয়ে গেল। এরা উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবার। এদের মোটর আছে দুখানা। লক্ষ্য করলুম এদের বাবা মির্জা মহম্মদ ফয়েজকে বহু লোক চেনে ও সম্মান করে।

তৃতীয় দিন সকালে আমরা সবাই এতই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলুম যে, মনসুরকে আমি একটা সম্পূর্ণ গরম স্যুট উপহার দিলুম এবং মেহেরার গায়ে নিজের হাতে আমার কল্কাদার ফ্লানেল গাউনটি পরিয়ে দিলুম। ওরা ধনী, কিন্তু গরীবের হাত থেকে প্রীতি উপহার নেওয়াটাই ত কাল্চার! ওরা চেঁচামেচি করতে লাগল। শেষকালে মেহেরা আমাকে টেনে নিয়ে গেল ওদের শোবার ঘরে এবং মনোহারির আলমারি খুলে বলল, আপনা মর্জিসে জো সামান্ খুশি ওঠা লো।

কী নেবো? আমি দিতে চাই, নিতে চাইনে। মেহেরা একটি মুক্তো-বসানো ছোট কৌটো বার করে একটি মীনা-করা সোনার আংটি আমার কড়ে আঙুলে পরিয়ে তবে ছাড়ল এবং কৌটোটা আমার পকেটে পুরে দিল।

সেদিন পরম আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে দিয়ে এসে ভাই-বোন দুজনে আমাকে ডাকগাড়িতে তুলে দিয়ে গেল এবং আমি দু ঘণ্টার মধ্যেই সোজা এসে অমৃতসরে নামলুম।

এটিও পিণ্ডির মতো শিখপ্রধান শহর। রেশমকুঠীর বাজারের ভিতরে ঢুকে এক হোটেলে জায়গা নিলুম—যার খাবারের দোকানটা নিচে। আমার মাত্র দুটি আকর্ষণ—সরোবরের মাঝখানে স্বর্ণমন্দির এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ। তখন জালিয়ানের রাস্তাটা এক সঙ্কীর্ণ গলিপথ, দুখানা গাড়ি পাশাপাশি যেতে চায় না। সেই গলির এক স্থলে একটি ডাকঘর, নাম 'জালিয়ানওয়ালাবাগ'। ডাকঘরের পাশেই সরু পথ ভিতরে ঢুকবার। আন্দাজ কুড়ি-পঁচিশ গজ এগোলে একটি ছোট মাঠ—যার চারিদিকে বাড়ি, এবং প্রায় সব বাড়িরই পিছন দিক। বলা বাহুল্য, চারিদিক স্বভাবত পাঁচিল-ঘেরা—চোর-ছ্যাঁচড়ের পথ আটকাবার

জন্য। একটু পেরিয়ে বাঁ দিকে এক ইঁদারা। ডাকঘরের ওই গলির মুখ আগলিয়ে যদি এই মাঠে পুলিস বা মিলিটারি জনসমাবেশের উপর গুলি চালায় তবে একজন মাত্র ব্যক্তিরও পালাবার পথ থাকে না! সেইজন্য সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের দিনে অদূরবর্তী ওই কুয়ার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে অনেকে প্রাণ বাঁচাতে গিয়েছিল, কিন্তু কেউ বাঁচেনি! সমস্ত মাঠটা মৃত ও আহতে ভরে গিয়েছিল। যারা টিকটিকির মতো দেওয়াল বেয়ে ওঠবার চেষ্টা পেয়েছিল, গুলির আঘাত খেয়ে তাদের মৃতদেহ শিউলিফুলের মতো ঝরে পড়েছে। এই ব্যাপক মৃত্যুর থেকে গান্ধীজীর নেতৃত্ব মাথা তুলেছিল!

হোটেলের কাছ থেকে একটি সোজা পথ গেছে স্বর্ণমন্দিরের দিকে। মন্দির হল সরোবরের মধ্যে। তীর থেকে একটি প্রশস্ত মার্বেল পাথরের পথ ধরে মন্দিরে ঢুকতে হয়। সেখানে গ্রন্থসাহেব পড়ছিলেন শিখ পুরোহিতরা। মন্দির এলাকা বিশাল এবং চারিদিক অতি রমণীয়।

আমি যেন যন্ত্রচালিত। কী করছি, কী দেখছি মনে নেই। পিছন পথে যা ফেলে এলুম, সেটা চাকরি ঠিক নয়, সে যেন একটা বিশেষ জীবনের দীপ্তোজ্জ্বল টুকরো, একটা নিবিড় অনুভূতির কাল। এবার যেন ছিট্‌কিয়ে এলুম সেই পরিচিত রূঢ় বাস্তবে—একটা সুখের স্বপ্ন যেন ফেটে বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে গেল।

পর দিন সকাল আটটার পর ট্রেনে উঠলুম। এ গাড়ি হাওড়া যাবে।

দেশের দিকে ফিরছি যেন যুগান্তকাল পরে। যেন গত জন্মের পথঘাট ঠাহর করতে করতে যাচ্ছি এই নতুন জন্মে। জলন্ধর, লুধিয়ানা, আম্বালা—এ সব চিনতে দেরি হচ্ছে। এ যেন নতুন নতুন আবিষ্কার। অতি পরিচিতরা যেন অপরিচয়ের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল। আমি পেরিয়ে যাচ্ছিলুম স্বপ্নলোকের ভিতর দিয়ে। সেই পুরনো আমিকে আর খুঁজে পাচ্ছিনে।

কাশীতে এসে পৌঁছলুম পরদিন অপরাহ্ণকালে।—

আমি আগেই জানতুম মা আছেন কাশীতে। কিন্তু তিনি জানেন না, আমি ফিরে যাচ্ছি আমার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে। তিনি আশাও করেন না, আমি সেই সুদূর সীমান্তলোক থেকে অন্তত পাঁচ বছরের মধ্যে ছুটি নিয়ে একবার সবাইকে দেখে যাব!

লটবহর নিয়ে যখন সোনারপুরার বড় বাড়িতে এসে ঢুকলুম তখন বিকাল। শীতের রোদ গাছের ডগায় উঠেছে। গাড়ি ভাড়া চুকিয়ে মালপত্র বারান্দায়

নামিয়ে যখন সিঁড়ির দরজায় উঠেছি, দেখি মা ও প্রভাসের স্ত্রী অদূরে বসে বিশ্রম্ভালাপ করছেন।

মা ? মা আমি—

মা চমকিয়ে উঠে আমার দিকে তাকালেন, ঈষৎ নিরীক্ষণ করলেন, এবং চক্ষের পলকে উঠে ভিতর দিকে চলে গেলেন। প্রভাসের বউ মাথায় ঘোমটা টেনে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। আমি হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললুম, বৌদিদি, সবাই ভুলে গেছেন আমাকে ?

হঠাৎ যেন আঁতকিয়ে উঠলেন দুর্গাঠাকরুণ, তারপর ছুটে ভিতরে গিয়ে চেঁচালেন, ছোট মাসিমা, ও ছোট মাসিমা, ও যে ঠাকুরপো—আপনি বোধ হয় চিনতে পারেননি ··

বাড়িতে হইচই উঠল। ছুটোছুটি পড়ে গেল। মা আবার ঠিক সেইভাবেই হনহনিয়ে বেরিয়ে এলেন বটে, কিন্তু আমার দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়ে সকলের পিছনে দাঁড়ালেন। মা যেন কী খুঁজেছিলেন আমার চেহারায়।

সেদিন রাত্রে আহারাদির কালে মা আমাকে বার বার অলক্ষ্যে নিরীক্ষণ করছিলেন। তারপর হাত ধুয়ে এসে যখন তাঁর সামনে দাঁড়ালুম, তিনি বললেন, হ্যাঁ রে, অমন ছাড়ালো ঢ্যাঙ্গা হলি কেমন করে ?

সমস্ত নিচের তলাটা কাঁপিয়ে আমি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলুম।

মাকে বোধ হয় একটু সস্নেহ কৌতুকবুদ্ধি পেয়ে বসেছিল। রাত্রে যখন গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে বিছানায় উঠেছি, তখন মা এসে বললেন, মুখপোড়া, তুই দেখছি বংশের ধারা পেয়েছিস—

কেন মা ?

তোর মাথার চুলের ঝাঁকা, মুখ, সমস্ত গা—অত রাঙ্গা হল কোত্থেকে ? তুই বুঝি মদ খেয়েছিস ?

প্রভাস, দুর্গাঠাকরুণ, দিদি ও আমি—সবাই মিলে হেসে লুটোপুটি। বললুম, মদ খেলে যদি রাঙ্গা চেহারা হয়, তাহলে বলো মদ খেতে কোনও দিন মানা করবে না ?

আবার হাসির হট্টগোল।

পরদিন বেরোবার আগে মার কাছে আমার টাকাগুলো গচ্ছিত করলুম, এবং সে টাকার পরিমাণ কম নয়। তারপর একরাশ বাজার এনে হাজির করলুম। মামা রয়েছেন এক প্রকার শেষ শয্যায়, তাঁকে দেখতে গেলুম কিছু পথ্যাদি নিয়ে। দিদিমা রয়েছেন এ-বাড়িতেই। শেষের দিন গুনছেন।

আমি জানতুম শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র কাশীতে রয়েছে। সুতরাং আমি গিয়ে 'আউধগর্বির' বাড়িতে কড়া নাড়লুম। প্রথমে সাড়া দিল না কেউ। পরে উপর থেকে এক ভদ্রলোক জানালেন, তাঁরা এ বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন তাঁরা বলতে পারেন না! পুরনো দুই প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে বহুদিন পরে, সুতরাং আমার সেদিনকার উদ্দীপনা অবর্ণনীয়!

হরিশচন্দ্রের ওদিক থেকে সোজা কেদারঘাটের পথ ধরে সোনারপুরা এবং বাঙালীটোলার ভিতর দিয়ে পেরিয়ে গণেশ মহল্লায় গিয়ে কালী মাস্টারের ওখানে উঠলুম। উল্লসিত অভ্যর্থনার পালা শেষ হবার পর প্রশ্ন করে জানলুম, শৈলজার এখন ইস্কুল-মাস্টারি নেই, সে এখন তার দুইজন স্ত্রীসহ দেবনাথপুরার সেই পেভমেণ্ট-করা গলির এক বাড়িতে ভাড়া আছে। তার অবস্থা খারাপ। প্রেমেন কলকাতায় চলে গেছে।

কাশীতে এবার মোট চার-পাঁচ দিন থাকব, তারপর মাকে নিয়ে ফিরব। সুতরাং এ-ক'দিন বন্ধুদের নিয়ে ঢালাও আড্ডা দেওয়া চলবে। সুধাদা নেই, অতএব হরকুমারের দোকান, তাঁর ফরিদপুরার বাড়ি, অহল্যাবাঈর ঘাটের সেই শেষ বুরুজ—সবই ফাঁকা। তিনি মধ্যমণি। তাঁর জুড়ি কেউ নেই। রবীন্দ্রনাথের কবি-ভাগ্যও ভাল যে, তাঁর জীবদ্দশায় এত বড় একজন রবীন্দ্র-ভাষ্যকার দেশের মধ্যে রয়েছেন। সুধাদার অভাবে আমাদের বৈঠক কোথাও প্রাণবন্ত হয় না।

সেইকাল পর্যন্ত লেখকদের স্বভাবপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। তবু ওর মধ্যে আমার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ছিল শৈলজানন্দ। তার প্রকৃতি ছিল মিষ্ট ও বন্ধুত্বপূর্ণ, অন্তরঙ্গ হতে সে জানে। একটা নিরভিমান মানবিকতা ওর মধ্যে দেখতে পেতুম—যেটার স্বাদ ছিল অনেকের কাছে প্রিয়। শৈলজা ঠিক কাকে সর্বাপেক্ষা পছন্দ করে বলা কঠিন কিন্তু সে প্রীতি অর্জন করতে জানে। তাকে কখনও ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত, স্পষ্টবাদী, অপ্রিয় সত্যভাষী—এ সব হতে দেখিনি। মুখোমুখি সে কখনো কারোকে আঘাত করে না এবং নিজের কোনও দুর্বলতার দিকে তার চোখও পড়ে না। মাদকাদি সেবনের ব্যাপারে তাকে কখনো বেহুশ হতে দেখা যায়নি। শৈলজা আমার খুবই প্রিয়। বীরভূঁয়ের একটি গ্রাম রূপসীপুরে তার 'মাঠকোটা' বাড়ি, সেই বাড়িতে আমি গিয়েছি ও থেকেছি দু-চার দিন। শৈলজার সেই দিনকার আতিথেয়তা স্মরণীয়। তার জন্য একাধিক প্রকাশকের সঙ্গে আমি লড়াই করেছি।

পাঁড়ে হাউলি ছাড়িয়ে দেবনাথপুরায় ঢোকবার মুখে এক জলের কলের

গায়ে ইঁট-বাঁধানো গলিতে সে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। আমি তাকে ডাকলুম, কিন্তু তার গলার সাড়ায় কোনও উল্লাস নেই। আগে সে নিচে দাঁড়াতে বলল, পরে সে উপরে ডাকল। অন্দর মহল থেকে কয়েক হাত দূরে সে আমাকে ডেকে বসালো। তাকে এতকাল পরে দেখে আমি আনন্দে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলুম।

কেমন আছ, শৈলজা ?

ওই এক রকম।

আমাকে দেখে যে-ব্যক্তি বরাবর প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, তার মুখে-চোখে একপ্রকার বিমর্ষতা দেখে আমি দুঃখিত হলুম। শৈলজা পুনরায় বলল, মাষ্টারিটা নেই, নিত্য অভাব। পাওনা টাকা কেউ পাঠায় না। পবিত্রকে লিখেছি যদি কিছু টাকা যোগাড় করে পাঠায়।

শৈলজার প্রথমা স্ত্রীকে আমি বৌদিদি বলি, এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীকে 'ননদ' বলে সম্ভাষণ করি। এবার বললুম, এঁরা কোথা গেলেন ?

শৈলজা অতটা গায়ে মাখল না। বলল, ঘরেই আছে। যাবে আর কোথায় ?

আমার একটু ধোঁকা লাগল। কিন্তু কথা বাড়ালুম না। অন্য কথায় ফিরে গিয়ে বললুম, প্রেমেন চলে গেছে শুনলুম। আশা করেছিলুম এখানে তার সঙ্গে দেখা হবে।

শৈলজা চুপ করে রইল। কিন্তু তার গাম্ভীর্য আমাকেও যেন কতকটা বিমর্ষ করে তুলল। তার সেই উল্লাস, উচ্ছ্বসিত প্রীতি—আজ কিছুই যেন চোখে পড়ছে না। যাই হোক, এক সময় সে এমন ধরণের কথা তুলল যেগুলি শুনে আমি একেবারে হতবুদ্ধি। প্রেমেন্দ্র সম্বন্ধে কতকগুলি অবাস্তব অভিযোগ সে তৈরি করেছে যেগুলি অশ্রদ্ধেয় এবং ভিত্তিহীন। এর সঙ্গে টাকা পয়সার কোনও যোগ আছে কিনা আমি জানিনে। কিন্তু এগুলি শোনার জন্য আমার মন প্রস্তুত ছিল না। কারণ বন্ধুত্বের লয়াল্টি আমি মেনে চলার চেষ্টা পাই। সুতরাং অনুপস্থিত প্রেমেন্দ্রর প্রতি এ ধরণের মন্তব্য আমার পক্ষে বরদাস্ত করা সেদিন কঠিন ছিল।

আমার কাশীতে আসার আনন্দ, উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সেদিন যেন এক ফুৎকারে নিভে গিয়েছিল।

কলকাতায় তখন কংগ্রেস অধিবেশনের বিরাট তোড়জোড় চলেছে, যেটি আমি রাওয়ালপিণ্ডি ও লাহোরে শুনতে শুনতে এসেছি। এবারে মূল সভাপতি হচ্ছেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু। গান্ধীজী কলকাতা অধিবেশনে থাকছেন তার সহকর্মীদের নিয়ে। এই সূত্রে বড় বড় নাম শোনা যাচ্ছে। লালা লজপৎ রায়, কে এফ নরীম্যান, গোপবন্ধু দাস, হাকিম আজমল খাঁ, এম এ আনসারী, সরোজিনী নাইডু, বল্লভভাই প্যাটেল, পট্টভি সীতারামাইয়া, সত্যমূর্তি ইত্যাদি। সুভাষচন্দ্র তখন জওয়াহরলাল নেহরুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন ভারত গড়তে চান, সেজন্য গান্ধীবাদী রক্ষণশীল কংগ্রেসের সম্মুখে নতুন কর্মসূচী হাজির করছেন। পূর্ব কলকাতার প্রান্তে অধিবেশন বসছে। সেখানে বিরাট এক ময়দান অনুন্নত অবস্থায় রয়েছে। পরবর্তীকালে সেই অঞ্চলের উন্নতি ঘটে, এবং নাম হয় 'পার্ক সার্কাস'।

কলকাতার এই কংগ্রেস অধিবেশনকালে কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথম দুটি বিরাট স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকাবাহিনী গড়ে তোলেন বাঙ্গলার তদানীন্তন তারুণ্যের প্রতীক সুভাষচন্দ্র। এই দুই সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন তিনি নিজে, অর্থাৎ জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং। নারী-বাহিনীর অফিসার কমাণ্ডিং নির্বাচিত হন তৎকালীন সর্বপরিচিতা তরুণী নেত্রী সুদর্শনা শ্রীমতী লতিকা বসু। সেদিন হাওড়া স্টেশন থেকে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুকে যে বিরাট ও সুপরিচালিত শোভাযাত্রাসহ অধিবেশন ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কংগ্রেসের ইতিহাসে সেটি নিত্য স্মরণীয়। সামরিক পোশাকে সেদিন মোটর ট্রাকের উপর গম্ভীরানন সুভাষচন্দ্রের যে রূপচ্ছটা দিব্যরূপ ধারণ করেছিল, তারই পরিণতরূপ দেশবাসী দেখেছিল পনেরো বছর পরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে পৃথিবীর অপর কোনও জননেতা বাঙ্গালীর রসকল্পনাকে এমন করে উদ্দীপ্ত করেনি!

বাঙ্গলায় তখন 'বিগ ফাইভ' রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁরা হলেন শরৎচন্দ্র বসু, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও তুলসীচন্দ্র গোস্বামী। এঁদের মুখপত্র আগে ছিল 'ফরোয়ার্ড' (ইংরেজি) ও 'বাঙ্গলার কথা'। পরে 'বেলুড় ট্রেন দুর্ঘটনার' মামলায় জড়িয়ে এ দুটি কাগজ নাম বদলিয়ে হয় 'লিবার্টি' ও 'বঙ্গবাণী'। এ দুটি কাগজে যাঁরা কাজ করতেন তাঁরা প্রায় সকলেই আমাদের বন্ধু। কেউ সম্পাদক, কেউ বা সহ-সম্পাদক। যেমন সত্যরঞ্জন বক্সী, নীহাররঞ্জন রায়, প্রমোদ সেন, সত্যেন বসু, জানকীজীবন

ঘোষ, বিজন সেনগুপ্ত, গোপাললাল সান্যাল, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিজয় দাশগুপ্ত, শশাঙ্ক চৌধুরী, শচীন সেন, অগ্নিহোত্রী উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, গল্প-লেখক সরোজ রায়চৌধুরী এবং আরও কেউ কেউ।

ওরই মধ্যে একদিন 'কল্লোল'-এ বেশ আড্ডা জমে উঠেছে, এমন সময় হঠাৎ নরেন্দ্র দেব ভিতরে ঢুকলেন। তিনি সজ্জন, অমায়িক ও সব দলের বন্ধু। তিনি আমাকে দেখামাত্রই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন,—তুই নাকি চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিস? সাহিত্য করে কারো ভাত জোটে? খেতে না পেয়ে পথে পথে ঘুরবি, লেখকদের দুর্দশা দেখতে পাচ্ছিসনে চারদিকে? তোরা ত সামান্য, রবিঠাকুরের বই কখানা বিক্রি হয় বাজারে?

আমরা সবাই নতমুখ।

নরেন্দ্র দেবের তিরস্কারটি অনেকদিন মাথার মধ্যে ঘুরেছিল। আমরা প্রায় সবাই এখন বেকার। শৈলজা শীঘ্রই আবার কাশী থেকে ফিরবে বেকার হয়ে, দেরি নেই। নৃপেন, পবিত্র, অজিত সেন, ঢাকাকেন্দ্রিক বুদ্ধদেব ও অজিত দত্ত, অচিন্ত্য, দীনেশরঞ্জন ওরফে 'ডি আর',—প্রায় সকলেই বেকার।

লক্ষ্য করছিলুম, তরুণ লেখকরা সর্বত্র তখন নিন্দিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, শক্তিমান লেখকরাই সমকালীন সমালোচকদের কাছে বেশি গালি খায়। 'শনিবারের চিঠি' তখন খুললেই দেখতে পাই, সজনীকান্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছে প্রধানত নজরুলকে, অচিন্ত্যকে, প্রগতি সম্পাদক বুদ্ধদেবকে এবং আমাদের মুখচোরা ও মিষ্টভাষী বন্ধু জীবনানন্দ দাশগুপ্তকে।

'শনিবারের চিঠি' শত্রুভাবে সকলকে ভজনা করেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ, হোমরুল আন্দোলন, রুশ বিপ্লব, রাশিয়ায় প্রথম 'সোস্যালিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা—ক্ষুধাতুর সর্বহারা অপমানিত এক মানবগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, গান্ধীর অভ্যুত্থান, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের নাইট-হুড পরিত্যাগ, ইংরেজিতে অনুবাদ করা কনটিনেণ্টাল সাহিত্য, বাংলায় বিপ্লবী দলের সঙ্গোপন কর্মতৎপরতা—এগুলি সব একত্র মিলে একটি অপ্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল একদল লেখকের মনে। তাঁরা বার করেছিলেন 'আত্মশক্তি' ও 'বিজলী'। দুটোই সাপ্তাহিক। অন্য দিকে ছিল দেশবন্ধুর দ্বারা প্রতিপালিত 'নারায়ণ'। এগুলি সবই জাতীয়তা-বাদী সাময়িক পত্র। এই তিনটি কাগজে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উপেন বাঁড়ুজ্যে, বারীন ঘোষ, শচীন সেনগুপ্ত, নলিনীকান্ত সরকার, নজরুল ইসলাম, শিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম আগে মনে আসে। এর মধ্যে চেরী প্রেস থেকে ছাপা হত 'বিজলী'। বহুবাজার স্ট্রীটে এই প্রেসেরই একফালি বারান্দায় যে অজ্ঞাতকুলশীল কৃষ্ণকায় যুবকটি কোনও মতে আশ্রয় নিয়ে সারাদিন বইয়ের পোঁটলা সাইকেলে বেঁধে ফিরি করে বেড়াত, সেই ব্যক্তি আপন অধ্যবসায়ের গুণে পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন ডি-এম লাইব্রেরীর মালিক গোপাল মজুমদার। কিন্তু গোপালবাবু তাঁর প্রাক্তন আশ্রয়দাতাগণের হৃদয়-বত্তার কথা ভোলেননি। নানাবিধভাবে তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন।

যা বলছিলুম। পূর্বোক্ত কাগজগুলি একে একে বন্ধ হয়ে গেল। শুধু টিম-টিম করতে লাগল 'নারায়ণ' কিছুকাল অবধি। বারীন ঘোষ চলে গেলেন পণ্ডিচেরী, উপেন বাঁড়ুয্যে পারিবারিক জীবনে ঢুকে কিছু কিছু লেখা লিখতে লাগলেন। তাঁর 'নির্বাসিতের আত্মকথা' ও 'উনপঞ্চাশী'—এ দুটি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে মণিরত্নের মতো উজ্জ্বল ও জীবন্ত হয়ে রইল। নলিনীকান্ত সরকার একজন সঙ্গীতবিদ্, তিনি গানের মাষ্টারি নিয়ে রইলেন। শচীন সেনগুপ্ত তথৈবচ। ওঁদেরই ভিতর থেকে উঠে এল তৎকালীন তরুণ বাংলার প্রিয় কবি নজরুল। সে যেন ছুটে এসে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কতকাংশ স্মরণ করিয়ে দিল—"বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র কলোচ্ছ্বাসে বিদ্রোহী নবীন বীর/স্থবিরের শাসন-নাশন/বারে বারে দেখা দিবে/আমি রচি তারই সিংহাসন তারই সম্ভাষণ।"

নজরুল কোথায় যেন এক জায়গায় লিখেছিল, "আমি যুগের না হই, হুজুগের কবি—"

এরপর তরুণ বাংলার সাহিত্যে এল আরেক নতুন তরঙ্গ। এরা কেউ মার্কা-মারা জাতীয়তাবাদী নয়। রাজনীতিকদের সঙ্গে এদের যোগ নেই, সাহিত্যে রাজনীতি এরা আনতে চায় না। এরা জীবনরসিক এবং সাহিত্যরঙ্গপ্রিয়। এদেরই অভিভাবক হয়ে যাঁরা সামনে এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরাই একটি মাসিকপত্র বার করেন, তার নাম দেওয়া হয় 'কল্লোল'। এরা এদের অগ্রগামী 'ভারতীর' লেখকগোষ্ঠীর মতো অবস্থাপন্ন বা রবীন্দ্রস্নেহপুষ্ট লেখকগোষ্ঠী ছিল না। এরা ছিল দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর কয়েকজন কাঁচা তরুণ। এরা অন্নের জন্য ছোঁক ছোঁক করে, কর্মসংস্থানের জন্য পথে-পথে ঘোরে। কিন্তু এদের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছিল একশ্রেণীর শক্তিমান লেখককে—যারা পূর্বতন সাহিত্যের ঐতিহ্য বহন করে না। এরা সাহিত্যের আভিজাত্য বোঝে না, চলতি সমাজের অনুশাসন স্বীকার করে না এবং রবীন্দ্রনাথের স্তাবকদলের তালিকায় নিজেদের নাম লেখাতে চায় না। এরা সমাজদ্রোহী, গৃহবিদ্রোহ, এবং এরা জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায়।

শরৎচন্দ্র কতকটা নিম্নমধ্যবিত্তের স্তরে নেমে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এরা যারা কল্লোল-কালিকলম প্রগতি-ধূপছায়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—এরা নামতে চাইল আরও অনেক নিচে—যেখানে শ্রমিক চাষী মজুর ধোবা নাপিত এবং বস্তিবাসীদের সেই অসহনীয় দুর্গত জীবনে। এরা বেছে নিল নৈরাশ্যবাদী তরুণ সম্প্রদায়কে, ওই সঙ্গে দরিদ্র দুঃস্থ হতভাগ্য বঞ্চিত ও উৎপীড়িতকে। বেছে নিল বেশ্যা, মাতাল, গাঁটকাটা, গাঁজাখোর, জুয়াড়ি, অন্ধ, খঞ্জ, নুলো, ভিখারী ও কাঙ্গালের দলকে। এদের নিয়েও দেশ। এরাও আসুক সাহিত্যে। এই নতুন চেতনা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম এল 'বামপন্থা'। কিন্তু ওদের কোনও রচনাতেই রাজনীতিক প্রচারকার্যের শস্তা বুলি থাকত না। ওরা মর্মান্তিক ছবি তুলে ধরত, কিন্তু নীতিকথা আওড়াতো না। ওদের লেখাগুলো হত কাঁচা, কিন্তু আপন প্রচণ্ডতায় নতুন। অনেক ক্ষেত্রেই অনেক লেখা অক্ষম, কিন্তু তীব্রভাবেই অনন্য। ওরা অশ্লীল লেখা ঠিক লেখে না, লেখে তার চেয়েও যা মারাত্মক—অর্থাৎ দুর্নীতিবাদ। ওরা ভাঙতে চাইছিল রক্ষণশীলতাকে, ওরা মেয়েদের ঘোমটা খসিয়ে তাদেরকে পথে বার করতে চাইছিল, চলতি সমাজকে ওরা জাহান্নমে পাঠাচ্ছিল, ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে তছনছ

করে দিচ্ছিল। ওরা ধর্মের বুলি শুনতে চায় না, শস্তা উপদেশ ওদের দু-চক্ষের বিষ, নীতিকথায় ওদের মন ভোলে না। ওরা চাইছিল এমন একটা জীবন যার স্পষ্ট ছবি ওদের নিজেদের কাছেও নেই!

এই ভাঙনের আওয়াজে ঘুম ভেঙেছিল রক্ষণশীল পাঠক সমাজের। তাদের মুখ্যমোড়ল হল সজনীকান্ত দাস—আমার প্রথম লেখক জীবনের বন্ধু। তৎকালীন 'শনিবারের চিঠি'র চেষ্টা ছিল, 'কল্লোল-কালিকলম্-প্রগতি-ধূপছায়ার' অতি-আধুনিক লেখকগোষ্ঠীর কেউ যেন ভদ্রসমাজে জায়গা না পায়! শনিবারের চিঠির 'মণিমুক্তা' সংগ্রহের উদ্দেশ্যও তাই ছিল।

সাহিত্যে এই বামপন্থা অনুসরণের কালে আমাদের তৎকালীন শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক জনাব মুজাফফর আহমেদ নিঃশব্দে 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন। এক সময় এই পার্টির সকল বিশিষ্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সেই মামলার নাম দেওয়া হয় 'মীরাট কন্‌সপিরেসি কেস'। সেই মামলার উদ্বোধনকালে কলকাতার এক ইংরেজ ব্যারিস্টার মিঃ নর্টন জোন্স মহামান্য ইংরেজ বিচারককে সম্বোধন করে চিৎকার করেছিলেন, "My Lord, they are anti-god, anti-national, anti-society, anti-everything."

কল্লোল-কালিকলমের তরুণ লেখকরা এ কথাগুলি শুনে খুবই পুলকিত হয়। যাই হোক, অতঃপর এই মামলায় 'পর্বত মূষিক প্রসব' করে। ষড়যন্ত্রের বিশেষ কোনও প্রমাণ না পাওয়ায় ব্রিটিশ শাসকরা বছর তিনেক পরে আসামীদের ছেড়ে দেন। এই আসামীদের অন্যতম শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বন্ধু হয়ে ওঠেন। ওই হাস্যকর মামলা চলাকালে আসামীদের অবসর বিনোদনের জন্য আমি কিছু কিছু সাহিত্যগ্রন্থ পাঠাতুম।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কথা বলছি। নব্য বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন ভাবনার তরঙ্গ তোলেন যে কয়জন, তাঁদের মধ্যে নাট্যজগতে শিশির-কুমার, সঙ্গীতে দিলীপকুমার রায়, রাজনীতিতে যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র, কাব্যে ও গানে নজরুল, নৃত্যকলায় উদয়শঙ্কর ও তাঁর সঙ্গিনী ফরাসী মেয়ে শ্রীমতী সিমকী। আবার ঠিক এই একই সময়ে দুখানা বিশিষ্ট মাসিক সাহিত্য-পত্র দেখা দেয়—'পরিচয়' ও 'বিচিত্রা'। 'পরিচয়' নাকি 'অভিজাত' সাহিত্য বিতরণ করবে! সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—অ্যাটর্নী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এবার থেকে নাকি রবীন্দ্রনাথ ওই কাগজে 'পুস্তক সমালোচনা' লিখতে আরম্ভ করছেন। ওদিকে 'বিচিত্রা'র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে লেখাচ্ছেন 'তিনপুরুষ' বা 'যোগাযোগ', শরৎচন্দ্রকে দিয়ে

'শ্রীকান্ত'র চতুর্থ পর্ব, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে 'পথের পাঁচালী' এবং তরুণ আই. সি. এস. অন্নদাশঙ্করকে দিয়ে 'পথে-প্রবাসে'। কিছুকালের মধ্যে হঠাৎ অচিন্ত্য গিয়ে 'বিচিত্রা'য় চাকরি নিল। মাইনে পাবে মাসিক পঞ্চাশ টাকা। 'কল্লোলের' সর্বাগ্রগণ্য লেখক অচিন্ত্য ছিল সর্বাপেক্ষা 'নিন্দিত'। এবার সে গিয়ে উঠল অভিজাত সাহিত্যমঞ্চের একটা উঁচু আসনে। আমরা নিচের থেকে তার দিকে মুখ তুলে ঈর্ষান্বিত চক্ষে তাকালুম। অতঃপর অচিন্ত্যর নামের পাশে ছাপা হতে লাগল—'এম-এ, বি-এল'।

কল্লোলের যখন মরণদশা ঘটছে সেই সময় লাভপুর বীরভূম থেকে জনৈক লেখক দুটি গল্প পাঠালেন, 'রাইকমল' অথবা 'রসকলি' ও 'হারানো সুর'—লেখক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আপন অসাধারণত্বে এ-দুটি বৈষ্ণব-রসাশ্রিত ছোট গল্প, অতি উজ্জ্বল। জাতশিল্পী এই লেখকের রচনাভঙ্গীর সুনিপুণ দক্ষতা লক্ষ্য করে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলুম। লাভপুরের নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেউ কি হবে এই লেখক? সাহিত্যের কোন্ কারখানায় এমন কারিগর তৈরি হয়েছে? কিন্তু তারপর এই লেখকের আর কোন উচ্চবাচ্য শোনা গেল না।

কল্লোলের আড্ডায় আসছিল পবিত্র, জলধর সেনের ছেলে অজিত, সুধীন্দ্রিয়, মধ্যে-মাঝে ঢাকা থেকে বুদ্ধদেব ও অজিত দত্ত, যখন-তখন নৃপেন, কালেভদ্রে কাজী, কখনো কখনো কবিযশোপ্রার্থী প্যাণ্ট-পরা হুমায়ুন কবির ও গিরিজা মুখুজ্যে। গিরিজার মধুর প্রকৃতি ও তার ছোট ছোট সনেট্ অনেকের প্রিয় ছিল। কিন্তু তখন কল্লোলে ভাঙ্গন ধরেছে। সম্পাদক দীনেশরঞ্জনকে প্রায়ই ধরে নিয়ে যাচ্ছেন চিত্রনির্মাণেচ্ছু দেবকী বসু। মাত্র ছয় বছরেই 'কল্লোল' মরতে বসেছে। লেখকরা যে যার পথ খুঁজে নিচ্ছে। তারা বাইরে বাইরে লিখে পারিশ্রমিক পেতে আরম্ভ করেছে। একটা ছোটগল্প গুছিয়ে লিখতে পারলে পনেরো টাকাও পাওয়া যায়।

বন্ধুমহলের পারস্পরিক আচরণের ফলে এই সময় একপ্রকার বিষাক্ত বাষ্প ঘুলিয়ে উঠছিল। কিন্তু একে ঠিক অপরাধ বা স্বভাব প্রকৃতির দোষ বলা চলে না। এর মূলে রয়েছে দারিদ্র্য এবং প্রতিষ্ঠালাভের লালসা। প্রত্যেক লেখকের যেটুকু অংশ তার প্রতিভা—সেটুকু বাদে বাকি বৃহৎ অংশটা অনেক সময় বীভৎস। এই বীভৎসতা মাঝে মাঝে শ্বাসরোধী হয়ে উঠছিল।

এই সময়টায় আমি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছিলুম। আমার বাঁধন নেই, আগল নেই, শাসন নেই, সংযম নেই, এবং মানসিক প্রশান্তিও

নেই। আমার স্বাস্থ্যের বাঁধন কঠিন, সাংঘাতিক, কণ্ঠে আমার পশুরাজের মতো গর্জন, আমার যৌবনের প্রবলতা অনেকের পক্ষে ভীতির কারণ। কোনও সময়েই আমার মস্তিষ্ক এবং শরীরের অন্ত্রতন্ত্র স্থির থাকছে না,—আমি বেপরোয়া, দুর্দান্ত এবং অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম যেখানে সেখানে। এর একটা কারণ আমি জানতুম। আমি মিলিটারি সার্ভিস ছেড়েছি এবং তার সঙ্গে জগদীশচন্দরের ভগ্নী সরস্বতীকে একটা বিসদৃশ অবহেলার সঙ্গে ত্যাগ করে এসেছি, এর জন্য মনে-মনে একটা প্রতিক্রিয়া ছিল। আমি যেন নিজেকে কোনমতেই ক্ষমা করতে পারছিলুম না। কেমন একটা ধ্বংসাত্মক শক্তি আমাকে পেয়ে বসেছিল।

পাপ এবং দুর্নীতির পথ নাকি খুব পিচ্ছিল—পা যদি একবার হড়কিয়ে যায় তবে একেবারে অতল তলে তলিয়ে যাও। সুতরাং বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে যখন সেই অতল পিচ্ছিল গহ্বরের মধ্যে নেমে যাচ্ছিলুম তখন আনন্দ-কৌতুকে নিজেই হাসছিলুম। এ যেন নাগরদোলায় চড়েছি! কখনো যাচ্ছি তলিয়ে, কখনো হুস করে আবার উপর দিকে উঠে আসছি! এত আনন্দ যে পদস্খলনের এ-কথা কি আগে জানতুম? এক-এক সময় খবর পাই অমুক-অমুক পল্লীতে আমাদের পক্ষে চরিত্র নষ্ট করার সুবিধা। চলো যাই সব বন্ধু মিলে সেই দিকে। তুমি এসো, হ্যাঁ, তুমিও এসো! আর তুমিই বা থাকবে কেন পিছিয়ে—এসো, চলে এসো। সন্ধ্যার পর তুমি-আমি এক, সেই আমরা আদিম গুহাবাসী মানবেতর জানোয়ার। আমরা দুষ্কর্মব্রতী, আমরা ভ্রষ্টনীতি, পাপাচারী—ক্ষুধায় লোলুপতায় অপকর্মে দুষ্প্রবৃত্তিতে আমরা যেন নিখুঁৎ নষ্টচরিত্র হতে পারি। আমরা চোর নই, কিন্তু চোরের মতো। আমরা সমাজবিরোধী কোনও কাজ করিনে, কিন্তু আমরা সমাজের প্রবলতম শত্রু! যদি গাঁটকাটা হতুম, রাহাজানি করতুম, ডাকাতি করে বেড়াতুম, প্রতারণায় যদি হাত পাকাতুম—সে ভাল ছিল। সেখানে অন্যায়ের শাস্তি ছিল, কিন্তু বৃহত্তর সমাজ-মন সেখানে অসুস্থ বোধ করত না!

কিন্তু এখন ও-সব নীতিকথা থাক। এখন সবাই এসো আমরা সঙ্গোপন-চারণের পথে মিলি। আমরা অন্ধকার থেকে আবছায়ার মধ্যে যাই চলো। না, পিছনে চেয়ো না, ভয় পেয়ো না, অস্বস্তি রেখো না মনে, সঙ্কোচে কুণ্ঠিত হয়ো না—ওগুলো বলবান পুরুষের পরিচয় নয়! নিজের মধ্যে সত্য হও, নির্ভীক হও, উদার হও—নচেৎ ভবিষ্যৎকাল তোমাদের ক্ষমা করবে না। তোমরা সবাই এখনও ছোট ছোট প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ, এখনও তোমরা মাত্র

লেখক—এখনও শিল্পী হয়ে ওঠোনি! তোমাদের পদস্খলন-এর পরিচয় ইতিহাসে যেন সগৌরবে স্থান পায়। তোমরা ক্ষুদ্রে, তুচ্ছে, নীচতায়, মূঢ়তায়, মালিন্যে যেন কীটের মতো কিলবিল কোরো না। তোমরা কেবল পুরুষ নয়, তোমাদের মধ্যে রয়েছে অশরীরী পুরুষোত্তম—যে স্রষ্টা, যে জীবনকে নির্মাণ করে, যে নিত্য ছবি এঁকে চলে বিশ্বের পটে-পটে।

এই নিশাচর জীবন-সন্ধানীর দল যখন পথে-বিপথে, নোংরায়, খানায়, বস্তির আশেপাশে ঘুরে বেড়াত, তখন আমি চেয়ে দেখতুম এক অদৃশ্য নিয়ন্তা একটি বিশেষ যুগের নক্সা আমাদের সামনে এঁকে ধরছে—যে-যুগটি ১৯২৩ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে সীমিত। আজ যে সকল ছোট ছোট বুভুক্ষু প্রতিভা সর্বহারার মতো রাত্রির ছায়ার মধ্যে আপন আপন প্রাণের তাড়নায় নৈশ অভিযানে চলেছে—তাদের ভিতরে রয়েছে ভবিষ্যৎকালের অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ্, আইনজীবী, নৃত্যশিল্পী, বিচারক, চিকিৎসক, চিত্রনির্মাতা, কবি, নাট্যকার, ঐতিহাসিক, কথাশিল্পী, ঔপন্যাসিক, সম্পাদক, বিজ্ঞানী প্রভৃতি। এদের মধ্যে কেউ কেউ সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ললিতকলার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক সম্মানলাভও করেছিল। আজ এরা শাবক, ভবিষ্যতে এরাই হয়ে উঠবে পাখি। এদের প্রতিভার পাখায় আসবে বেগের চাঞ্চল্য, এদের আকাশ হবে অনেক বড়। এদের মধ্যে যারা সাহিত্যকর্মী, নতুন কালের ভাবনায় যারা অনুপ্রাণিত, যারা বর্তমান যুগকে ছাড়িয়ে যুগান্তরকে প্রভাবিত করার প্রতিশ্রুতি এনেছে—তাদের নিত্যকার কৌতূহল, ঔৎসুক্য, জানার আগ্রহ, অভিজ্ঞানলাভের পিপাসা,—তাদেরকে এই কালে একটি দুর্লভ বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। এরাই পরবর্তীকালে পুরনো ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে নতুন দিগন্তের দ্বার খুলেছে, প্রচলনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নতুন চিন্তাধারার পথ কেটেছে, নারীসমাজের বন্ধনমুক্তির চেতনা এনেছে এবং বিচিত্র জীবনের স্বাদ এনেছে কথায়-কথায়। সেদিন এদের সাহিত্যসাধনা ধূলিধূসর পথে নেমেছিল।

সে যাই হোক, কথায়-কথায় চরিত্র নষ্ট করার সেদিন সুযোগ ছিল কম। মূল কারণ অর্থাভাব। যদি সংযমী হও, ব্রহ্মচর্যব্রতী হও, নীতিধর্মে যদি তোমার মতি থাকে—তা হলে তোমার কোনও খরচ নেই! কিন্তু যদি শ্লথচরিত্র হতে চাও, যদি ছক-কাটা জীবনের বাইরে গিয়ে কিছু দেখে আসতে সাধ হয়—তবে তার খরচ অনেক। সুতরাং চরিত্র-নষ্টের উদ্দাম প্রচেষ্টাকে অনেক সময় থামিয়ে রাখতে হত, এবং আমরা নিজেদের সংযম ও অনাসক্তির জন্য কষ্ট পেতুম!

মনে মনে ভাবতুম কালের বিচারে সমকালীন লেখকদের কারও প্রতিভা এখনও স্বীকৃত হয়নি। কেউ ঈষৎ চিকচিক করছে, কেউ কিছু দানা বাঁধছে। শক্তির সেই অনন্য স্ফুরণ কারও মধ্যে এখনও স্পষ্ট নয়। কারও কুঁড়ি ধরেছে, কুঁড়ির মধ্যে গন্ধ জমেছে—সে-কুঁড়ি অকালে ঝরে না গেলে ফুল আসবে! ফুলের পর ফল ধরবে। সেই ফলে রসের সঞ্চার হবে। অতঃপর সেই রস হবে মধুর ও সুস্বাদ। সুতরাং এখনও অনেক দেরি। এখনও অনেক বছর।

সম্প্রতি কয়েকজন প্রবীণ লেখকের সংস্পর্শে এসেছিলুম। কবিশেখর কালিদাস রায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার ও হেমেন্দ্রলাল রায়, রায়বাহাদুর জলধর সেন ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মোহিতলাল মজুমদার, শচীন সেনগুপ্ত প্রভৃতি। তখন শচীনবাবুর সম্পাদনায় 'ফরওয়ার্ড' অফিস থেকে 'নবশক্তি' নামক সাপ্তাহিক কাগজ ছাপা হত। তখন 'নবশক্তি'র খুব নাম। সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্র। এই পত্রে 'শতকরা নিরানব্বই' নামক আমার একটি ছোটগল্প ছাপা হবার ফলে একটা সোরগোল ওঠে। গল্পটি নাকি অশ্লীল। এ নিয়ে নবশক্তির মালিক শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের সঙ্গে শচীনবাবুর কিছু বচসা বাধে। শচীনবাবু ছিলেন নির্ভীক এবং অতিশয় স্পষ্টবাদী। তিনি বলেন, দায়িত্বশীল সম্পাদকের বিচারই শেষ বিচার। এ গল্প আমি ভেবেচিন্তেই ছেপেছি। এ ব্যাপারে যদি কেউ আমার উপরে প্রভুত্ব করতে আসে, আমি চাকরি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।

কথাটা ওখানেই চাপা পড়ে। শচীনবাবু খুবই বেপরোয়া ছিলেন।

এই আবহাওয়ার মধ্যেই লিখে যাচ্ছে সবাই। মাসিকের পৃষ্ঠা ভরাবার জন্য ছোটগল্প চাই—তার জন্য কোথাও কোথাও দশ-পনেরো টাকা মেলে। নজরুলের কবিতার আর্থিক দাম আছে, অন্য কারও নেই। কবিতা লিখে পারিশ্রমিক পাওয়া তখন স্বপ্নাতীত। প্রবন্ধাদি লিখতে গেলে কিছু পাণ্ডিত্য লাগে। সে-দিকে কেউ হাঁটে না। উপন্যাস কেউ চায় না, কারণ কেউই তখন ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠেনি। এই সময় আমি একখানা ছোট উপন্যাস লিখে এক বটতলার প্রকাশকের কাছে নিয়ে যাই। দিন তিনেক পরে খবর নিতে গেলুম। তিনি বললেন, আজকাল বই ছাপতে খরচ অনেক। তবে হ্যাঁ, ছাপা যেতে পারে! ফর্মা পিছু দু আনা দাম ধরতে হবে, নইলে খরচ উঠবে না। আমি বইটির জন্য পঁচিশটি টাকা চেয়েছিলুম। তিনি তৎক্ষণাৎ পাণ্ডুলিপিটি বের করে ফেরত দিলেন। মনে করেছিলুম ছিঁড়ে ফেলে

দেবো। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কারণ যেমন তেমন করে ওই কাঁচা অপদার্থ উপন্যাসটি রাত্রির পর রাত্রি জেগে শেষ করেছিলুম, কেবলমাত্র কিছু পাব আশা করে। আমার দারিদ্র্য প্রায় চরমে উঠেছিল।

এর প্রায় ষোলো বছর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে যখন প্রবল মুদ্রা-স্ফীতি ঘটে, সেই সময় জেলেটোলার পাড়া থেকে এক নব্য প্রকাশক আমার কাছে একখানি নতুন উপন্যাস চান। পূর্বোক্ত উপন্যাসটি আমি বের করলুম। সেটিতে এখন পোকা ধরেছে, ড্যাম্পের ছোপ পড়েছে, কাগজগুলোয় গর্ত-গর্ত হয়েছে। কিন্তু আমি ছিলুম একটু জেদী। যে-বইটিতে একদা পঁচিশটি টাকাও পাইনি, সেই বইটির দুটি সংস্করণের দরুন পঁচিশ শ' টাকা দাবী করলুম। নব্য প্রকাশক দ্বিরুক্তি করলেন না। সেদিন মনে হয়েছিল, পথ থেকে আড়াই হাজার টাকা যেন কুড়িয়ে পেলুম।

ওদিকে ভারতের রাজনীতিক দিগন্তে আবার দেখা দিল কালো মেঘ। বাঙলায় বিপ্লববাদ বেশ নিঃশব্দে দানা বেঁধে উঠছিল। বড়লাট লর্ড রেডিং উৎপীড়নের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এখন এসেছেন দু-মুখো লর্ড আরউইন। বিপ্লব-নেতা ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু আর বটুকেশ্বর দত্তর বিচার শেষ হচ্ছে। লাহোর জেলে তরুণ যতীন দাস আমরণ উপবাসের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে।

ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে শাণিত তরবারির ফলকের মতো বিজলীর ঝলক থেকে থেকে ঝলসিয়ে উঠছিল। ওই লাহোরে এবার জওয়াহরলাল নেহেরু কংগ্রেস সভাপতি হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করবেন। সুভাষচন্দ্র জ্বালাময়ী বক্তৃতার দ্বারা বিশাল ভারতকে চঞ্চল করে তুলেছেন।

এই দশকে একে একে যাঁদের শবযাত্রার সঙ্গী হয়েছিলুম, তাঁরা হলেন স্যার আশুতোষ, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। এবার আসছে যতীন দাসের মৃতদেহ। জেলের মধ্যে সে চৌষট্টি দিন নির্জলা উপবাস করেছিল। সেই মুমূর্ষু যতীনকে বলপূর্বক নাক দিয়ে ও গলা দিয়ে খাওয়াবার চেষ্টা করা হয়। সেই সাংঘাতিক উৎপীড়নের মধ্যে মৃতকল্প হয়েও বাঙলার কেশরী সেই বিপ্লববাদী তরুণ আপন সঙ্কল্পচ্যুত হয়নি। পৃথিবীর বিপ্লববাদীদের ইতিহাসে যতীন হয়ে উঠল দ্বিতীয় ম্যাকস্যুইনি। সেদিন সমগ্র কলকাতা কাঁদতে কাঁদতে ছুটেছিল হাওড়া স্টেশনে। যতীনের মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে আসছে ওর ছোট ভাই কিরণ দাস।

বাঙালী সেদিন অহিংসা-মন্ত্রে আরেকবার বিশ্বাস হারিয়েছিল। যাই হোক, সেই থেকে কিরণদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়।

কিন্তু আর নয়, এবার আসি ব্যক্তিগত কথায়।

আমি বেরিয়ে পড়েছিলুম ভ্রমণে। এর মধ্যে 'বাগ্দির হাঁড়িতে কিছু পান্তাভাত' জমেছিল। অর্থাৎ ঘরে পান্তা থাকলে বাগ্দি আর কাজ করতে চায় না। সেইরূপ আমার সাহিত্যকর্মের বকশিশ মাঝে মাঝে কিছু জমে যেত। তখন আর ছোটখাটো কথা নয়—একেবারে সোজা হিমালয়। তখন মারি ত গণ্ডার, লুটি ত ভাণ্ডার! হিমালয়ের এখানে ওখানে বৃষ্টিতে ভিজে, রৌদ্রে পুড়ে, ঠাণ্ডায় কেঁপে, আধপেটা রুটি খেয়ে ক্লান্ত হয়ে একদিন গিয়ে বসতুম হরিদ্বারে। কেউ তখন জানত না আমি কোথায়। অবশেষে একদিন একখানা কম্বল আর পুঁটলি নিয়ে নামতুম কাশীতে!

বেশ গুছিয়ে কদিন কাশীতে বসেছি এবং ধীরে ধীরে বেশ আড্ডাটা জমে উঠেছে এমন সময় একদিন হেমন্তবাবুর ওখান থেকে এক আমন্ত্রণ পেলুম। রাস-পূর্ণিমা তিথিতে ওঁদের ওখানে সত্যনারায়ণের ব্রতপূজা। ওঁরা কয়েক-জনকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেছেন। আমি নাকি এবার হেমন্তবাবুর বিশিষ্ট অতিথি।

আমি রাজী হয়ে গেলুম। হেমন্তবাবু আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু। কাশীতে তিনি অধ্যাপনা করেন। সম্প্রতি তিনি ন্যায়রত্ন উপাধি পেয়েছেন।

কার্তিকী পূর্ণিমার দিন সত্যনারায়ণ ব্রতপালন। পূজা, ব্রতকথা, হরির লুট ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ঝঞ্ঝাট পেরিয়ে একটু রাত করেই আমরা মদনপুরার কাছেই এক বাড়িতে গিয়ে ঢুকলুম। নিচের তলাটা খুবই অন্ধকার। উপর থেকে কে যেন আলো ধরল সিঁড়ির দিকে। আমি এবার অনেকদিন পরে এসেছি, সুতরাং অভ্যর্থনায় কিছু সমারোহ ছিল। হেমন্তবাবু আগে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ঘরে তাঁর মা, স্ত্রী এবং আরেকজন অল্পবয়স্কা ফর্সা বিধবা কে যেন। এর আগে প্রসাদ বিতরণ হয়ে গেছে। এবার আমরাই শুধু খেতে বসব।

হেমন্তবাবুকে নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ গল্পে জমে গেছি, এমন সময়ে সেই বিধবা মহিলা মুখ বাড়িয়ে আমাদের ডাকলেন, আপনারা এসে খেতে বসুন।

উট্‌কো জায়গায় আমি সাধারণত একটু লাজুক এবং নতমুখ। সেজন্য উত্তরার সুরেশের মতো আনন্দমুখর বা ননীর মতো পরিহাসরসিক কোনটাই হতে পারিনে। আমি খেতে এসেছি, হাসিমুখে দুটো আলাপ করে খেয়ে চলে

যাব—এর বাইরে আমার অন্য কাজ নেই। ঘর-গৃহস্থ সম্বন্ধে আমি নির্বিকার।

গাওয়া ঘিয়ের লুচির সঙ্গে ফুলকপির তরকারি। পায়স, মোহনভোগ, রাবড়ি। দইয়ের সঙ্গে দরবেশ আর ক্ষীরের খোয়া—অর্থাৎ তখনকার দিনে নৈবেদ্যলোভী নারায়ণ জাগ্রত দেবতা ছিল! প্রচুর পরিমাণ আহারাদি সেরে একে একে সবাই হাত ধুতে উঠল। হেমন্তবাবু আগে উঠে হাত ধুয়ে নিজের ঘরে গেলেন। পরে একে একে সকলের হাতে জল ঢেলে দিচ্ছিলেন ওই বিধবা মহিলা। সব শেষে আমি একপ্রান্তে এগিয়ে ঠিক নলের মুখে হাতখানা যখন বাড়িয়েছি, তখন হঠাৎ ওই মহিলা আমার এঁটো হাতখানা নিজের ডান হাতে টিপে ধরে বাঁ হাতের ঘটির জলে কচলিয়ে ধুইয়ে দিতে লাগলেন, এবং অতি সঙ্গোপনে প্রায় আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, আমাকে ভুলে গেছেন?

ইলেকট্রিকের শক্! আমার সর্বাঙ্গ অসাড় ও অচেতন হয়ে গিয়েছিল। আমার কিছু বলবার আগেই তিনি পুনরায় বললেন, কাল বেলা এগারোটায় ঘোড়াঘাটে হাঁড়ির দোকানের কাছে দাঁড়াবেন,—একটু কথা আছে!

সমস্ত ব্যাপারটা আধ মিনিটেরও অনেক কম। মহিলা ওঁর থান কাপড়ের আঁচল দিয়ে পলকের মধ্যে আমার হাতখানা মুছে নিলেন। আমি সেখান থেকে সরে এলুম।

উত্তেজনায় থর থর করে আমি কাঁপছিলুম। গত একঘণ্টা কালের মধ্যেও মুখ তুলে যাঁর দিকে একটিবারও তাকাইনি, তাঁর এবম্বিধ আচরণ আমাকে বিমূঢ় করেছিল। হেমন্তবাবুর ঘরে ঢুকে একটা পান মুখে দিয়ে সকলের আগেই আমি অন্ধকার সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালুম।

সেই রাত্রে আমার ঘুম হয়নি। কুচবিহারের কালীবাড়িতে রোশনচৌকির সঙ্গীত আরম্ভ হয় শেষ রাত্রে,—তখনও আমি জেগে। মনে হচ্ছিল জীবনে এই প্রথম একজন আমার নিদ্রাহরণ করেছে। ওই প্রকার হাত টিপে ধরার মধ্যে কী ছিল আমি জানি। কিন্তু আমি কখনই কল্পনা করিনি, ভদ্রসমাজের এক বিধবা জনৈক পুরুষের হাত এভাবে ধরবেন! এতকাল ধরে জেনে এসেছিলুম মেয়েদের পিছনে পুরুষ ছোটে, কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম দেখে নিজেই নির্বোধ বনে গেছি। প্রণয় ইত্যাদি ব্যাপারে আমি কেবল অনভিজ্ঞই নয়, আমি অকৃতী ও অপদার্থ,—অন্তত এখন পর্যন্ত এইটিই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু আমি মূলত রোমান্টিক্, স্বপ্নদর্শী, রসকল্পী—আমি সেন্টিমেণ্টাল্। আমি বহু পরিবারের সঙ্গে লিপ্ত, বহু অন্দরমহলে আমার আনাগোনা, কিন্তু অদ্যাবধি আমার নৈতিক চরিত্র নিয়ে কোথাও কোনও কথা ওঠেনি। এসব ব্যাপারে

আমি অযোগ্যও বটে, উদাসীনও বটে।

নতুন ও মধুর ঠাণ্ডা পড়েছে কাশীতে। পুজোর ভিড় ক্রমে ক্রমে শেষ হচ্ছে, পালপার্বণ এখন কিছুকাল কমই থাকবে। ঘাটগুলোয় গতকাল জনতা ছিল প্রচুর, আজ অনেকটা ফাঁকা। বাঙ্গালীটোলার গলিতে জনস্রোত কিছু মন্দা। আমি ওরই ভেতর দিয়ে এগোচ্ছিলুম। আমার পায়ের সঙ্গে মনও কাঁপছিল উত্তেজনায়। আমি যাচ্ছিনে, আমাকে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে! সমস্ত ব্যাপারটার পিছনে রয়েছে একটা গোপনীয়তা, সেটা আমাকে যেন এক-প্রকার চৌর্যবৃত্তিতে উস্কানি দিচ্ছে। না, এটা রোমান্স নয়, এটা স্বপ্নাবেশ নয়, এর মধ্যে কাব্যের বা সঙ্গীতের কোনও স্বরমূর্ছনা নেই,—এ যেন স্থূল একটা যৌবন-বিহ্বলতার ডাক।

দশাশ্বমেধ ঘাটে নেমে প্রয়াগ ঘাটের তলা দিয়ে আমি ঘোড়াঘাটের সিঁড়ি ধরলুম। উঠতে উঠতেই উপর দিকে বাঁহাতি লক্ষ্য করলুম, যাঁর জন্য এসেছি তিনি আগে-ভাগেই এসে হাঁড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দরাদরি করছেন। ওঁর গায়ে মটকার একখানা চাদর জড়ানো। মাথায় একটু ঘোমটা। পায়ে একজোড়া চটি। গত রাত্রে যাঁকে আচমকা চিনতে পারিনি, আজ তাঁকে চিনলুম। তিনি শাস্ত্রী মশায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী শীলা।

কাছাকাছি এসে আমি হাসলুম। আমার হাসিতে সাদর অভ্যর্থনা ছিল।

শীলা দেবী বললেন, এবার আমি দেখলুম আপনাকে বছর তিনেক পরে। কিন্তু কই, আমি ত ভুলিনি?

বললুম, বাঃ আপনাকে ভাল করে দেখলুম কবে? শাস্ত্রীমশায়ের কাছে বই আনতে যেতুম, আগের বই ফেরত দিয়ে চলে আসতুম। হয়ত এক-আধবার আপনাকে দেখে থাকব। এখন কী কথা আছে বলুন।

চলুন, এখানে নয়। যেতে যেতে বলব।—শীলা দেবী নিজেই এগোলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে দশাশ্বমেধ বোর্ডিংয়ের পিছনের গলিটায় দুটো সিঁড়ি পেরিয়ে চললুম।

শীলা দেবী বললেন, আমি কিন্তু এ গলিতে কখনো হাঁটিনি। আপনি এ পথ চেনেন?

বিলক্ষণ, সবাই চেনে।

বড্ড লোকজন গিজগিজ করছে। চলুন না একটু নিরিবিলিতে? বসবার জায়গা নেই কোথাও?

চলুন দেখি।—

এখন আর আমরা কোনও অপরিচয়ের মধ্যে নেই। উনি আমাদের বড়বাড়ির সবাইকে জানেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে প্রভাসের শ্বশুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। অনীতা ওরফে দুর্গাঠাকরুণ আমার বৌদিদি—এটি ওঁর জানা। আমার ভাগ্নী বুলি যে কিশোর বয়স থেকে বিধবা সে খবর উনি রাখেন।

কথা বলতে বলতে আমরা এক সময় ডানদিকে বেঁকে নেপালী মন্দিরে এসে নামলুম। এটি গাছের ছায়াঢাকা নিভৃত পশুপতিনাথের মন্দির। অনেক নিচে গঙ্গা মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে ঝিকমিক করছে। পাশ দিয়ে নেমে গেছে ঘাটের সিঁড়ি। এ মন্দির শহরের জনকোলাহল থেকে একটু দূরে, সেজন্য বড় একটা কেউ এদিকে আসে না। সব মিলিয়ে মন্দিরটি খুব বড় নয়।

জলের দিক ঘেঁষে আমরা শান-পাথরের এক জায়গায় এসে বসলুম।

মেয়ের পক্ষে অপমান—যদি সে মনে করে তার গরজই বেশি। সুতরাং গরজ আমারও আছে, এই তাকে বোঝানো দরকার। শীলা দেবী বললেন, অবাক কাণ্ড! আপনার চেহারা এত বদলে গেছে যে, আমি প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারিনি। সেদিন মাস্টারমশায়ের সঙ্গে আপনি মদনপুরা দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি দেখলুম জানলা দিয়ে। আমি যে হেমন্তবাবুর বউয়ের কাছে শেলাই শিখতে আসি!

এবার বললুম, আপনার স্বামী মারা গেছেন কদ্দিন আগে?

না, আমাকে 'আপনি' না,—তুমি! কই, আমার ত বাধে না তুমি বলতে?—শীলা বললেন, এতদিন ধরে আমি একমনে তোমাকে ভেবে এসেছি, আর আজ তুমি আমাকে আপনি-আজ্ঞে বলে দূরে সরাতে চাও? থাক্ স্বামীর কথা! কবে ঘর করলুম তার সঙ্গে যে তার কথা তুলব? কখ্খনো তার কথা আর বলো না!

আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলুম। এ মেয়ে কোন্ কথায় কোথায় আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? আমি ছোট গল্প লিখি, উপন্যাস লেখবারও চেষ্টা পাই। কিন্তু সে ত প্রত্যক্ষ জীবন নিয়ে কারবার করা নয়—সে যে আমার প্রগল্ভ কল্পনা। সেখানে আমারই মনের দুই রসের ধারা দুই কল্পিত নায়ক নায়িকার মুখ দিয়ে আমারই পছন্দমতো কথা নয় কি? কিন্তু এখানে? এ যে কাঁচা জীবন! একে ত দেখিনি বা বুঝিনি কোনদিন? আজ কী জবাব দেবো সামান্য সাধারণ মেয়ের প্রশ্নের?

ওর ওই দু'একটা কথায় আমি যেন খেলো হয়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু এবার আমি মুখ খুললুম,—কাল রাত্রে লুকিয়ে হঠাৎ আমার হাতখানা ধরেছিলে কেন

বলো ত ? কথাই বা কি আছে আমার সঙ্গে ?

এ আবার কী বলছ তুমি ?—শীলা বলল, আমি ত এই জন্যেই তোমাকে ডেকে আনলুম। তিন বছর ধরে দিনরাত যার কথা ভাবছি, তার হাত আর আমার হাত মিলে-মিশেই ত আছে। ছুঁয়েছি এই না হয় প্রথম। তুমি বুঝি খুব রাগ করেছিলে ?

আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি অন্য কথা ভেবেছিলুম !

শীলা এবার মুখ টিপে হাসল। বলল, আমার মতন মন্দ মেয়ে আগে কখনো দেখেছ ? জোর করে পুরুষমানুষের হাত ধরল, গলা টিপে এতদূর নিয়ে এল, কাছে বসিয়ে মনে-মনে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করছে,—এ মেয়ে মন্দ শুধু নয়, এ নষ্ট-দুষ্টু ! তাই না ভেবেছিলে ?

কি জানি,—আমিও হেসে ফেললুম, আমি বোধ হয় কোনও মেয়েকেই স্পষ্ট করে কোনদিন দেখিনি। তুমি নতুন আমার কাছে।

আমার হাসিতে শীলাও যোগ দিল। পরে বলল, আমি নতুন তোমার চোখে, তুমি আমার কাছে কিন্তু নতুন নও। এই যে এতক্ষণ কথা বলছি, তুমিও মাথা নিচু করে শুনছ,—কিন্তু কই, মুখ তোলোনি ত ? নিজের মুখে সব কথা কেন বলব ? মানুষ ত চোখ দিয়েও বলে, হাসি-কান্না দিয়েও ত বলে ! তুমি কি কিচ্ছু শেখোনি ?

এবার আমি মুখ তুললুম। স্পষ্ট করে তাকালুম শীলার দুই চোখের দিকে। কিচ্ছু বললুম না, হাসলুম। শীলার দুই চোখের বড় বড় দুটো কালো তারা বড় বড় কালো পল্লবে যেন ছায়াঢাকা। গায়ের রঙে যেন কাশীর ভরা গঙ্গার আভাস পাওয়া যায়। আমি নাবালক নই। কী সে বলতে চায় আমি জানি। কিন্তু রবিঠাকুর হয়ত একদা এমনি দুটো চোখ কোথাও দেখে লিখে থাকবেন, "দেখেছি কালো চোখের পক্ষ্মরেখায় জলের আভাস/দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর বেদনা—"

এবার গা ঝাড়া দিয়ে বললুম, বলো ত শীলা, কী আছে তোমার মধ্যে ?

শীলা এক ঝলক হেসে উঠে দাঁড়াল। আরেকবার মট্‌কার চাদরখানা গুছিয়ে গায়ে জড়িয়ে বলল, আমার মধ্যে ? আমার মধ্যে একটি ছোট্ট কথা আছে লুকিয়ে। অনেক খোসা ছাড়ালেও সেটি খুঁজে পাবে না কোনদিন। চলো, এবার যাই। তোমাকে ডেকে এনেছিলুম এই কথা বলতে যে, সে কথা তুমি শুনবে না কোনদিন।

আমি এখন যাব না।

তাহলে আমিই চলে যাব তোমাকে ফেলে! শীলা বলল, তাহলে তুমি দাঁড়িয়ে থাকো এই মন্দিরে, নিচে গঙ্গা বয়ে চলুক! থাকো এখানে শিবের গায়ে-গায়ে—যতকাল ধরে গঙ্গার স্রোত ছুটবে কাশীর পায়ের তলা দিয়ে! পারবে দাঁড়িয়ে থাকতে ততকাল? চলো, আর না—। তুমি শুনতে চাওনি, কিন্তু আমার কথা বলা হয়ে গেছে!

তা হলে এখানেই সব শেষ করে দিতে চাইছ?

শীলা ফিরে দাঁড়িয়ে আমার একখানা হাত ধরে বলল, এসো। না, এখানে শেষ নয়, এখানে আরম্ভ। ঠিক জায়গায় গিয়ে ঠিক সময়টিতে শেষ হবে। চলো—।

শীলা সেদিন ধরে এনেছিল ওদের বাড়িতে। চৌষট্টির গলি ছাড়িয়ে হাতী-ফটকা পেরিয়ে দেবনাথপুরায় ঢুকে দুটো গলি পেরোলেই ওদের বাড়ি। নিচের তলাটা ঝরঝরে, খটখটে—দুদিক থেকে আলো-হাওয়া আসে। দক্ষিণে বেশ চওড়া বারান্দা—শীতের দিন রোদ পাবার স্ববিধা। এ বাড়ি আমার খুবই চেনা। এ বাড়িতে আমার বহুদিনের যাতায়াত।

শাস্ত্রীমশায়ের সামনে আমাকে নিয়ে হাজির করল শীলা। বলল, জ্যেঠামশাই, এই দেখুন আপনার পুরনো ছাত্র এসেছেন।

কে? আরে তুমি? এসো বাবা, এসো-·

আমি দু'পা এগিয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিলুম। শাস্ত্রীমশায় বললেন, কিশোরের মুখে শুনেছি তুমি পাঞ্জাব থেকে ফিরে এসেছ। ভালই করেছ। কদ্দিন আছ?

বললুম, দশ-বারো দিন হল এসেছি, দু-চারদিনের মধ্যেই ফিরব। আমি আপনার এখানেই আসছিলুম, শীলা দেবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কালীতলায়।

উনি বললেন, হ্যাঁ কাল গেছে রাস, আজ পারণ। ওর পিসিমার পুজোটা দিতে গিয়েছিল কালীতলায়। যাই হোক, তোমার চেহারাটা এবার একটু ডাকাবুকো হয়েছে যেন। অনেক দিন পরে দেখছি ত?

আমি খুব হেসে উঠলুম। শীলা গা-ঢাকা দিয়েছিল।

দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বৃদ্ধা পিসিমা। আমি গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি আমাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, তা কেন বলছ, বৈকুণ্ঠ? ওই বয়সে কিশোরের চেহারাটা ভাঁবো দেখি? সেও ছিল মউরছাড়া কার্তিক। সাণ্ডেলগুষ্টির ধরনটাই ওই।

শীলা এবার ফিরে এলো। পিসিমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার চোখে সে

চোখ রাখল। পরে বলল, জ্যেঠামশাই, কাল ওঁর বউদিদিরা যাচ্ছেন বিশ্বনাথের শয়নারতি দেখতে। ওঁদের সঙ্গে আমি যাব জ্যেঠামশাই?

স্নানের সময় হয়েছিল শাস্ত্রীমশায়ের। তিনি উঠছিলেন। বললেন, শয়নারতি? তা মন্দ কি? রাজবেশ দেখতে ভালই ত লাগে। বেশ, যেয়ো মা। কাল সন্ধ্যায় তাহলে উপনিষৎ পড়াটা স্থগিত রেখো?

পিসিমা বললেন, ফিরতে যে অনেক রাত হবে, শীলা?

হোক না পিসিমা—শীলা বলল, বড় বউদিদিকে বলব আমাদের দরজা অবধি যেন পৌঁছিয়ে দিয়ে যান।

শাস্ত্রীমশায় আমার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে স্নানে গেলেন। পিসিমা আমাকে একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়বেন না। তারই এক ফাঁকে চাপাগলায় শীলা আমাকে জানিয়ে দিল, কাল সন্ধ্যে ঠিক সাড়ে সাতটায় কালীতলায়—। মাথার দিব্যি রইল কিন্তু। ঠিক আসা চাই।

কপটতায় আমি সেদিনও সিদ্ধহস্ত হইনি। কিন্তু নিঃসঙ্কোচ ও বিনা দ্বিধায় সেদিন শীলা তার শান্ত ও নম্রহাস্যে পিসিমা ও জ্যেঠামশায়কে এমন এক পরিস্থিতিতে প্রতারিত করল যেটি লক্ষ্য করে আমার সর্বাঙ্গে একটা কাঁপন ধরে গেল। আমি সম্মোহিত, বিমূঢ়—আমি যেন পক্ষাঘাতে অচেতন। জনৈকা বিধবা যুবতীর পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, নৈতিক শুচিতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা —সমস্তই যে এই প্রতারণার ফলে বিপন্ন হতে পারে, শীলা সেটি ভাবল না। আমি ওর মুখের দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে ছিলুম।

সেদিন পিসিমার হাতের মিষ্টি খেতে গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে আমার গা ঘুলিয়ে উঠছিল।

॥ প্রথম পর্ব প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥